

কালিদাস ।



কবিতার প্রতি দাসদাস অলিখিত

কালিদাস-কবিতা-মণি-মাল্য - বাণিজ্য-বাণিজ্য
 Chitra Press, Calcutta.

কালিদাস ।

‘মহাকবি কালিদাস বিরচিত, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত,
রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্কশী ও
অভিজ্ঞান-শকুন্তল,— এই ছয়খানি
কাব্যের সমালোচনা ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পদ্মশাত্তাব্দোদ্যাপক, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও ‘লেকচারর,’ ‘দত্তক-
বিধি-বিসার’ ‘কালিদাস ও ভবভূতি’
প্রভৃতি গ্রন্থ-কারক —

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত ।

কলিকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর ৪ নং, বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্র ভূতপূর্ব
সদস্য ও অধ্যাপক, বিবিধ-ভাষাভিৎ, স্থ প্রসিদ্ধ —

হরিনাথ দে এম্, এ, (ক্যান্টাব এবং কলিকাতা)

মহোদয়-লিখিত-ভূমিকা-সংবলিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হটেল

এস, সি, বসু কর্তৃক

প্রকাশিত ।

১৩১৭

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ।

এই পুস্তক, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, এস, সি, বঙ্গুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীনবহুদর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় বিচারপতি

ডাক্তার

শ্রীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী,

সি. এস. আই, এম. এ, ডি. এল., ডি. এস. সি., এফ. আর. এ. এস.,

এফ. আর. এস. ই. মহোদয়েষু—

বিশ্বোদ্ভাসি-বশঃ-সুধাকর ! কৃপা-সৌজন্ত-পাথো-নিধে !

বাগদেবী-বর পুত্র ! ভারত-মহী-সোভাগ্য-গর্বেক-ভূঃ !

ভাষা-কৈরবিনী-প্রবোধন-বিধো ! বিশ্বজ্ঞানেকাশ্রয় !

বিন্মস্তা ভবতঃ সরোজকরয়ো দীনা মমেয়ং কৃতিঃ ।

প্রশুকার ।

চিত্র-সূচিকা

| • চিত্র । | পত্রাঙ্ক । |
|--------------------------------------------------------|------------|
| ১। হর-সমাধি-ভঙ্গ | ৬৩-ক |
| ২। রামগিরিতে বিরহী যক্ষ | ১০১-ক |
| ৩। পঞ্চবটাবন, গোদাবরীতট, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ | ১২৭-ক |
| ৪। নিশীথে কুশ ও অযোধ্যার অধিদেবতা | ২২৫-ক |
| ৫। লতা হইতে উর্বশী | ৩৫০-ক |
| ৬। শকুন্তলার প্রতি দুর্কাসার অভিলাষ | ৪৪৩-ক |

নিবেদন ।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাবলীর সমালোচনা বড়ই ছুঁকর কার্য্য । আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই, এ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । বহুকাল পূর্বে, প্রাচ্যঃসরগীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব'-শীর্ষক একখানি অতি উপাদেয় পুস্তিকা প্রণয়ন-পূর্ব্বক সংস্কৃতামোদী বিদ্যার্থীগণের কাব্য-সমালোচনা-শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট কৌতূহল-বৃদ্ধি এবং সহায়তা করিয়া গিয়াছেন । প্রকৃত প্রস্তাবে, সংস্কৃত কাব্যের তাদৃশ সমালোচনা ঐ-ই প্রথম । বঙ্গের সাহিত্য-রাজ্যের সম্রাট্‌রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি, আই, ই, বাহাদুর মহোদয়ও, বহুদিন পূর্বে, তদীয় 'বঙ্গদর্শন'-নামক মাসিক পত্রে, মহাকবি ভবভূতি প্রণীত, 'উত্তরচরিত' নাটকের এক অতি চমৎকারিণী ও হৃদয়-গ্রাহিণী সমালোচনা করিয়াছিলেন । রায় বাহাদুরের ঐ সমালোচনার পর, ওরূপ প্রবন্ধ আর বাহির হয় নাই । কতিপয় বৎসর পূর্বে, মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, মহোদয়, অতি দক্ষতার সহিত, উত্তরচরিত, রত্নাবলী ও মুচ্ছকটিক প্রভৃতি কয়েক খানি সংস্কৃত নাটকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া, বঙ্গ-ভাষার অশেষ গৌরব-বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন । কলিকাতা সংস্কৃত কালোজের বর্তমান অধ্যক্ষ, নানা ভাষায় সুপণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাক্ষুষণ, এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়, 'ভবভূতি' সম্বন্ধে একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া, বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন । বর্তমান চিন্তাশীল লেখকগণের অন্ততম, মনস্বী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, এবং নিপুণ-দৃষ্টি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়, বথাক্রমে, 'শকুন্তলাতত্ত্ব' ও 'শকুন্তলারহস্ত' নামে, মহাকবি কালিদাসের 'সর্কস্ব' অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের অতি সুন্দর সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ-পূর্ব্বক বঙ্গভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন

করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, আরও কতিপয় কাব্যামোদী ব্যক্তি, প্রসঙ্গ-ক্রমে, দুই একখানি সংস্কৃত কাব্যের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের অনিকাংশ কাব্যই এখনও অসমালোচিত রহিয়াছে। ভারতের সম্রাটগণ কবির কাব্যাবলী-সম্বন্ধে এত প্রকার উদাসীন-প্রকাশ, ভারতবর্ষের তথ্য-সংবাদীর যে একান্ত লজ্জার বিষয়, সে পক্ষে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যদিও বর্তমান কালে, অনেক কৃতি-দাতা ব্যক্তি, অতি আগ্রহ-সহকারে সংস্কৃতভাষার আলোচনা করেন, সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সে মনস্তত্ত্ব যেন সাময়িক আশ্ব-প্রসাদের ছাত্র। তাহারা ভারতের প্রাচীন কবিগণের আলৌকিক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-দর্শনে, নিজে নিজে, অতুল আনন্দ-রস আপ্ত হইয়া বসে, কিন্তু তাঁহাদের উজ্জল প্রতিভালোকে ঐ সমুদয় নিসর্গ-রমণীয় প্রতিমা, তাহারা অন্ধের নয়নে প্রদীপিত করেন না, বা করিবার যেন আবশ্যকতাও বোধ করেন না।

ইউরোপের গৌরবকেতন, মহাকবি সেক্সপীয়ার, কতকাল পূর্বে, তাহার অনুপম কাব্যাবলী নিম্নিত করিয়া গিয়াছেন, আর অদাবধিও সেই সকল কাব্যের সমালোচনা, অপ্রতিহত-ভাবে আবির্ভূত হইয়া, পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমাজের গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে। উক্ত মহাকবি-নিম্নিত চরিত্র সমূহের কত প্রকার সমালোচনা কত মনস্বী করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন! এমন বৎসর নাই, অথবা এমন নাস নাই, যখন, সেক্সপীয়ারের কাব্যাবলী সম্বন্ধে কিছু না কিছু নূতন সমালোচনা না হইতেছে। টেইন, ডাউডেন, জারভিল্লুস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ, সেক্সপীয়ারের কাব্যাবলীর যে সমুদয় অপূর্ণ অপূর্ণ সমালোচনা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, সে সমুদয়কে পাশ্চাত্য সাহিত্য-ক্ষেত্রের, এক একটা অভভেদী ‘মহামেণ্ট’ বলিলেও অত্যাতিয়াই নাই। এখনও ‘সেক্সপীয়ার সোসাইটি’ নামিকা সমিতি, অদম্য

উৎসাহের সহিত, উক্ত মহাকবির কাব্য-সমালোচনার তৎপর রহিয়াছেন ! কেবল সংস্কৃত-পীয়ারের নহে, পাশ্চাত্য অপরাপর কবিগণের কাব্যাবলীও এই প্রকারে সমালোচিত হইতেছে । পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, স্বদেশের মহাকবির আলোচনা কর, স্ব স্ব জাতীয় গৌরব বলিয়া মনে করেন ।

কিন্তু হায়, আমাদের মহাকবি কালিদাস-তবভূতি প্রভৃতির অমৃত-নিশ্চন্দ্রিনী কবিতাবলী এই ভাবে আলোচনা করিতে আমরা কয়জনে তৎপর ? যে কালিদাসের কবিতারসের কিঞ্চিন্দ্রাত্র আশ্বাদনে, বা তদীয় অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির যৎকিঞ্চিৎ অবধারণে, আমরা জীবন সার্থক মনে করি, যে কালিদাসের কাব্যাবলীর আলোচনা-কালে, আমরা সংসার ভুলিয়া যাই, আপনাকে ভুলিয়া যাই, তন্ময় হইয়া পড়ি,—সেই কালিদাসের কবিতার আলোচনা আমরা কয়জনে করিতে উৎসুক ?

যে দীর্ঘ মাহেন্দ্র-ক্ষেণে, মহামতি স্যার উইলিয়ম্ জোনস্, কালিদাসের কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, যে দিন মণিয়র উইলিয়ম্, উইলসন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য গুণজ্ঞ পণ্ডিতগণ, আমাদের উপেক্ষিত মহাকবিকে আদর করিয়া তাঁহাদের স্বদেশের সম্মুখে পরিচিত করিয়াছিলেন, তদবধি আজ পর্য্যন্ত, ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিদ্বৎ-সমাজে, কালিদাসের কবিতা, কত ভাবে, কত নিপুণতার সহিতই না আলোচিত হইতেছে ! কিন্তু আমরা উদাসীন ! আমরা এমনই ‘গম্ভীর-বেদী’ হইয়া পড়িয়াছি, যে, কিছুতেই যেন চৈতন্য নাই !

আমি সংস্কৃত সাহিত্যের বটটুক অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়াছি, তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি যে প্রকৃত প্রস্তাবে, কালিদাস-তবভূতি প্রভৃতির অল্পমম কবিত্বের যথার্থ পরিচয়-লাভ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-গণের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না । ভূরি ভূরি পাঠ্যপুস্তকের হুর্দহ ভারে, স্কুলমার-

মতি ছাত্রগণের সহজ-নম্য অন্তঃকরণ অতিশয় দমিয়া পড়ে, তাই অধ্যাপনাকালে, তাঁহাদের স্বক্কে, আরও উপরিচাপ দিতে, হয়ত, অনেক অধ্যাপকেরই প্রাণে বাধা লাগে। সেই জন্ত, বোধ হয় অধ্যাপকগণও এই বিষয়ে, তাদৃশ প্রয়াস করেন না।

বর্তমান সংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, বাহ্যতে ছাত্রগণ, মাত্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ না করিয়া, সেই সেই গ্রন্থের প্রকৃত তত্ত্ব, কবির প্রকৃত অভিপ্রায়, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তদনুযায়িনী শিক্ষার বিস্তার-সাধন। সূচাক্রমে একখানি গ্রন্থের অধ্যয়নও বরং উত্তম, কিন্তু অপ্রবুদ্ধতাবে বহু গ্রন্থের অধ্যয়নও বাঞ্ছনীয় নহে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধু উদ্দেশ্য সমাক্ষেপ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কালিদাসের কাব্য-সমালোচনা-দ্বারা অধ্যয়নার্গিগণের কথঞ্চিৎ সহায়তা করিবার জন্ত, এবং সাধারণে কালিদাসের কবিত্বের, আমার অত্যন্ত সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব, আভাস দেওয়ার জন্ত, এবং পরিশেষে, স্বদেশের মহাকবিগণের কাব্যাবলীর আলোচনা করিয়া, আপনাকে ধন্য ও পবিত্র করিবার জন্ত, আমি এই ছুটির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। সংকাব্যাবলীর যত অধিক আলোচনা হয়, সমাজ এবং সাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। সংকাব্যের আলোচনার দেহ-মন পবিত্র হয়, চিত্তে অনির্বচনীয় প্রশাদ জন্মে, সংকার্য্যে প্রবৃত্তি ও অসংকার্য্যে নিবৃত্তি জন্মে। সংকাব্যের আলোচনায় অপরিমেয় পরিতৃপ্তি। তাই আমার এই ছুঃসাহস।

স্বর্গগত, দয়ার সাগর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তদীয় ‘সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব’—নামক গ্রন্থে সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনার যে পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আমি সেই পথেই যাত্রা করিয়াছি। কতিপয় স্থলে, তাঁহার বাক্য অবিকল উল্লেখ করিয়া, আমার গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছি। আমি অনেক স্থলে, কবি-ব্যবহৃত শব্দের ‘ ‘ এইরূপ চিহ্ন দিয়া, যথাযথ-ভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, অশেষ ভাষাবিৎ, ভুবন-
বিখ্যাত, মাননীয় মনস্বী শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে, এম্, এ, মহোদয়, অনুগ্রহ-
পূর্বক, আমার এই নিক্কিৎন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া, আমাকে গৌর-
বিত ও অপরিশোধা স্বৰ্ণে আবদ্ধ করিয়াছেন। কঠিন পৰ্কত-গাত্রে কুসু-
মিত লতিকার ছায়া, আমার এই নীরস গ্রন্থের পক্ষে, পরম শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত দে মহোদয়ের লিখিত এই ভূমিকা, সুন্দর অলঙ্কার-স্বরূপ। শ্রীযুক্ত
দে মহোদয়, তদীয় প্রকৃতি-সিদ্ধ মহানুভবতা-গুণে, আমার ধন্যবাদটি
পর্যাপ্ত গ্রহণ করিতে লজ্জিত। তথাপি আমি তাঁহার নিকটে আমার
অন্তরের নির্বাক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সংস্কৃত কালেন্দের ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক, আমার অগ্রজকল্প, সংস্কৃতে ও
বাঙ্গালায় বহুবিধ গ্রন্থে রচয়িতা, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
মহাশয়, অনুকম্পাপূর্বক, এই পুস্তকের অনেক স্থল সংশোধন করিয়া
দিয়া, আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

সাধারনসারে যত্ন করিয়াও, আমি মুদ্রাবস্তুর কবল হইতে ত্রাণ
পাই নাই। হয়ত, দেখিয়া দিয়াছি একরূপ, মুদ্রিত হইয়াছে অন্তরূপ।
যাহা হউক, পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রত্যেকের নিকট, পৃথগ্ভাবে, আমার
কৃতজ্ঞলিপিতে প্রার্থনা—

অযুক্তমস্মিন্ যদি কিঞ্চিৎকৃতং অজ্ঞানতো বা মতিবিভ্রমাদ্বা
ঔদার্য্য-কারুণ্য-বিগুহ্ব-ধৌতি মর্ন্য-বিভিস্তং পরিশোধনীয়ম্ ॥

কলিকাতা,
সংস্কৃত কালেন্দ্র,
১৫ই চৈত্র,
১৩১৫।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দেবশর্মা

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

‘কালিদাস’ গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে গ্রন্থের কতিপয় স্থান বিশেষ ভাবে সংশোধিত ও একখানি চিত্র পরিত্যক্ত হইল। গ্রাহকবর্গে: সুবিধার জন্ত, পুস্তকের মূল্যও হ্রাস করা গেল। এইক্ষেণে প্রার্থনা—পাঠকবৃন্দ, পূর্ব বারে, কালিদাসের প্রতি যে প্রকার স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কালিদাস এবারেও যেন সেটরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য হয়। ঠিকি—

কলিকাতা,
সংস্কৃত কলেজ,
১৫ই চৈত্র,
১৩১৭

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দেবশর্মা ।

সূচিকা ।

| | | |
|-------------|-------------------------------|------------|
| • ভূমিকা | শিঃ হরিনাথ দে, এম, এ, লিখিত । | |
| অধ্যায় | বিষয় । | পত্রাঙ্ক । |
| ১ম অধ্যায় | সংস্কৃতকাব্য, | ১ |
| ২য় অধ্যায় | কালিদাস, | ৩ |

১। কুমার-সম্ভব । ২১—৮২ ।

| | | |
|--------------|--------------------|----|
| ৩য় অধ্যায় | কুমার-সম্ভব, | ২১ |
| ৪র্থ অধ্যায় | কুমারের বৃত্তান্ত, | ২৮ |
| ৫ম অধ্যায় | কুমার ও পুরাণ | ৩৬ |
| ৬ষ্ঠ অধ্যায় | পার্বতী, | ৪১ |
| ৭ম অধ্যায় | মদন, | ৫১ |
| ৮ম অধ্যায় | হর-সমাধি-ভঙ্গ, | ৫৭ |
| ৯ম অধ্যায় | তাৎপর্য, | ৬৬ |
| ১০ম অধ্যায় | সাধনা ও সিদ্ধি, | ৭৪ |
| ১১শ অধ্যায় | উপসংহার, | ৮৩ |

২। মেঘদূত । ৮৭—১০৪ ।

| | | |
|-------------|--------------|----|
| ১২শ অধ্যায় | মেঘদূত, | ৮৭ |
| ১৩শ অধ্যায় | নূতন সৃষ্টি, | ৯৩ |

৩। রঘুবংশ । ১০৫—২৫৩ ।

| | | |
|-------------|---------|-----|
| ১৪শ অধ্যায় | রঘুবংশ, | ১০৫ |
| ১৫শ অধ্যায় | দিলীপ, | ১১২ |

| অধ্যায় | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|-------------|---------------------|----------|
| ১৬শ অধ্যায় | পুত্র-লাভ | ১২৩ |
| ১৭শ অধ্যায় | রঘু, | ১২৮ |
| ১৮শ অধ্যায় | সুপ্রভাত, | ১৩৬ |
| ১৯শ অধ্যায় | ইন্দুমতীর স্বয়ংবর, | ১৪১ |
| ২০শ অধ্যায় | ইন্দুমতী-বিয়োগ, | ১৫২ |
| ২১শ অধ্যায় | দশরথ, | ১৬১ |
| ২২শ অধ্যায় | রাম, | ১৬৮ |
| ২৩শ অধ্যায় | বনবাস, | ১৭৩ |
| ২৪শ অধ্যায় | আকাশ-পথে, | ১৮৪ |
| ২৫শ অধ্যায় | পূৰ্ণস্মৃতি, | ১৮৯ |
| ২৬শ অধ্যায় | বজ্রাঘাত, | ২০১ |
| ২৭শ অধ্যায় | বিসর্জন | ২০৮ |
| ২৮শ অধ্যায় | যবনিকা-পতন | ২১৬ |
| ২৯শ অধ্যায় | নিশাথ-স্বপ্ন, | ২২৩ |
| ৩০শ অধ্যায় | অধঃপতন, | ২৩৩ |
| ৩১শ অধ্যায় | দীপ-নির্বাণ, | ২৩৯ |
| ৩২শ অধ্যায় | উপসংহার, | ২৪৩ |

৪। মালবিকাগ্নিমিত্র । ২৫৪—৩৩১।

| | | |
|-------------|----------------------|-----|
| ৩৩শ অধ্যায় | মালবিকাগ্নিমিত্র, | ২৫৪ |
| ৩৪শ অধ্যায় | নাটকীয় বৃত্তান্ত, | ২৬৪ |
| ৩৫শ অধ্যায় | মালবিকার আত্মোৎসর্গ, | ২৬৯ |
| ৩৬শ অধ্যায় | উপবনে মালবিকা, | ২৮৪ |
| ৩৭শ অধ্যায় | মালবিকার পরিণয়, | ২৮৮ |

| অধ্যায় | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|-------------|--------------|----------|
| ৩৮শ অধ্যায় | অগ্নিমিত্র, | ৩০৪ |
| ৩৯শ অধ্যায় | ধারিণী, | ৩০৭ |
| ৪০শ অধ্যায় | ইরাবতী, | ৩১৩ |
| ৪১শ অধ্যায় | বিদুষক, | ৩২১ |
| ৪২শ অধ্যায় | পরিব্রাজিকা, | ৩২৫ |
| ৪৩শ অধ্যায় | উপসংহার, | ৩২৯ |

৫। বিক্রমোর্কশী। ৩৩২—৩৭৯।

| | | |
|-------------|------------------------------|-----|
| ৪৪শ অধ্যায় | বিক্রমোর্কশী, | ৩৩২ |
| ৪৫শ অধ্যায় | বৃহাস্ত, | ৩৩৭ |
| ৪৬শ অধ্যায় | উর্কশীর মুক্তি ও পুনর্কল্পন, | ৩৩৯ |
| ৪৭শ অধ্যায় | অভিশপ্তা উর্কশী, | ৩৪৪ |
| ৪৮শ অধ্যায় | লতাময়ী উর্কশী, | ৩৪৯ |
| ৪৯শ অধ্যায় | পুরুষবার উন্মাদ, | ৩৫৫ |
| ৫০শ অধ্যায় | দেবী ঔশীনরী, | ৩৬৩ |
| ৫১শ অধ্যায় | উপসংহার, | ৩৭৭ |

৬। অভিজ্ঞান-শকুন্তল। ৩৮০—৪০০।

| | | |
|-------------|-------------------|-----|
| ৫২শ অধ্যায় | অভিজ্ঞান-শকুন্তল, | ৩৮০ |
| ৫৩শ অধ্যায় | কল্পনা, | ৩৮৭ |
| ৫৪শ অধ্যায় | সৃষ্টি কোশল, | ৩৯৫ |
| ৫৫শ অধ্যায় | শকুন্তলা, | ৪০৬ |
| ৫৬শ অধ্যায় | সতীর আত্মমর্যাদা, | ৪৩০ |
| ৫৭শ অধ্যায় | শাপ না শাসন ? | ৫৩৯ |

| অধ্যায় | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---------------|---------------|----------|
| ৫৮শ . অধ্যায় | বিদায়, | ৪৪৮ |
| ৫৯ম অধ্যায় | অপরিচিতা, | ৪৫৪ |
| ৬০ম অধ্যায় | সতীত্বের জয়, | ৪৬২ |
| ৬১ম অধ্যায় | দুঃখান্ত, | ৪৭০ |
| ৬২ম অধ্যায় | ধর্ম্মের জয়, | ৪৮১ |
| ৬৩ম অধ্যায় | পুনর্মিলন. | ৪৯৬ |
| ৬৪ম অধ্যায় | উপসংহৃত, | ৫০০. |

INTRODUCTION.

A new book on Kalidasa and his poetry would now-a-days be considered a work of supererogation, unless the writer has something new to say about the poet and his productions. The date of Kalidasa has been at last conclusively settled by the industry of two eminent scholars, viz., Dr. T. Bloch and Pandit Ramavatara Sharma *Sahitya-charya*, the results of whose researches, carried on independently of each other, happily agree in almost every detail. They have succeeded in satisfactorily proving from evidence, both internal and external, that the author of *Raghuvamsham* and *Kumarasambhavam* flourished during the reign of Chandragupta II, Vikramaditya, and that of his son Kumaragupta. Obvious references to the Gupta kings are to be found in lines like—

“आसमुद्रचित्तौगनाम् etc.”¹

—which contains a covert allusion to the line of kings beginning with Samudragupta,—

“तच्चै सभ्याः सभाय्याय गोप्ते गुप्ततमेन्द्रियाः ।”²

“अन्वाख्य गोप्ता गृहिणी-सहायः ।”³

(1) *Raghuvamsham*, 1—5.

(2) *Raghuvamsham*, 1—255.

(3) *Raghuvamsham*, 2—24.

—both of which contain a direct reference to the Gupta dynasty.

Moreover Chandragupta II is plainly alluded to in the well-known simile :—

“तनु-प्रकाशेन विचेय-तारका

प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ।”¹

Again allusions to Kumaragupta are to be found in passages like—

“इक्षुच्छाय-निषादिन्यः तस्य गोप्तुर्गुणोदयम्

षाकुमार-कथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ।”²

Lastly, it must be remembered that there is a remarkable coincidence of details between the conquests of Samudragupta which are mentioned in the Allahabad pillar inscription which goes after his name, and the victories of Raghu which are ushered in by the famous lines—

“स गुप्त-मूल-प्रत्यन्तः शुद्ध-पार्श्विरयान्वितः ।

षड्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्-जिगीषया ॥”³

About the works of Kalidasa we have but little to say. The *Meghaduta* seems to have been his earliest work. The idea of the cloud being employed as a messenger has been imitated in German poetry by Schiller, who, in his drama

(1) *Raghuvamsham*, 3—2.

(2) *Raghuvamsham*, 4—20.

(3) *Raghuvamsham*, 4—26.

Maria Stuart, puts the following appeal in the mouth of the captive Scottish Queen :—

“Eilende Wolken ! Segler der Luefte !
 Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte !
 Gruesset mir freundlich mein Jugendland !”
 (“Hurrying clouds ! Ye sailors of the air !
 O that one could wander and sail with you !
 Greet kindly on my behalf—the land of my
 youth”.)

Kalidasa, however, was not the first to treat the cloud as a messenger. A Chinese poet of the 2nd century A.D. named *Hsiu Kan*, who, according to professor H. Giles (see his *Chinese Literature*, p. 119), translated the famous work of *Nagarjuna*, entitled “*Pranyamula-shastra-tika*”, had sung 200 years before Kalidasa in the following strain :—

“O floating clouds that swim in heaven above,
 Bear on your wings these words to him I love...
 Alas ! You float along nor heed my pain
 And leave me here to love and long in vain.”.

Of the numerous pithy remarks imbedded in the *Cloud Messenger*, perhaps the best known is :—

“याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ।”¹

which occurs in the famous stanza which may be translated as follows :—

"Scion of the Clouds Diluvian whose renown
 the world doth fill,
 I know the, Minister-Chief of Indra, changer
 of thy shapes at will,
 So to thee I pray now, severed from my spouse
 by cruel fate,
 Better far than base-born favour were refusal
 from one great."

This thought finds a remarkable parallel in a quatrain of Omar Khayyam which Whinfield has thus translated :—

“To wise and worthy men your time devote,
But from the worthless keep your walk remote ;
Dare to take poison from a sage’s hand,
But from a fool refuse an antidote.”

It is difficult to avoid the temptation of quoting the half-sensuous half-pathetic lines in which the love-lorn Yaksha describes his wife from whom he has been parted—

“Slender, fair, her teeth are pointed, and her lips
 with *bimba* vie,
 Deep her navel, thin her waist is, like the timid
 fawn’s her eye,

"Heavy hips her gait retarding, slightly bent by
 bosom's weight,
 Like Creator's first-framed woman—such is she,
 my beauteous mate.'

The best translations of *Meghaduta* in any European language are a metrical German version by the late Prof. Max Müller and the German prose-rendering by the scholar Schuetz, both of which unfortunately are out of print. The version of Schuetz was dedicated to our great countryman, Raja Radhakanta Deb, who had financially helped the poor German scholar when the latter had fallen on evil days owing to blindness and old age.

The *Kumarasambhavam* was probably the next great work of Kalidasa. In its present shape it consists of 17 cantos ; but out of these only the first eight were written by Kalidasa himself,—a fact recognised by Mallinatha who commented on these cantos only. The rest is the work of an inferior hand, for it is inconceivable that Kalidasa could ever have been guilty of errors of style and diction with which the last nine cantos of *Kumarasambhavam* abound. The *Kumarasambhavam*, as written by Kalidasa, ends with the nuptials of Hara and Parvati, and the birth o

Kārtikeya. It was in all probability composed by the poet with a view to celebrate the birth of Kumaragupta, the son of his patron Chandragupta II. The personal name of Kumaragupta, was Chandraprakasha,—a fact alluded to in the stanzas—

“राजापि लेभे सुतमाशु तस्मात्

पालोकमर्कादिव जीवलोकः ।”

“ब्राह्मे मुहूर्त्ते किल तस्य देवी

कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम् ।”

“रूपं तदोजस्रि तदेव वीर्यं

तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम् ।

न कारणात् स्वाद् विभिदे कुमारः

प्रवर्त्तितो दीप इव प्रदीपात् ॥”¹

The *Raghuvamsham* is the last and the greatest of the poet's epics. Its concluding portions are pervaded by a tone of sadness, a fact which would seem to indicate that the last days of the great poet were not happy. The scenes described in the later cantos of this poem are at once characterised by melancholy and pathos. For instance the description of the abandoned city of Ayodhya—

its broken hearths and terraces, its ruined ramparts, its streets frequented by jackals, its bathing-places infested by tigers, its homesteads haunted by serpents, its gardens ravaged by wild monkeys, its walls covered with cobwebs,—powerfully reminds us of Tennyson's famous picture of desolation in *Demeter and Persephone* :—

“By many a waste forlorn of man,

* * * * *

The jungle rooted in his shattered hearth
The serpent coil'd about his broken shaft,
The scorpion crawling over naked skulls :—
I saw the tiger in the ruined fane
Spring from his fallen God.”

Of the dramas of Kalidasa it is needless to say anything here. Sakuntala has hitherto been a favourite with Europeans, and may it long remain so ! Goethe's appreciative quartrain is already too well known to require a reference. A fuller appreciation of Sakuntala by him appears in a letter which he wrote towards the end of his life to the French Sanskritist Chézy, thanking the latter for his very kind gift of a copy of his edition of Sakuntala. This letter, which ought to be better known, is to be found in Hirzel's introduction to his German translation of Sakuntala.

I cannot conclude this introduction without paying a tribute to the memory of the late Prof. A. Stenzler, to whose Latin translation of *Raghuramsham* and *Kumarasambharam* the late Dr. K. M. Banerjea owes whatever is excellent in his edition of the two epics, and to that of the late Prof. Pischel, himself one of the most distinguished pupils of Prof. Stenzler, whose revised edition of the Bengali recension of *Sakuntala*, which is now being brought out by Prof. Lanman in America, will settle once for all the priority of the Bengali recension of the text of that drama.

It may also interest the reader to know that Dr. H. Beckh, a learned scholar of Tibetan and Sanskrit, has lately brought out an edition of the Tibetan version of the *Meghaduta*, a work which will prove of great use to learners of classical Tibetan. With this prefatory note I beg leave to introduce to the public Pandit Rajendra Nath Vidyabhushan's original appreciation of Kalidasa which I myself have read with much interest and enjoyment.

IMPERIAL LIBRARY,
Calcutta, 15th March 1909. }

HARINATH DE.

কালিদাস

প্রথম অধ্যায় ।

সংস্কৃত কাব্য ।

আমরা বখনই কোন সংস্কৃত কাব্যে অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টিপাত করি, তখনই দেখিতে পাই যে,—জগতে যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নূতন, নিষ্পাপ, নির্মল ও মনোহর,—সে সমস্তই যেন একত্র সঙ্কলন করিয়া,—যে স্থানে যেটির সন্নিবেশ করিলে, তাহার সুন্দরতা ও নির্মলতা আরও পরিস্ফুট হয়, তথায় তাহা ঠিক সেই ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া, ভারতের কবিতাময়ী চিত্র-শালিকার অমর ভাস্করগণ—স্বপ্ন এবং মনেরও অগোচর, অনির্বচনীয় চিত্রাবলী অঙ্কন করিয়াছেন। সেই হৃদয়োন্মাদিনী আলেখ্যমালা দর্শন করিতে করিতে, দর্শকবৃন্দ বখন, সৌন্দর্য্যে বিম্বিত, স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, হৃদয়প্লাবী ভাব-রসে নিমগ্ন হইতে থাকেন, মর্ত্তে থাকিয়াও স্বর্গের সুখ অহুভব করিতে থাকেন, সেই সময়ে, তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে—তদীয় অন্তঃকরণও যেন সাধুভাস হইয়া উঠে। নির্মল ও সুন্দর আলেখ্য-মালার সংসর্গে তাঁহাদের হৃদয়ও ক্রমে নির্মল ও সুন্দর হইয়া উঠে। তখন—সেই চিত্রাবলীর পরিদর্শন-কালে, তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে, যাহা-কিছু অসুন্দর, যাহা-কিছু অযশস্ব, যাহা-কিছু নীচ, তাহার চিন্তা পর্যাণ্ডও তিরোহিত হয় ; তখন সত্যাবের আবেশে দম্বকগণের মনঃপ্রাণ পুলকিত হয়। নির্মল আদর্শতলে,

বেমন প্রতিকৃতি সুপরিষ্কৃষ্টরূপে প্রতিভাসিত হয়, তজ্জন, তখন দর্শকগণের নিম্নলিখিত হৃদয়াদর্শে, কাব্যোন্নিখিত পুত-চরিত্র ব্যক্তি-সমূহের সাধুত্বের ও নিম্নলিখিত প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে । তাঁহাদের মতি গতি প্রবৃত্তিও সাধু হইয়া উঠে । তখন, তাঁহারা রামাদির দ্বায় জগৎ-পূজ্য-চরিত্র-সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, রাবণাদির দ্বায় হইতে চাহেন না । তাই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন,—সৎকাব্য যশস্কর, অর্থকর, ব্যবহার-জ্ঞান-প্রদ ও অমঙ্গল-হর ; সৎকবিতা, সাধ্বী বনিতার দ্বায় পরম-শাস্তিদায়িনী ও হিতোপদেশিনী । যাহারা পরিণত-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, যাহারা একান্ত অকুসুম-মতি, তাঁহারাও সৎকাব্যের আলোচনায়—কবি-নির্ম্মিত আদর্শ চরিত্রের আলো-নায় অশেষ শুভ-ফল প্রাপ্ত হইবেন^১ ।

পাঠকগণ নিম্নলিখিত আনন্দ-লাভের জন্ত কাব্য-পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন বটে, কিন্তু কাব্যের কল্পনাময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বকীয় দিব্য-প্রভাবে তাঁহাদিগকেও নিম্নলিখিত করিয়া তুলেন । পাঠকের অজ্ঞাত-সারে, তদীয় হৃদয়ের উপর এই প্রকার আধিপত্য-বিস্তারে, ভারতীয় মহা-কবিগণ এক প্রকার অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী বলিলেও, বোধ হয়, অত্যাশ্চর্য্য হয় না । এইরূপে, নিজের অলৌকিক কবিতালোকে, পাঠকের অন্তঃকরণ আলোকিত ও বশীভূত করিতে যে সমুদয় মহাকবিগণ সমর্থ হইয়াছেন, তন্মধ্যে 'কালিদাস সর্কোৎকৃষ্ট, স্তত্রাং তাঁহারই কথা আমাদের প্রথম আলোচ্য ।

১—'কাব্যঃ যশসেৎকৃত্যে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে ।

সদাঃ পরানবৃত্তয়ে কাণ্ডা-সম্মিততয়োপদেশযুক্তে ॥' কাব্যপ্রকাশ ।

চতুর্ভূজ-কল-প্রাপ্তিঃ সুখাদনধিয়ামপি

কাব্যাদেব—

সাহিত্যদর্পণ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

কালিদাস ।

‘ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অস্ত্রের হৃদয়ঙ্গম করা হুঃসাধ্য । যাহারা কাব্য-শাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন যে, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্কোৎকৃষ্ট নাটক, সর্কোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্কোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন । কোন দেশের কোন কবি, কালিদাসের জ্ঞায় সর্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ হয়, অভুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না’ ।’

মহাকবি কালিদাসের অমৃতময়ী কাব্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সর্বপ্রথমে একটি ব্যাপারে আমরা মুগ্ধ হই । দেখি, পৃথিবীর মধ্যে যাহা সুন্দর—হৃদয়ের উন্মাদকর, যাহা অপাপবিদ্ধ—প্রকাণ্ড, যাহা অমুপম, তাহাই কালিদাসের কাব্যের প্রধান উপজীব্য বা জীবন ।

জগতে কবিগণের বর্ণনীয় বিষয় দুইটি,—অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ । নীরঞ্জন-প্রতিম সুনীল প্রশান্ত আকাশ, নীল-নীরদ-প্রভ অনন্ত জলরাশি, ‘পূর্বাণর’-সমুদ্রাবগাহিনী অভ্র-ভেদিনী পর্বতমালা^১, ‘বসন্তোদায়-রমণীয়’ প্রকৃতির লীলাময়ী ‘শ্রামায়মান’ বনভূমি^২, ‘সৈকত-লীন-হংস-মিথুনা’ কলবাহিনী শ্রোতস্বিনী^৩ প্রভৃতি বহির্জগতের সুন্দর সুন্দর বস্তু ; আর,

১—বিদ্যাসাগর ।

২—কুমারসম্ভব ।

৩—শকুন্তলা ।

৪—ঐ ।

শ্রীতি, স্নেহ, দয়া, সৌন্দর্য, প্রেম, আত্মোৎসর্গ, সমবেদনা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তের সুন্দর সুন্দর বস্তু ;—এই সমস্তই যেন মহাকবি কালিদাসের নিজের সম্পত্তি । তিনি, এই সমুদয়ের—যেটির যে স্থানে ইচ্ছা, “বিনিয়োগ” করিয়াছেন । সব যেন বেতের মত ঘুরিয়া তাঁহার বর্ণনার অঙ্কুর হইয়া আসিয়াছে । যে স্থানে যে কথাটি বলিলে, যে স্থানে যে আঁচি প্রকাশ করিলে, তাঁহার নিসর্গ-সুন্দর আলেখ্য গুলির সৌন্দর্য—চাক্তা, আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হয়, তথায়, তাহা ঠিক সেইভাবে বসাইয়া-ছেন । যে ছবিতে প্রাণে উন্মাদ জন্মে না, যে কথায় কর্ণে অমৃত বর্ষণ হয় না, যে হাসিতে হৃদয় পবিত্র ও লঘু হয় না,—অথবা অধিক কি,—যে রসে হৃদয় বিধৌত হইয়া স্বচ্ছ দর্পণের ভায় নির্মল এবং ভাবগ্রহণের সমাক্ উপযোগী হয় না, তাদৃশ ছবি-কথা-হাসি বা রস কালিদাসের কাব্যে নাই । সুন্দর পদার্থ বাতিরিক্ত তিনি স্পর্শও করেন নাই ।

পর্বতের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, সেইটিই তাঁহার ; নদীর মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সেইটিই তাঁহার ; ঋতুর মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সেইটিই তাঁহার । তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা, স্বর্গের অলকা হইতে মর্ত্যের—ভারতের—তথা কালিদাসের বড় আদরের স্থল উজ্জয়িনী পর্যন্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে ।

মৃৎজীব সংসারের জালাবস্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া, কত সময়ে, কত প্রকারে, কাঁদিয়া, বিলাপ করিয়া কাটায়, দুর্দহ জীবনের ভার কথঞ্চিৎ লবু করে ! সেই সকল কান্নার বা বিলাপের মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে দারুণ, সর্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী, যে কান্না বা যে বিলাপ গুনিলে মনে হয়, প্রাণ দিলেও যদি ইহার উপশম হয়, তবে তাহাও দিই,—সেই কান্না, সেই বিলাপ, কালিদাস তাঁহার করুণাময়ী কল্পনা-বীণায় বজায়

করিয়াছেন'। যে সমুদয় গুণ থাকিলে মানুষ দেবতা হয়, সংসার স্বর্গ হয়, পৃথিবীর সর্ব সুন্দর দেখায়, কালিদাস সেই সকল গুণের আধার করিয়া তাঁহার কাব্যাবলীর প্রিয় নায়ক-সমূহ নির্মাণ করিয়াছেন। আবার সকল গুণের শ্রেষ্ঠ, সকল ধর্মের বরণ্য—যে আত্ম-ত্যাগ, তাহা দিয়া তদীয় নায়কের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনীয় সমস্তই সুন্দর। বসন্তের কোকিলা তাঁহার কল্পনার দূতী, মধুমােসের কুসুমগুচ্ছ তাঁহার কল্পনার অলঙ্কার, শরতের নিশ্চল কৌমুদী তাঁহার কল্পনার বসন, ভাগীরথীর নির্ঝর-শীকর তাঁহার কল্পনার পাদ্য, হিমালয়ের গুহামুখ-জাত নির্ঝর-শীকর-সিক্ত শ্রামল দুর্কারাজি তাঁহার কল্পনার অর্ঘ্য।

তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা কখন আকাশ পথে বিচরণ করিতে করিতে 'লবণাশ্রু-শির' 'তমাল-তালী-বনরাজি-নীলা' বেলা ভূমির লাবণ্য দর্শন করিতেছে*। কখন বা, অভ্র-ভদ্রা পর্বতের নিতম্বদেশে সঙ্করণ-শীল, চঞ্চল, ঘন-কৃষ্ণ মেঘমালায় ক্রোড়া দেখিয়া, তাঁহার কল্পনা-সুন্দরী আপনাকে আপনিই ভুলিয়া যাইতেছে*। আবার কখনও বা, উন্মাদিনী নিজেই মেঘময়ী হইয়া, বৃকের উপরে কবিকে বসাইয়া, আকাশ-পথে উড়াইয়া, কোথায়—কোন্ অস্ত্রের জগতে ছুটিয়াছে*। কখন দেখি, শাস্ত্র-তপোবনের জীবন্ত শাস্ত্র-প্রতিমা ঋষি-কন্যা-দিগের সহিত তাঁহার কল্পনা, বালিকার ছায় কুসুম-চয়নে বা আলবাল-পরিপূরণে মাতিয়া রহিয়াছে, ভ্রমরের সহিত খেলা করিতেছে, হরিণের সহিত ছুটাইয়া কহিতেছে*। আবার কখন হয়ত, রাজাধিরাজের অন্তঃপুরে উপেক্ষিতা অভিমানিনী মহিষীর ককণকঠে কণ্ঠ মিশাইয়া কতই না ক্রন্দন করিতেছে। পরক্ষণেই

১—রঘু—৮ম সর্গ, অজ-বিলাপ; ১৪শ সর্গ, নির্বাসিতা সীতার বিলাপ। কুমার—৪র্থ সর্গ, রতিবিলাপ প্রভৃতি।

২—রঘু, ১৩শ সর্গ মোক—১৫শ। ৩—কুমার, ১ম সর্গ, মোক মে। ৪—বিক্র
১, ৪র্থ অঙ্ক, শেষ মোকের পূর্বমোক। ৫—অভিজ্ঞানশকুন্তল, প্রথম অঙ্ক

আবার ‘অভিনবমধু-লোলুপ’ রাজার মনের মধ্যে যে মন—তাহার মধ্যে চুকিয়া, জন্মান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, বিমুগ্ধ নরপতিকে ‘পূৰ্ব্বাৎ-স্মক’ করিয়া তুলিতেছে^১ । রাজরাজেশ্বরের বড় আদরের কঙ্কাকে, জনক-জননীর স্নেহের পুত্রলিকাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া, জটাবকুল পরাইয়া, পৰ্ব্বতে পৰ্ব্বতে, গুহায় গুহায়, লইয়া বেড়াইতে তাঁহার কল্পনার কতই না আনন্দ^২ ।

‘উদাসিনী’ রাজ-নন্দিনীকে কখন, নিজহস্তে পদ্ম-রাগ-বিনন্দী অশোক-কুসুমের অলঙ্কার দিয়া তাঁহার কল্পনা সাজাইতেছে, কখন কাঞ্চন-কাস্তি কর্ণিকার পুষ্পে রাজকন্യാর বেশ-বিক্রাস করিতেছে, ছুগ্ধ-ধবল সিঁদুর প্রস্থনের মালা রচনা করিয়া, মৃত্যুর মালার ত্রায় তাঁহার ‘বন্ধুর’ কণ্ঠে দোলাইয়া দিতেছে । রাশি রাশি বসন্ত কুসুমের—বসন্ত পল্লবের আভরণে সাজসজ্জা করিয়া সেই উদাসিনী রাজকন্യാ যখন মন্দির-পদে চলিয়া যান, তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, বুঝি ‘পুষ্পস্তবকাবনজা’ ‘পল্লবিনী’ কোন বাসন্তী লতিকা, কমলীয়-কন্ডা-শরীর-পরিগ্রহ-পূর্বক দীপপদ-সঙ্কারে চলিয়া যাইতেছে^৩ । তাঁহার কল্পনা-বীণার মোহনতানে, মৃগের শৃঙ্গস্পর্শে শৃঙ্গী অবশ হইতে হইতে, ক্রমে ভাবাবেশে ‘নিমীলিতাক্ষী’ হইতেছে । তাঁহার প্রগল্ভা কল্পনা, বংশবদ ভ্রমরকে ভ্রমরীর পীতাবশিষ্ট মধু আগ্রহ-সহকারে পান করাইতেছে^৪ । তাই আবার বলি—পৃথিবীর মধ্যে যেটি সুন্দর, যেটি নিষ্পাপ, যেটি অনিন্দনীয়, সে সব তাঁহার কল্পনার অধিকৃত । যাহা মহান্, যাহা অপক্লপ, তাহা তদীয় কল্পনাদেবীর আয়ত্ত ।

যে ছবি দেখাইলে দর্শকের মনঃপ্রাণ জুড়াইবে—উদার হইবে, যে ছবি দেখাইলে সংসারে শাস্তির প্রস্রবণ ছুটিবে—আনন্দের প্রবাহ বহিবে,

১—অভিজ্ঞানশকুন্তল,—৫ম অঙ্ক, হংস-পদিকার গীত এবং তচ্ছবনে ছায়াস্তর উৎসাহ্য । ২—কুমার ৫ম সর্গ, শ্লোক ২৮ । ৩—কুমার—৩য় সর্গ, শ্লোক ৫৩, ৫৪ । ৪—কুমার, ৩য়, ৩৬ ।

যে ছবি দেখাইলে মানব-হৃদয় দেবভাবময় হইবে,—দর্শক আশ্চর্যবিস্মৃত হইয়া জগৎকে ভাল বাসিতে শিখিবে, তাদৃশ ছবি ব্যতীত কালিদাস অঙ্কিত করিতেন না । বাহাতে মাধুরী নাই, বাহাতে উন্মাদকতা নাই,—তাহা তাঁহার অস্পৃশ্য ছিল । অসুন্দর পদার্থের দিকে তিনি ভ্রমেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না ।

পুন্ড্রাভের জন্ত, গুরুদেবের আদেশে স-সাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ‘লতা-প্রতান’-দ্বারা জটা-সংযমন-পূর্বক, অ-স্বর্ঘ্যাস্পৃশ্য মহিষীর সহিত বনে বনে বিচরণ করিতেছেন, পরস্মিনী ধেমুর সেবা করিতেছেন, হিন্দু-ধর্মের এ একটা প্রধান আদর্শ । আমাদের কবি এ’টি লইয়াছেন^১ ।

ফুলের মালার আঘাতে কুসুম-কোমলা রাজমহিষীর মুচ্ছা হইয়াছে, তাঁহার হেমকাস্তি কলেবর ক্রমে নিম্নত হইতেছে,—তদর্শনে, পত্নীময়-জীবিত ধরণীর ঈশ্বর, নিজের ‘সহজ-ধীরতায়’ জলাঞ্জলি দিয়া, ‘সংসার-কর্মে তুমি আমার গৃহিণী, মন্ত্রণায় তুমি আমার সচিব, রহস্তে তুমি আমার সখী, ললিত-কলা-বিষয়ে তুমি আমার প্রিয়-শিষ্যা, অথবা তুমি আমার সর্বস্ব,’—বলিয়া তারস্বরে, কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছেন ; সে ক্রন্দনে পাষাণও বিগলিত হয়, বজ্রেরও বুঝি হৃদয় বিদীর্ণ হয় ;—আমাদের কবি এ’টি লইয়াছেন^২ ।

স্বয়ংবর-সভায় সমবেত, ‘উজ্জল-নেপথ্য’, নরপতি-বৃন্দের মধ্যে লজ্জা-বনতমুখী রাজ-কন্তা, বরমালা হস্তে করিয়া পরিচারিকার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন । সেই ‘কণ্ঠাললাম-লিপ্সু’ আগন্তুক রাজকন্তা-বৃন্দের হৃদয়ে, রাজ-নন্দিনীর প্রতি-পাদ-বিক্ষেপের সহিত কত আশার বিছাৎ, নৈরাশ্রের মেঘ—উঠিতেছে, ভাঙিতেছে, ডুবিতেছে ! আমাদের কবি এ’টি লইয়াছেন^৩ ।

১—রঘু. ১ম,—দিলীপ-হৃদক্ষিণার ‘নন্দিনী’-সেবা ।

২—রঘু. ২ম, ৪২, ৪৩, ৬৭ । ৩—রঘু. ৬ষ্ঠ, ৬৭ ।

১. ভুবন-মোহন, অনন্তরূপের আধার, সৌন্দর্য্যে, বিলাসে, রজ-ভজিয়ার
বিধ-বিজয়ী—জীবিতেশ্বরের তাদৃশ অদ্ভুত মরণে অনন্ত-শরণা বালিকার
'অগ্নি জীবিতনাথ জীবসি' বলিয়া সেই পাষণভেদী রোদন* ।—

নিরুপরাধা, অগ্নি-পরীক্ষিতা, সাধবী দেবী-প্রতিমার পতিকর্তৃক প্রজা-
রজনের নিমিত্ত সিন্ধাসন, আবার সেই পতি-গত-প্রাণা, গর্ভ-ভরালসা;
ভয়াতুরা অবলার গহন বনে,—

‘নিশাচরোপপ্লুত-ভর্তৃকাণাং

তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ ।

ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমগ্ৰম্

কথং প্রপৎস্তে হুয়ি দীপ্যামানে ॥

ভূয়ো যথা মে জননাস্তুরেহপি

তমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রযোগঃ* ২ ।

প্রভূতি মন্দ-বিদারিণী বিলাপ-গাথা ;—

যে প্রাণাধিক স্বামী, বিনাদোষে, চিরজন্মের মত, উরগঙ্কত অঙ্গুলির
শ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই উদ্দেশে, সেই নির্বাসিতা,
আলুলায়িতকেনী, সতী প্রতিমার ‘তপস্বি-সামান্যমবেক্ষণীয়া’ বলিয়া শরবিদ্ধ
‘কুরুরী’ মত মুক্তকণ্ঠে রোদন* ;—

১—কুমার, ৪৪—৩ ।

২—রঘু, ১৪শ, ৪৪, ৬৬ । “বলিও, যখনতোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলাম,
তখন, তপস্বিগণ নিশাচর-কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাপস-কামিনীরা আমার শরণাগত
হইতেন, আর তুমি, আমার অনুরোধে তাঁহাদের বিপদ নিবারণ করিতে । আর এক্ষণে,
অবোধার অধঃখর তুমি বিদ্যমান থাকিতে, সেই আমি, গহনবনে কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা
করিব ? কে আমাকে রক্ষা করিবে ? তুমি ত্যাগ করিয়াছ, কর, কিন্তু আমি জন্মান্তরে
যেন তোমাকেই স্বামী পাই, তোমার সহিত আর যেন বিচ্ছেদ না হয় ।”

৩—রঘু, ১৪শ, ৬৭ ।

কত কষ্টে—কত প্রয়াসে, দুস্তর-জলধি-বন্ধন-পূর্বক, অপকৃত্ত ভার্যার ঊদ্ধার-সাধন করিয়া, উৎফুল্লহৃদয়ে, সেই পত্নীর সহিত পতির আকাশ-পথে পুশ্পক-বিমানে বিচরণ, বিরহকালের সঞ্চিত আশা-রাশি আজ উভয়েরই হৃদয় ছাপাইয়া উঠিয়াছে, চক্ৰোদয়ে অঘুরাশি যেমন উদ্বেল হয়, তদ্রূপ, আজ বহুকাল পরে, বাহিত-সন্দর্শনে পরম্পরের হৃদয় সমুদ্রও যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, দুই জনে এক-প্রাণ হইয়া—এক হইয়া, শাস্ত্র আকাশ-পথ বাহিয়া যাইতেছেন ! ‘তোমাকে হারাইয়া যখন আমি পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতেছিলাম, তখন যে লতা—তাহার কচি কচি শাখা দোলাইয়া আমাকে তোমার পথ দেখাইয়াছিল, ঐ দেখ, ঐ সেই লতা’^১ ; তোমার বিরোগে যখন আমি উন্মত্তপ্রায়, তখন যে পর্বতের বন্ধুর-গাত্রে ঘন-নীল মেঘের নর্তন দেখিয়া আমি কতই না কাঁদিয়াছিলাম, ঐ দেখ, ঐ সেই পর্বত’^২ ; ‘কোথায় তুমি, কোথায় তুমি—বলিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, যখন আমি কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিতেছিলাম, তখন যে স্থানে, সরল-নয়নমৃগীগণ আমার হৃৎখে মুখের তৃণ-কবল ফেলিয়া দিয়া, ককণ-দৃষ্টিতে ইঙ্গিত করিয়া, আমাকে তোমার হরণ-পথ বুঝাইয়া দিয়াছিল—ঐ দেখ, ঐ সেই স্থান’^৩—প্রভৃতি উক্তি-শ্রবণে, পতিরতার সেই নিকট দৃষ্টি, নীরবে অশ্রুবর্ষণ ;—ইত্যাদি যত কিছু মনোহর ছবি বল্লনার তুলিকায় যতদূর সুন্দর করা যাইতে পারে, তদপেক্ষাও যেন সুন্দরতর—সুন্দরতম করিয়া, সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস তাঁহার অমর ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন ।

অকালে বসন্তের আবির্ভাব হওয়ায়, তরুলতা-বল্লবীর সহিত সমস্ত বনভূমি অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়াছে । মৃগ-মৃগী, করি-করিণী, ভ্রমর-ভ্রমরী, কোকিল-কোকিলা, চক্রবাক-চক্রবাকী, সব যেন, পরম্পর মন্ত্রণা-পূর্বক

১—রঘু, ১৩ শ, ২৪ ।

২—রঘু, ১৩ শ, ২৬ । ৩—ঐ ২৫ ।

এক-যোগে আনন্দে মাতিয়াছে, এবং বনস্থলীকেও মাতাইয়াছে । নিরবচ্ছিন্ন সুখই যাহাদের জীবন, সেই অমরোমণ্ডলী বনের কুঞ্জে কুঞ্জে কত রঙ্গে বেড়াইতেছে ।—কালিদাস অতি যত্নে, অতি সন্তুর্পণ, তাঁহার অমানুষিক কল্পনার সাহায্যে ঐ বনের প্রতিকৃতি তুলিয়াছেন ।

বিলাসী যক্ষ,—যে, জীবনে, এক মুহূর্ত্তের জন্তও বিরহ কাহাকে বলে, জানে না,—সেই যক্ষ, আজ ভাগ্য-বিপর্যয়ে দূর পাহাড়ে নির্বাসিত হইয়া একাকী পড়িয়া কাঁদিতেছে । বেদনায় ছটফট করিতেছে । সেই নির্জন গহন-বনে, তাহাকে একটি কথা বলিয়া সাস্থনা করে—এমন একটি প্রাণীও নাই । হতাভাগা কখন জলে পড়িতেছে, কখন স্থলে উঠিতেছে, কখন বা হৃদয়ের বেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার আশায়, পাবাণে বক্ষঃ চাপিয়া শয়ন করিতেছে, পরক্ষণেই আবার বসিতেছে, কত কি করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রাণ শীতল হইতেছে না ; বরং হৃদয়ের অগ্নি-শিখা দাউ দাউ করিয়া ক্রমে প্রজ্বলিওঁ হইতেছে,—এমন সময়ে প্রণয়ীর সখা কালিদাস তথায় উপস্থিত । তিনি কল্পনার মোহন-মন্ত্রে মেঘের প্রাণ প্রেরিত্তা করিয়া যক্ষের দূত করিয়া দিলেন । যক্ষ সেই দূতের নিকটে প্রাণের কথাগুলি বলিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিল ।

ওদিকে অলকায়, বিষাদিনী চিন্তা-কুশা যক্ষ-বধু,—যাহার বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিলে পাবাণ পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়, সেই নিরাশ্রয়া যক্ষবধুর গত-প্রায় প্রাণ, কালিদাস, ভবিষ্যৎ-গিলনাশারূপ মৃগনাভি দিয়া কোন মতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন ।

‘নিশীথ-সময়ে, প্রবাস-গত নরপতির ‘স্তিমিত-প্রদীপ’ জনহীন শয়ন-কক্ষে, অকস্মাৎ প্রোষিত-ভর্তৃক ‘অদৃষ্টপূরী’ বনিতার,—তড়িঘরী দিব্য ললনার আবির্ভাবে চমকিত হইয়া, শয়ান নর-নাথ যখন, ‘পূরী-ক-

বিন্দু-তন্ন' হইয়া, সেই সহসোপনতা কামিনীকে, 'তুমি কে, কি করিয়া আমার এই অর্গলবদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিলে ?—

• • • 'যোগ-প্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে,—

• বিভর্ষি চাকারমনিবৃত্তানাম্,
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্'—

বলিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, এবং সেই অনাথা আবার যখন,

'তস্তাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীত-নাথাং

জানীহি রাজমুখি দেবতাং মাং'—

বলিয়া, সজল-নয়নে ও গদ-গদ-বচনে, আশ্র-পরিচয় প্রদান করিতেছেন,—

করণ-হৃদয় কালিদাস তখন তথায় বর্তমান' ।

জ্যোৎস্নাময়ী নদীর পুতলী, রাজা ও রাণীর ঘর-আলো-করা, প্রাণ-আলো-করা কন্যা, ছোট ছোট সখীগণের সঙ্গে মনাকিনী-সৈকতে বালির ঘর বাধিতেছে, পুতুলের বিবাহ দিতেছে, ঘুঁটি খেলিতেছে—
কালিদাস তথায় উপস্থিত^১ ।

অপুত্রক নরপতির কত সাধ্য-সাধনার ধন, কত হৃদয় তপস্তার ধন, কত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সিংহের মুখে আশ্র-সমর্পণ করিয়া,—
পাওয়া পুত্ররত্ন, তাহার ধাত্রীর কথা শুনিয়া আধো আধো কথা কহিতেছে, ধাইমার আঙ্গুল ধরিয়া সবে হাটিতে শিখিতেছে, 'নমো কর' বলিলেই 'সরল শিশু মস্তক নত করিতেছে । স্নেহের পুস্তলির এই ঐক্স-জালিক ব্যাপার-দর্শনে পিতা কি-জানি-কি আনন্দ-তজ্রায় অবশ হইয়া বালককে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, বুকের মধ্যে যে বুক, তাহার মধ্যে

১—রঘু, ১৬শ ৪, ৬, ৭, ৯ "তোমার ও কোন যোগপ্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না ; শিশিরমখিতা মৃণালিনীর স্তায় তোমার আকৃতি বিবাহময়ী কেন ?

"রাজন ! আমি হৃৎতাপিনী সেই জনহীন অযোধ্যার অনাথা অধিদেবতা ।" •

২—কুমার, ১৮-২৯ ।

চাপিয়া ধরিতেছেন। সুখে, মোহে, জড়তায় সন্তান-বৎসল জনকের ন্যূন আপনিই নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কালিদাসের 'অমুগ্ধহে, নিত্যানুভূত হইলেও যেন অননুভূত-পূর্ব ও অদৃষ্টের এই চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি' ।

পুত্র-হীন সংসার-বিরক্ত শূন্ত-হৃদয় নরপতি, দূর হইতে কা'র যেন একটি শিশুর অকারণ-হাস্য-পরিপূর্ণ, কুন্দ-কুটুমল-নিভ-কুঙ্গ-দশন-মুক্তা-সমুজ্জল, অব্যক্ত মধুর-বচন, মুগ্ধ-সুন্দর মুখ দেখিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন যে,—এজগতে এতাদৃশ ছুর্গত রত্নে যে বঞ্চিত, তাহার জীবন বৃথা, এই প্রকার ধূলি-ধূসর বালকের অঙ্গের ধূলিতে যাহাদের দেহ পবিত্র নহে, এই রূপ সংসার-ললাম যাহারা অন্ধে স্থান দিতে পায় না, তাদৃশ পিতামাতার জীবন বিড়ম্বনা-ময়, তাহারা হতভাগ্য; হায়! আমি অপুত্রক, এ রত্নে বঞ্চিত, আমি হতভাগ্য, আমি অধম! ক্ষিতীধর আজ অদৃষ্ট-বৈশাখ্যে নিজের পুত্রকে চিনিতে না পারিয়া, পরের পুত্রভ্রমে, এই ভাবে মনে মনে কত আন্দোলন করিতেছেন। এ বড় সুন্দর চিত্র! কালিদাস এক এক খানি করিয়া, এ সব ছবিই আমাদিগের জন্ত, অতি স্পষ্ট-ভাবে, চিত্রিত করিয়াছেন* ।

রাজার কন্তা, রাজার ভগিনী, অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকা—অদৃষ্টদোষে দম্ভ্যকর্তৃক অপহৃত হইয়া, ভিখারিণীর বেশে নানা দেশে পর্য্যটন করিতেছেন, অথচ এক নরপতির অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া পরিচারিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। বয়ঃক্রম অতি অল্প। তাঁহার বেদনার পরিসীমা নাই। কালিদাস তাঁহার সহায় হইয়াছেন* ।

১—রঘু ৩য়, ২৫ ২৬ ।

২—শকুন্তলা, ৭ম, আলক্ষ্য-দন্ত-সুকুলাননিমিত্ত-হাসিরব্যাক্তবর্ণনসঙ্গ-প্রবৃত্তি ।

অকালপ্র-প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তে ধন্তাতদনঙ্গস। মলিনীভবতি ।

৩—মালবিকাগ্নিমিত্র ।

অথবা একটি একটি করিয়া কত দেখাইব ? এইরূপ যত প্রকার সুন্দর ছবি কল্পনায় আসিতে পারে, তোমার আমার কষ্টকল্পনায় নহে, কালিদাসের কল্পনায়—বাণীর বরপুত্রের কল্পনায় উদ্ভিত হইতে পারে, কল্পনা-রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বর কালিদাস, তাহা বাছিয়া বাছিয়া লইয়াছেন । তাঁহার কল্পনাদেবীর বিমল প্রভা পৃথিবীর—অথবা পৃথিবীর কেন, স্বর্গ-মর্ত-রসাতলের, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের, সকল মনোহর পদার্থের উপরেই সমভাবে বিরাজমান । সমগ্র ভারতবর্ষ তদীয় কল্পনা-সুন্দরীর লীলাক্ষেত্র । বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় যখন ভারতের তাবৎ রাজবর্গকে সমবেত করিয়া, প্রগল্ভা পরিচারিকা সুন্দার দ্বারা, কালিদাস, প্রত্যেক নৃপতির নিজ নিজ রাজ্যের বর্ণনা করাইতেছেন, বংশের বর্ণনা করাইতেছেন,—

‘কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোহন্তে

রাজহতীমাহরনেন ভূমিम् ।’ ১

বলিয়া, কল্পনাবলে, মগধেশ্বরের লুপ্ত-গৌরবের স্মৃতি, সমবেত, নবাভূদিত, তরুণ নরপতিগণের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতেছেন, যাহার রাজ্যে বাহা কিছু সুন্দর, উল্লেখ-যোগ্য, তাহাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তখন তাঁহার ভারত-ব্যাপিনী কল্পনার প্রভাব-দর্শনে সত্য সত্যই অবাক—স্তম্ভিত হইতে হয় । যুবরাজ রঘুর দ্বিধিজয়-কালে, যে ভাবে তিনি, বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের মানচিত্র, পৃথক্ পৃথক্ রূপে, পাঠকের নয়নের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় ।

✓ অতি অল্প কথায়, সুন্দর পদার্থ বর্ণন করিবার, সম্পূর্ণ-রূপে চিত্রিত

৩—রঘু, ৬ষ্ঠ, ২২ । অস্ত্র সহস্র সহস্র নৃপতি থাকুন, কিন্তু পৃথিবীতে ‘একুত্ত রাজ্য’ কে বলিলে ইহাকেই বুঝায় । ইহার দ্বারাই ধরণী ‘রাজহতী’ অর্থাৎ শোভন রাজ্য-বিশিষ্ট ।

করিবার, এবং সেই চিত্রে দর্শকগণের মনঃপ্রাণ বিমোহিত ও পরিপূরিত করিবার ক্ষমতা, কালিদাসের তুলা, অল্প কোন কবির ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কালিদাসের এই ক্ষমতার সিদান হইল তাঁহার মাত্রা-জ্ঞান-নৈপুণ্য ও পর-হৃদয়-জ্ঞান-নৈপুণ্য।, কীদৃশ বিষয়ে পাঠক বা দর্শকের কিয়ৎ পরিমিত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার কতটুকু চান, তাহা সুদক্ষ মহাকবি বিশেষ ভাবে বিদিত ছিলেন। তিনি তুল্যদণ্ডে যেন তাহা মাপিয়া লইতে জানিতেন। এই অনন্ত-সাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই কালিদাস ‘কালিদাস’, তিনি ‘ভারবি’ বা ‘মাঘ’ নহেন, তিনি ‘বাণ’ বা ‘ত্ৰীহর্ষ’ নহেন।

সুদক্ষ মণিকার সেমন, আকর-লহরী, অসংস্কৃত মণি, শাণোল্লিখিত করিয়া তাহার নৈসর্গিক ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত করিয়া লয়, আনাদের সুদক্ষ কবিও, তজ্জপ, স্বকীয় প্রতিভাযশের সাহায্যে, বর্ণনীয় পদার্থের অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিবর্জন-পূর্বক, তাহার স্বাভাবিক কাস্তির ক্ষুরণ করিয়া লইতেন। কোন্ স্থানে কোন্ পদার্থের কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনার প্রয়োজন, কোথায় কোন্ পদার্থের বিস্তার করিলে রচনীয় বস্তু সুসমঞ্জস, চমৎকারী ও হৃদয়-গ্রাহী হইবে, তাহা তিনি যেন দিব্য-নয়নে দেখিতে পাইতেন। জগতের যাবতীয় পদার্থই কল্পনার রঞ্জে রঞ্জিত করিব, বর্ণনার চাতুর্য্যে অসুন্দরকেও সুন্দর করিয়া তুলিব, কবি জন-সুলভ এ চরিত্র তাঁহার ছিল না। যাহা চিরদিনের মত, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—সকল সময়ে সকল দেশের সকল সমাজবাদী মানুষের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে, যাহার সংস্কার পাষাণের রেখার জায় মানবের হৃদয়পটে চিরস্থিত থাকিবে, তাদৃশ বিত্তক পদার্থ-নির্দীচনে তিনি ‘বৃহস্পতি’ ছিলেন। যাহা ইহার পরিপন্থী, তিনি তাহা স্পর্শও করিতেন না। পর-হৃদয়-জ্ঞানে তাঁহার এতাদৃশী অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই, অল্পাংশ কবির কাব্যের জায় তাঁহার কাব্য পাঠে আমরা ক্লান্ত হই না।

একবার তাঁহার কাব্যে মনঃসংযোগ করিলে, তাহা এ জীবনে আর ছাড়িতে পারি না । তাঁহার কবিতার প্রকাণ্ডত্বে, নূতনত্বে ও সুন্দরত্বে আমরা দিগন্ধে বিশ্বস্ত-বিশুদ্ধ করিয়া তুলে ।

যখন দেখি, প্রজার অযথা-সন্দেহ-ভঞ্নের জন্ত, অযোধ্যার 'নূতন রাজা' রাম, তাঁহার সেই ধনুর্ভঙ্গ-পণ-লক্ষ্য, রাবণদর্প-নিকষোপল, প্রিয়তমা, সাধ্বী, সহস্রাচারিণীকে, পাষণে বুক বাঁধিয়া নির্বাসিত করিতেছেন^১ ;—যখন দেখি, 'পিতার আক্সা পালনের জন্ত, রাম অযাচিতোপনত রাজ্য সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সহস্রাবদনে জটাবকল পরিধান করিতেছেন'^২ ;—যখন দেখি, 'মাতৃ পূরীবাদ-নবাবতারঃ' বলিয়া, সজল-নয়নে ও গদ-গদ-বচনে, 'মৃৎপাত্র-শেষ-বভূতি' রাজা রঘু, 'শুরুদক্ষিণার্থী' ব্রহ্মচারীর আতিথা করিতেছেন^৩ ;—তখন, তাঁহার বর্ণনার প্রকাণ্ডত্বে, নূতনত্বে ও সুন্দরত্বে, কেমন যেন অবাচ্ উদ্ভাস্ত হইয়া পড়ি ! আনন্দে, বিশ্বসে, ভক্তিতে মনঃপ্রাণ নত হইয়া আইসে ! সংসার ভুলিয়া যাই ! তন্ময় হইয়া পড়ি !

কালিদাসের রামের কাছে ভারবির অর্জুন বা মাঘের শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়, কালিদাসের দিলীপের কাছে নৈষধের নল অকিঞ্চৎকর, কালিদাসের কুশের নিকটে বাণভট্টের চন্দ্রাপীড় বা গ্রীহর্ষ উল্লেখযোগ্যই নহে । কালিদাসের সীতা, শকুন্তলা, মালবিকা, ধারিণী, ঔলীনরী, উর্কশী—ইহাদের প্রত্যেকেই যেন এক একটা নিরুপম সৃষ্টি । সর্বোপরি কালিদাসের 'পর্যন্ত রাজ-পুত্রী উমা,' যাহার তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই ।

যখন কালিদাসের বিক্রমোর্কশীতে দেখি যে, কামরূপিণী উর্কশী নব-জল-সম্ভূত মেঘের আকার ধারণ করিয়াছেন, আর রাজা পুরুষা সেই মেঘময়ীর আশ্রয়ে আকাশপথে স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে চলিয়াছেন ;—যখন রঘুবংশে দেখি যে, দূর আকাশপৃষ্ঠে বিমানে বসিয়া রাম,—

বৈদেহী পশ্চামলয়াদ্বিভক্তঃ মহসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিम् ।

• ছায়াপথেনেব শরৎ-প্রসন্নঃ আকাশমাবিকৃত-চাক্রতারম্ ॥

বলিয়া, যাহাব উদ্ধারের জন্য দুস্তর সমুদ্রকেও বন্ধন করিতে হইয়াছিল, সেই শাস্তমুষ্টি সীতাকে, সে-ই সমুদ্র এবং সমুদ্রসেতু দেখাইতেছেন ;— যখন দেখি, তিনি তাঁহার আদরিণী সীতাকে, আকাশে বসাইয়া, দূরে—অতিদূরে, ভূকণ্ঠে দোহলামান একছড়া মুক্তার মালায় জায় প্রতিভাত মন্দাকিনীর ক্রীণতরু দেখাইতেছেন ;—

পশ্চানবদ্যাস্মি ! বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যযুনাতিরঙ্গৈঃ ২ ।

বলিয়া গঙ্গাযযুনার সঙ্গম দেখাইতেছেন ;—তখন, কালিদাসের বিরাট কল্পনার বিচিত্র-প্রভাব-দর্শনে, আনন্দে, বিশ্বয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ি । মর্ত্যধাম ছাড়িয়া প্রাণ এক অচিস্তিতপূর্ব অমৃতময় রাজ্যে উপস্থিত হয় । এ প্রকার কত দেখাইব ?

মহাকবি কালিদাস, তদীয় অসাধারণ-কমলা-বলে এবং অলৌকিক প্রতিভালোকে, স্থল-বিশেষে, ব্যাস-বাস্তবিকিকেও যেন কিয়ত-পরিমাণে নিশ্চত করিয়াছেন । রামায়ণ বা মহাভারতে, যে যে বিষয় অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হওয়ায়, পাঠকের জীবৎ বৈধা-চ্যুতির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থলে, কালিদাস অতি সতর্কহস্তে তাহার সংশোধন করিয়াছেন । যতটুকু বর্ণনা পাঠকের আকাঙ্ক্ষা-বারিণী স্তব্রাং হৃদয়-গ্রাহিণী হইতে পারে, অথবা যতটুকু বর্ণনায় পাঠকের আকাঙ্ক্ষার শেষ না হইয়া, সৌন্দর্য্য-দর্শন-লালসা আরও প্রবল হইয়া উঠে, তথায় মাত্র

১—রঘু. ১৩৯২ । বৈবোধি । ঐ দেখ, বলয় পর্কত হইতে নদীয় সেতুর দ্বারা সমুদ্র বিভক্ত হইয়াছে, ফেনপুঞ্জ অম্বুরাশির কি শোভাই জন্মিয়াছে ! দেখিলে মনে হয়, যেন শরতের নির্মল, নক্ষত্র-ভূষিত আকাশ ছায়াপথের দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে ।

২—রঘু. ৪৭ । হে অনবদ্যাস্মি ! ঐ দেখ, যযুনার বুকতরঙ্গে গঙ্গার প্রবাহ বিদ্রিত হওয়ায় গঙ্গাযযুনার সঙ্গম কি অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে ।

তৎ-পরিমিত বর্ণনা করিয়াই কালিদাস বিরত হইয়াছেন । সুতরাং ব্যাস-
বাস্তবিক অপেক্ষা তদীয় বর্ণনা পাঠকের অধিকতর মনোহারিণী হইয়াছে ।
ঐতাদৃশ সারগ্ৰ্থা, আশ্চর্য্যসত্য এই অধিক বিশ্বাস যদি তাঁহার না থাকিবে,
তবে, যে দেশের প্রতি গৃহে, দীর্ঘকাল হইতে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি
পঠিত, গীত এবং ভক্তির সহিত শ্রুত হইয়া আসিতেছে, সেই দেশের
সেই সমাজে, সেই রামায়ণ মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের তিনি পুনর্বর্ণনা
করিতে গেলেন কেন ? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রামায়ণ মহাভারত
প্রভৃতি যে প্রকার দীর্ঘ, স্থলবিশেষে যে প্রকার উৎকট কল্পনায়
অতিরঞ্জিত, তাহাতে, ঐ সমুদয় কাব্যের দ্বারা সহৃদয়গণের সম্পূর্ণ
আনন্দরসায়ুভূতির কিঞ্চিৎ বাধা ঘটে । তবে তিনি ইহাও বুঝিয়া-
ছিলেন যে, ব্যাস-বাস্তবিক বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণন-প্রয়াস এক প্রকার
বাতুলের কার্য্য । তাই পরম সারস্বত মহাকবি এক অতি সমীচীন পন্থা
আশ্রয় করিয়াছেন । ব্যাস-বাস্তবিক, তাহাদের অমৃত-নিঃশব্দিনী কবিতায়
যে সমুদয় বিষয়ের চমৎকারিণী বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস তাহার
সবিস্তর বর্ণন করেন নাই । অতি অল্প কথায়, দুই একটি শ্লোকে,
যেটুকু না বলিলে নয়, মাত্র সেইটুকু বলিয়াই তাহার শেষ করিয়াছেন ।
আর যে সমুদয় বিষয়ের বর্ণনা ব্যাস-বাস্তবিক কর্তৃক অতি সংক্ষেপে
পরিসমাপ্ত হইয়াছে, বা যে সমুদয় স্থল তাহারা উপেক্ষা করিয়াছেন, নিপুণ
কবি কালিদাস, সেই সমুদয়ের অতিবিস্তৃত, সম্পূর্ণ ও মনোজ্ঞ বর্ণনা
করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন, সহৃদয়-নয়নে এক অদৃষ্টের দৃশ্য প্রতিকলিত
করিয়াছেন । কালিদাসের সমগ্র গ্রন্থাবলী এই ক্রম সত্যের উপর—এই
মহাভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । তাই রামায়ণ মহাভারতে যাহা সবিস্তর
বর্ণিত, কালিদাসের কাব্যে তাহার অতি সামান্য ভাবে নির্দেশ এবং ঐ ঐ
গ্রন্থে যাহা সংক্ষেপে লিখিত, কালিদাস-গ্রন্থে তাহার সবিস্তর বর্ণন
দেখিতে পাই । সুতরাং ব্যাস-বাস্তবিকের সহিত বা অপরাপর পূরণ-

কর্তৃগণের সহিত, কোন নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া, কালিদাসের কখনও কোন রূপ সম্বন্ধ উপস্থিত হয় নাই। তুলনার অবসর ঘটে নাই। দূরদর্শী মহাকবি নিজেই সে পথ অবরুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, এই কারণেই তদীয় রচনা, সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। কালিদাসের আবির্ভাবের পূর্বে বা পরে, সংস্কৃত ভাষায়, যিনি যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোন খানিও চমৎকারিতায় বা হৃদয়-গ্রাহিতায়, কালিদাস-রচনার ত্রিসীমায়ও পৌঁছিতে পারে নাই। তাহার রচনা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই সূক্ষ্মবুদ্ধি। তদীয় রচনার প্রতিবর্ণে প্রসাদ এবং মাধুর্য্য-গুণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। তাহার উপমার তুলনা নাই। অপর কোন দেশের কোন কবি উপমা-সম্পদে তাহার ছায়া সৌভাগ্যবান্ কি না, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ভারতের অন্য কোন কবিই যে, অতি সংক্ষেপে, সর্বলোক-বিদিত বিষয়ের উপমা-প্রদানে কালিদাসের সনকক্ষ নহেন, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তাহার উপমা-প্রয়োগের এমনই কৌশল যে, উপমান ও উপম্যের সাধন বা সাদৃশ্য-বোধে কাহারও কোন প্রকার প্রয়াস করিতে হয় না। অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রচলিত বিষয়ের সহিত তিনি কদাচ কোন পদার্থের উপমা দেন নাই। তাহার শব্দ-বিশ্বাস-নৈপুণ্য এত অধিক ছিল যে, তদীয় কাব্যাবলীর কোন স্থানের কোন একটা শব্দ পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা যায় না। তাহার এক একটা শ্লোক যেন এক একখানি ছবি। শ্লোকাবৃত্তির পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের নানস-পটে যেন একখানি মনোহারিণী প্রতিকৃতি আপনিত আসিয়া উদ্ভিত হয়। যখন তাহার—

কার্য্য সৈকত-লীন-হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদান্ত্যামভিতো নিষর-হরিণা গৌরীশুরোঃ পাবনাঃ ।

শাখা-লম্বিত-বন্ধলস্ত চ তরোনির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ

• • শৃঙ্গে কৃষ্ণ-মৃগস্ত বাম-নয়নং কণ্ঠ্যমানাং মৃগীম্ ॥^১

স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত-সব্যাপাদম্ ।

দৈর্দর্শ চক্রীকৃত-চারুচাপং প্রহর্তুমভূদাতমাত্মযোনিম্ ॥^২

প্রভৃতি কবিতা পাঠ করি, তখন, বহির্নয়নে কবিতাক্ষর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে, অন্তর্নয়নে যেন এক এক খানি অল্পপম আলেখ্য দর্শন করি। চিরদিনের মত, সে আলেখ্য হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

আমরা অন্তর্য দেখিতে পাই, কোন কবির হয়ত রচনাশক্তি অতীব ননোহারিণী কিন্তু কল্পনাশক্তি তাদৃশ চমৎকারিণী নহে; কাহারও বা কল্পনাশক্তি নিরতিশয় হৃদয়-গ্রাহিণী, পরন্তু রচনাশক্তি প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু কালিদাস, কি রচনা-শক্তি, কি কল্পনা-শক্তি, উভয় সম্পদেই সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন। তাহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তদীয় কল্পনা এবং রচনা—উভয়ে সমবেতভাবে, ভাগীরথীর স্রোতের ছায়, অক্লিষ্ট ও অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ প্রয়োগের জল্প, বা কোন স্থলে প্রকৃতিপযোগী কোন

১—এ চিত্রের এখনও অনেক বাকী। এখনও মালিনী নন্দা অঙ্কিত হয় নাই, তাহার সৈকতে হংস-মিথুনপ্রাণি দলে দলে খেল করিতেছে—অঙ্কিত হয় নাই। মালিনীর উভয়তীরে হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্বত, আর সেই পর্বতসমূহে হরিণগণ নির্ভয়ে নিদ্রা—অঙ্কিত হয় নাই। আমার বাসনা যে, আশ্রমতরঙ্গাজির শাখায় তাপসগণের বন্ধল বিলম্বিত রহিয়াছে, আর সেই তরুতলে, কৃষ্ণমৃগের শৃঙ্গ মৃগী তাহার বাননয়ন কণ্ঠ্যন করিতেছে—এইটুকু অঙ্কিত করি। শকুন্তলা ৬ষ্ঠ।

২—তিনি দেখিলেন, কামদেব তাহার প্রতি; বাণ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ধনুঃগ-ধারী তাহার মুষ্টি দক্ষিণ চক্রের প্রান্তভাগ পর্যন্ত সমানীত হইয়াছে, দুই ঋক অবনত, বাম চরণ কিঞ্চিৎ বক্রীকৃত এবং ধনুক মতদূর সম্ভব আকৃষ্ট হওয়াতে মণ্ডলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। কুমার-৩য়-৭ম। (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য)।

ভাব প্রকাশের জন্ত, তাঁহাকে অণুমাত্রও চিন্তা করিতে হয় নাই । গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গমে ত্রিবেণী যেমন পবিত্র ও সৰ্বজন-কায়া, ভাব, কবিত্ব এবং রচনার সমাবেশে কালিদাসের গ্রন্থও তদ্রূপ পবিত্র ও সৰ্বজন-সেবা । তিনি মাহেন্দ্রকণে, তাঁহার ইহলোক এবং পরলোকের উপাত্ত দেবতাকে—

বীণা-রঞ্জিত-পুস্তক-হস্তে !

ভগবতি ! ভারতি ! দেবি ! নমস্তে,

বলিয়া প্রণাম-পূর্বক আরাধনা করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রণাম ও আরাধনা সার্থক হইয়াছে । তাঁহার পূজার পবিত্র নিম্নাল্যে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্য, ভারতবর্ষের অধিবাসী—সকলেই পবিত্র ও কৃতকৃত্য হইয়াছে ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

কুমারসম্ভব ।

যদ্যপি সংস্কৃত সাহিত্যের নাম করিতে গেলেই সৰ্ব্বাঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশের কথা হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে, তথাপি কতিপয় কারণে, তৎপ্রণীত ‘কুমারসম্ভব’-নামধেয় মহাকাব্য তদীয় রঘুবংশের পূৰ্ব-বিরচিত, সুতরাং তাঁহার প্রথম মহাকাব্য বলিয়া অস্বীকারিত হওয়ায়, কুমারসম্ভবের আলোচনাই প্রথমতঃ কর্তব্য ।

কুমারসম্ভব এবং রঘুবংশের রচনা-প্রণালী ও ঘটনার সমাবেশ বিচার করিয়া দেখিলেই কুমার যে রঘুর পূৰ্ববর্তী, এই অস্বীকার্য সঙ্গত বলিয়া মনে হয় । কুমারের যে সমুদয় অংশ অতীব হৃদয়-গ্রাহী, যে সমুদয় ভাব চিত্তের একান্ত আশ্বাস-জনক, রঘুবংশে সে সমুদয়ের অধিকাংশকেই বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় । তবে কুমার অপেক্ষা রঘুতে বিশেষ এই যে, কুমারের যে সৃষ্টি সূচরু, রঘুতে তাহা সূচরুতর । পক্ষান্তরে, কুমারের যে সকল স্থলে ঈষৎ অপরিপক্বতার উপলক্ষি হয়, কালিদাসোচিত রচনা-নৈপুণ্যের কিঞ্চিৎ নূনতা পরিলক্ষিত হয়, রঘুতে সে সমুদয় স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে । রতিবিলাপ এবং অজবিলাপ, পার্শ্বতীর বিবাহ ও ইন্দুমতীর বিবাহ, হিমালয়গৃহে জামাতা চন্দ্রশেখরের প্রবেশ ও বিদর্ভ-পতিগৃহে কুমার অজের শোভাযাত্রা—একত্র মিলাইয়া পাঠ করিলেই এ কথাই বাখ্যার্থী হৃদয়ঙ্গম হয় । কুমারের উক্ত-স্থান-সমূহে যে সকল বিষয় বর্ণিত, রঘুতে প্রায় সে সমস্তই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, এমন কি, ‘কোন কোন স্থলে কুমারের অনেক শ্লোক পর্য্যন্ত অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, কোন স্থলে বা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে সেই ভাবেরই পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে । ফলতঃ কুমারসম্ভবে কালিদাস যে সকল হিরণ্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়াছেন, রঘুবংশে তাহাদের অধিকাংশকেই যেন হীরক-মুক্তা-খচিত অনবদ

আন্তর্যগে সজ্জিত করিয়াছেন । তাই বলিতে ইচ্ছা করে যে, কুমারসম্ভব রঘুবংশের পূর্ব-রচিত ।

আর এক কথা । কুমারের নায়ক-নায়িকা হর-পার্ষতী, উভয়েই স্বর্গের দেবতা, স্বর্গ-মর্ত-রসাতলের উপাত্ত । আর রঘুবংশের প্রতীপাদা পুরুষগণ, মর্তের—ভারতের সর্বপ্রধান নরপতির বংশীয়, বৈবস্বত মন্তর বংশধর । একের লীলাস্থল স্বর্গ-মর্ত-রসাতল, অত্রের লীলাস্থল কেবল মর্তধাম । ইহাও ভাবিবার একটি প্রধান বিষয় । নবীন কল্পনায়—প্রথম কল্পনায়, এমন পদার্থ বর্ণন করাট সঙ্গত, যাহাতে কবির অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা (unbounded imagination) যথেষ্ট প্রযুক্ত হইতে পারে । প্রায়শঃ ইহাই হইয়া থাকে । মর্তবাসীর নয়নে, সুকবির অঙ্কিত, অদৃশ্য-জগতের চিত্র মনোজ্ঞ হইবারই কথা । কিন্তু মর্তবাসীর নয়নে, মর্তলোকের বর্ণনা,—নিয়ত পরিদৃষ্ট চিরপরিচিত পদার্থের বর্ণনা চমৎকারিণী করিয়া তুলি বড়ই কঠিন । অতীন্দ্রিয় পদার্থের বর্ণনে কবির পর্যাপ্ত প্রভুত আছে, সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নিত্যানুভূত পদার্থের বর্ণনে কবিকল্পনা অনেকটা সংযত, পাঠকের অভ্যাসানুগত । উহাতে অতিরঞ্জনের প্রভাবকে ধ্বংস করিতে হয় । তুমি স্বর্গের মন্দাকিনীর বর্ণনাকালে তাহাতে সোণার কমল ফুটাইতে পার^১, তাহার সিকতা কাঞ্চনময়ী করিতে পার^২,—সমস্তই

১—কুমার, ২য় সর্গ, শ্লোক ৪৪ :—

মন্দাকিজ্ঞাঃ পয়ঃ শোণং দিগ্‌বার্ণমদ্যাবিলম্ ।

হেমাস্তোরহশক্তানাং তদ্বাপ্যো ধাম কেবলম্ ॥

২—মেঘদূত, উত্তরমেঘ, শ্লোক ৪ :—

মন্দাকিজ্ঞাঃ পয়সি শিশিরেঃ সেবামানি মরুজিহ্বাঃ

মন্দারাগামমুতটরুহাঃ ছায়য়া বারিতোক্ষা

অশ্বেষ্টবোঃ কনক-সিকতা-মৃষ্টি-নিষ্কেপগুচৈঃ ॥

সংক্রৌড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা গজ কজ্জাঃ ॥

সম্ভব ; কিন্তু মর্তের ভাগীরথীর বর্ণন-সময়ে, তোমাকে, বিশেষ সতর্কতার সহিত, মর্ত্য-হৃদয়ের বশে চলিতে হইবে। যাহা দেখি নাই, তাহা তুমি আশ্রয়ক তোমার কল্পনাবলে দেখাইতে পার, দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে পার ; কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, যাহার সৌন্দর্য্য-দর্শনে চমত্কৃত হইয়াছি, সেই সকল অনুভূত পদার্থের প্রতিকৃতি-প্রদর্শন করিয়া তুমি আমাকে যে কতদূর বিস্মিত করিতে পারিবে, তাহা বলা বড়ই কঠিন। তাই প্রথমা-বস্থায়, কালিদাস, লোক-নয়নের অতীত জগতের পদার্থ লইয়া, আরাধ্য ও ধ্যানগমা দেব-দেবীর বৃত্তান্ত লইয়া, কাব্য-নিম্মাণ করিয়াছেন। হিন্দু আমরা ঐহাদের নামোল্লেখই দেহমন পবিত্র মনে করি, সে দিন সার্থক মনে করি, ভক্তিভরে ঐহাদের নাম করিয়া প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাওঁ-খান করি, এবং দিনান্তে দিনগত পাপক্ষয় করি, তাহাদের সম্বন্ধে যিনি যতই অতিরঞ্জন করুন, তাহা আমাদের আরাধ্যদেবীর অনুকূল বই প্রতিকূল হইবে না। সুতরাং তাদৃশ আরাধ্য দেবদেবীর বর্ণনে কবির অধিকারভূমি অতীব বিস্তীর্ণ। তাহাদের প্রভাব প্রদর্শন করিতে গিয়া, কবি অকালে বসন্তের আবির্ভাব করাটতে পারেন^১, অকস্মাৎ ‘আকাশভবা সরস্বতীর’ সৃষ্টি করিতে পারেন^২। তাহাদিগের সৌন্দর্য্য, কার্য্য, বিভূতি প্রভৃতি, ‘কবি, যত ইচ্ছা, রমণীয়, অলৌকিক ও বিশাল করিতে পারেন। তাদৃশ স্থলে কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কবির কল্পনাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। কিন্তু ঐহিক পদার্থের বর্ণনকালে, কবিকে নিয়ত, ইহলোকের কল্পনার অধীন থাকিতে হয়। শরতের চন্দ্র তুমিও দেখিয়াছ, আমিও দেখিয়াছি। সেই শরচ্ছত্রের তুমি যদি বর্ণন করিতে যাও, তবে তোমাকে এমন কথা বলিতে হইবে, এমন সৌন্দর্য্য দেখাইতে হইবে, যাহা আমার প্রাকৃত নয়নে প্রতিকলিত হয় নাই, অথবা প্রতিকলিত হইলেও যেমন করিয়া

১—কুমার, ৩৩৪।

২—কুমার, ৪১৩৩।

দেখিতে হয়, সে ভাবে দেখি নাই, তবেই ত তোমার শরচ্ছত্র-বর্ণনা চমৎকারিণী হইবে । সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখ, অতীন্দ্রিয় পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বর্ণন করা বড়ই কঠিন কার্য । সাধারণে যাহা দেখেন, তাহা ত তোমাকে দেখাইতে হইবেই, পরন্তু তদতিরিক্ত কিছু যদি তুমি দেখাইতে না পার, তবে মর্ত্তের পদার্থ লইয়া কবিত্ব প্রকাশ করিতে কদাচ সাহসী হইও না । তাই কালিদাস, অতিমর্ত্তা চরিত্র উপজীব্য করিয়া কুমারসম্ভব বিরচন করিয়াছেন । তবে, হরপার্কটীকে বর্ণন করিতে গাইয়া, কালিদাস অনেক স্থলে তাঁহাদিগের চরিত্র মর্ত্তের মধ্যে আবিষ্ট করিয়াছেন । উদার মানব-প্রকৃতির অতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণে দেবদম্পতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন । দেবদেবীর আদর্শকল্প নিখুল চরিত্রে অতি বিগুপ্ত পার্শ্বি ধর্ম্মের ছায়াপাত করিয়া পার্শ্বি দর্শকের নয়ন রঞ্জন করিয়াছেন । সেটী জন্মই হরপার্কটীর চরিত্রের কোথাও কোথাও পৌণ্ড্র্যাবে, বিগুপ্ত মানব-প্রকৃতির বিগুপ্ততম অংশের স্ফুরণ দেখিতে পাই । অনেক স্থলে মনে হয়, বুঝি কোন দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবদম্পতির অপার্শ্বি প্রেমের চিত্র দেখিতেছি । কিন্তু তাহাতেও আবার বৈচিত্র্য এই যে, সে মর্ত্ত্যধম্মা প্রকৃতির কোথাও কোন প্রকার পার্শ্বি ভাবনার—ভোগলালসার লেশও নাই । তাই হরপার্কটীর চরিত্র পার্শ্বিচ্ছায়া-সম্পন্ন হইয়াও অপার্শ্বি ও অমুপম ।

অতিমর্ত্তা-চরিত্র-কুমারসম্ভব রচনার পর, কালিদাস এমন চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে মর্ত্তা ও অতিমর্ত্তা—উভয়েরই সন্নিবেশ আছে । সে চরিত্র মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষবধূর । তাঁহারা স্বর্গের দেবযোনি হইয়াও মর্ত্তের ভাবনার ও লালসার অধীন । তাঁহাদের বর্ণনার স্বর্ণমর্ত্ত উভয়ের সম্মিলিত চিত্র আছে । তাহাতে যেমন জড় মেঘের দোহা আছে, ‘কনক সিকতা-মুষ্টির’ জীড়া আছে, তেমনই আবার কাঞ্চন-নির্ম্মিত ‘বাস-যষ্টির’ উপরে ময়ূরের তালে তালে নর্ত্তন আছে, মুগ্ধা যক্ষবধূর স্বর্ণবলয়ের রুণ রুণ শিঞ্জিত আছে, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মিশ্রণ আছে । কিন্তু

২৮৬১৫/ভা২১০.৩.১৩১৩

তাহাতে একটি পদার্থ নাই—আদর্শ নাই । যে আদর্শে সমাজের উপকার হইবে, কাঁবা-প্রণয়নের মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে, সে নিরবদা আদর্শ নাই । তাহাতে চতুর্কর্গ-ফল-প্রাপ্তি-রূপ প্রতিজ্ঞা সাধিত হয় নাই ।

তাই পরে, যখন নিজের ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তখন কবি, রঘুবংশে নিরবচ্ছিন্ন মর্তের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । সমাজ-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া, মর্তের বরণে রাজবংশের অতুল্য আদর্শ চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন । সে চরিত্র ভারতবাসীর নিত্য পরিচিত, নিত্য পূজিত । রঘুবংশে অতিমানুষিক বর্ণন অতি কম । অধিকাংশই স্বাভাবিক । তবে সে সমুদয় চিত্র মহাকবির বিদ্বাৎ-প্রতিম-প্রতিভালোকে এমনি আলোকিত, যে, চির পুরাতন হইলেও, নূতনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । এই সকল কারণেই মনে হয়, কালিদাস প্রথমে কুমারসম্ভব, পরে মেঘদূত, তার পর রঘুবংশ নিৰ্মাণ করেন । কুমারে দেবদেবীর বিষয়, প্রশান্তঃ স্বর্গের বিষয়, মেঘদূতে ঠিক দেবতা নয়, মাঝামাঝি—দেবযোনির বিষয়, স্বর্গ ও মর্তের বিষয়, আর রঘুবংশে কেবল মর্তের বিষয়, ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের বিষয়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজগণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । প্রথম দেবতা, পরে দেবযোনি, তারপর মানুষ—এই ত্রিবিধ স্তরে কালিদাসের বর্ণনা বিভক্ত ।

কালিদাসের নাট্যকাবলীরও এই প্রকার ক্রমনির্দেশ করা যাইতে পারে । যথা—প্রথমে বিক্রমোর্কশী, তাহাতে মর্ত্য-অতিমর্ত্য—উভয়বিধ বিষয়ের সন্নিবেশ আছে । কিন্তু মেঘদূতের জ্বাৰ তাহাতেও সমাজ শিক্ষার উপযোগী, উজ্জ্বল আদর্শ নাই । পরে মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল । এই গ্রন্থদ্বয়ে মর্তের বিষয় অতিমর্ত্য পদার্থ অপেক্ষাও সুচাক্রুর রূপে বর্ণিত হইয়াছে । তবে মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ককেও, কালিদাস, আদর্শ-চরিত্র-সম্পন্ন করিতে পারেন নাই । তাই বোধ হয়, সর্বশেষে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে, ছয়স্ত শকুন্তলা উভয়কেই অনিষ্ট-চরিত্রের আধার

করিয়া, উজ্জল-আদর্শ-চরিত্র-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কুমার, মেঘদূত এবং রঘুবংশের পৌরীপর্ষা সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই রূপই প্রতীতি জন্মে। কিন্তু নিম্নোক্ত যুক্তদ্বারা তাঁহার বৈলক্ষণ্যও উপলব্ধ হয়।

কালিদাস অসামান্য কল্পন-শক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম বয়সে, যখন মানব নিজের জগতই বাস্তব থাকে, আপনার চিন্তা বাস্তব পরের চিন্তা করিতে ততদূর সমর্থ হয় না, সেই সময়ে, জীবনের সেই প্রভাতকালে, নবীন কবি বোধ হয়, মেঘদূতের সৃষ্টি করেন। মিলন অপেক্ষা বিয়োগে প্রণয়ের চিত্র সমধিক পরিস্ফুট হয়, উহার বাস্তব স্বরূপ এবং দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়; তাই কবি, চিরবিনাসমগ্ন বিরহীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এত বড় বিশাল ভারতবর্ষে তিনি তাঁহার মনের মত নায়ক নায়িকা খুঁজিয়া পাইলেন না, মনের মত ভোগের ভূমি খুঁজিয়া পাইলেন না, তাই কবি, তাঁহার সেই নবীন, অব্যাহত প্রতীভার প্রথর আলোকে, ভারতবাসীর সম্মুখে, মানব-কল্পনার অতীত, স্বর্গের ভোগময়ী ভূমির চিত্র উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও কবির পরিতৃপ্তি হইল না। তিনি ক্রমে বুঝিলেন যে, ভোগের চিত্র অল্পপন হইয়াছে সত্য, কিন্তু জগতে ভোগই ত আর্থা-হৃদয়ের চরম প্রার্থনীয় নহে, ভোগ অপেক্ষাও ত সাধুতর উচ্চতর বস্তু আছে, একবার সেই দিকটা দেখিতে হইবে। মেঘদূতের নায়কের দৃষ্টান্তে যদি লোক-শিক্ষা হয়, তাহা হইলে, সমাজে হিত অপেক্ষা অহিতের আশঙ্কাই অধিক। তাই কবি আরও উচ্ছে উঠিলেন। স্বর্গের নটরূপ যক্ষের চরিত্র ছাড়িয়া, এবার তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলের নাটের যিনি প্রধান গুরু, সেই নিকাম, শাসান-চারী, বিভূতি-ভুষণ, নীলকণ্ঠের পবিত্র আদর্শ সৃষ্টি করিলেন। যেমন শব্দর, তাঁহার তেমনই অমূল্যপিণী শব্দরীর মূর্ত্তি নিদ্রাণ করিলেন। সে শব্দর শব্দরীর প্রেম অদ্ভুত, অল্পপন। তাহাতে ভোগের গন্ধ নাই। রাসনার লেশ নাই।

অমন আদর্শ প্রেম আর হয় না । ওরূপ মহান্ আদর্শ মানবের পরিমিত-
 হৃদয়েনু ধারণার অতীত । অতবড় বিরাট মূর্তি, ক্ষুদ্রশক্তি মানব-নয়নের
 প্রকৃত প্রস্তাব, বিষয়ীভূতই হইতে পারে না । তাই কবি, শেষে মর্তের
 দিকে অবতরণ করিলেন । দেবতার দৃষ্টান্ত অপেক্ষা মানবের দৃষ্টান্তে
 মানব-হৃদয় সহজেই বশীভূত ও গঠিত করা যায়—এই জ্ঞানই রঘুবংশের
 সৃষ্টি করিলেন । পুরুষোত্তম রাম এবং মানবী দেবী সীতার আদর্শ
 চিত্রিত করিলেন । এই কারণে মেঘদূতকে কুমারের পূর্ববর্তীও বলা
 যাইতে পারে ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

কুমারের বৃত্তান্ত ।

কুমারসম্ভবের “হুলবৃত্তান্ত এই—তারক নামে এক মহাবর, পরাক্রান্ত অতি দুর্দান্ত অস্তুর, ব্রহ্মদেব বরের প্রভাবে, অত্যন্ত গর্বিত ও দুর্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে, পার্শ্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ-সংহার করিয়া তোমাদিগকে পুনর্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন ; তদনুসারে দেবতারা উদ্‌যোগী হইয়া হরগৌরীর” প্রণয়-সম্পাদনার্থে কন্দর্পকে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প সমাদিত বরুণাক্ষের ধানভঞ্জে উদাত হইলে, বিবদ-নেত্রের রৌষ-কল্যাণিত-ললাট-নয়ন-নির্গত অগ্নি-শিখা, তাহাকে ভস্মীভূত করে। পরে হরগৌরীর পরিণয় সম্পাদন হয় এবং “কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্তের সমভিবাাহারে সমর-মাগরে অবতীর্ণ হইয়া দুর্জয় তারকাসুরের প্রাণ সংহার পূর্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃস্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত স্ফটিকরূপে কুমারসম্ভবে, সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।”

“কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্বত্র অনুশীলন আছে ; অবশিষ্ট দশ সর্গ একেবারে অপ্ৰচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে একরূপ অপ্ৰচলিত ও এক প্রকার অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে, বোধ হয়, তাহার হেতু এই,—অষ্টম সর্গে হর-গৌরীর বিহার-বর্ণনা আছে, তাহাও সামান্ত নায়ক-নায়িকার বিহারের ভাষা বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হরগৌরীর কৈলাস গমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের

জন্মব্রহ্ম বর্ণিত আছে । এই দুই সর্গেও অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় । ভারতবর্ষীয় লোকেরা হরগৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন । জগৎপিতা ও জগন্মাতার সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অসুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অমূল্য রহিত করিয়াছে । আলঙ্কারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরীর বিহার বর্ণনাকে অত্যন্ত অসুচিত ও অত্যন্ত দুষ্ক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কান্তিকের বাল্যলীলা, সৈন্যপতা গ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত,—এই সমস্ত ব্রহ্ম সন্নিহিত বর্ণিত হইয়াছে । এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশনাত্মক নাই । কিন্তু অষ্টম নবম এবং দশম এই তিন সর্গের দোষে ইহারও একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে ।”

কুমারসম্ভব সম্বন্ধে, বহুশাস্ত্রবিৎ, মনস্বী ৩ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অভিমত । প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মন্মটভট্ট, বহুশত বৎসর পূর্বে তদীয় ‘কাব্য-প্রকাশ’ গ্রন্থে, এবং বিশ্বনাথ ‘সাহিত্য-দর্পণে’ রসদোষ-প্রসঙ্গে কালিদাস-কৃত হরপার্বতীর সম্ভাগ বর্ণনার অনোচিত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুমারসম্ভব বিষয়ক উক্ত অভিমত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে ।

কুমারসম্ভবের অন্ত অংশ না হউক, অষ্টম সর্গ, যাহা বর্তমানে কালিদাস-প্রণীত বলিয়া সর্বত্র প্রচলিত, তাহা যে প্রকৃতই কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । কুমারসম্ভব রঘুবংশের পূর্ববর্তী । প্রথম রচনা একেবারে নির্দোষ হওয়া অসম্ভব । তাই কালিদাস, কুমারের যে যে স্থল কিঞ্চিৎ অসংলগ্ন, তৎসমূহ স্থল সমূহ রঘুবংশে সংশোধিত করিয়াছেন । হরপার্বতীর বিবাহ ও অজ ইন্দুমতীর বিবাহ এবং রতিবিলাপ ও অজবিলাপ মিলাইয়া পড়িলে,

এ সিদ্ধান্ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । কুমারের অষ্টম ও রঘুর ত্রয়োদশ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ।

নগেন্দ্রনন্দিনী উমা প্রথমবার, সৌন্দর্য্যে বিরূপাক্ষের হৃদয় জয় করিতে যাইয়া, মদন-ভঙ্গের পর অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । পরে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্তা করিয়া তিনি চক্রেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিলেন । আজ পার্কীতী সেই বহু-তপস্তা-লব্ধ ধনের সহিত—সেই চির-বাহিত্র দেবতার সহিত মিলিত হইয়াছেন । যাহার জন্ত পার্কীতীর সেই জীবন-পাতিনী তপস্তা, অত কষ্ট, পরিণয়ের পর, সেই হৃদয়েশ্বরের সহিত পিতৃগৃহে কিয়দিন বাস করিয়া উভয়ে একসঙ্গে কিছুকাল নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন । মেরুপর্বতে যাইয়া মহাদেব কত আদরে কত সন্তর্পণে গৌরীকে স্বভাবের কত শোভা দেখাইলেন । কখন সোণার পল্লবের সুখশয্যায় তাঁহারা কুলশয্যা করিতেন । কখন চক্রেবাস্ত-মণিময় শিলাতলে তাঁহারা উপবেশন করিতেন । কখন কৈলাস পর্বতে, বিমল চন্দ্রালোকে, দুইজনে দুইজনের অন্তঃকরণের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া আনন্দ-নিমীলিতাক্ষ হইতেন । মলয় পর্বতে যখন তাঁহারা বিচরণ করেন, তখন চন্দনবনের ধীর দক্ষিণ সমীর, লবঙ্গ কেশর উড়াইয়া আনিয়া, সেই দেবদম্পতির গাত্র-মার্জ্জন করিয়া দিত । একদিন অপরাহ্নে, যখন দিনমণি অন্তগমনোন্মুখ, সেই সময়ে শঙ্কর শঙ্করীর সহিত গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত । উভয়েই একথাও কাঞ্চন শিলাতলে উপবেশন করিলেন । শঙ্কর, বাম-বাহুদ্বারা নগেন্দ্রনন্দিনীকে বেঠেন পূর্নক অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী করিয়া, অন্তাচলগানী তপনের শোভা দেখাইতে লাগিলেন । ক্রমে মহাদেব একটি একটি করিয়া—কখনো ভূধর শোভা, কখনো পৃথিবীর শোভা, কখনো আকাশের কাস্তি, কখনো মন্দাকিনীর কাস্তি, কত-কি-ই না পার্কীতীকে দেখাইলেন । তৎকালে হরপার্কীতীর প্রসন্ন হৃদয়ের জ্বায়া, পৃথিবীর তাবৎ পদার্থই যেন অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে । তাবৎ পদার্থই যেন

তাঁহাদের সেবায় রত । মহাদেব, ইত্যন্তঃ বাহ্য দেখেন, তাঁহার মনে
 হঠাৎ লীলিগল, যেন সে সমস্তই তদীয় তপঃকৃশা হৃদয়েস্বরীর পরিচর্যা
 ভঁজ্র ভৎসুক । কুমারের অষ্টমের সেই সকল বর্ণনা অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী ।
 রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে, রামচন্দ্র যখন জ্ঞানকীর সহিত আকাশ
 পথে অগোচ্যায় প্রতাবৃত্ত হইতেছেন, তখন সেই স্থলে আমরা যে
 সকল নিরুপম চিত্র দেখিতে পাঠ, কুমারের অষ্টমে, যেন সেই সকল
 চিত্রেরই প্রথম রেখাপাত করা হইয়াছে । কুমারের ঐ অংশ, কোন কোন
 স্থলে ঈষৎ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় ; কিন্তু রঘুর ত্রয়োদশে, তাহার উন্মাদিনী
 কল্পনা পরিপক্ভাব ধারণপূর্বক, গিরিনিকরের ত্রায় অপ্রতিহত গমনে
 চলিয়া গিয়াছে । উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া পাঠ করিলেই এই কথার যথার্থ্য
 উপলব্ধ হইবে । কুমারে অষ্টম সর্গের ২, ৭, ১০, ১৬, ৩২, ৩৪, ৫০, ৫১,
 ৫২, ৫৩, প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিলে, এই কল্পনার কৰ্ত্তা যে কালিদাস
 এ বিষয়ে কোনট সংশয় থাকে না । তাদৃশ হৃদয়োন্মাদিনী প্রতিমা,
 কালিদাস ব্যতিরিক্ত আর কে নিশ্চয় করিতে পারেন ?

মানুষ অভ্যস্ত নহে, সুতরাং কুমারের অষ্টম সঙ্কল্পে হয়ত আমারও ভ্রম
 ঘটিতে পারে । নবমাদি সর্গ সঙ্কল্পে মনস্বী বিদাসাগর মহাশয়ের অভিমতই
 সঙ্গত আদরণীয় । ঐ অংশ যে কালিদাসের রচিত নহে, তাহার প্রামাণ্য
 পক্ষে নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোকই বোধ হয় পর্যাপ্ত হইবে ।

গঙ্গা-বারিণি কল্যাণকারিণি শ্রমহারিণি ।

স ময়ো নিবৃত্তিং প্রাপ পুণ্যভারিণি তারিণি ॥ ১১-৩৬ .

এই শ্লোকে প্রক্ষেপ-কৰ্ত্তা, মাতা ‘রিণি’ অংশের সহিত অনুপ্রাস ও
 সমক রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্থের দিকে একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই ।
 তাই ‘রিণির’ অহুরোধে ‘গঙ্গা-বারিণির’ পুণ্যভারিণি প্রভৃতি অদ্ভুত বিশেষণ
 দিয়াছেন । এই প্রকার—

সৌভাগ্যেঃ খলু সুপ্রাপাং মোক্ষ-প্রতিভুবাং সতীম্ ।

ভক্ত্যত্র তুষ্ঠবুস্তাং তাঃ শ্রদ্ধাধানা দিবো ধুনীম্ ॥ ১১-৫১

মুক্তি-স্তুী-সঙ্গ-দূত্যৈজ্জৈস্তত্র তা বিমলৈর্জলৈঃ ।

প্রক্ষালিত-মনাঃ সম্মুঃ স্নানাতান্তপসাস্বিতাঃ ॥ ১১-৫২

স্নান্বা তত্র স্নানভায়াং ভাগ্যেঃ পরিপচেলিমৈঃ ।

চরিতার্থং স্বমাত্মানং বহু তা মেনিরে মুদা ॥ ১১-৫৩

প্রভৃতি কবিতাও যে কদাচ কালিদাসের করুণা-প্রসূত নহে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলি যাউতে পারে। ঐ সমুদয় শ্লোক যেমনই কষ্ট-কল্পিত, তেমনই অপ্রাসঙ্গিক ও স্থলবিশেষে প্রস্তুত-বিরোধী। কিন্তু এসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

✓ কুমারের অষ্টম পর্য্যন্ত যে কালিদাস প্রণীত তাহা স্থির হইল। বিদ্যা-সাগরের মতে সপ্তম পর্য্যন্ত কালিদাসের রচিত। তদতিরিক্ত অস্ত্রের, কালিদাসের নহে। কালিদাসের রচিত অষ্টমাদি সর্গ বিলুপ্ত। সুতরাং কেবল অষ্টম সর্গ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। তবে তিনি যে বলিয়াছেন, কালিদাসপ্রণীত নবমাদি সর্গ জগৎ-পিতা ও জগন্নাথার বিহার-বর্ণনাত্মক বলিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে,—এ সম্বন্ধে আমাদের অন্য প্রকার মনে হয়।

জগত্তের নাতা-পিতৃস্থানীয় উমা-মতেশ্বরের বিহার প্রভৃতি বর্ণিত হওয়াতেই যে কালিদাসের কবিতার একেবারে বিলোপ ঘটিয়াছে, ভারতের মমস্বি-হৃদয় হইতে কালিদাস-কবিতার স্মৃতিমাত্রও অস্তিত্ব হইয়াছে—ইহা স্বীকার করিতে প্রাণে ব্যথা লাগে। নবমাদি সর্গ-বিলোপের কারণ যদি ঐ-ই হয়, তবে, অত্যাশ্চর্য বহু সংস্কৃত কাব্যের বহু স্থানের বহু কবিতা, বহু অংশও ত বিলুপ্ত হইবার কথা। তাহাদের অস্তিত্বের কারণ কি? যে সংস্কৃত সাহিত্যে—

‘ত্রসন্তু বারাজি-সুতা-স-সম্ভব-স্বয়ং-গ্রহাশ্লেষ-সুধেন নিক্রয়ম্’ ।

প্রভৃতি অনাবৃত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইতে কালিদাসের সতর্ক কল্পনা-
প্রসূত-চিত্রাবলী যে পরিতাক্ত হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর ? বরং
পুরাণাদিতে হর-গৌরীর বিহারাদির চিত্র যেরূপ মুর্ত্তিতে স্থান পাইয়াছে,
কালিদাসের মার্জিত-হস্তের পরিচ্ছন্ন চিত্রাবলী যে তদ্রূপ হইতেই পারে না,
ইহা সহজেই স্বীকার্য্য। মনে হয়, কালিদাস অষ্টম সর্গের অধিক আর
বচনাই করেন নাই। মহাদেবের সহিত পার্শ্বতীর বিবাহ হইলেই ত
কুমারের ‘সম্ভব’ অর্থাৎ সম্ভাবনা হইল। তবে আর কেন ? চতুর্মুখ
দেবতাদিগকে বলিয়াছেন—

উমা-রূপেণ তে যুয়ং সংযম-স্তিমিতং মনঃ ।

শস্তোর্বতধ্বমাক্রষ্টুময়স্কান্তেন লৌহবৎ ॥

তস্তান্মা শিতি-কণ্ঠস্থ সৈন্যপত্যমুপেত্য বঃ ।

মোক্যতে সুর-বন্দীনাং বেণীবীৰ্য্য-বিভূতিভিঃ ৩।

চতুর্মুখের কথা তথা কালিদাসের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইয়াছে। উমা-মহেশ্বরের
মিলন হইয়াছে। সুতরাং সেনাপতির ‘সম্ভব’ অবশ্যসম্ভাবী। গ্রহের
প্রতিপাদ্য শেষ হইয়াছে। তবে আর কেন ? গ্রহবাহুল্যের প্রয়োজন
কি ? তাই কালিদাস বিরত হইয়াছেন।

১—মাঘঃ ১ম সর্গ ।

২—কুমার, ২-৫২ :—মহাদেবের মন তপস্বীতে আসক্ত আছে, অতএব—পার্শ্বতীর
লৌহবী ঘারা, চুচক ঘারা লৌহাকর্ষণের দ্বারা, তাহার চিত্ত তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতে
হইবে।

৩—কুমার ২-৫১ :—সেই নীলকণ্ঠের পুত্র তোমাদিগের সেনাপতিগণ গ্রহণপূর্বক, অমৃত
পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, বন্দীকৃত দেব-মহিলাদিগের বৈশিষ্ট্য বোচনপূর্বক বিরহিনীর বেশ
দ্রুত করিবেন।

বিশেষতঃ, তিনি দেখিলেন যে কুমারের নায়ক-নায়িকারূপে, জগৎ-
 স্খিতা ও জগন্মাতার যে অল্পম মূর্তি গঠন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের যে
 অবাঞ্ছনস-গোচর, অদ্ভুত, নিকাম, পবিত্র প্রেমের চিত্র অঙ্কন
 করিয়াছেন, সে চিত্রের কোথাও যেন করম্পর্শ হয় নাই, সে চিত্রের
 কোথাও বাসনার লেশ নাই, লালসার গন্ধ নাই, ভোগের নামও নাই ।
 সে চিত্রে আত্মসমর্পণ আছে, কিন্তু তাহা মুক্তির জন্ত, ভোগের জন্ত নহে ;
 সে অগাধ-প্রেম অদমা আবেগ আছে, কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তির উন্মেষণাও
 নাই, বরং তাহাতে নিবৃত্তি বলবতী । এতদূশ যে বিরটি, বিগুহ, নিকাম
 প্রেমের মূর্তি, তাহার সম্বন্ধে যদি, ভোগ-ভূমি পৃথিবীর প্রবৃত্তিময় ভোগ-
 ক্লাস্ত জীবের বিহারাদির স্থান বিহারাদির বর্ণনা করেন,—বর্ণনা ত দূরের
 কথা,—যদি তাঁহাদের উপর তাদৃশ ভীষণত্বের আরোপও করেন, তবে, হর-
 পার্কতীর সেই অবাঞ্ছনস-গোচর বিরটি প্রেমের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রহিল
 কৈ ? সে অতুল মূর্তির অতুল রহিল কৈ ? তাই কালিদাস সংসারী
 জীবের যে বিচক্ষণ ক্ষেত্র, তাহার অনেক উচ্চে হরপার্কতীর স্থান
 দিয়াছেন । মানাত্ম জনের স্থান, তাঁহাদের বিহারাদির বর্ণনা করিয়া
 অজ্ঞানি করেন নাই । পরিণয়ের পর নবদম্পতির—না—না, কেবল
 পরিণয় নহে, অতঃপশ্চাৎ, অতঃসামান্যতার পর, মিলিত হরপার্কতীর
 কাল যে ভাবে অতিবাহিত হইতে পারে, আর তাহার চিত্র আবার যত
 সুন্দর হইতে পারে, তাহা কালিদাস মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন । তবে
 অতঃসুন্দর একট: ভাব কালিদাস উপেক্ষা করিতেও পারেন নাই । রঘুর
 প্রয়োদশে, অপহৃত জানকীর উদ্ধারের পর, তাঁহার সহিত রামের মিলন
 করাষ্টয়া, কালিদাস, হরপার্কতীর বিহার-বর্ণনার আক্ষেপ মিটাইয়াছেন ।
 তিনি কুমারে, দেবদেবীর দেবত্রে পাছে মাহুত্ব আসিয়া পড়ে, এই
 আশঙ্কায় হরপার্কতীর সম্বন্ধে বর্ণনার যে বিরত হইয়াছেন, রঘুতে রামসীতার
 সম্বন্ধে সেই বর্ণনা করিয়া, তাঁহাদিগকে দেবত্বময় করিয়া তুলিয়াছেন ।

এই কারণেই বোধ হয়, কালিদাস কুমারের অষ্টমের অধিক আর রচনা করেন নাই ।

• তিনি কুমার লিখিবার সময়েই বুঝিয়াছিলেন যে, দেবতার আদর্শে মানব-সমাজ গঠন করা যায় না, লোক-শিক্ষা দেওয়া চলে না । মানব-সমাজ শিক্ষিত করিতে হইলে মানবেরই উচ্চ আদর্শ চাই । তাই তিনি তখন হৃৎকণ্ঠে বোধ হয়, মানব-দেব রাম ও মানবী-দেবী সীতার চরিত্র বর্ণন করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন, এবং কুমারের দেব-দেবীর সম্বন্ধে বর্ণনায় বিহাঙ্গাদি বিষয়ের সক্ষমত উপকরণপ্রাপ্তি, রঘুবংশের রাম-সীতার জন্ত সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন । হরপার্বতীর পবিত্র প্রেমের কথা তিনি ঈষ্টমন্ত্রের মত হৃদয়ে রাখিয়া রাখিয়াছিলেন । তিনি, যখন যে কোন উচ্চ আদর্শ গঠন করিতে গিয়াছেন, তখনই, সন্ধ্যায় হর-পার্বতীর পবিত্র চরিত্র তাঁহার মনে পড়িয়াছে । মানবের চরিত্র তিনি ঐ আদর্শে গঠন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন । তাই, তাঁহার প্রধান প্রধান পুস্তকে, যে কয়খানিতে তিনি উৎকৃষ্ট নরনারীর আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমুদয়ের প্রারম্ভেই, ‘পার্বতীপরমেশ্বরকে’ প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের আদর্শ হৃদয়ে রাখিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছেন । রঘুবংশ, বিক্রমোর্কশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা—সমস্ত কাব্যেই এই সত্য বিদ্যমান ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

কুমার ও পুরাণ ।

কুমার-সম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতিতেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । তবে রামায়ণের বর্ণিত বৃত্তান্ত এবং কুমার-বর্ণিত-বৃত্তান্তে প্রভেদ এই যে, রামায়ণে পার্শ্বতীর সহিত পরিণয়ের পর মদন-ভস্মের কথা বর্ণিত^১, আর কুমারে পরিণয়ের পূর্বেই মদনকে ভস্মীভূত-করা হইয়াছে । ইহা ছাড়া আর বড় বেশী প্রভেদ নাই । কিন্তু অজ্ঞাত পুরাণাদিতে ঠিক কুমারের বর্ণনার স্থায়, হরগৌরীর বিবাহের পূর্বেই মদনকে ভস্মসাৎ করা হইয়াছে । কেবল ইহাই নহে, ঐ সকল পুরাণের সহিত, কুমারসম্ভবের ঐতিহ্যের যেরূপ সাদৃশ্য আছে, অনেক স্থলে, শ্লোকেরও সেই প্রকার সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । এমন কি, কুমারের অনেক শ্লোকও পুরাণাদিতে অবিকল পরিদৃষ্ট হয়^২ । এইক্ষেণে প্রায় এই

১—“কল্পর্পে নৃন্তিমানানীং কাম ইত্যাচ্যতে বুধৈঃ । তপশ্চস্তমিহ স্বাসুঃ নিয়মেন সমাহিতম্ । ১০ কৃতোদ্বাহ তু দেবেশং গচ্ছন্তং সমরদগ্ধনম্ । ধর্ম্মমাসি চুর্ম্মেধাঃ হ্রুতশ্চ মহান্মনা । ১১ অবধাতশ্চ রুদ্রশ্চ চকুবা রঘুনন্দন । বাসীর্ঘাস্ত শরীরাত্ম স্বাৎ সর্ক-গাত্রাপি চূর্ম্মতেঃ । ১২ তত্র গাত্রা হতং তস্ত নিদংস্ত মহান্মনা । অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্বেষেণ হ । ১৩ রামায়ণ, বাল, আদি, ২৩শ সর্গ ।

২—কুমার, ১ম ২৬ শ্লোক এবং ব্রহ্মপুরাণ, অধ্যায় ৩৪, শ্লোক ৮৫, ৮৬ । কুমার, ৩য় ৩৩ শ্লোক এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ঐক্কক-জন্ম-খণ্ড, অধ্যায় ৩৯, শ্লোক ২৫ । কুমার, ২য় ৩৩ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত, ঐক্কক-জন্ম-খণ্ড, অধ্যায় ৩৯, শ্লোক ৪০ । কুমার, ৫ম—২০, ২৬ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত, ঐক্কক-জন্ম-খণ্ড, ৪০, শ্লোক ১৫, ১৭ প্রভৃতি । কুমার,—৫ম, ৭০, মহাজনঃ স্নেহমুখো ভবিষ্যতি । ব্রহ্মবৈবর্ত,—ঐক্কক-জন্ম-খণ্ড, অধ্যায় ৪১, শ্লোক ২৬—“মহাজনঃ স্নেহমুখঃ ভূতিমাত্রাভ-বিষ্যতি । তদ্বিচ্ছাসি বিতো যষ্টুং সেনান্তং তস্ত শাস্তরে । কর্ণবন্ধিহিহ বর্ম্ম ভবত্যেব

বে, কালিদাস কি তবে, পুরাণাদির বৃত্তান্ত অবিকল ভাবে অবলম্বন করিয়া, এমন কি স্থল-বিশেষে পুরাণাদির শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া, কুমার-সম্ভব গ্রন্থখন করিয়াছেন ? ইহাত কিছুতেই মনে হয় না । কালিদাস যদি কাহারও নিকট শ্রুণী থাকেন, তবে সে যে, ব্যাস-বাস্থ্যিকির নিকট, ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহাদের বর্ণিত শ্লোক পর্য্যন্তও যে আত্মসাৎ করিবেন, এরূপ কখনও সম্ভবপর নহে । বিদ্যাসাগর মহাশয় সতাই বলিয়াছেন,—“কালিদাস অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, যে আপন কাব্যে অন্তর্দীপ্ত শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে । যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অন্ত্যস্ত গ্রন্থের রচনার সহিত সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে, কিন্তু উক্ত পুরাণাদির কোনও অংশের রচনার সহিত কোনও অংশে উহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না ।” বিশেষতঃ ঐ সমুদয় পুরাণ, অথবা উহাদের ঐ সমুদয় স্থান, “কুমার-সম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কি না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে । যাবতীয় পুরাণ বেদ-ব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ । কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা-প্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া কোনও ক্রমে প্রতীতি হয় না । যাহাদের সংস্কৃত রচনার ইতর-বিশেষ বিবেচনা কুরিবার শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারেন, যে, এই সকল এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে । বাস্তবিক

মুদ্রকঃ । যমোহপি বিলিখন্ জুহিঃ দণ্ডেনান্তবিত্তিবা । বিষয়কোহপি সংবদ্ধা বদ্যং হেতুনসাম্প্রতন্ । শিবপুরাণ, উত্তর খণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায় । কুমার-সম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ ।

‘আকাশ-ভবা সরস্বতী । শকরীং হৃদ-শোভ-বির্রবাং প্রথমা বৃত্তিরিবাক্ষসায়ং ।’ বোধ-বাণিষ্ট, কুকেলাস, পৃ ১২৩ । কুমার, ৪র্থ সর্গ । এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও আছে ।

পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয় এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয় পুরাণ-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-সমূহের অধিকাংশই প্রাচীন নহে।” উহাদের কতিপয় বেদবাস রচিত, এবং অবশিষ্টগুলি, হয়ত; পরবর্তিত-কালের যশোলিপ্সু গ্রন্থকারগণ প্রণয়ন পূর্বক, বেদ-বাস-রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নতুবা বেদবাস-রচিত বলিয়া এমন পুরাণও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে, সম্রাট আকবরের নামোল্লেখ আছে, লণ্ডন শকের নির্দেশ আছে, আর সেই লণ্ডনের অধীশ্বরী “বিকটাবতী” বা ভিক্টোরিয়ার পর্য্যন্ত কীর্ত্তন আছে। সুতরাং বেদবাস-নামের সংযোগ থাকতেই যে তাবৎ পুরাণ “বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্বে রচিত, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, ও তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিত্যন্ত ভক্তি না থাকিলে, এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন। বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগ-বাশিষ্ঠ ও কুমারসম্ভবে শ্লোকের ঐক্য আছে। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ সে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও ঋষি-প্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোনও অংশ সংশয় হইতে পারে না।”

মনে হয়, কুমারসম্ভবের ঐতিবাহ্য-শাষ্টি, কালিদাস রামায়ণ হইতে সংকলিত করিয়াছেন। রামায়ণে হরগৌরীর বিবাহের বহুকাল পরে, তপস্চারিত বিরূপাক্ষ কর্তৃক মদন ভয়ীকৃত হইয়াছেন। কালিদাস দেখিলেন, ইহাতে লোকশিক্ষার আন্তরকূলা হইতে পারে, কিন্তু চমৎ-কারিতার বিকাশ হয় না; তাই তিনি বিবাহের পূর্বে মদনকে ভয়ীভূত করিয়া, পার্কীর সৌন্দর্য্যভিমানের মূলচ্ছেদ-পূর্বক, পরে আবার পার্কীরই অমুরোধে, বিবাহিত আনন্দময় আশুতোষের দ্বারা মদনের পুনরুজ্জীবন করাইয়াছেন। এই প্রকারে ঐতিবাহ্যের কিয়ৎপরিবর্তনে, রামায়ণের ঐ অংশ অপেক্ষা কালিদাসের ঐ অংশ সমধিক সুন্দরতর ও মনোহর হইয়াছে।

বাস-বাগ্মীকির বর্ণিত ইতিবৃত্তের এইরূপে ঈষৎ পরিবর্তন, পরিবর্জন বা প্রয়োজনানুসারে পরিবর্জন পর্যাস্ত করিতেও সৌন্দর্যের কবি কালিদাস ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যেমন লোকশিক্ষা সমাজ-শিক্ষা এবং সর্বজন-মনোরঞ্জনের জন্ত রামায়ণাদি লিখিত হইয়াছে, তদ্রূপ কলা-শিক্ষার জন্ত, সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনের জন্ত, কেবল শিক্ষিত সামাজিকগণ ও কবিতারসামোদীদিগের জন্তও কাব্য প্রণীত হওয়া উচিত। তাই তিনি শেষোক্ত ভাবে কাব্য-প্রণয়ন করিয়াছেন। এই কারণেই রামায়ণ-বর্ণিত অংশের সহিত কুমারসম্ভবের বর্ণিতাংশের, এবং মহাতারত-বর্ণিতাংশের সহিত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-বৃত্তান্তের ঈষৎ প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যে সমুদয় পুরাণাদিতে হর-পার্কটীর বিবাহের পূর্বে মদনকে ভয়ভূত করা হইয়াছে, মনে হয় ঐ সকল পুরাণপ্রণেতার কবি কালিদাসেরই প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়াছেন। কেননা, ঐ সকল গ্রন্থের হর-গৌরীর বিবাহ-বিষয়িণী বর্ণনার অধিকাংশই কুমারসম্ভবের ঐ অংশের অনুরূপ।

কালিদাস কুমার-সম্ভবের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া অতীব দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উপর বাগদেবীর অপার করুণা ছিল, তাই তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন; নতুবা, বোধ হয়, অল্প কোনও কবিই কুমারসম্ভবে হস্তক্ষেপ করিলে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

তাঁহার কুমারের প্রধান বান্ধি তিনজন,—পার্কটী, মহাদেব ও মদন। কাব্যের যিনি নায়িকা তিনি দেবীর দেবী আদ্যা শক্তি, ত্রিজগতের পরমারাধ্যা, মাতৃস্থানীয়া। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কবিকে, সর্বদাই অতি সতর্কতার সহিত কথাবার্তা কহিতে হইবে। মাতার কথা সম্ভবনের বে ভাবে বলা সঙ্গত, সেই ভাবে বলিতে হইবে। কাব্যের যিনি নায়ক তিনি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ সমস্ত দেবগণের বন্দনীয়, ত্রিসংসারে পূজনীয়, জিতেজয়, নিকাম-নির্লিপ্ত, আশান-চ্যারী, স্বর্গ-মর্ত-রসাতলের গিড়স্থানীয়। আর কাব্যের যিনি প্রতিনায়ক, তিনি আবাস, অনন্ত-

ক্ষমতাশালী, জগতের সম্বোধন ; ব্রহ্মার উপরও তাঁহার অপরিমিত আধিপত্য, আব্রহ্ম-স্বত্ব-পর্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন । তিনি নামে মদন, কার্যেও মদন । এতাদৃশী ত্রি-মূর্তির ত্রিবিধ অসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টি-বস্তুপারে কালিদাস হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । জগদারাধ্যা আদ্যা শক্তির চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে ; জগদারাধ্যা, জিতেন্দ্রিয়, মহাদেবের জিতেন্দ্রিয় অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে ; আবার জগদ্বন্দ্যাদক মদন,

“কুর্য্যাং হরস্তাহপি পিনাক-পাণেঃ

ধৈর্য্য-চ্যুতিং কে মম ধ্বিনোহন্তে ?”

বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাও পালন করাইতে হইবে । এ বড় কঠিন সমস্তা । দেখা যাউক, এই কঠিন সমস্তার পূরণে আমাদের মহাকবি কতদূর ক্লতকার্য্য হইয়াছেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পার্কতী ।

পার্কতী-চরিত্র লইয়াই কুমারসম্ভব । কুমারে অস্ত্রান্ত্র যত চরিত্র
বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই গৌণ । মুখ্য চরিত্রই পার্কতীর । সুতরাং
পার্কতীচরিত্রই আলোচনা করা যাউক । তাহা হইলে, সেই সঙ্গে
অস্ত্রান্ত্র চরিত্রেরও আভাস পাওয়া যাইবে ।

পার্কতীচরিত্রে আবার, বিরূপাক্ষের প্রতি পার্কতীর অনুরাগই প্রধান
ব্যাপার । সে অনুরাগ এত অদ্ভুত, অসাধারণ, গম্ভীর ও অপরিমিত যে,
দেবী বাতীত মানবীতে তাহার ক্ষুরণ হইতেই পারে না । মানুষের
সকলই স-সীম । মানুষের অনুরাগ যত গম্ভীর, যত অসাধারণই হউক
না কেন, কিন্তু তাহা পরিমেষ । অথবা কেবল মানুষ কেন, যক্ষাদি
দেব-যোনিদিগের অনুরাগেরও একটা ইয়ত্তা আছে । কিন্তু শ্বশান-চারী
ভূতনাথ, বিরূপাক্ষের প্রতি ‘পার্কত-রাজ-পুত্রী’ উমার যে অনুরাগ,
তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহা অনন্ত, অপরিমিত । মানবে অত অনুরাগ
সম্ভাবিত নহে, তাই বুঝি কালিদাস, ঐ অনুরাগ-প্রবাহের যিনি প্রত্নবিশী
তঁাহাকে দেবীর দেবী আদ্যা শক্তি করিয়াছেন । যেসে দেবীতে হইবে
না, ইচ্ছাশী বা বক্রগানীতে অত অনুরাগ, অমন প্রণয় দেখান যায় না,
তাই মহাকবি মহামায়ার শরণ লইয়াছেন । নিজের কল্পনার উপর তঁাহার
এত অধিক বিশ্বাস ছিল যে, তিনি, তদীয় সর্বপ্রথম কাব্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ
দেব-দেবীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । তঁাহার অপরূপ কাব্যে
প্রণয়চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত, কুমার-সম্ভবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ।

তঁাহার মেঘদূতে, বিলাসী যক্ষ তাহার বিরহিণী বিলাসিনীর অস্ত
একেবারে উন্মত্ত । যক্ষের যত কিছু ব্যাপার, সব যেন ইন্দ্ৰিয়বিকারেরই ফল ।
তাহার প্রতিকথায় বলবতী ভোগ-লালসার পরিচয় প্রকটরূপে বিদ্যমান ।

“নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্ছন্দিকাসু ক্ষণাসু”^১ বলিয়া যক্ষ তাহার লালসা-বহির প্রদীপ্ত-শিখা আবরণ উন্মোচন করিয়াছে ।

তাঁহার অভিজ্ঞান-শকুন্তল, যদিও অপার্থিব, পবিত্র, প্রণয়য়ত্নের আকর, কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্রিয়-লালসার ছায়াপাত হইয়াছে । রাজ্য হৃষ্যস্তের শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া যে কথা^২, তাহাও ইন্দ্রিয়-বিকারেরই পূর্বসূত্র । তাঁহার—

‘যদার্য্যমশ্রামভিলাষি মে মনঃ’ ।

এবং—‘বৈখানসং কিমনয়া ত্রতমাপ্রদানাৎ

ব্যাপার-রোধি মদনশ্চ নিষেবিতব্যম্’ ॥

প্রভৃতি প্রসঙ্গ, তদীয় হৃদয়ের প্রবল ইন্দ্রিয়-ওরঙ্গাভিযাতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র । তবে শকুন্তলায়, সে ইন্দ্রিয়-বিকার অতিশয় প্রচ্ছন্ন ।

তাঁহার বিক্রমোদগমী ত ইন্দ্রিয়-বিকার-গ্রাস্তেরই প্রতিকৃতি । নায়িকা অপ্সরা, তিনি আবার স্বর্গের রাজ-সভার প্রধান নর্তকী । সুতরাং তাহাতে ইন্দ্রিয়ের প্রাণাত্ম না থাকিলেই একান্ত অস্বাভাবিক হইত । এই সমস্ত কাব্যোক্তি প্রণয় ইন্দ্রিয়-বিকারের সজ্জিত মিশ্রিত । ইন্দ্রিয়-বিকার-শূন্য, কাম-গন্ধ-বর্জিত, স্বর্গীয় প্রণয়ের চিত্র এষ্ট সকল কাব্যে নাই । কিন্তু কালিদাস, কুমারে পার্কটীর যে প্রণয়-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রিয়-বিকারের লেশ নাই, কামের গন্ধ নাই । ভোগ-লালসা সে গভীর পার্কটী-

১—মেঘদূত, উত্তর মেঘ স্লোক—৪৭ ।

২—‘অহো! যধুরমাংসং দর্শনম্’—শকুন্তলা, ১ম, অঙ্ক । আহা! ইহাদের কি হৃদয় রূপ ।

৩—যেহেতু আমার আৰ্য্য হৃদয় ইহাতে অভিলাষী হইয়াছে ।

৪—যতদিন ইহার বিবাহ না হইবে, কেবল ততদিন* কি ইনি এই মদন ব্যাপার বিরোধী বৈখানস-ত্রুত ধারণ করিয়া থাকিবেন ?

প্রণয়ের ত্রি-সীমাত্তেও স্থান পায় নাই। সে প্রণয় জগদানন্দ-দায়িনী আদ্য শক্তিরই অমূরূপ, কেবল তাঁহাতেই সম্ভবপর।

পার্বতীর মাতা মেনা, তিনি পিতৃ-গণের মানসী কন্তা। পিতা হিমালয়, তিনি পর্বতকুলের রাজা। যখন প্রজাপতি, গিরিরাজ হিমালয়ের পৃথিবী ধারণের যোগাতা দেখিলেন, ভগ্নতে বত প্রকার যাগযজ্ঞ হয়, সে সমুদয়ের সমস্ত উপকরণ একমাত্র হিমালয়ে আছে—ইহা জানিলেন, তখন তিনি স্বয়ং হিমালয়কে পর্বত-কুলের রাজা করিয়া দিলেন, দেবতা-দিগের ত্রায়, যাগ-যজ্ঞের অংশ-ভাগী করিয়া দিলেন, চূড়ান্ত সম্মান করিলেন^১। অবতড় সম্মানো রাজার অমূরূপ সহদম্বিনী কোথায় মিলিবে? পূর্বাপর-সমুদ্রাবগাহী বিরাট হিমালয়, পৃথিবীর যাবতীয় পর্বত-কুলের ‘অধিরাজ’ প্রকাণ্ড হিমালয়, স্বর্গের দেবতারদের লীলা-নিকেতন বিশাল হিমালয়,—তাঁহার পত্নী,—বড় কঠিন কথা। হিমালয় নিজে যেমন অসামান্য, তাঁহার পত্নীও তেমনই অসামান্য না হইলে মানাইবে কেন? বিধাতার সৃষ্টিতে তাঁহার অমূরূপ ভাৰ্য্যা চূর্ণত। পৃথিবীর সমস্তই ক্ষুদ্র, সঙ্কর্ণ; সুতরাং কোনও পার্থিব নারী-সৃষ্টিই বিরাট হিমালয়ের পত্নীর যোগা হইতে পারে না। তাই পিতৃগণ, তাঁহাদের এক মানসী কন্তা সৃষ্টি করিলেন। সে কন্তা যোগ-ব্রহ্ম-বাদিনী, সে কন্তা সম্মানিত মুনিগণেরও বহু মাননীয়। স্থিরতায় এবং ধীরতায় সে কন্তা হিমালয়েরই অমূরূপ। সে কন্তা স্বর্গের পিতৃ-গণের যেমন ভাদরণীয়া, মর্ত্তের ঋষিগণেরও তেমনই পূজনীয়^২। এতাদৃশ স্বর্গ-মর্ত্ত-পূজিত কন্তার সহিত, স্বর্গমর্ত্তবাপী পরমসম্মানী গিরিরাজের পরিণয় হইল। এবম্বৃত্ত স্বর্গমর্ত্তপূজিত, স্বর্গমর্ত্তবাপ্ত পিতা-মাতার কন্তার হৃদয়, এবং সেই হৃদয়ের প্রণয়, যে প্রকার হওয়া উচিত, পার্বতীরও ঠিক তাহাই হইল। অথবা

১—কুমার—১৫—১৭।

২—কুমার—১৫—১৮।

হৈর্য্যে, ধৈর্য্যে, গান্ধীর্থে, পার্শ্বতীর হৃদয় এবং সে হৃদয়ের প্রাণয়, বেন
ছিন্ন-ধীর-গান্ধীর মেনা-হিমালয়কেও অতিক্রম করিল ।

দৃঢ়-সঙ্কল্প পার্শ্বতী মদন ভ্রমের পর, আবার যখন তপোবলে চঞ্জ-
শেখরের করুণা লাভের জন্ত যাত্রা করেন, তখন দেবগণের মান্য কল্প
মেনাও পার্শ্বতীর অলৌকিক প্রাণয়-গতি-দর্শনে অবাক হইয়াছিলেন ।
'এ অসাধ্য সাধন কেন'—বলিয়া মাতা মেনা হুহিতা পার্শ্বতীকে কতই না
বুঝাইয়াছিলেন । কল্পার সেই অসাধারণ হৃদয়-গতি, জননী মেনা নিজ-
মনে ধারণা করিতেই পরিয়াছিলেন না । তাই তিনি, যখন শুনিলেন
যে তাঁহার সেই অনিন্দ্যমুন্দরী কল্পা উমা, একবার বাঁহার অত সেবা
শুশ্রূষা করিয়াও, প্রাণপাতী সন্তর্পণ করিয়াও মন পায় নাই, আবার
সেই বৃক্ষজের প্রতি আসক্তিমতী হইয়াছে; সৌন্দর্য্য বাঁহাকে মুগ্ধ করিতে
পারে নাই, তপোবলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে আবার পণ করিয়াছে,
তখন মেনা পার্শ্বতীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—'মা, এমন
কোন্ দেবতা আছেন, বাঁহাকে, ইচ্ছামাত্রেই, তোর পিতৃগৃহে বসিয়া না
পাই? তবে কেন এ তপস্তা? তোর এ কোমল-দেহ কি কঠোর
তপস্তার ভার সহিতে পারিবে? কাজ নাই তোর তপস্তায়' ।' মাতা
মেনা মাতৃ-ধর্ম্মে ভুলিয়া, পার্শ্বতীকে ঐ প্রকার কত কথাই বলিয়াছিলেন
কত উপদেশই না দিয়াছিলেন! স্নেহময়ী জননী কল্পার শারীরিক
কোমলতাই মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই কল্পার হৃদয়ের দৃঢ়তা যে
কত অধিক, মনের বল যে কত বিপুল, কত অসীম, তাহা গিরীজ-মহিষী

১—কুমার, ৫২—

“নিশমাটেনাং তপসো কুতো দ্যাবাং হুতাং দ্বিরীশ-প্রতিসঙ্কমানসাম্ ॥

উবাচ বেনা পরিরম্ভ্য বক্ষসা নিবারয়ন্তী বহতো মুনি-ব্রতান্ ॥” ৩ ।

• “ননীষিতাঃ সন্তি গৃহেবু দেবতা তপাঃ কৃৎসনৈঃ । ক চ তাবতঃ বপুঃ ।

পদং সহেতু জসরম্ভ পেলবঃ শিরীষ-পুলাং ন পুনঃ পতজ্জিহ্বাঃ ॥” ৪ ।

বুঝিতে পারেন নাই। তাই বলিতেছিলাম,—বে, প্রকাণ্ড মেনা-
হিমালয়ের কন্তা পার্শ্বতী, কালে, স্বীয় হৃদয়ের প্রকাণ্ডত্ব, তাঁহার মাতা
শিতাংকেও যেন অতিক্রম করিয়াছিলেন।

বালিকা পার্শ্বতী পিতা-মাতার পরম আদরের ধন। অপরাপর পুত্র
বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হিমালয়ের স্নেহ কিন্তু কন্তা পার্শ্বতীর উপরই
সমধিক। তিনি কন্তাকে নিরন্তর নিকটে রাখেন; অতৃপ্ত-নয়নে ও
স্নেহ-পূর্ণ মনে কন্তার দিকে যত চাহিয়া থাকেন, তত তাঁহার আরও চাহিয়া
থাকিতে বাসনা জন্মে^১। পামাণ হিমালয়ের অমৃতোপম স্নেহনির্করে সেই
লাবণ্য-লতিকা, এষ্ট ভাবে, দিনে দিনে, গুরুপক্ষের শশিকলার জ্বায় বর্দ্ধিত
হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বৈবাহিক কাল উপস্থিত হইল। এমন সময়ে
একদিন, সেই কুমারীকে পিতার সমীপবর্তিনী দেখিয়া, নারদ কেবল বলিয়া
গেলেন যে, এই কন্তা প্রেমবলে একদিন মহাদেবের দেহাঙ্কভাগিনী
হইবেন, মৃত্যুঞ্জয়েরও হৃদয়-জয় করিতে পারিবেন^২। পিতৃ-পার্শ্ববর্তিনী
পার্শ্বতী নিবিষ্ট-হৃদয়ে, স্থিরভাবে দেবর্ষি নারদের এই আদেশবাণী
শুনিলেন। এ বাণী যেন তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মন্মে প্রবেশ
করিল। তাঁহার প্রশান্ত, নিশ্চল, আকাশকল্প বিশাল হৃদয়ে যেন একটা
স্বপ্নের সৌদামিনী চকিতে খেলা করিয়া গেল।

ক্রমে কন্তার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেবর্ষি নারদের মুখে মহাদেবের
নাম শ্রবণ করা অবধি, পিতা হিমালয়, কন্তার পরিণয়-সম্বন্ধে একেবারে
নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শশাঙ্ক-শেখর ব্যতীত অস্ত্র বরে, কন্তা-সম্প্রদানের
তাঁহার আর বাসনাষ্ট নাই। কিন্তু অঙ্গিনাথ নিজে উপযাচক হইয়া ভিখারী

১—কুমার, ১ম—“মহীভূতঃ পূজ্যভোহপি দৃষ্টান্তশ্রিত্যতো ন জগাম ভৃগুশ্চ।

অনন্ত-রহস্য মমোহি চূতে দ্বিরেকমালা সবিশেষ-সঙ্গা।” ২৭।

২—কুমার, ১ম—৪০।

ভোলানাথকে এ প্রস্তাব জানাইতে সাহসী হইলেন না^১ । তিনি নীরবে কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । আর এক কথা,—পশুপতির নিকটে কল্পা-দানের প্রস্তাব করেনই বা কোন্ সাহসে ? দক্ষ-মুখে পুত্রির নিন্দা শ্রবণে মগ্না হইয়া যে দিন সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে যে সতী-কান্ত হৃদয়ের সমস্ত বাসনা বিসর্জনপূর্বক, দারাস্তর পরিগ্রহ না করিয়া, শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান^২, তাহার কাছে—অমন অগাপ প্রেম-পারাবারের কাছে, পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিতে কারিই বা সাহসে কুলায় ? ‘চরিত্রের বল বড় বল’ সে বলের নিকটে রাজাধিরাজ মহারাজকেও অবনত হইতে হয়, দৃপ্ত সিংহকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হয় । নগাপিরাজ হিনালয় তাই উৎসুক হৃদয়ে কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে, শ্মশান-চারী শঙ্কু তপস্তার জন্ত হিনালয়ের এক সাহুদেশে উপস্থিত হইলেন । সে স্থান অতি মনোরম । সে স্থানে, উর্ব্ব দেশ হইতে পতিত, কল-নাদিনী গঙ্গার পূব-প্রবাহে দেবদার বন নিত্য অভিষিক্ত^৩ । সেই সঙ্ক-প্রধান স্থানে, মৃগগণ নির্ভয়ে ইতস্ততঃ ক্রীড়া রত ; মৃগ-নাভি-সৌরভে সমগ্র সাহুদেশ আনন্দিত । কিম্বদ-কিম্বদীর্ঘ নখর-কণ্ঠে গান দরিয়। সে সাহুদে সমস্ত বন-ভূমি উদ্গাদিত ও মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন । এবং বিধ স্থানে নির্ঝিন্দার শঙ্কর সমাপিত হইলেন । তাহার অল্পচর প্রমথগণ, সেই স্থানে, পুরাগকুসুমের অবৎস করিয়া কাণে পরিত । শীতল মন্থণ ভূজপত্র পরিধান-পূর্বক শরীর জুড়াইত । সুগন্ধি গৈরিক চূর্ণে দেহ বিলিপ্ত করিত^৪ । এই ভাবে, পরম সুখে, তাহার তথায় বাস করিতে লাগিল । আর সেই গঙ্গাধর, বাঁহার তপস্তায় ভক্তের কোনও

১—কুমার, ১ম—“অবাচিতারঃ নহি দেবদেবমজিঃ স্তভাঃ গ্রাহয়িতুং শশাক ।

অভ্যর্থনা-ভঙ্গ-ভয়েন সাধুন্যাদ্যাহ্মিষ্টেইপাবলম্বতেহর্ষে ॥” ৫২ ।

২—কুমার, ১ম—৫৩ ।

৩—কুমার, ১ম ৫৪ ।

৪—কুমার, ১ম—৫৪—৫৫ ।

অভীষ্ট অর্পণ থাকে না, বাহার বাহা অভিপ্রেত, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, তিনি—সেই ভক্ত-বান্ধ-কল্পতরু গঙ্গাবর, জানি না, কি কামনা সিদ্ধির জন্য আভ্যাসগুণে, প্রজ্জলিত অগ্নি স্থাপন-পূর্বক তপস্তায় নিমগ্ন! কাহার সাধা তাঁহার নিকটে যায়? হিমালয় এতদিন সময়ের দিকে চাহিয়াছিলেন, আভ্যাসগুণে, সময় আসিয়াছে। তখন—

অনর্ঘ্যমর্যোগ তমদ্দিনাথঃ স্বর্গৌকসামর্চি তমর্চয়িত্বা ।

আরাধনায়ান্ত সখীসমেতাং সমাদিদেশ প্রযতাং তনুজাম্ ॥

কথার উপর, কথার উদার চরিত্রের উপর, হিন্দুর অগাধ বিশ্বাস ছিল। চিত্তসংযমের ক্ষমতা যে সে কথার কত গরীবসী, তাহা তিনি জানিতেন। এবুও তিনি, মানমথ শিবের শুশ্রূষার জন্য যখন পার্বতীকে প্রেরণ করেন, তখন তাহার সঙ্গে, দুই জন সখীও দিয়াছিলেন। ধীর হিমালয়, অনেক চিন্তা করিয়া পার্বতীকে বিদায় দিলেন।

দেবর্ষি নারদ তাহার কথা বলিয়াছেন, আর কিছু না; হউক, কেবল নীরবে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াই এ জীবন সার্থক করিব—ভাবিয়া সেই লাভণ। গরজ্জী গৌরা কানমথ গিরীশের সমীপবর্তিনী হইলেন। গৌরার আর কিছুই আকাঙ্ক্ষিত নহে। কেবল সেবা করিবেন। তাহাতেই তাঁহার কত আনন্দ! কামিনী-কাঞ্চন সাধনার পরিপন্থা হইলেও, নির্বিকার মহাদেব পার্বতীকে সেবা করিবার অনুমতি দিলেন*। ইহাতেই—সেবা করিবার এই অনুমতি টুকুতেই, পার্বতীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

১। কুমার ১ম—৫৭।

২—কুমার, ১ম—৫৮। দেবতাদিগের পূজনীয় অভুলিত মহিমশালী সেই প্রভুকে অর্ঘ্যদান পূর্বক পূজা করিয়া পরতরাজ আপন কন্ঠকে আদেশ করিলেন যে বাও তোমার দুই সখীর সহিত পবিত্র মনে দেবদেবের সেবা কর গিয়া। (কৃষ্ণকমল)

৩—কুমার, ১ম—“প্রত্যুখী-ভূতাসপি তাং সমাধেঃ শুশ্রূষমাণাং গিরিশোহনুমে।

বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাসি ত এব ধীরাঃ”। ৫৯।

তাহার গভীর হৃদয়ের গভীর প্রণয়, যেন আরও গম্ভীর-ভাব ধারণ করিল । সে প্রণয়, সরস্বতীর পুণ্য-প্রবাহের জ্বাৰ, তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়— তাহার মধ্যে লুকাইল । তিনি তাহার বাহ্যিক দেবতার সেবা করিতে পাইবেন, এই আনন্দে সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমার অতুল রূপ-রাশি যেন আরও হাসিয়া উঠিল । গৌরী তাহার সেই, ঘন-কৃষ্ণ মেঘ-বিনিন্দী কেশ-পাশ পৃষ্ঠদেশে দোলাইয়া, যখন বনের ইতস্ততঃ কুসুম-চয়ন করিতেন, তখন বন-দেবীরাও বিস্মিত-নয়নে সেই অনিন্দ্য-বাস্তির দিকে চাহিয়া থাকিতেন ! পার্শ্বতী অনন্ত-হৃদয়ে মহাদেবের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন । তিনি শিবের অর্চনার জন্ত পুষ্প-চয়ন করিয়া আনেন, শিবের সমাধিবেদি অতি যত্ন-সহকারে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করেন, শিবের জ্ঞানের জ্বল আনিয়া দেন, বাছিয়া বাছিয়া অক্ষত কুশ আহরণ করেন,—এই ভাবে, ক্রমে, তিনি যেন একেবারে শিবময়ী হইয়া পড়িলেন^১ । মহাদেবের যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে পারে, সে সমস্ত, পার্শ্বতী পূর্ক্সাহুই সংগৃহীত করিয়া রাখিতেন । মহাদেব কেবল শুশ্রূষার অনুমতি দিয়াছেন, পার্শ্বতী কি করেন না করেন, তাহার প্রতি লক্ষ্যও করেন না । যখন শৈলেন্দ্র-পুত্রীর শরীর ক্লান্ত হয়, বা হৃদয় অবসন্ন হয়, তখন কেবল তিনি ধ্যান-মগ্ন চক্রে-শেখরের সেই ললাট-চক্রে ম্লিঙ্ক-কিরণে বসিয়া, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্তি-ও অবসাদ দূর করেন^২ । ইহাতেই তাহার কত সুখ কত আনন্দ ! সে হৃদয়ের প্রণয় যে কত গভীর, কত অচল—অটল, তাহা ত্রি-জগতের অন্ত কেহই জানিত না । অথবা অন্তে জানিবে কি প্রকারে ? পার্শ্বতী নিজেই জানিতেন না সে, তাহার সে স্বর্গীয় হৃদয়ের যে স্বর্গীয় সম্পদ তাহার পরিমাণ কত ! তিনি যে অতুল ধনের অধিকারিণী, সে ধনের—সে অমূল্য প্রণয়রত্নের—পরিমাণ কত !

১—কুবার, ১ম—৬০ ।

২—কুবার, ১ম—৬০ ।

তিনি, এইভাবে সমাপ্তিমগ্ন শঙ্করের সেবা করেন, ও অবসর ক্রমে বন-
দেবতা-রূপিণী সখী ছুইটীর সহিত কখন বা খেল করেন । কখন কখন
সুখীন্দ্র, সুন্দর সুন্দর কুল ও কচি কচি পল্লব দিয়া, তাঁহাকে সাজাইয়া
দেন । বাসন্তী প্রতিনার ছায় তিনি সেই নিস্তরু বনস্তনী উদ্ভাসিত করিয়া
ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন । বিস্তৃত বর্ষাবসর প্রতি তাহার স্থির দৃষ্টি । তিনি
যাহাট করুন না কেন, দে দিকেই চান না কেন, দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকার
ছায়, কিন্তু তিনি কদাচ লক্ষ্যচ্যুত হইতেন না । শিবের শুক্রবার তাহার
বিন্দুনাত্রও ক্রটি থাকিত না ।

অপেক্ষের বহু বসন্ত গোরের বর অবশিষ্ট না হইলে ও পিতৃ হিন্দুর
ফলকালের জন্তও স্থির হইয় গৃহে থাকিতে পারেন নাই । তাহার
সর্বদাষ্ট দূরে দূরে পার্শ্বকর কলার অবস্থা ও গতিবিশি পর্যবেক্ষণ
করিতেন । কখন কি সংঘটিত হইবে—এই ভাবনার তাহার নিয়ত
উৎসুক নয়নে গোরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন । গোরের ঘোমতিন্তন অবস্থা
দর্শনে—সেই নবীন বয়সে বনবা সিনীত কায় কলপ-দর্শনে, মেনা হিন্দুর
নমো নমো কাদিয়া ফেলিতেন, কিন্তু আবার পরক্ষণেই সে পার্শ্বক-ছন্দরের
প্রগাঢ় প্রণয়, বিচিত্র প্রেম ও অদ্ভুত আত্ম সমর্পণ দর্শনে, ভাবিতেন, যত
পারিত, আর এতদূর কলার পিতৃ নাঃ বদীর আমলও যত !

পার্বতী শিবারূপের জন্ত কুসুমচয়ন করেন, নাগ করেন করেন,
মন্দাকিনী হইতে পল্লবীভ আহার্য-পুন্দর আশ্রমে বিস্তৃত করিয়া সুন্দর
সুন্দর রূপ-মালা গাথিয়া রাখেন : বাসনা, যদি অবসর ক্রমে কখনও
চন্দ্রশেখরের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারেন । এই ভাবে রাজ-নন্দিনীর দিন
কাটিতে লাগিল । সে বড় সুখের দিন । এ জগতে, অথবা স্বর্গ-মন্ড-
রমাণ্ডে, কয় জনের ভাগ্যে অমন দিন আসিয়াছে ? অমন অপ্রতিম রূপ,
অতুল গুণ, অনিন্দ্য যৌবন যৌবন—অমন বিশ্ব-পূজিত, পরম-সম্মানী, অনন্ত-
রত্নের প্রভব পিতৃ যাত্র—আর অযোনিসম্ভব, দেব-ঋষি-পূজা, দেবী জননী

যাঁর—তঁাহার অভাব কিসের ? তবুও তিনি আজ ভিখারিণী, গহন-বন-
নাসিনী । পার্কটী যঁহার জন্ত ভিখারিণী বনবাসিনী, সেট'শিব কিঙ্ক
কোন সংবাদই রাখেন না । তিনি ধ্যানস্থ । তিনি নিরাত-নিষ্কম্প-
প্রদীপের ছায়, স্থির 'অমৃতরঙ্গ' জন-নিধির ছায়, প্রশান্ত ও অরুণ-সংরক্ত
অম্বুবারের ছায় গম্ভীর-ভাবাপন্ন । এতদূশ মহাসৌগীর্য সেবার পার্কটী
রত । পার্কটীর জদন প্রসিদ্ধান-নিবপেক্ষ । স্মৃত্যং সে মহাসৌগী
পার্কটীর এষ্ট প্রাণপাণিনি শুশ্রূষার বিহীন বিদিত হউন আর না-ই
হউন, তাহাতে পার্কটীর কি ? পার্কটীর সে কেবল সেবারেই সুখ,
অজ্ঞাত আত্ম-সমর্পণেই পরম আনন্দ । কি সুন্দর চিত্র । কালিদাস যদি
তঁাহার অজ্ঞ কোন কাব্য প্রণয়ন না করিয়া, কেবল কুনারসমুদ্রের এষ্ট
প্রাণ সর্গ লিখিয়া রাষ্ট্র-জন, ওহা হউলেক মহাকবির রত্নময় কিরীট
সর্পিণ্ডে তঁাহারই মস্তক স্থান পাইত ।

সপ্তম অধ্যায় ।

এদন ।

এই ভাবে পার্শ্বভীর দিন কাটিতে লাগিল । এ দিকে বড় এক বিষম সমস্যা উপস্থিত । অমুর-নাশের প্রয়োজন । অমুর-ভরার্জ দেবতাদিগকে ব্রহ্মা বলিয়া দিয়াছেন যে, হর পার্শ্বভীর পুত্র জন্মিলে, সেই পুত্র হোমাদের সেনাপতি হইয়া সংগ্রামে অমুর-নাশ করিবেন^১ । মহাদেব ধ্যান-মগ্ন । কবে—কত দিনে হর-পার্শ্বভীর মিলন হইবে, কত দিনে তাঁহাদের পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই । অথচ অমুরের অত্যাচারে, উপদ্রবে, দেব-দল স্বর্গ-রাজ্য হইতে বিতাড়িত, নিস্কামিত । সুতরাং দেবগণ একটু ক্ষিপ্ৰতা করিলেন । বাহাতে সম্ভব মহাদেবের সহিত পার্শ্বভীর পরিণয় সংঘটিত হয়, তাহার ব্যবস্থায় তৎপর হইলেন । সমবেত দেবগণ স্থির করিলেন যে, ধ্যান-মগ্ন বিরূপাক্ষের অচিরে ধ্যান-ভঙ্গ করিতে হইবে । অত্থা সম্ভব পরিণয়ের সম্ভাবনা নাই ।

কোন কার্য্যই ক্ষিপ্ৰ-কারিতা প্রাপ্তসমীচীন নহে । তুমি মনুষ্যই হও, আর দেবতাই হও, বিশ্বপতির জগৎ-পরিচালনার যে সমুদয় রীতি-নীতি আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলে হোমার সূক্ষ্ম হইবে না । দেবতাদিগকেও এই ক্ষিপ্ৰ কারিতার সমুচিত ফলভোগ করিতে হইবে । আর এক কথা, তুমি নিজের জন্ত বাকুল হইও না । নিজের জন্ত বাকুল হইলে অনেক সময়ে কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞানের সীমা লঙ্ঘিত হয় । ঘোর অনর্থ-সংঘটন হয় । স্বার্থ-প্রণোদিত চিত্ত অনেক সময়ে সদসদ্বিবেক-বিমূঢ় হয় । তাই আজ দেবতারাও সমাধিমগ্ন পরমেশ্বরের সমাধিভঙ্গে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন । ফলও তদনুরূপ হইল । কবি কালিদাস অতি নিপুণ ভাবে

দেখাইলেন যে মনুষ্যের ত কথাই নাই, স্বার্থপ্রিয়তা দেবতাদের পর্য্যন্ত
কদাচ ক্ষেপঙ্করী হইতে পারে না ।

বাপার অতি ভীষণ । পরব্রহ্ম ধান-গম্ব, তাঁহার ধান ভাজিতে
হইবে, এ কল্পনাতেও দেবগণের হৃদয় ছুঁক-ছুঁক কম্পিত হইল । বেক্রপ
ভয়ঙ্কর কার্য্য, দেবগণ তাঁহার আয়োজনও তদনুরূপ করিলেন । ইহার পূর্ব্ব-
পূর্ব্ব কালে কোন মূনিঋষি যদি উৎকট উপস্থাপন করিতেন, তবে সে
তপস্যায় ভীত হইয়া দেবগণ ছুই একটি অম্বর প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের
তপোভঙ্গ করিতেন । কিন্তু এবার দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং উপস্থারত,
সমাধিত ; সূত্রাৎ এ ক্ষেত্রে অম্বর প্রেরণে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, তাই
ব্রহ্মস্পতি-প্রমুখ দেববৃন্দ এবার অম্বরাদের বিনিমাস্তর গুরু, সেই নটরাজ
মদনকে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন ।

অরণ-মাত্রে মদন উপস্থিত । দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, ‘মদন, একটি
অসাধ্য সাধন করিতে হইবে ।’ মদন চিরদিন জগৎ উন্মাদিত করিয়া
বেড়ান, কখনও কোন স্থানে তাঁহার উন্মাদিকা শক্তি প্রতিহত হয় নাই ;
তিনি ভাবিলেন যে, আমার আবার ‘অসাধ্য’ কি ? নবীন মদন পূর্ব্বাপর
চিন্তা না করিয়াই গর্ভভরে আশ্ফালন-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে বলিলেন,—

তব প্রসাদাৎ কুন্তুমায়ুধোহপি সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্ব ।

কুর্য্যাং হরস্তাপি পিনাক-পাণেধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধ্বনিবোহন্তে ?

ইন্দ্র যে বিষয়ের অনুরোধ করিতে যাইতেছিলেন, মদন তাহা
অগ্র্যেই বলিয়া বসিলেন । ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন । অধস্তনের
দ্বারা কোন ছুঁক কার্য্য সাধিত করিবার সময়ে, প্রভুগণ বেক্রপ অতিরিক্ত

১—কুমার, ওয় ১০ । যদিও পুণ্ড্রই আমার অস্ত্র, তথাপি আপনার প্রসাদে এই
বসন্তক একমাত্র সহায় পাইলে, বন করিলে সেই পিনাক-পাণি মহাদেবের পর্য্যন্ত চিত্ত
চঞ্চল করিতে পারি, অস্ত্রাত বীরের কথা আর কি বলিব ?—(কৃতকমল)

আদর—‘অতিভক্তি’ দেখাইয়া অধীনের মন ভুলাইতে প্রয়াস করেন, ইচ্ছুক সেইরূপ করিলেন। মদনকে কত আদর করিলেন, কত প্রশংসা করিলেন^১। মদন একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অঙ্গীকৃত ব্যাপারের গুরু-লাঘব^২ বিবেচনা না করিয়া, মদন শিবের ধ্যানভঙ্গের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। বসন্ত সত্য-সত্যই মদনের ‘অভাগ-সহনো বন্ধুঃ’ তাই মদনের সঙ্গে বসন্তও আসিয়াছিলেন। ইচ্ছ ভাবিলেন, মদন ত গাইতেছেন, কিন্তু কার্য যেরূপ গুরুতর, তাহাতে শুধু মদনে হয়ত কুলাইবে না,—তাই প্রকাশে বসন্তেরও কিছুই প্রশংসাবাদ করিয়া, তাহাকেও মদনের সহায় হইতে অনুরোধ করিলেন^৩। বসন্ত মদনের অগ্রসর হইলেন। এদিকে রতি,—মদনের পক্ষবাণের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মদনের জগদ্বন্দ্যাদনার যিনি প্রধান সাধন, অথবা এক কথায়, মদনের যিনি যথা-সর্বস্ব,—সেই মদনময়-জীবিতা রতিও পতির সহ-গামিনী হইলেন। ইচ্ছ ভাবিলেন, মদন, বসন্ত, রতি—তিন জনে যখন গাইতেছেন, তখন আর ভাবনা কি? বসন্ত বহির্জগতের সম্রাট, পৃথিবীর বাহ্যিক সৌন্দর্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর; মদন অন্তর্জগতের বিলাস-মগ্ন অধিপতি, সৌরকুলের রাজা ‘অগ্নিবর্ণের’ ত্রায় সুখৈক-শরণ, তিনি বসন্তের সৈন্যপত্যে জগদ্বিজয় করেন; আর রতি, তিনি ও বহিরন্তর—উভয় জগতের ষাবতীয়-সৌন্দর্যের সম্পদের একমাত্র ভাণ্ডার, ঋতুরাজ বসন্ত ও হৃদয়রাজ মদনের জীবনী শক্তি;—এবং বিধ ব্যক্তি-ত্রয়ের যখন সমবায় ঘটিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি?

বিশ্ববিমোহন পতি মদন, বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাত্রা করিলেন তাবিয়া, কোমল-হৃদয়া রতির প্রাণ সহসা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভয়ে ভয়ে পতির সঙ্গে চলিলেন^৪। মদন এবং রতি তপোমগ্ন পিনাক-পাণির

১—কুমার, ৩য়—১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২০।

২ কুমার, ৩য়—২১৭ ও। কুমার, ৩য়—২৩।

আশ্রমে উপস্থিত হইবার পূর্বেই তথায় বসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন ।
 'অকালে, অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত বন-ভূমি যেন রোমাঞ্চিত
 —ক্ষুণ্টিময়ী হইয়া উঠিল । তরুলতঃ কুসুমভরণে সজ্জিত হইল । সে
 বনস্থলী যেন, কচি কচি পত্র-পল্লব-রূপ অরুণ-বসনে দেহ সাজাইয়া
 ঋতুরাজের সধবীনা করিল । ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ বন্ধারে, কোকিলের
 কুহকুহ-রবে বনস্থলী মুখরিত হইল । কিরীট-গণ মধুর-কণ্ঠে তান ধরিল ।
 প্রকৃতি-চঞ্চল কম্পুরুষ-গণ যেন আরও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল । বনের
 পশু-পক্ষি-গণ পর্য্যন্ত উন্মত্ত । সে বনে, যে সমস্ত তপস্বি-বৃদ্ধ দীর্ঘকাল
 হইতে তপস্শ্রাবত, তাঁহাদেরও মন যেন কেনন একটু উদ্বেল হইবার
 উপক্রম করিল । তাঁহারা অতিপ্রায়ে, সহস্র-বিকৃত অন্তঃকরণের
 ভাব-সংবরণ করিলেন । ভূত-নাথের অমুচর-গণ স্বভাবতই একটু
 উচ্ছ্রাণ, তাহাতে আবার নব-বসন্ত সনাগন, তাহাদের মনস্তঃ আরও
 বর্ধিত হইল । নন্দী বামহস্তে এক গাছি স্বর্ণবেত্রের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া,
 ধ্যান-মগ্ন ত্রিলোচনের লতাপুত্রে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন । বনস্থলীর
 এই আকস্মিক পরিবর্তনে তিনি বিস্মিত ও চমকিত হইলেন । প্রমথ-
 গণের চিত্ত-বিকার দর্শনে তাঁহার বড়ই বিরক্তি জন্মিল । পাছে
 যোগেশ্বরের যোগ-ভঙ্গ হয়, তাই তিনি একটি কথাও কহিলেন না ।
 কেবল একবার নিজের তর্জনী দ্বয়ে কম্পিত করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন—
 'চূপ্' । তাঁহার এমনই দোদীপ্ত-প্রতাপ যে, ঐ ইঙ্গিত-মাত্রেরই সব
 থামিয়া গেল । কেবল প্রমথগণ নয়, সমগ্র বনভূমি হঠাৎ নীরব-
 নিম্পন্দ হইল । বসন্তের সে মুছ-মধুর সগীর-হিলোল কোথায় লুকাইল !
 তরু-রাজি, ভ্রমর-পঙ্ক্তি, পক্ষিকুল, মৃগ-কদম্ব, সব নীরব, সব নিম্পন্দ !
 এক নন্দিকেশ্বরের তর্জনী-কম্পনে সমগ্র বনভূমি যেন চিত্রা-র্পিতের স্থায়
 স্পন্দন-শূন্য !

বসন্তের এত আশ্ফালন, এত প্রতাপ, সব বৃথা হইল । মদনের সহায়তা করিবার জন্য বসন্তের বত আরোজ্ঞন, উদ্বোধন,—সব ব্যর্থ হইল । রতি-সহচর মদন দেখিলেন, বসন্ত বিধ্বস্তপ্রায়, তিনি অমনি অগ্রসর হইলেন । কিন্তু বসন্তের ছুরবস্থা দেখিরা, নন্দীর নয়ন-পথের পথিক হইতে নগ্নপথের আর সাহস হইল না । তখন—

দৃষ্টি-প্রপাতং পরিত্যজ্য তস্মৈ কামঃ পুরঃশুক্ৰমিব প্রয়াণে ।

প্রাস্তেযু সংসক্ত-নমেরু-শাখং ধ্যানান্পাদং ভূতপতের্বিবেশঃ ॥

মদন তরুরের ছায়, নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে, ক্রোধারক্তনেত্র নন্দীর পশ্চাৎদিক দিয়া, ধূর্জটির ধানস্থানের পার্শ্ববর্তী শাখা-ঘন নমেরু বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন । মনে ভাবিলেন যে,—খুব লুকাইয়াছি । কুসুম-শায়ক এই ভাবে বক্ষাস্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিরা, তাঁহার অঙ্গীকৃত শরবা, ধান-মগ্ন, সেই বিরূপাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, যাচা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরায়া উড়িয়া গেল । তিনি তখন, তাঁহার সেই—

কুর্যাং হরস্যপি পিনাক-পাণেঃ

ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধম্বিনোহশ্বে ?

প্রতিজ্ঞার কথা একবার স্মরণ করিতে লাগিলেন, আর এক এক বার সেই—

অবৃষ্টি-সংরক্তমিবানুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্ ।

অস্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্ নিবাত-নিকম্পমিব প্রদীপম্ ॥

১—কুমার, ৩য়,—৪৩ ।

২—কুমার, ৩য়—৪৮ । শব্দ 'তখন শরীর-স্রাবভী বায়ুগণকে রোধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, এ কারণ তাঁহাকে জ্ঞান হইতেছিল যে, বৃষ্টির আড়ম্বর নাই এতাদৃশ একখানি মেঘ, অথবা তরঙ্গ উদয় হয় নাই এইরূপ জল, নদী, অথবা বায়ুশূন্য স্থান-বর্তী নিশ্চল-শিখা-ধারী একটা প্রদীপ ।' (কৃত্তকমল)

ত্রিপুরার দিকে চাহিতে লাগিলেন । অনেক ক্ষণ পরে, চঞ্চল চিত্ত কুথঞ্চিৎ সংযত করিয়া, মদন, সেই বিষমাক্ষের প্রতি বাণ-অঙ্গণ পরিবার আশায়, কুসুম-নির্মিত ধনুক খানি উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইলেন না । ভয়ে, আশঙ্কায়, মদন যেন জড়ীভূত, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন । তাঁহার হস্ত ক্রমে অসাড় ও অবসন্ন হইয়া আসিল । সে হস্ত হইতে কুসুমের ধনু, কুসুমের বাণ অলিত হইল, তিনি ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না । তিনি চিত্রাপিতের ছায়, প্রস্তর-মূর্ত্তির ছায়, বজ্রাহতের ছায়, নিম্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন । তাঁহার প্রিয় বন্ধু বসন্তের মত, তাঁহারও তাবৎ আয়োজন-উদ্যোগ বার্থ হইল । সেই প্রতিজ্ঞা কালীন আশ্ফালন, দর্প, একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল ।

বড় দর্প করিয়া বসন্ত আসিয়াছিলেন, তিনি অবসন্ন হইয়া, সে-ই হর-তপোবনের বহির্দেশে পড়িয়া আছেন । নন্দীর তর্জনী-কম্পন স্মরণ করিয়া আর উত্তিবারও সাহস হইতেছে না । বড় দর্প করিয়া কন্দর্প আসিয়াছিলেন, তিনিও অবসন্ন-দেহে, পিনাক-পাণির ধ্যান-গৃহে 'দাক্ষভূতো মুরারিঃ' হইয়া রহিয়াছেন । বিষমাক্ষের সমাধি ভঙ্গ করে—কাহার সাধ্য ?

অষ্টম অধ্যায় ।

হর-সমাধি-ভঙ্গ ।

নব-জগৎ-সমুৎ, নিবিড়-মেঘারত গগনের জায়, সেই তপোবনস্থলী
নীরব, নিম্পন্দ, প্রশান্ত । একটি পত্র 'কম্পনের শব্দ পর্য্যন্তও শ্রুত হয়
না । এমন সময়ে, গিরিরাজ-কন্যা গৌরী, প্রাত্যহিক শুক্রবার জন্ত,
জাহ্নবী দুইটি সঙ্গিনী বনদেবতা-সখীর সহিত তথায় দর্শন দিলেন' । সে
সৌন্দর্য্য-প্রতিমার লাবণ্য-তরঙ্গে অকস্মাৎ সমগ্র তপোবন সমুদ্ভাসিত ও
আলোকিত হইল । পার্শ্ববর্তী বসন্তের ফুলে, বসন্তের পল্লবে, বিচিত্র
সাজ-সজ্জা করিয়াছেন । বকুল ফুলের চক্রহার গাঁথিয়া নিতম্বে
পরিয়াছেন । সে রূপ, সে সৌন্দর্য্য ত্রিজগতে অতুল । কালিদাসের
কল্পনা ব্যতীত সে প্রতিন' অস্ত্রে অঙ্কিত করিতে পারে না । তখন সেই—

‘অশোক-নির্ভৎসিত-পদ্ম-রাগং আকৃষ্ট-হেম-দ্যুতি-কর্ণিকারম্ ।

মুক্তা-কলাপীকৃত-সিন্ধু-বারং বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী ॥

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণাক্ষরাগম্ ।

পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবকাবনত্ৰা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

অস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেসর-দাম-কাঞ্চীম্ ।

তাসীকৃতাং স্থান-বিদা স্মরেণ মৌবর্ষীং দ্বিতীয়ামিব কাশ্মুকস্ত ॥

সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিবৃদ্ধ-ভৃগুং বিশ্বাধরাসন্ন-চরং দ্বিরেকম্ ।

প্রতিক্ষণং সজ্জম-গোল-দৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥

১—কুমার, ৩য়—৫২ ।

২—কুমার, ৩য়, ৫৩—৫৬ ।—‘পার্শ্ববর্তী তৎকালে বাসস্তিক পুষ্পাধারা কতকগুলি
অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পরিয়াছিলেন, অশোক পুষ্পে পদ্মরাগ বর্ণের কাঁধা নির্ঝাঁহ হইয়াছিল,
কর্ণিকার সুবর্ণের জায় হইয়াছিল, আর সিন্ধুবার পুষ্পই মুক্তার মালার জায় হইয়াছিল ।’ ৫৩ ।

কত্না দেখিয়া, মদনের অবসন্ন হৃদয় পুনরায় আশ্বস্ত হইল । মদন ভাবিলেন যে, এবার পারিব, এমন অশ্রু যখন সম্মুখে, তখন আর ভাবনা কি ? মদন এবার বাণ-প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন । ওদিকে, তপোবনের বহির্দেশে বসন্ত অবসন্ন দেহ পড়িয়া ছিলেন, তিন্তিও পুনরায় সজ্জ হইলেন । নন্দিকেশ্বরের তর্জ্জনী কম্পনের পর, বসন্তের আর একাকী বিরূপাঙ্গের সম্মুখীন হইবার সাহস হইতেছিল না । এতক্ষণে তাঁহার সুবোগ উপস্থিত হইল । তিনি ভাবিলেন যে, এবার আর একাকী যাইব না, কিংবা পুংসবৎ, নন্দী বা মহাদেবের সাক্ষাত্ প্রত্যক্ষীভূত হইব না, এবার পরোক্ষভাবে তাহাদের সম্মুখীন হইব । তাই সেই কত্না-কুল-ললান-রূপিণী শৈলেন্দ্র-নন্দিনীকে পাঠিয়া, বসন্ত তাঁহারই দেহ আশ্রয় করিয়া, পুনরায় শিব-সনীপে উপনীত হইলেন । এই তাৎপর্যটুকু বুঝাইবার জন্ত কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, নানা-বিধ বসন্ত-পুষ্পভরণে সজ্জিত করিয়া, পার্ক ভীকে ধানয় ত্রিলোচনের সম্মুখবর্তিনী করিলেন । কুশাস্ত্রী গোষ্ঠী আত্মীয় নব-বসন্ত পরবাদি সজ্জার ভাণ্ডে, যেন ঈষদবনত-দেহে শস্যের সম্মুখীন হইলেন ।

‘তিনি স্তন-ভরে ঈষৎ অবনত ছিলেন, প্রভাত-কালীন আতপের স্নায় আরক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, অতএব জ্ঞান হইতেছিল যে, স্থল স্থল পুষ্পস্তবকের ভারগ্রস্ত নম্রীভূত একটি লতাই যেন চলিয়া যাইতেছে ।’ ৫৪ ।

‘বকুল-মালাকে তিনি চন্দ্রহার করিয়া পরিয়াছিলেন, তাহা নিতম্বদেশে হইতে মুহমূহ খুসিয়া পড়িতেছিল এবং মুহমূহ হস্তদ্বারা ধারণ করিতেছিলেন । তাঁহার নিতম্ববর্তিনী সেই বকুল-মালা বর্শন করিলে জ্ঞান হইত যেন, কামদেব আপন ধনুকের আর একটি শূল (ছিল) , এই স্থানে গচ্ছিত রাখিয়াছেন ।’ ৫৫ ।

‘একটি ভ্রমর তাঁহার গুরুভি নিশ্বাসে আবৃত্তি হইয়া, বিদ্য-ফল-ভুল্য অধরের সন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহার দংশন-ভয়ে তিনি চঞ্চল-দৃষ্টি-নির্বেপ করিতে করিতে হস্তস্থিত পদ্ম-স্বারা তাহাকে নিবারণ করিতেছিলেন ।’ ৫৬ । (তুৎকবল) .

মদন, হর-সমাধি-ভঙ্গের সেই অকস্মাৎপনত শাণিত অস্ত্রের দিকে অনিমেঘ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন । রত্নির পতি বলিয়া কন্দর্প বড়ই গর্কিত । যখন রত্নিকে সঙ্গে আনেন, তখন হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, আমার রতি যখন স্বয়ং ঘাইতেছেন, তখন আর ভাবনা কি ? অত্ৰ কোন বিশেষ অস্ত্রের বোণ হয় আর প্রয়োজন হইবে না । কিন্তু মহাদেব পর্যাস্ত উপনীত হইবার পূর্বেই, তাঁহার অনুচর নন্দীকে দেখিয়াই কন্দর্প বুঝিলেন যে, না, এতাদৃশ অস্ত্রের সাহায্যে ত্রিপুরা-বিজয় একপ্রকার অসম্ভব । তা'র পর, সেই ধ্যানমগ্ন মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া তিনি চমকিত হইলেন । তখন আরও বুঝিলেন যে, এ শত্রু জয় করিতে হইলে, এ দুর্জয় দুর্গ ভগ্ন করিতে হইলে, আমার যে সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র আছে, তাহাতে হইবে না, তদপেক্ষা দৃঢ়তর অস্ত্রের প্রয়োজন । এইরূপ সময়ে পার্শ্বতী উপস্থিত । কালিদাস, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ছাত্র, বড় সময় বুঝিয়া, পার্শ্বতীরূপ কস্তুরী-প্রয়োগে মদনের অবসর হৃদয় সবল করিলেন । তখন কুসুমধু—

‘তাং বীক্ষ্য সর্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রী-পদমাদধানাম্ ।

‘জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্প-চাপঃ স্বকার্য্য-সিদ্ধিং পুনরাশংসে’ ॥

মনমথ, সেই বসন্ত-পুষ্পাভরণ-নিঃশব্দী প্রতিমার দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সময়ে যদি একটা বাণক্ষেপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, জিতেন্দ্রিয় শূলো শস্ত্র নিশ্চয়ই বিদ্ধ হইতেন ।

১—কুমার, ৩য়—৫৭ । ‘তাঁহাকে দেখিলে নিজ-কাস্তা রতি পর্যাস্ত লজ্জা পান, এরূপ দোষস্পর্শ-শূদ্ধা সৌন্দর্য্যশালিনী সেই বালাকে দর্শন করিয়া কাবদেবের মনে এই আশার সঞ্চার হইল যে, মহাদেব যতই জিতেন্দ্রিয় হউন, ইহার সাহায্যে তাঁহার প্রতি বাণ-প্রয়োগ-পূর্বক নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিলেও করিতে পারেন ।’ (কুমারবল)

যোগস্থ শূল-পাণির পুরোভোগে গৌরী যখন দণ্ডায়মানা, তখন তাঁহার সেই বনদেবতা সখী-দ্বয়, তাঁহাদের স্বহস্তাবচিত, বসন্তের কুসুম, বসন্তের পল্লব রসালু করিয়া মহাদেবের চরণে অঞ্জলি দিলেন ও প্রণাম করিলেন^১ । এ দিকে পার্বতীও তাঁহার চিরবাহিত চন্দ্র-শেখরকে প্রণাম করিলেন । ‘প্রণামকালে, তাঁহার অবনত মস্তক হইতে, নীল-বর্ণ কেশ-কলাপের মধ্যে শোভমান নবীন কর্ণিকার কুসুম এবং কর্ণের অবতংসরূপী নব পল্লব,—যুগপৎ ভূমি-তলে পতিত হইল^২ । কন্দর্প দেখিলেন, এই প্রকৃষ্ট অবসর,—‘তিনি অমনি তাঁহার কুসুম ধনুক ধানি উত্তোলন-পূর্বক, শরবা বিরূপাক্ষকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ।’ আশা, যেমন গৌরী আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবেন, অমনি কুসুমদ্বারাও তাঁহার কুসুমের বাণটি নিক্ষেপ করিবেন । উমা ধীরে চন্দ্রশেখরের আরও নিকট-বর্ত্তিনী হইলেন ;—এ দিকে—

কামস্ত বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্ বহুমুখং বিবিধুঃ ।

উমা-সমক্ষং হর-বন্ধ-লক্ষ্যঃ শরাসন-জ্যাং মুহুরামমর্শ^৩ ॥

মদনও পতঙ্গের ছিলা বার বার স্পর্শ করিতে লাগিলেন, যেন বাণক্ষেপ করেন আর কি ; কিন্তু বিরূপাক্ষের সেই ভীষণ-মূর্ত্তি-দর্শনে, কোন ক্রমেই সাহসে ভর করিয়া বাণতাগ করিতে পারিলেন না ।

পার্বতী মন্দাকিনী হইতে স্বহস্তে পদ্ম-চয়ন-পূর্বক, উহার বীজ সূর্য্যোতপে গুহ্য করিয়া, সেই সকল ভ্রমর-কুমুদ পদ্ম-বীজ দিয়া এক ছড়া

১—কুমার, ৩য়—৬১ ।

২—কুমার, ৩য়—৬২ ।

৩—কুমার, ৩য়—৬৪—‘কামদেবের নিতান্ত আগ্রহ যে শিবের লোচন-বহিত পতঙ্গের দ্বারা দণ্ড হইয়েন, অতএব, যখন মহাদেব পার্বতীকে আশীর্বাদ করেন, সেই সময়ে কাম, যখন বাণ বারি, ইহাই ভাবিতেছিলেন, এবং শিবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধনুকের ছিলা বারংবার স্পর্শ করিতেছিলেন !’ (কুব্জকমল)

অতি সুন্দর জপমালা গাঁথিয়াছিলেন, আজ সেই মালা, স্বীয় পল্লব প্রতিম করে লইয়া, ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে, শশাঙ্ক-শেখরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন^১। ভক্তবৎসল, ‘প্রণয়ি-প্রিয়’ আওতোষ, যেমন সেই মালা গৌরীর আত্ম করকিসলয় হইতে গ্রহণ করিবার জন্ত হস্ত উত্তোলনের উপক্রম করিলেন, অমনি পুষ্পধ্বাও তাঁহার ত্রি-ভুবন-মোহন, সকল বাণের শ্রেষ্ঠ, ‘অমোঘ’ ‘সম্মোহন’বাণ কুসুমধনুতে যোজন করিলেন। বাণ আর নিক্ষেপ করিতে হইলনা, কেবল—

সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধ্বা,
ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্^২ ।

কেবল ধনুকে বাণটি সন্ধান করিলেন মাত্র। মদনের ভরসা যে,— পার্শ্বাভী যখন সম্মুখবর্ত্তিনী, তখন সন্ধান অব্যর্থ।

যে দ্রব্যের যে গুণ, যে শক্তি, তাহা সর্বত্রই বিদ্যমান থাকে। কোনও স্থলেই তাহার একেবারে বিলোপ হয় না। তবে স্থল-ভেদে, সেই শক্তির কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে মাত্র। বিষপানে অস্ত্রের প্রাণনাশ নিশ্চিত, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণ নাশ হইয়াছিল না বটে, কিন্তু বিষের জ্বালায় তাঁহারও কণ্ঠ নীল হইয়াছিল।

মন্থথ যেমন, সম্মোহন বাণটি শিঞ্জিনীতে সন্ধান করিলেন, অমনি মহাদেবেরও হৃদয় যেন একটু কেমন হইয়া উঠিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির কেহ হইলে হয়ত, ঐ বাণের সন্ধানমাত্রেই তিনি মদনের নিকট পরাজয়-স্বীকার করিতেন। জিতেজয় শূন্যপাণির তত দূর হইল না সত্য, কিন্তু তাঁহার মনটা একটু ‘খট’ করিয়া উঠিল।

চন্দ্রোদয়ের পর নহে, চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভকাল, অম্বুরাশি যেমন ঈষৎ

১—কুমার, ৩য়—৬৫।

২—কুমার, ৩য়,—৬৬।

চঞ্চল হইবার মত হয়, মহাদেবেরও বৈর্য্য সেইরূপ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল ।
বিশ্বোষ্টী উমার বদন-পঙ্কজের দিকে তাঁহার নয়নত্রয় যেন, যুগপৎ পতিত
হইবার উপক্রম করিল^১ । বিস্তৃত নিমেষমধ্যেই, তিনি পুনরায় পূর্ববৎ
স্থির হইলেন ।

এদিকে ‘শৈল-সুভারও’ কিঞ্চিৎ ভাবান্তর ঘটিল । তাঁহার দেহ-যাটী
‘ক্ষুরদ-বাল-কদম্বের’ ত্রায় কষ্টকিত হইল । তিনি তখন আর ব্রীড়া-প্রযুক্ত
গঙ্গাধরের দিকে চাহিতে পারিলেন না, আনন্দ-নয়নে মুগ্ধানি কিশিইয়া
জ্বলো-নের সম্মুখে চিত্রা পিতার ত্রায় নিম্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন^২ ।

রতি বসন্ত ও মদন—তিনজনে সনবেত হইয়া বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে
অভিমান করিয়াছেন । মহানোগীর যোগ ভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন ।
অন্তের পক্ষে এ তিনের প্রয়োজন নাই, একটি যথেষ্ট । দেবাদিদেব
মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে হইবে, তাই এই ত্রাহস্পর্শ । এই
ত্রাহস্পর্শের প্রভাব সম্পূর্ণ বিফল হইবার নহে । আর হইতেও পারে না !
হইলে যে, স্বভাবের মর্গাদা ক্ষয় হয় । তাই দেবাদিদেব মহাদেবেরও
বৈর্য্য ‘কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত’ অর্থাৎ চঞ্চল হইল । দেবীর দেবী পার্শ্বতীরও
কিঞ্চিৎ ভাবান্তর ঘটিল । আর রতি-বসন্ত-মদনের প্রয়াসও কথঞ্চিৎ
সফল হইল । স্বর্গের অস্ত্র লগনার ত্রায়, পার্শ্বতীর কোনরূপ উল্লেখ-
যোগ্য বিকার ঘটিল না বটে, তবে বস্ত্রসম্মে অঙ্গ-লতিকা অকস্মাৎ
রোমাঞ্চিত হইল মাত্র । তিনি অননিষ্ট, জীবদ্-বিসৃভ-বদনে ও অধোনয়নে
আত্ম-সংগম করিয়া লইলেন । আর মহাদেব নিমেষমধ্যেই^৩ পূর্ববৎ
স্থির ধীর হইয়া পুনরায় অপ্রকম্প্যভাবে ধারণ করিলেন ।

১—কুমার, ৩য়, ৬৭—‘হরস্ত কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তবৈর্য্যাক্ষরোদয়ামস্ত ইবাধুরাশিঃ ।

উমাযুগে বিদ্য-কলাধরোষ্ঠে বাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥

২—কুমার, ৩য়, ৬৮—বিসৃভতী শৈল-সুভাপি ভাবনমস্বে ক্ষুরদ-বাল-কদম্ব-কস্মৈঃ ।

মাচীকুতা চারুতরোণ তস্মৈ মুখেন পর্যাস্ত-বিলোচনেন ॥



কবি, অতি কৌশলের সহিত, সকল চরিত্রেরই অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিলেন। রতি-বসন্ত-মদনের শক্তি, মহাদেবের মহামহিমশক্তি, আর পার্শ্বতীর অপূর্ণ আশ্রয়-ধারণ-শক্তি—সমস্তই অতি সুপরিষ্কৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিলেন।

যদিও জিতেজিয় পিনাক-পাণির চিত্রে প্রকৃতপক্ষে বড় কোনো বিকার জন্মিয়াছিল না, কিন্তু তবুও, অকস্মাৎ তিন নয়নই পার্শ্বতীর বিদ্যারণের প্রতি দৃষ্টি-দানে বাঞ্ছা হইল কেন? ইহার কারণ কি? কৈ—এতদিন পার্শ্বতী আছেন, আজ নূতন নহে, অদ্যকার ছার প্রতাই ত মহাদেবের গুণাবলি করেন, আর কখন ত শিবের চিত্রে এ প্রকার ক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই, আজ হইল কেন? ইহার হেতু কি?—তাই বশিষ্ঠেষ্ঠ অবুধ্য-নেত্র, তদীয় চিত্র বিকারের কারণ-দিদৃক্ষু হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অদূরে, ‘চক্রীকৃত-চাকচাপ’, ‘দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মৃষ্টি,’ ‘নভাংস,’ আকৃষ্ণিত-সবা-পাদ,’ বাণ-নিক্ষেপোদ্যত মদনকে দেখিতে পাইলেন। তপস্তার প্রতি আক্রমণ-নিবন্ধন, রুদ্রের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তাঁহার নয়নদ্বয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তখন সে নরনের দিকে, সে মুখের দিকে, দৃষ্টিপাত করে কাহার সাধ্য? অকস্মাৎ বিরূপাক্ষের সেই রোষ-কষায়িত ললাট-নয়ন হইতে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা বিনির্গত হইল। আকাশে দেবগণ, মদনের ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় পূর্ব হইতেই সমবেত ছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে বিরূপাক্ষের ধান-ভঙ্ক, ভয়ঙ্কর বাপার, যদি হঠাৎ কোন বিপত্তি উপস্থিত হয়, তবে আমরা সকলে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় অবতরণ করিব, যতদূর পারি একটা প্রতিবিধান করিব। কিন্তু এরূপ যে হইবে, তাহা তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন নাই। যেমন জ্বলোচনের তৃতীয় নয়ন হইতে অগ্নিশিখা নিজ্জাল হইল, অমনি ভীত দেবগণও,—

‘ক্রোধঃ প্রভো ! সংহর সংহর’

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন । তাঁহাদের সেই নিবারণ-ধ্বনি রুদ্ধের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বেই,—যখন সেই দেববাণী আকাশে বহতাসের কোলে ভাসিতেছিল, তখন, নিমেষমধ্যে, সেই অনল-শিখায় মদন ভস্মীভূত হইলেন* ।

সব ফুগাইল ! দেবতাদের এত আয়োজন, এত আড়ম্বর—সমস্তই এক নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল ! স্বর্গরাজ্যের পুন-রুদ্ধার-বাসনার বৃথি মূলোচ্ছেদ হইল ! এ দিকে, পতির অকস্মাৎ তাদৃশ অচিস্তিত-পূর্ব অবস্থা-দর্শনে, মদন ময়-জীবিতা রতিও মুচ্ছিত হইয়া ছিন্ন-ব্রততীর ভায় ভুতলে পতিত হইলেন । আজ তাঁহার যে কি হইল, তাহা সমাক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই হতভাগিনীর সংজ্ঞা-লোপ হইল* । ব্যথিত-হৃদয়ের পরমোপকারিণি মুচ্ছ ! তুমি ছঃখিনী রতিকে আর পরিভাগ করিও না, তাঁহার জ্ঞান আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিও না ।

অকস্মাৎ পতিত বজ্র সেনান বনের প্রকাণ্ড ‘বনস্পতিকে’ ভগ্ন ও ভস্মীভূত করিয়া অদৃশ্য হয়, ‘তজ্জপ তপোনিষ্ঠে মহাদেব, তপস্যার বিষভূত সেই কামদেবের নিপাত-সাধন করিয়া স্থির করিলেন যে, নারী-জাতির নিকটে আর থাকা নয়, তাই তৎক্ষণাৎ প্রমথ-গণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন* ।’ এ দিকে, আলোচ্য-লিখিতার ভায় নিস্পন্দ-ভাবে দণ্ডায়মানা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় পার্শ্বভীও দেখিলেন যে, সমস্তই বৃথা হইল । তাঁহার অত বড় সম্মানী উন্নত পিতার যে সমুন্নত অভিলাষ, তাহা সিদ্ধ হইল না । তাঁহার যে অনিন্দ্যসুন্দর কলেবর, ললিত কাস্তি, তাহাও ব্যর্থ হইল । তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য্য অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহার কোনই শক্তি নাই । সখীদ্বয়ের সম্মুখে বাহিত চক্র-শেখর-কর্তৃক তাঁহার যে অদ্ভুত আতিথ্য সাধিত হইল, তাহাতে তিনি মর্মে মর্মে মরিয়া

গেলেন । তিনি তখন, শূন্যহৃদয়ে, অবনত-মস্তকে, অতি কষ্টে গৃহাভিমুখে
যাত্রা করিলেন । রুদ্ধের সেই বিশ্ব-বিকম্পিনী নয়নাকৃতির মুহূর্মুহঃ
স্মরণে, তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিতে লাগিল । নয়ন মুকুলিত হইয়া আসিল ।
হিমালয় শূর্য হইতেই কত্কার গতিবিধি, কত্কার অবস্থা সতর্কভাবে
পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি এই আসন্ন বিপদে অধীর হইয়া, অতি
ক্ষিপ্ততার সহিত, ‘ভবনাভিমুখী’ শূন্য-হৃদয়া ছহিতাকে কোড়ে করিয়া
স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । পার্বতীর প্রথম পরীক্ষার শেষ হইল ।
তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, ইন্দ্রা-দি-দেবগণ-রচিত শিব-সমাধি-ভঙ্গ-
নাটকেরাযবনিকা পতিত হইল ।

নবম অধ্যায় ।

তাৎপর্য্য ।

মদন রতি ও বসন্ত—তিনজনে একযোগে, মহাদেবের^২ ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন ; মদন হর-নয়নানলে ভস্মীভূত,—রতি মুচ্ছিত,—বসন্ত পার্কতীর দেহ আশ্রয় করিয়া ছিলেন—সুতরাং পার্কতীর তিরোধানের সহিত তিনিও তিরোহিত হইলেন । মহাদেব বিরক্ত হইয়া সদল-বলে অন্ত্র প্রস্থান করিলেন । এক মুহূর্ত্ত পূর্বে যে তপোবন, রতি-মদন-বসন্ত ও গৌরীর উপস্থিতিতে বিলাসের তরঙ্গে, আনন্দের প্রবাহে ভাসমান হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহা ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল । দক্ষীভূত কন্দর্পের ভস্মময় কঙ্কাল, সে শ্মশানের রৌদ্রমূর্ত্তি সেন আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল । কালিদাসের অতুল কল্পনার বলে, অকস্মাৎ মধুর প্রভাতকালে, সেন গভীর নিশাথিনীর আবির্ভাব হইল । বিবাদের ‘সূচি-ভেদ্য’ অন্ধকার, অকস্মাৎ প্রকুর বনস্থলীকে গাঢ়ভাবে আবৃত করিল ! কালিদাস, তপোবনের এই মধুর মূর্ত্তিকে হঠাৎ এমন ভয়ঙ্করী করিলেন কেন ? বিষয়টি একটু নিবিষ্ট-হৃদয়ে বুনিতে প্রয়াস করা গাউক :

প্রথমেই বলিয়াছি যে, কবিগণের বর্ণনীয় বিষয় মাত্র দুইটি,—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ । কবিগণ কখনও বহির্জগতের সাহায্যে অন্তর্জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, কখনও বা অন্তর্জগতের সাহায্যে বহির্জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, সৃষ্টি করেন ! কখনও আবার, উভয় জগতের এমন সংমিশ্রণ করেন যে, বহিরন্তর্বিচারে বিমুঢ় হইতে হয় । এই মদন-ভস্ম-ব্যাপারেও, কালিদাস, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের প্রাধান্ত-প্রদর্শন-পূর্ব্বক, পরিশেষে উভয়ের সংমিশ্রণ করিয়াছেন । প্রথম বহির্জগতের অন্ততম প্রধান বসন্ত ও অন্তর্জগতের প্রধান রতি-মদনের সৃষ্টি করিয়া, পরে উভয় জগতের সংমিশ্রণ-পূর্ব্বক, প্রমাণ

করিয়াছেন, যে, তোমার উদ্দেশ্য যদি সাধু না হয়, তবে বহিঃস্বৰ্গ উভয় জগৎ যুগপৎ সহায় হইলেও তাহা সিদ্ধ হইবে না । অসাধু-বাসনার সিদ্ধি সুদূর-পর্যাহত । তাই দেবগণ, বহিঃজগতের প্রধান উদ্দীপনরূপী বসন্তো ও অন্তর্জগতের প্রধান উন্মাদক-রূপী মদনের সাহায্য পাইয়াও, অভিপ্রেত হরসমাধি-ভঙ্গ-রূপ অবৈধ কার্য্য 'সু-সাধিত' করিতে পারিলেন না । যে যে কারণের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়াছিলেন, কার্য্যসিদ্ধি ত দূরের কথা, সেই সেই কারণ-কলাপের পর্য্যন্ত ধ্বংস হইল । ইহাই হইল মদন-ভাস্কর প্রথম তাৎপর্য্য ।

জগতে সকলেই সৌন্দর্য্যামুভবের জন্ত, সৌন্দর্য্য-প্রীতি-সাধনার জন্ত উৎসুক । যাহারা বলেন, 'আমি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহি' আমি তাহাদের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না । মানুষের হৃদয় কদাচ নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না । তুমি যদি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী না-ই হও, তবে তোমাকে কিসের পক্ষপাতী বলিব ? তোমার হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে বলিব ? গুণের দিকে ? তাই যদি হয়, তুমি যদি গুণেরই পক্ষপাতী হও, তাহা হইলেই তুমি সৌন্দর্য্যের সেবক হইলে । রূপ বস্তুর বহিঃস্থ অস্থায়ি সৌন্দর্য্য, আর গুণ তাহার অন্তঃস্থ স্থায়ি সৌন্দর্য্য । যাহাতে এই উভয় সৌন্দর্য্যের সম্মিলন আছে, তাহাই জগতে অধিকতর কমনীয় । হিমালয়ের নিতম্বদেশে ঘন-কৃষ্ণ মেঘমালায় নৃত্য আছে, সেই নৃত্যে আবার বিছাতের বিলাস আছে, মেঘ-প্রিয় শিখীর 'যজ্ঞ সংবাদিনী' কেকা আছে, ইহা হিমালয়ের বহিঃ-সৌন্দর্য্য । তথায় বিদ্যাধর-সুন্দরীগণ, মন্থণ ভূর্জপত্র 'ধাতুরসের' দ্বারা লেখা-রচনা করিয়া থাকে, গুহা-মুখোন্মিত্তাসম্মুখে তথায় কীচক-রক্ত পরিপূর্ণ হইয়া বংশীর স্বরের দ্বায় মধুরস্বর-সংযোগে কিল্লর-কিল্লরীগণের বিলাস-সঙ্গীতে তান-প্রদান করিয়া থাকে, তথায় গজেন্দ্র-গণের কপোল ঘর্ষণে ছিন্নবকু হইয়া সরল-কুম-নিচয় সুরভি নির্যাস বর্ষণ করে, তাহাতে সমগ্র

সামুদ্রেশ সৌরভে আমোদিত হয়,—এ সমুদয় হিমালয়ের বহিঃ-সৌন্দর্য্য ।
তথায় চমকীগণ তাহাদের ‘চক্ৰ-মরীচি-গোর’ চামর-পঙ্ক্তি আনন্তিত করিয়া
যখন চলিয়া যায়, তখন মনে হয়, বুধি শত-সহস্র চামর-ধারিণী ‘কিঙ্করী
নগাধিরাজের পরিচর্যা করিতেছে,—ইহা হিমালয়ের বহিঃ-সৌন্দর্য্য’ ।
আর হিমালয়ের যে অপ্রতিম সৈধ্যা, অনন্ত-সুন্দর গান্ধার্যা, চিরতুবার-
ময়ঙ্ক, এই সকল তাহার অন্তঃ-সৌন্দর্য্য । হিমালয়ে এই উভয়বিধ
সৌন্দর্য্যের অনুপম সন্নিবেশ আছে বলিয়াই, তিনি নগ-কুলের অধিষ্ঠায়
অধিরাজ । তিনি আকারে যেমন পূর্বাপর-সমুদ্রাবগাহী—বিরাট, স্থিরতা-
গম্ভীরতা প্রভৃতি গুণ-সম্পদেও তদ্রূপ প্রকাণ্ড—অসাধারণ । তাই
বলিতেছিলেন যে, যাহাতে বহিঃস্তব্ধ উভয় সৌন্দর্য্যের সম্মিলন আছে,
তাহা অধিকতর কমনীয় ।

ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন দেখিলেন যে, অশ্বিনচরী, বিভূতি-ভূষণ,
মহাযোগী, ভূত-নাথের ধ্যান-ভঙ্গ করিতে হইবে, বহিঃ-জগতের অলৌক
সৌন্দর্য্যে যিনি স্পৃহাশূন্য, তাদৃশ সংসার-বিরক্ত মহান্ সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-ভঙ্গ
করিতে হইবে, পতিনিন্দা-শ্রবণে যেদিন দাফায়ণী সতী দেহ-ত্যাগ
করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যে সতী-কান্ত সাধবী দক্ষ-হৃদিতার অন্তঃ-
সৌন্দর্য্যে বিনুগ্ধ হইয়া, বহিঃজগতের সমস্ত বাসনা-পরিহার-পূর্বক, পর্বতে
পর্বতে অশ্বিনে অশ্বিনে, সতীর অস্থি-ভঙ্গ-প্রভৃতি লইয়া ভ্রমণ করিয়া
বেড়ান,^১ তাদৃশ প্রেম-সিক্তকে সংকোচিত করিতে হইবে, যাহার
কল্পনাতেও হৃদয় আশঙ্কিত হয়, তাদৃশ ছন্দ্র কার্যের অনুষ্ঠান করিতে
হইবে, তখন দেবতারা স্থির করিলেন যে, এবংবিধ প্রশান্ত হৃদয়ে
বহিঃজগতের প্রভাব বিস্তার অসম্ভব, প্রয়াস করিলে হয়ত, অন্তর্জগতের
কথঞ্চিৎ ছায়াপাত করা যাইলেও যাইতে পারে । তবে অন্তর্জগৎ

১—কুমার, ১ম সর্গ—৫১১ ।

২—কুমার, ১ম—২১, ৫৩, ৫৪ ।

একেবারে বহির্জগৎনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যে কতদূর সূমর্থ, তাহা ভাবিবার বিষয় । তাই দেবগণ, বসন্ত ও রতি-মদনের সম্মিলন করিয়া, বহিরন্তর—উভয় জগতের বিচিত্র সমাবেশ-সাধন-পূর্ব্বক, অধিকতর মনোহর উপায়ে, শিব-সমাধি-ভঙ্গের চেষ্টা করিলেন ।

আলঙ্কারিকের মতে বলিলে বলিতে হয় যে,—রতি অনুরক্ত হৃদয়ের স্থায়ী ভাব, আর সেই রতি-বিষয়ে যে অভিলাষ বা কাম, তাহা ব্যতিচারী ভাব, এবং বসন্ত-বর্ষা-প্রভৃতি হৃদয়ের উল্লাসকর পদার্থসমূহ উদ্দীপন বিভাব । বসন্তাদি হৃদয়োন্মাদক পদার্থে চিত্ত প্রথমতঃ উল্লসিত ও উদ্দীপিত হয়, তখন সেই উল্লাসময় চিত্তে ভোগের আকাঙ্ক্ষা উদ্ভিত হয়, ক্রমে নানাবিধ অভিলাষ বা ব্যতিচারী ভাবের উদয়ে হৃদয়ের সেই ভোগাকাঙ্ক্ষা নিরতিশয় বলবতী হইয়া উঠে, সে হৃদয় একান্ত উৎসুক, উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে । পরে, প্রীতি বা ভোগে সে হৃদয়ের উৎসুক্য-উৎকণ্ঠার কথঞ্চিৎ উপশম হয় । কবি, দেবতাদের দ্বারা সেই জন্তাই, উদ্দীপন বসন্ত, অভিলাষ বা বাসনারূপী কাম এবং ভোগ বা প্রীতিরূপিণী রতি—এই তিনজনকে প্রেরণ করাইলেন । বসন্ত-রূপী বহির্জগৎ এবং রতি-কাম-রূপী অন্তর্জগৎ—এই উভয়ের সহায়তায়, এই ভাবে দেববৃন্দ শিবের সর্বনাশ-সাধনে তৎপর হইলেন । কিন্তু স্থূল-দৃষ্টিতে বাহ্যকে সুন্দর পদার্থ বলা যায়, তদপেক্ষা সুন্দরতর পদার্থও এ জগতে আছে । লোকে সংসারের নানাবিধ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, যেমন ঘোর সংসারী সাজিয়া সৌন্দর্য্যের উপভোগ করে, তেমনই আবার, এই আপাততঃ সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান সংসার ব্যাপারে একান্ত ভীত ও কাতর হইয়া, অনেক বিবেক-সম্পন্ন মনস্বী মহাজনও নিত্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সুন্দরতম পদার্থের অবেষণে গহন অরণ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন । সংসার-সৌন্দর্য্য তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অলীক—অকিঞ্চিৎকর । তাই রতি, মদন ও বসন্ত—তিন জনকে সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া, তাঁহাদের সম্পূর্ণ

প্রভাবের দ্বারা সৌন্দর্য্য-তরঙ্গিণী উমার হৃদয় আবেগযুক্ত করিয়া, কবি, লাবণ্যময়ী উমাকে যখন ত্রিলোচনের নয়ন-পথবর্ত্তিনী করিলেন, তখন শঙ্কর সে বসন্ত-কুসুম-ভূষিতা গৌরীর প্রতি প্রকৃত প্রস্তাবে জর্জরিত করিলেন না । যদিও নৈসর্গিক শাসনামুসারে শঙ্কর নয়নজঙ্ঘ একবার নিমেষের জন্ত, উমার মুখের দিকে পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু বশী মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ হৃদয় স্থির করিয়া লইলেন । পার্শ্বতীর সেই অপার্থিবরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্ব্বক অবিনীত মদনের যথোচিত শাস্তি বিধান করিয়া অস্তহিত হইলেন । কবি দেখাইলেন যে, যে বাক্তি একবার যথার্থরূপে বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, নশ্বর ভোগের আপাত-রম্য উপলব্ধি পূর্ব্বক যে মহাত্মা, অবিনশ্বর, উচ্চতম, চিরানন্দ পদার্থের ভাবনায় চিত্ত সনাহিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট সকল প্রলোভনই বার্থ । বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমবেতশক্তি-প্রয়োগেও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করা যায় না । সে চেষ্টায় সফল না হইয়া কু-ফলট হইয়া থাকে । বহিঃ-সৌন্দর্য্য নিতাস্ত অলীক, নিতাস্ত ভঙ্গুর ; তাই, এক নিমেষের মধ্যেই সৌন্দর্য্যের নিদান মদন ভস্মীভূত, রতি মুচ্ছিত, বসন্ত পলারিত ও পার্শ্বতী পিতার আশ্রিত হইলেন । মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব যে বন সৌন্দর্য্যের নন্দন কানন ছিল, মুহূর্ত্ত পরেই, তাহা ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইল । সৌন্দর্য্য এতট অকিঞ্চিৎকর ! ইহাই মদন-ভঙ্গের দ্বিতীয় স্তাৎপর্য্য ।

রাজ-নন্দিনী পার্শ্বতী, নারদ-মুখে চক্রেশ্বরের নাম শ্রবণ মাত্রেই, উদ্দেশে তাঁহাকে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন । দিগম্বর পঞ্চাননের রূপ বা গুণ—কিছুই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অথবা তাহার কোন অঙ্গসন্ধানই না করিয়া, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্ধ্য-পূর্ব্বক, কেবল তাঁহার নাম শুনিয়াই তদীয় চরণোদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন । প্রণয়ের এবংবিধ বিচিত্র ক্ষুরণ এই নূতন । ‘বিষয়ান্তর-নিরপেক্ষ

সমাধি-মগ্ন স্থাণুর সেবা করিয়াই পার্কতীর কত তৃপ্তি। শুশ্রূষা করিতে করিতে যদি কোন সময়ে ঘোরীর ক্লাস্তি-বোধ হয়, তবে তখন তিনি, ধ্যানস্থ নিমীলিত-নেত্র চক্ষুশেখরের পুরোভাগে উপবেশন পূর্বক মৃদ্ধ-নয়নে, তাঁহার ললাট-চক্ষের দিকে অনিমেষ চাহিয়া থাকেন, ইহাতেই গোরীর কত আনন্দ! এইভাবে পার্কতীর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন, তাঁহার সখীরূপিণী বন-দেবতারা তাঁহাকে বসন্তের ফুল, পত্র-পল্লবে কতই না সাজ-সজ্জা করিয়া দিলেন। গ্রহের এমনই বিপাক, যে, বাছিয়া বাছিয়া সেই দিনটিতেই ব্যোমকেশের সমাধি-ভঙ্গের জন্ত, দেবগণ-প্রেরিত রতি, মদন ও বসন্ত তথায় উপস্থিত। রতি, মদন ও বসন্তের প্রভাবে পার্কতী-চিত্তে একটু বিকৃত-ভাব ঘটিবার উপক্রম হইল। এতদিন সরস্বতীর প্রবাহের জ্বায় যে প্রণয় পার্কতীর হৃদয়ের অতি-নিগূঢ়-প্রদেশে লুক্কায়িত ছিল, আজ এহার ঈষদ্ বহিরুন্মেষ হইল। অমনি, এত দিনের এত পরিচর্যা, এত-আত্মসমর্পণ, সমস্তই পণ্ড হইল। পার্কতী-হৃদয়ের সেই অতুল নিঃস্বার্থ প্রেমে কামের কলঙ্কিনী ছায়ার প্রতিবিম্বনে উমার এত সাধা-সাধনা সব ব্যর্থ হইল। অমন প্রণয়ের ত্রিসীমাতেও যদি মদনের মলিন করস্পর্শ হয়, তবে তাহা বড়ই শোচনীয়, নৃৎপরো-নাস্তি বেদনা-জনক। তাই কৃত্তিবাস বিরক্ত হইয়া পার্কতী-সন্নিধান পরিত্যাগ করিলেন, আর সেই সঙ্গে, অমন নিম্মল শারদ চক্ৰমাকে গ্রাস করিবার জন্ত যে করাল রাহু মুখ-বাদান করিতেছিল, সেই মদনকেও ভয়ীভূত করিয়া গেলেন। পার্কতীর ওরূপ নিম্মল-নিঃস্বার্থ প্রেমে—যাহাতে উত্তর কালেও আর, মদনের আধিপত্য না পৌছিতে পারে, তজ্জন্তই মদনের এই ভয়ে পরিণতি। কবি দেখাইলেন যে, সুবিশুদ্ধ প্রেম পঞ্চবাণের অধিকার-বহির্ভূত হওয়াই উচিত। বিশুদ্ধ প্রেমে মদনের নাম গন্ধও একান্ত অসহ। আত্মোৎসর্গে কাপটা

থাকিলে চলিবে কেন ? তাহাতে কামের গন্ধ থাকিলেও তাহা তোমার আত্মোৎসর্গ হইল না ; তাহা তোমার আশ্রয়-নাশেরই রূপান্তর মাত্র । তোমার জন্মান্তর-সঙ্কিত শুভাদৃষ্ট-ফলে, যদি কখনো তুমি বিগুহ্ব-প্রেম-রত্নের অধিকারী হও, এবং যদিও কোনক্রমে তোমারই হৃদয়-দৃষ্ট-বশতঃ, সেই বিগুহ্ব-রত্নে বাসনা-রূপ কীট প্রবেশ করে, তবে অচিরে তাহার সংস্কার করিয়া লইও । নতুবা মনে রাখিও, ভাগ্য-ক্রমে তুমি যে অনাবিদ্ধ-রত্নের অধিকারী হইয়াছ, তোমার সে অমূল্য-রত্ন অচিরেই ঐ কীট-দংশনে, জীর্ণ-শীর্ণ-শতচ্ছিন্ন হইবে । সুতরাং দৃষ্ট কীটের বিনাশ করিয়া ফেল । তাই কবি-কুল-কেশরী কালিদাস, পরম যোগী বিরূপাক্ষের দ্বারা মদনকে বলিদান দিয়া, পার্শ্বতীর হৃদয়াসীনা প্রেম-প্রতিমার অর্চনা করাইলেন । পার্শ্বতীকে মদন-গীড়া-শূন্য বিগুহ্বতম প্রেমের অধ্বিতীয় অধিকারিণী করিলেন ।

বিগুহ্ব প্রেম পণ্য-চর্চার সামগ্রী নহে । উহাতে সাজ-সজ্জার কোনই প্রয়োজন নাই । যাহাকে অজ্ঞাতসারে তুমি মনে মনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, যাহার নিকট তোমার কিছুই প্রার্থনীয় নাই, কিন্তু যিনি তোমার ইহলোক ও পরলোকের একমাত্র প্রার্থনীয়, তাঁহার সম্মুখে আবার সাজ-সজ্জা কেন ? কি প্রলোভনে না, আজ অকস্মাৎ তোমার এমন সুন্দর বেশ-ভূষায় বাসনা জন্মিল ? জননি ! অমন নিশ্চল রত্নে আবার শিল্প-চাতুর্য্য কেন ? তুমি তোমার অন্তরের মহার্ঘ রত্নকে বাহ্য আবরণে সাজাও কেন ? না ! উহা যে তোমার দেবী-হৃদয়ের একান্ত বিসদৃশ । সাজ-সজ্জায়, তোমার সেই ভ্রম্যবৃত্ত-কার, আশান-চারী, উপাশ্র-দেবতার কি প্রীতি হইবে ? উহাও যে তোমার হৃদয়ের পূর্বাশ্র-বিরোধী ।

অহেতুক আত্মোৎসর্গে ভ্রম্যন্তরের প্রয়োজন নাই । সে নিজেই নিজের ভূষণ । অন্তরের গদ্যার্থ বাহিরে আনিতে নাই । উহাতে তাহার মহিমা ধ্বংস

হয় । নিঃস্বার্থ আত্ম-সমর্পণের সংসর্গে অস্ত্রে ভূষিত হয়, তাহার নিজের বেশভূষা অনাবশ্যক । ‘তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিচ নাশ্রুতঃ শুদ্ধিমহতঃ’ ১
 যাহার প্ররোচনায় তোমার এই বুদ্ধি-মান্দ্য ঘটিয়াছে, তোমার নিজের
 হৃদয়কে ছুমি নিজেই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছ, সর্ব্বাঙ্গে তাহাকে—সেই
 মদনকে উন্মূলিত কর । তা’র পর, তোমার উপাশ্র দেবতার সম্মুখীন
 হইও । ইহাই হইল মদন-ভস্মের তৃতীয় তাৎপর্য্য ।

দশম অধ্যায় ।

সাধনা ও সিদ্ধি ।

মদন ভস্ম হইল । পার্কস্‌তীর প্রথম পরীক্ষা (trial) নিষ্ফল হইল । তিনি মর্মান্বিত ব্যথিত হইলেন । তাঁহার মস্তিষ্কের গ্রন্থিগুলি যেন শিথিল হইয়া পড়িল । তিনি শ্লথ-হৃদয়ের দুঃসহ যাতনায় একেবারে যেন মরিয়া গেলেন । কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত আত্মনির্ভর, অসাধারণ ধৈর্য্য । তিনি অভীষ্ট-দেবতার প্রসাদ-লাভের জন্ত এবার প্রাণান্ত পণ করিলেন । তিনি বুঝিলেন যে, সৌন্দর্য্যের শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকরী, উদ্ধার দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না । শরীর-পাতিনী সেবায় যাহার অল্পেই লাভ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে প্রাণপাতিনী তপস্যায় যদি তাঁহার কুপালেশও প্রাপ্ত হইতেন, জীবন সার্থক হইবে । অত্যাশা সেই চির-অভীষ্ট-দেবতার উদ্দেশ্যে বার্থ জীবনের অবসান করিবেন । তিনি বুঝিলেন যে, তপস্বি-হৃদয় জয় করিতে হইলে তপস্যার প্রয়োজন । তাই মনস্বিনী উমা, পিতার অনুমতিক্রমে, শিখণ্ডি-কুল-মণ্ডিত গৌরি-শিখর-পর্বতে তপশ্চরণের নিমিত্ত গমন করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন ।

সৌন্দর্য্যের উপর তাঁহার এমনই বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল যে, প্রিয়-মণ্ডনা পার্কস্‌তী কঠোর হার-যষ্টি দূরে নিক্ষেপ করিলেন । ‘বালারূপ-বক্র’ বন্ধন পরিধান করিলেন । তাঁহার ত্রিধ্ব-চিহ্নক কেশপাশ জটায় পরিণত হইল । নিতম্বে রসনার পরিবর্তে ‘ত্রিগুণমোজী’ বন্ধন করিলেন । ব্রতের নিমিত্ত নিয়ত কুশ্চেদন করায়, তাঁহার চম্পকভ অঙ্গুলিনিচয় ক্ষত বিক্ষত হইল । তিনি প্রমুখমালার পরিবর্তে ক্ষুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিলেন । সুকুমারী উমা এখন, বাহুলতিকায় মন্তক-সংস্থাপন-পূর্বক, অনাবৃত ভূমিতলে শয়ন করেন । তাঁহার নয়ন-পঙ্কজের সেই ‘বিলাস-চেষ্টিত’ ও

‘বিলোল-দর্শন’ বিলুপ্ত হইল । তপস্বিনী, প্রতিদিন স্নানান্তে, বক্ষের উত্তরীয় ধারণপূর্বক, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন, বিহিত অধ্যয়নাদি করেন । তাঁহার তপস্তা এবং সদাচারের কথা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া, বয়োবৃদ্ধ ঋষিগণও তাঁহার দর্শনার্থ-রূপে সমাগত হইতেন^১ । তাঁহার তপঃপ্রভাবে সমস্ত বনস্থলীও যেন সাংস্ক-ভাবময় হইয়া উঠিল^২ । এই ভাবে বহুদিন তপস্তার পর, বখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ইষ্ট-সিদ্ধির কোনই লক্ষণ অনুভূত হয় না, তখন দৃঢ়সঙ্কল্প পার্শ্বতী স্বীয় স্নকুমার শরীরের সামর্থ্য-বিষয়ে ক্রক্ষেপ না করিয়া, আরও কঠিনতর দুঃশর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি দুঃসহ নিদাঘকালে, চতুর্দিকে চতুর্বিধ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তাহার মধ্যবর্তিনী হইয়া, সহাস্তবদনে ও অনিমেঘনয়নে, দুর্দর্শ সবিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন । প্রতপ্ত সৌরকরে তদীয় বদন পঙ্কজবৎ সুশোভিত হইত ; কিন্তু প্রখ্য রৌদ্র-তাপে ক্রমে তাঁহার অপাঙ্গযুগল কৃষ্ণাভ হইতে লাগিল^৩ । তিনি আহার ত্যাগ করিলেন । কেবল ‘অযাচিতোপস্থিত’ জলদ-জলে ও অমৃতদ্রব্যতির বিমল রশ্মি-ধারায় তাহার পারণা বিহিত হইত । তিমিরাবৃত গভীর নিশীথ-সময়ে, যখন তিনি অনাবৃত স্থলে শিলাথণ্ডে শয়ন করিয়া থাকিতেন, আর ভয়াবহ ঝটিকার সহিত বৃষ্টিপতিত হইত, মধ্যে মধ্যে বিদ্রাৎ চমকিত, তখন মনে হইত, যেন নিশীথিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পার্শ্বতীর কঠোর তপস্তা-দর্শনাশায়, এক এক বার নয়ন উন্মীলন করিতেছেন, স্রোতার পরক্ষণেই, সেই স্নকুমার-দেহের তাদৃশী শোচনীয়দশা দেখিয়া, সমবেদনায় অধীর হইয়া ঝটিকি নয়ন মুদ্রণ করিতেছেন^৪ । এইভাবে গ্রীষ্মে

১—কুমার—৫৮—৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬ ।

২—কুমার, ৫৮—১৭ ।

৩—কুমার—৫৮—১৮, ২০, ২১ ।

৪—কুমার, ৫৮—২২, ২৫ ।

সূর্য্যাতপে ও অনলমধ্যে, বর্ষায় উন্মুক্ত শিলাখণ্ডে এবং শীত-রজনীতে জলমধ্যে থাকিয়া পার্কীতী তপস্তা করেন । এইরূপ কঠোর তপশ্চরণে, দিন দিন তাঁহার অঙ্গ-লতিকা ক্ষীণ ও দুর্বল হইতে লাগিল । এই ভাবে, কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ চলিয়া গেল ; কিন্তু বাহার উদ্দেশে তাঁহার এই ঘোর, প্রাণপাতী সাধনা, তাঁহার প্রসন্নতার কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না । উমা যখন তপস্তা আরম্ভ করেন, তখন যে সমুদয় বাল-পাদপ রোপণ করিয়াছিলেন, প্রত্যহ প্রভাত ও সায়াংকালে স্বহস্তে সলিল সেচন-পূর্ব্বক বাহাদিগকে জীবিত রাখিতেন, এক্ষণে সেই সমুদয় পাদপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীকহে পরিণত হইয়াছে, নানাবিধ ফল-পুষ্পে তাহারা এখন সুশোভিত, কিন্তু যে আকাজ্ঞা হৃদয়ে ধারণ করিয়া দীনা রাজনন্দিনী এই কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই আকাজ্ঞার—চন্দ্রশেখর-বিষয়ক সেই অভূতান্ন ননোরথের—অঙ্কুর পর্য্যন্তও এত দিনে উৎখত হইল না^১ । এইভাবে তপস্বিনী উমার বহুকাল কাটিয়া গেল ।

চুষকের আকর্ষণে লোহ যেমন আকৃষ্ট হয়, এতকাল পরে, তেমনই হর-বন্ধ-হৃদয়া পার্কীতীর ভক্তির আকর্ষণে ভক্ত-বৎসল আশুতোষের আসন টলিল । তিনি নবীন-ব্রহ্মচারী-বেশে পার্কীতীর আশ্রমে অতিথি হইলেন । বাসনা,—সেই তপস্বিনী-হৃদয়ের পরিমাণ কত, আর সে হৃদয়ের প্রণয়েরই বা গভীরতা কতদূর, তাহা আর একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবেন । পার্কীতী অতিথির যথাবিহিত সৎকার করিলেন । কে কি জন্ত, তাঁহার আশ্রমে আজ অতিথিরূপে উপস্থিত, ইহার বিদ্যু-বিসর্গও তিনি জানিলেন না, বা জানিতে বাসনাও করিলেন না । তপস্তা-বিষয়ক দুই চারিটি কুশল-প্রশ্নের পর, সেই নবীন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“পার্কীতি ! কিসের জন্ত তোমার এ কঠোর তপস্তা ? হিরণ্যগর্ভের সমুন্নত ও সুপবিদ্র বংশে তোমার জন্ম । ত্রিজগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যাদৃশি যেন একত্র

সমাহৃত করিয়া, তদ্বারা তোমার দেহযষ্টি নির্মিত। তোমার পিতা পৰ্ব্বত-কুলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সুতরাং কল্পনায় যত প্রকার ঐশ্বর্যের কথা উদ্ভূত হইতে পারে, সে সমস্তই ত তোমার পক্ষে একান্ত স্থূলভ। তোমার এই নবীন বয়ঃক্রম,—ত্রিজগতে তোমার আকাজ্জার বিষয় ত কিছুই দেখি না, তবে তুমি কি বাসনায় এই মহাতপস্তায় রত হইয়াছ? অতিথি এই ভাবে কত কথা ভিজ্জামা করিলেন, পার্বতী কিন্তু নির্বাক। অতিথি বলিলেন, ‘তুমি কি স্বর্গ-কামনায় তপস্তা করিতেছ? তাহা যদি হয়, তবে তোমার কেন এ নিরর্থক শ্রম? তোমার পিতৃভবন যে স্বর্গস্থ দেবতা-বৃন্দেরও নিত্য-লীলা-নিকেতন, ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’। আমার মনে হয়, স্বর্গ তোমার প্রার্থনীয় নহে। তবে কি উপযুক্ত পতি-লাভের জন্ত তোমার এই তপস্তা? তাহা হইলেও ত তোমার জ্ঞায় কল্পার পক্ষে এ শ্রম বৃথা। রত্নকেই লোকে যত্ন করিয়া অন্বেষণ করে, রত্ন স্বয়ং কখনো কাহাকেও অন্বেষণ করে না^১।’ এতক্ষণ পার্বতী নির্বাক ও নিম্পন্দ-ভাবে এবং আনত-বদনে অতিথির কথা শুনিতেছিলেন,—কিন্তু অতিথির এই প্রশ্ন-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারও একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল। চতুর ব্রহ্মচারী যেন, ঐ এক দীর্ঘ-নিশ্বাসেই সমস্ত বুঝিয়া লইলেন। তখন অমনি তিনি বলিলেন,—‘গৌরি! আর কত কাল এই ভাবে তপস্তায় শরীর-পাত করিবে? যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, তখন আমিও অনেক তপস্তা করিয়াছি, আমার সে তপস্তা সঞ্চিত আছে, না হয় তাহারই অর্ধেক তোমাকে দান করিতেছি, তদ্বারা তুমি তোমার অভীষ্ট লাভ কর! কিন্তু তোমার সেই অভীষ্টটি কি, তাহা কি আমি

১—কুমার, ৫২—৪১,—কূলে প্রসূতিঃ প্রথমস্ত বৈশমল্লিলোক-সৌন্দর্য্যবিবোধিতঃ বপুঃ ।

অমৃগামৈবর্ষ্য-স্থং নবঃ বয়স্তুগঃ-কলং স্তাং কিনতঃপরং বহ ।

২—কুমার, ৫২—৪৫,—দ্বিগং যদি প্রার্থয়সে বুধাঃ প্রবং, পিতৃঃ প্রদেশাত্তব দেবভূময়ঃ ।

অখোপবস্ত্রারমণং সরাধিনা—ন রত্নমবিত্যতি যুগ্মতে হি তৎ ।

জানিতে পারি' ?" ব্রহ্মচারী এইভাবে, নানাবিধ আত্মীয়-ব্যবহারে পার্শ্বতীর হৃদয়-নিহিত অভিপ্রায় আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । পার্শ্বতী লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন । একটি কথাও কহিলেন না । কিন্তু জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর না দিলে, যদি অতিথি অবমাননা বোঝ করেন,— এই আশঙ্কায়, পরম আতিথেয়ী উমা সন্নীপ-বর্তিনী সখীকে ইঙ্গিত করিলেন । তখন তাঁহার সেই বয়স্তা বলিলেন—‘ইহার অভিলাষ অতি উচ্চ ! ইন্দ্রাদি অতুল-ঐশ্বর্যশালী দেববৃন্দের কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষ ইহার নাই । কন্দর্পকে শাসন করিয়া যিনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে, সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইবার নহে, সেই, ‘অরুণপহার্য্য’ ‘পিনাক-পাণি’কে পতিত্বে বরণ করিবার আশাতেই অভিমানিনী উমার এই কঠোর তপস্তা । জানিনা, কত দিনে ইহার সে আশা-লতা কলবতী হইবে? ।’ বয়স্তার এই উক্তি শ্রবণে যেন বিস্মিত হইয়া, সেই ‘নৈষ্ঠিক-সুন্দর’ ব্রহ্মচারী বলিলেন—‘সত্য নাকি ? না আমাকে ‘পরিহাস’ করিতেছ’ ।’ পার্শ্বতীর আবার বিষম পরোক্ষ উপস্থিত । ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি আজ আশ্রমে অতিথি, অতিথির অবমাননা কদাচ কর্তব্য নহে । অথচ মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে যে কথা লুক্কায়িত, সেই কথার প্রকাশই বা কি করিয়া সম্ভবপর ? পার্শ্বতী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন । শেষে হৃদয়ে ভর করিয়া, অতি কষ্টে অবকঙ্ক-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন—

১—কুমার, ৫ম-৫০,—‘কিয়চ্চিরং শ্রামাসি গৌরি ! বিদ্যাতে মমাপি পূর্বাঙ্গম-সংকিতং তপঃ ।

তদর্জ্জ্ঞানেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং বরং তন্নিচ্ছাসি চ সাধু বেদিতুম্ ॥

২—কুমার, ৫ম-৫৩—ইয়ং নহেন্দ্র-প্রভৃতীনবিজিয়ন্ততুর্জিগীশানবনত্য মানিনী ।

অরুণপহার্য্যং মননস্ত নিগ্রহাৎ পিনাক-পাণিং পতিমাপ্ত বিজ্ঞতি ॥

৩—কুমার, ৫ম-৫২ ।

‘যথাশ্রুতং বেদবিদাং বর । ত্বয়া

জনোহয়মুচ্চৈঃ-পদ-লজ্জনোৎসুকঃ ।

তপঃ কিলেদং তদবাপ্তি-সাধনং,

” মনোরথানামগতি ন বিদ্যতে’ ॥

হে পণ্ডিতবর ! আপনি যাহা শুনিলেন, তাহা যথার্থ । সত্যই এ অভাজন অতি উচ্চপদের অভিলাষী । হায়, আমার এমনই ছরাশা যে সামান্য তপস্তা-দ্বারা সেই দুর্লভ-পদ-লাভের ইচ্ছা করিতেছি । মুগ্ধ বাসনা কোথায় না ধাবিত হয় ?’

নীল-কণ্ঠের প্রতি পার্শ্বতীর যে অমুরাগ, কথায় তাহার এই প্রথম প্রকাশ । ইহা অপেক্ষা গভীর ভাব, আর কোথাও দেখিয়াছি কি ? একটি মাত্র কথায়, অথচ সুপরিষ্কৃত-ভাবে হৃদয়ের ভাব ও আত্মোৎসর্গের অন্তঃসম চিত্রের এমন সুন্দর প্রকাশ আর আছে কি ? কিন্তু ইহাই পার্শ্বতীর শেষ কথা নহে । ইহার পর যোগিবর-কর্তৃক শিবের নানা প্রকার নিন্দা ও পার্শ্বতীর উত্তর—বড়ই চমৎকার । সংস্কৃতসাহিত্যের অল্প কোথাও তাহার তুলনা নাই ।

‘মহাদেবের তিন চক্ষু, জন্মের কোনই স্থিরতা নাই, চিত্তাভ্যাস তাহার দেহের অমুলেপ, বিষধর সর্প তাহার অলঙ্কার, পরিধেয় কখনো নাগচন্দ্র, কখনো বা তিনি দিগ্বসন, নর-কঙ্কাল তাহার মালা ও নর-কপাল তাহার পান-পাত্র, শ্মশান তাহার বিচরণক্ষেত্র, বলীবর্দ তাহার বাহন ; তুমি তাহার কোন্ গুণে মুগ্ধ হইলে ? এখনও অমুরোধ করি, এ অসদ্বিচ্ছা হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত কর,’—বলিয়া ব্রহ্মচারী, শিবের কতই না নিন্দা-বাদ করিলেন^১ । কল্পা-হৃদয়ে কল্পা-জন-মূলভ রূপ-তৃষ্ণার উদয়

১—কুমার, ৫৪—৫৫

২—কুমার, ৫৬, ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭২ ৭৩ ।

করিতে যতিবর কত প্রয়াস করিলেন । কিন্তু তপস্বিনী পার্কতীর হৃদয়
 হস্তির, ধীর অভীষ্ট সাধনার অটল । ব্রহ্মচারী-কথিত শিবের যত কিছু
 দোষ সে সমুদয়, পার্কতী তাঁহার বাহিত দেবতার অনন্ত-সাধারণ গুণ
 বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন । এইরূপে, অতিথি ব্রাহ্মণ পার্কতীর নিকটে
 ক্রমে অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন । ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠী পার্কতী
 যখন বলিলেন—

‘বিভূষণোদ্ভাসি পিনক-ভোগি বা, গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা ।
 কপালি বা স্যাদথবেন্দু-শেখরং ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ’ ॥
 বিবন্ধতা দোষমপি চ্যুতান্ননা ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্ ।
 বমামনস্ত্যাত্ত্বভুবোহপি কারণং কথং স লক্ষ্য-প্রভবো ভবিষ্যতিং ॥

তখন ব্রহ্মচারী সেই পার্কতী-হৃদয়ের গভীর প্রেম, অতুল আত্মসমর্পণ ও
 অলৌকিক নির্ভর দেখিয়া সত্য সত্যই অবাক হইলেন । পরে পার্কতী
 যখন আবার বলিলেন যে, অতিথি-বর তোমার সহিত বাগ্বিতণ্ডায়
 লাভ কি ? তুমি শিবের সম্বন্ধে যেসকল যেসকল বিদিত আছ,
 স্বীকার করিলান যে তিনি সেইরূপ অথবা তদপেক্ষাও নিন্দার পাত্র ;
 কিন্তু তাহাতেই বা আমার কি ? আমার চিত্ত তাহাতেই এক-নিষ্ঠ

১—কুমার,—৫৮—৭৮, ব্রহ্মাওই তাঁহার মূর্ত্তি, অতএব তাঁহার শরীর যে কি প্রকার ইহা
 অবধারণ কে করিবে ? কখন অলঙ্কারে উজ্জ্বল, কখন সর্পই তাহার ভূষণ ; কখন পরিধান
 হস্তিচর্ম্ম কখন বা পটবস্ত্র ; কখন নম্রবোর জলাটাহি সন্তকে ভূষণরূপ ধারণ করেন,
 কখনও বা চন্দ্রই তাহার শিরোভূষণ হয় ॥ (কৃষ্ণকমল)

২—কুমার, ৫৮—৮১—তুমিত অধঃপাতে গিয়াছ, শিবকে নিন্দা করাই তোমার অভিপ্রায় ।
 তথাপি শিবের একটা প্রশংসা তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে । তুমি বলিয়াছ তাঁহার
 জন্মের কোনই স্থিরতা নাই । ঠিক কথা, যিনি ব্রহ্মারও উৎপত্তির মূল, তাঁহার জন্মের
 নিরূপণ কিরূপে সম্ভবে ? (কৃষ্ণকমল)

একমাত্র তাঁহাতেই অম্লরক্ত^১ ; তখন অতিথি যেন আরও বিস্মিত হইলেন । পার্কীতী দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যুবক আবার যেন কি বলিবার উদ্বেগ করিতেছেন, সতী এবার বিরক্ত হইলেন । বাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার নিন্দাবাদ শুনিলে যে কেবল প্রাণে ব্যথা লাগে, তাহা নহে, তাদৃশ মহান্ মহোদয়ের নিন্দা শ্রবণে পাপও জন্মে, অথচ অতিথিকে নিবৃত্ত করিবার সাধ্যও আমার নাই, সুতরাং আমারই এস্থান ত্যাগ করা উচিত,—এই স্থির করিয়া যেমন

ইতো গমিষ্যাম্যথবেতিবাদিনী চচাল বালা স্তন-ভিন্ন-বক্ষলা ।

স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ সমাললক্ষে বৃষ-রাজকেতনঃ^২ ॥

‘এ স্থান হইতে আমি চলিলাম’ বলিয়া, পার্কীতী গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারীও তৎক্ষণাৎ চন্দ্রশেখর-মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক, সহাস্ত-বদনে, গমনোন্মুখী গৌরীকে ধারণ করিলেন । তখন বিস্ময়-বিস্মৃদ্ধা উমা—

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাজ-বপ্তি

নিষ্কপণায় পদমুদ্রিত মুদ্রহস্তী ।

মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিদ্ধুঃ

শৈলাধি-রাজ-তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ^৩ ॥

অকস্মাৎ সেই বহু-তপস্তা-লব্ধ হৃদয়েশ্বরকে দেখিয়া সমীর-পীড়িতা নলিনীর আয় কাঁপিতে লাগিলেন । তাঁহার তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণ কলেবর ঘস্মাক্ত হইয়া উঠিল ! তিনি স্থানান্তরে গমন করিবার জন্ত যে চরণ শূন্তে উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা শূন্তেই উত্তোলিত রহিল । অতএব, পথিমধ্যে কোনও শৈলে প্রতিহত হইলে, নদীর জল যেমন ক্রমশঃ স্ফীত হইতেই

থাকে, অগ্রসরও হয় না, পশ্চাদ্দিকেও যায় না, তদ্রূপ, শৈলেন্দ্রহিতা অগ্রসরও হইতে পারিলেন না, বা পশ্চান্-নিবৃত্তও হইলেন না । তিনি চিত্রাপিতার স্থায় দাঁড়াইয়াই রহিলেন । অধোমুখী রাজনন্দিনীর তাদৃশ নিশ্চল-নিষ্পন্দ-অবস্থান-দর্শনে, চন্দ্রশেখর হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

অদ্যপ্রভৃত্যবনতাজি ! তবাম্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ ।

হে অবনতাজি ! আজ হইতে আমি তোমার দাস হইলাম, তুমি তপস্তার দ্বারা আমাকে ক্রয় করিলে । ইন্দুভূষণের মুখে এই কথাটি শ্রবণ করিবামাত্রই তপস্বিনী গৌরী—

অহায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ্জ ।

এই দীর্ঘকাল-বাণিনী প্রাণ-পাতিনী তপস্তার যত কিছু কষ্ট, যত কিছু শ্রানি, সমস্তই যেন অকস্মাৎ ভুলিয়া গেলেন ! তাঁহার তপঃক্ষাম পতিতপ্রায় দেহে নবজীবনের আবির্ভাব হইল ! আজ উমার সম্মুখে তদীয় জীবন-নাটিকার আশ্রয় এক নূতন অঙ্ক সহসা উন্মুক্ত হইল ।

একাদশ অধ্যায় ।

উপসংহার ।

অসাধ্যসাধন করিতে হইলে, উচ্চ অভিলাষ পূরণ করিতে হইলে, তপস্যা চাই। আত্মসমর্পণ চাই। অন্তর্জয় করিতে হইলে আন্তরিকতা চাই। তাই পার্শ্বতীর এই কঠোর তপস্তা। তপস্তা কদাচ ব্যর্থ হয় না। সেই কতকাল পূর্বে, দেবর্ষি নারদের মুখে, বালিকা উমা, চন্দ্রশেখরের নামটি শুনিয়াই তাহার উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; এই দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার কল্পিত মূর্তির ধ্যান করিয়াছিলেন, একাগ্র-হৃদয়ে তাঁহার কল্পণার্থিনী হইয়া কঠোর তপস্তা করিয়াছেন, এতদিন পরে, আজ পার্শ্বতীর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। উমা স্বহস্তে যাহার মূর্তি অঙ্কিত করিয়া নির্জনে সেই প্রতিমূর্তিকে তিরস্কার করিতেন যে, হে বিশ্বনাথ, পণ্ডিতগণ তোমাকে সকলের অন্তর্যামী কহেন, কৈ, এ হতভাগিনীর অন্তরের যে কি বেদনা তাহা কি তুমি আজও জানিতে পারিতেছ না? আজ অকস্মাৎ সেই অন্তরের দেবতাকে বাহিরে দেখিয়া উমার জন্ম সার্থক হইল। তখন উমার হৃদয়ের অবস্থা যে কিদূশী, তাহা তিনি নিজেই ধারণা করিতে পারেন নাই, তাই তিনি ‘ন যযৌ ন তস্থৌ।’ এ বড় সুন্দর চিত্র! এমন নিরবদ্য চিত্র আর দেখিয়াছ কি? যত দিন জগতে বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে, মানুষের চেতনা শক্তি থাকিবে, ততদিন, এ প্রতিমা সর্বত্রই ভক্তিভরে অর্চিত হইবে। এই সকল স্বর্গীয় চিত্র যখন দর্শন করি, তখন মানব জন্ম সার্থক মনে হয়, হৃদয় লঘু হয়, দেহ পবিত্র হয়। মহাকবির উদ্দেশ্যে মন্তক আপনিই নত হইয়া আইসে।

১—কুমার, মে—যদি বুঝে সর্বপ্রথমদৃশ্যে ন দেখি ভাবহবিরং কথং জনম্।

ইতি বহুভোজিভিত্তক মুকুতা রহস্যগালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ।

এই ভাবে, সেই শিখণ্ডি-কুলমণ্ডিত, প্রকৃতির লীলাস্বলী, গৌরী-শিখর-পৰ্বতে শশাঙ্ক-শেখরের সহিত উমা-শশীর মিলন হইল। যিনি একবার উমার বহিঃসৌন্দর্য্য বিরক্ত হইয়া তাহাতে আবার অন্তরের আধিপত্য দেখিয়া ঘৃণার সহিত ‘জ্বীসন্নিবর্ষ’ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মদনকেও ভয়সাৎ করিয়াছিলেন, তিনি এখন সেই উমার মদন-গন্ধ-বর্জিত আন্তরিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইলেন। তখন যাহার হৃদয় বজ্রাপেক্ষাও কঠিন ছিল, এখন তাহারই সেই হৃদয় কুসুমাপেক্ষাও কোমল হইল। মহাকবি যথার্থই বলিয়াছেন—

“বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমহতি”।”

ক্রমে হিমালয়-গৃহে পরম সমারোহে হরপার্কণীকৃত বিবাহ হইল। সে বিবাহে হরগৌরীর পূজার জন্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বর্গের তাবৎ দেববৃন্দ উপস্থিত হইলেন।

পুরাণ-কর্তৃগণ রাজাধিরাজ হিমালয়ের রাজ্যশ্রম রক্ষার জন্ত, এইস্থলে আবার একটি স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শঙ্কর-শঙ্করীর আন্তরিক মিলন পূর্বেই সম্পন্ন করিয়া, পুনরায় বহিঃস্থলনের জন্ত এই স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান। চিত্রকর কালিদাস উহা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি দেখিলেন এমন সুন্দর চিত্রে অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকিবে, তাহাই উহার আবর্জনা-স্বরূপ। প্রকৃতির শাসনে যে কুসুম আপনিই বিকসিত-প্রায়, তাহাকে ফুটাইতে আবার বল-প্রয়োগ কেন? অপার্থিব চিত্রে পার্থিব কর-স্পর্শ কেন? উহা সৌন্দর্য্যের ঘোর পরিপন্থী। তাই তিনি ঐ সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১—উত্তরচরিত—লোকোত্তর মহাম্মদ-বৃন্দের হৃদয় কখনো বজ্রাপেক্ষা কঠিন, আবার পরক্ষণেই হৃদয়, কুসুমালপেক্ষাও কোমল। সে হৃদয়ের প্রকৃত স্বরূপ অতীব দুজ্জের।

হিমালয়-সদনে হর-পার্কর্ষীতীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল । ব্রহ্মার বাক্য সফল হইল । তারকাস্বরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আসন কম্পিত হইল । সর্গস্বতী স্বয়ং আসিয়া সেই বধুবরের স্তুতি করিলেন । অমরাগণ অতিশয় যত্নের সহিত, দম্পতির প্রীতি-বর্দ্ধন-মানসে, এক অভিনয় করিলেন । স্বর্গের সমস্ত দেবগণ সেই স্থলে সমবেত । হর-পার্কর্ষীতীর আজ প্রীতির সীমা নাই । এমন সময়ে, মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া, দেববৃন্দ অঞ্জলিবদ্ধ-করে, আওতোষের নিকটে ভাস্ত্রীভূত পঞ্চবাণের পুনর্জীবন ভিক্ষা করিলেন । বিরূপাক্ষ যখন মদনকে ভয়সাৎ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ছিলেন ‘অপরিগ্রহ’, আর আজ তিনি স-পরিগ্রহ, উমার সহিত মিলিত, অর্দ্ধ-নারীশ্বর-মুক্তি । আজ আর তাঁহার সে অন্তঃকরণ নাই, কামকে হারাওয়া কামপ্রিয়া রতির যে কি দশা হইয়াছে, তাহা তিনি আজ মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন । তাই যেমন প্রার্থনা, আওতোষ অমনি প্রসন্ন-হৃদয়ে অমুমতি দিলেন যে, কাম পুনরুজ্জীবিত হইয়া আমার সেবা করুন ! দেবতার পরম আনন্দিত হইলেন । কামের পুনর্জীবন লাভ হইল । মিলনের পূর্বে সংসার কামশূন্য ছিল, আজ মিলনের পরে, সংসারে কামের আবির্ভাব হইল । এই চিত্রে কালিদাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অতি নিগূঢ় রহস্যের মীমাংসা করিলেন । কুমারসম্ভবও এক প্রকার সমাপ্ত হইল ।

তারপর কুমারের অষ্টমে হরপার্কর্ষীতীর গন্ধমাদনাদি পর্বত ভ্রমণের বিচিত্র বর্ণনা । সে বর্ণনা যে প্রকার চমৎকারিণী, তদনুরূপই হৃদয়গ্রাহিণী । প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ঐহার হৃদয় উন্নত, প্রকৃতির প্রেমে বিহ্বল হইয়া যিনি সংসার-ত্যাগী, প্রকৃতির অব্যর্থ আকর্ষণে, যিনি পর্বতে পর্বতে, গুহায় গুহায়, ঋশানে ঋশানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার সহিত, প্রকৃতির প্রিয়নিকেতন হিমালয়ের কন্টার পর্বত-ভ্রমণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-দর্শন ; উভয়েই উভয়ের জ্ঞান আত্মবিস্মৃত, শিবের সমস্তই যেন গৌরীময়, গৌরীরও সমস্তই শিবময় ; কল্পনাতে সন্মত তাই !

কালিদাস কুমারের অষ্টমে, সম্মিলিত ‘পার্কী-পরমেশ্বরের’ যে স্বর্গীয় মূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন, রঘুবংশের ত্রয়োদশে, সেই ‘চিত্রীকৃত’ প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । জগন্মাতা ও জগৎ-পিতা বলিয়া, পার্কী-পরমেশ্বরের যে সকল ভাব, যে সকল অবস্থা, তাঁহার একান্ত প্রিয় হইলেও, বর্ণন করা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই, থিন্ন-হৃদয়ে বিরত হইয়াছেন, রঘুবংশে তাঁহার সে খেদ মিটাইয়াছেন । রাম-সীতার পবিত্র-মূর্তি স্রষ্ট করিয়া, তাঁহাদের সেই অরণ্যবাস এবং লঙ্কা-সমর-বিজয়ের পর আকাশপথে পতি-পত্নীর অযোধ্যায় পুনরাগমন বৃত্তান্ত প্রভৃতি বর্ণন করিয়া, কুমার-সম্ভবের বর্ণনায়, কবি, অপরিহার্য্য কারণে যে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহা পরিপূর্ণ করিয়াছেন । রঘুবংশ আরম্ভ করিবার সময়েই কুমারসম্ভবের অমুক্ত অংশগুলি—যাহা কবির মানস-পটে গ্রথিত ছিল,—মনে পড়িয়াছে, তাই বুঝি কবি, কুমারসম্ভবেরই নায়ক-নায়িকা ‘পার্কী-পরমেশ্বরকেই’ প্রণাম করিয়া, তাঁহার প্রিয় রঘুবংশের সূত্রপাত করিয়াছেন ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

মেঘদূত ।

“সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ড কাব্য আছে, মেঘদূত তন্মধ্যে সৰ্ব্বাংশে সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট । এই দশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ড কাব্য কালিদাস-প্রণীত । মেঘদূত ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় ।

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ অত্যন্ত স্নেহভাবশতঃ, আপন কৰ্ম্মে অবহেলা করিতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে, তোমাকে একাকী এক বৎসর রাম-গিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবেক । তদনুসারে সে তথায় আটমাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়তমার অদর্শন-দুঃখে উন্মত্ত-প্রায় হয় । পরিশেষে আষাঢ়ের প্রথম-দিবসে, নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া, যক্ষ বাহু-জ্ঞান-শূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া বাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন-বোধে সম্বোধন করিয়া, দোতাতার-গ্ৰহণ-প্রার্থনা জানাইল, এবং রাম-গিরি হইতে আপন আলয় অলকা পর্য্যন্ত পথ নির্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল । এই বিষয় অতি সুন্দর-রূপে মেঘদূতে বর্ণিত হইয়াছে ।

কালিদাস যক্ষের পথ-নির্দেশ উপলক্ষে, এই খণ্ডকাব্যে, নানা গিরি, নদী, গ্রাম, নগর, উপবন, ক্ষেত্র, দেবালয়, রাজ-ধানী, হিমালয়, কৈলাস, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষ-পত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন । ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি ও অনন্ত-সামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত ।”

মেঘদূত এক অতি বিচিত্র কাব্য । উহার সহিত অন্ত কোন কাব্যেরই তুলনা হয় না । মেঘদূতের তুলনা—মেঘদূত । এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে, মেঘদূতের কবি, কোথাও তাঁহার মনের মত স্থান, বা মনের মত সমাজ পাইলেন না । মর্তের পদার্থে, মর্তের সমাজে বা মর্তের মানুষের বর্ণনায় তাঁহার তৃপ্তি কল্পনার তৃপ্তি হইল না, তাই তিনি অতিমর্ত-লোকের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । মর্তের সমস্ত মূর্তিই স-সীম, সুতরাং সে মূর্তিতে তাঁহার অসীম কল্পনার আশা মিটিবে কেন ? তাই তিনি এক অ-সীম, অলৌকিক, নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন । সে জগতে ইহলোকের কোন নিয়মই প্রচলিত নহে । কালিদাসের চিরানন্দময়ী কল্পনা-বস্ত্রিকার সাহায্যে দেখিতে পাই, সে জগতের সবই যেন নূতন । সুখ মর্তেও আছে, কালিদাসের কল্পিত সে নূতন রাজ্যেও আছে, তবে প্রভেদ এই, মর্তের সুখের অন্ত আছে, আর তত্রতা সুখ অনন্ত । সে রাজ্যের বাহারা প্রজা, তাহাদের জীবন অনন্ত-সুখময় । এক সময়ে, বঙ্গদেশে জগৎশেঠ-বংশীয়-গণ যেমন ধন-কুবের-স্বরূপ ছিলেন, তদ্রূপ, সে রাজ্যের প্রজা-পুঞ্জ স্বর্গের ঈশ্বাদিরও ধন-কুবের-স্বরূপ (banker) । সে রাজ্যে ব্যাধি নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই,—এমন কি, সে রাজ্যের প্রজাদিগের বার্ষিক্য পর্য্যন্তও নাই । তাহারা স্থির-যৌবন-সম্পন্ন । দুঃখের জ্ঞান না থাকিলে সুখানুভূতি হয় না, সুখের সাধুর্য্যোপলব্ধি হয় না,—এই মহাজন-বাক্যের তথ্য ব্যাভিচার ঘটিয়াছে ! সে রাজ্যের সকলেই চিরসুখময় । কালিদাসের সে নূতন রাজ্য এমনই সুখ-ময়, এমনই সুন্দর । বিরাট-দেহ, দুহ-ধবল, স্ফটিকময় কৈলাস-পর্বতের উপর, কবির সে কল্পিতরাজ্য প্রতিষ্ঠিত । স্বচ্ছ স্বেতবর্ণ কৈলাসের চির-তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গমালা সুদূর উর্দ্ধদেশে উঠিয়াছে,—অথবা তাহাদের উর্দ্ধগমনের এখনও যেন বিরতি হয় নাই, তাহারা সেই অনাদিকাল হইতে এখনও যেন উর্দ্ধদেশে উঠিতেছে, উঠিতেছে, আরও উঠিতেছে । নির্মল কাচের দ্বারা আবৃত, বা একেবারে কাচের দ্বারাই

নির্মিত কক্ষমধ্যে, যেমন, একগাছি তুণেরও চতুর্দিকে প্রতিবিম্বন হয়, তদ্রূপ, সেই নির্মল, শ্বেত-কান্তি, কৈলাসের গাত্রে তদুপরিস্থিত সমস্তই ইতস্ততঃ যুগপৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া, তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে । নির্মল স্রোতস্থিনীর চঞ্চল তরঙ্গাকুল বক্ষে, আকাশের একমাত্র চন্দ্র যেমন শতমূর্তিতে প্রতিভাত হয়েন, তদ্রূপ সেই নির্মল ও বহুতর কৈলাস-গাত্রে পার্শ্ববর্তী হিমালয়ের যুগপৎ শতমূর্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে । বিরাট কৈলাসের সেই বিরাট স্ফটিক-ময়ী আকৃতির দর্শনে মনে হয়, বুঝি সুরপুর-বাসিনী ললনাদিগের এক খানি স্বচ্ছ দর্শন স্বর্গের দ্বারদেশে প্রলম্বিত রহিয়াছে । কৈলাসের বিশাল দেহে যেমন কৃষ্ণতার লেশও নাই,—সমস্তই স্বচ্ছ, শ্বেত, নির্মল,—কৈলাসবাসিগণের হৃদয়ও তেমনি, কৃষ্ণতার লেশ নাই, সে হৃদয় স্বচ্ছ, শ্বেত, নির্মল । এমনই সুন্দর সে কৈলাস পর্বত । এতাদৃশ রমণীয় পর্বতের রমণীয়তর শৃঙ্গমালার উপরে, কালিদাসের সেই রমণীয়তম রাজ্য সন্নিবেশিত । যেমন সুন্দর রাজ্য, তাহার রাজধানী অলকা-নগরীও আবার তেমনই সুন্দরী, কবির অলৌকিক কল্পনার অপূর্ব-সৃষ্টি । সে নগরীর সমস্তই নূতন, অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতচর । সমাজ বল, শাসন বল, তথায় সে সবই অভিনব । সে নগরী বিহ্বাদ-বিলাসিনী বনিতাদিগের প্রিয় নিকেতন । মুরজের ‘স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্বোধে’ সেই নগরী নিয়ত প্রতিধ্বনিত । তথায় গগন-স্পর্শী প্রাসাদ-নিচয়ের মণিময় কুটীমে সৌন্দর্য্যের অধিদেবতার সতত ইতস্ততঃ পাদ-চারণ করিয়া বেড়ান । তথায় ছয় ঋতু যুগপৎ উল্লসিত হইয়া নগরবাসিগণের চিত্ত-বিনোদন করে । মণি-মুক্তা-কাঞ্চন প্রভৃতি যাহাদের পক্ষে হ্রলভ, তাহারাই ঐ সকল মহার্ঘ্য ত্রব্যের অলঙ্কার পরিধান করিয়া আশ্ব-গৌরব-বৃদ্ধির প্রয়াস পায় ; কিন্তু কবির এ অলৌকিক নগরে, সকলেই অজস্র সম্পত্তির

অধিকারী,—তোমার আমার পরিমিত কল্পনায় যত ধন, যত সম্পত্তি আসিতে পারে, তদপেক্ষাও অধিকতর সম্পত্তির অধিকারী । যাহাদের গৃহ-মধ্য মণিময়, প্রাসাদ-ভিত্তি মণিময়, আর প্রাসাদ-নিবহ হীরক-মুক্তায় ঐশ্বিত্য, যাহাদের প্রাসাদ-মধ্য-বিলম্বিত চন্দ্রাতপের চন্দ্রকাস্ত-মণিময় ঝালর, চন্দ্রোদয়ে ঘনাক্ত হওয়ায়, তাহা হইতে টুপ্ টুপ্ করিয়া শিশিরবিন্দু৭ জল-বিন্দু পতিত হইয়া, প্রাসাদবাসিগণের গাত্র-নির্বাপণ করে, তাহাদের সম্পত্তির কথা কি আর অধিক বলিতে হইবে? তাই সে নগরের অধিবাসীরা হীরক মুক্তার অলঙ্কার ধারণ করে না, উহাতে তাহাদের বুঝি মর্যাদার হানি হয় । তাহার! প্রকৃতির মোহন-ভূষণে দেহ সজ্জিত করে । সে সজ্জার নিকটে হৈমী ভূষাও উল্লেখযোগ্য নহে । তাই কবি, শরতের পদ্ম, হেমস্তের কুন্দ, শিশিরের লোভ্র, বসন্তের কুরুবক, নিদাঘের শিরীষ এবং বর্ষার কদম্ব কুসুমে যুগপৎ সে নগর-বাসিনী রমণীদিগকে ভূষিত করিয়াছেন^১ । সে নগরের মধ্য দিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিত ; তাহার উভয় তীরে শ্রেণি-বদ্ধ-ভাবে মন্দার তরুগণ, তটিনীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে যেন বিমুগ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ; রাশি রাশি স্বর্ণ-বালুকার সে তটিনীর উভয় সৈকত অলঙ্কৃত । মন্দাকিনী-শীকর-বাহী, মন্দার তরুর সুশীতল সমীরণ, তথায় অভ্যাগত-গণের গাত্র নির্বাপণ করে । সেই সৈকতে, সেই স্বর্ণ-বালুকার মধ্যে, সেই নগরীর অনরপ্রার্থিত কল্পকাগণ, দলে দলে, মণি লইয়া কত খেলাই খেলিতেছে, একবার মণিগুলি দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, খুঁজিতেছে, পাইতেছে, আবার ফেলিতেছে, এই ভাবে কত খেলাই করিতেছে ।

১—উত্তরমেঘ, ২—হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুম্ভামুবিদ্ধঃ

নীভা লোভ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুভানানে শ্রীঃ ।

চূড়া-পাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং,

সীমস্তে চ বহুপগমজং যত্র নীপং বধুনাম্ ।

তীরস্থিত মন্দারবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ও শিশির সমীরণে, তাহাদের খেলিবার পরিশ্রমই বোধ হইতেছে না^১ ।

সে নগরের বহির্দেশে যেমন মেঘের ক্রীড়া, প্রাসাদ-মধ্যেও তেমনই মেঘের লীলা । মেঘ কখনও প্রাসাদ-বহির্ভাগে জলবর্ষণ করিয়া নগর স্নিগ্ধ করে, কখন বা উন্মুক্ত প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ-পূর্বক, অধিবাসিগণের শরীর নির্দোষ করিয়া, ধূমাকারে গবাক্ষ-পথে বহির্গত হয়^২ । সে নগরের বহির্দেশে যে সুন্দর উপবন, তথায় বিশাল-বপুঃ চন্দ্রশেখর বসিয়া আছেন, নগর-স্বামী যক্ষপতি কুবেরের আন্তরিক ভক্তিপাশে তিনি আবদ্ধ, ভক্তের প্রেমে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, তাই চন্দ্রমৌলী সেই উপবনে আসীন । তাঁহার সমুন্নত-ললাট-চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় সে নগর নিয়ত স্নাত । অন্ধকার তাহার ত্রিসীমাত্তেও আসিতে পারে না । ধবলকায় কৈলাসের সিত-মণিময় হস্ত্যমালা, চন্দ্রশেখরের সেই ললাট-চন্দ্রে সিত-দ্যুতিতে আরও সিততর হইয়াছে ; সেই হরশিরশ্চন্দ্রিকায় সমস্ত নগর আলোকিত^৩ । সে নগরে প্রাসাদের বহির্দেশ যেমন জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত, অভ্যন্তর প্রদেশও তেমনই, প্রাসাদ-ভিত্তি-খচিত রত্নাবলীর কিরণমালায় সুশোভিত । অস্ত্র-আলোক নিম্প্রয়োজন । তথায় অভিলাষ উদিত হইতেই যে বিলম্ব, উদয় মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিপূর্ণ হয় । নগর-বীথিকার উভয় পার্শ্বে শ্রেণিবদ্ধ কল্পবৃক্ষ বিরাজমান, তাহাদের নিকট কাহারই কোন অভিলাষ অপূর্ণ থাকে না । পরিধেয় মণ্ডন, নয়নের বিভ্রম-জনক মধু, নূতন পুন্নব, নূতন নূতন পুষ্প, চরণের অলঙ্কার,—বিচিত্র বিচিত্র বেশ-ভূষা—প্রভৃতি

১—উত্তরমেঘ, ৪—মন্দাকিঙ্কঃ পদ্মসি শিশিরৈঃ সেবামান৷ মরুতিঃ

মন্দারাগামনুতটরহাং ছায়য়া বারিতোষাঃ ।

অঘেষ্টবোঃ কনকসিকতা-মুষ্টি-নিষ্কেপ-গুটৈঃ

সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমর-প্রার্থিতা যত্র কঙ্কাঃ ।

২—উত্তরমেঘ, ৬ ।

৩—উত্তরমেঘ, ৭

অবলাগণের সর্ববিধ বিলাস-মণ্ডন ঐ কল্পবৃক্ষ প্রদান করে' । বাহার বখন
 যে বস্তুর প্রয়োজন, সে তখনই তাহা প্রাপ্ত হয় । মর্ত্তে এমন নগর কি হইতে
 পারে ? বাহার সমস্তই মর্ত্তধর্ম্মের অতীত, মর্ত্ত নিয়মের অতীত, মর্ত্তে তাহার
 স্থান হইবে কেন ? বাহার সকলই সুধময়, প্রসাদময়, উৎসবময়, মর্ত্তে
 তাহার স্থান হইবে কেন ? মর্ত্তেও বর্ণনার বস্ত, হৃদয়ানন্দকর বস্ত, অনেক
 আছে সত্য—মর্ত্তের সমুদ্র, পর্ব্বত, আকাশ—ইহারা নিরতিশয় হৃদয়ানন্দকর
 বটে, কিন্তু এ সমস্তই ত মানবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, পরিদৃশ্যমান । সুতরাং এ
 সমুদয়ে কবির মন প্রসন্ন হইল না । তাই তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের নিশ্চাণ-
 পূর্ব্বক পাঠককে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিলেন । মানুষ বাহা কল্পনাও করিতে
 পারে না, এমন স্থলে মানুষকে লইয়া গেলেন । সে স্থলে যাইয়া মানুষ
 বাহা দেখিল, শুনিল, সে সমস্তই নূতন । বাহা আজ নূতন, তাহা কাল
 পুরাতন হইবে, ইহাট বস্তুর ধর্ম্ম, কিন্তু কালিদাসের এ রমণীয় সৃষ্টি এমনই
 অল্পপম, এমনই বিচিত্র, যে, ইহা কোন দিন পুরাতন হইবে না । ইহা
 চিরদিন যেমন স্বয়ং নূতন থাকিবে, কবিকেও তেমনই নিত্য নূতন করিয়া
 সাধারণে প্রতিভাত করিবে ।

১—উত্তরনেম, ১১—বাসশিচ্চঃ মধু নয়নয়োর্বিজ্ঞানাদেশ-বক্ষঃ

পুষ্পোন্তেদং সহ কিসলয়েভূষণানাং বিকল্পান্ ।

লাঙ্কারাগং চরণকমল-স্থাস-যোগ্যাং চ বস্তান্

একঃ স্তম্ভে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ । .

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

নূতন সৃষ্টি ।

জগতে সকলেই সুখের জ্ঞান লাভ করিত। কেহ ইহলোকের সুখই মানব-জীবনের অধিষ্ঠিত উদ্দেশ্য মনে করেন, কেহ বা পরজীবনের সুখের আশায়, ক্ষয়িষ্ণু ঐহিক সুখে বীত-স্পৃহ হইলেন, কিন্তু সুখ সকলেরই বাঞ্ছিত। এই সুখের মোহে, লোক উন্নত-হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিলক্ষণ করিতেছে। বিধাতার এমনই বিচিত্র লীলা যে, তিনি চিরদিন মানুষকে এই সুখের আশায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কাহারও আশার শেষ হইতে দেন না। অভীপ্সিত সুখ কেহই পায় না। রাজাধিরাজ চক্রবর্তী হইতে পণ্ডিত-বাসী ভিক্ষকের হৃদয় পর্যন্ত এই কল্পিত সুখের মোহে বিমুগ্ধ, কল্পিত আশায় উন্নত। এই আশার কুহক-মন্ডলে আত্ম-জ্ঞান-শূন্য হইয়া, পরমৈশ্বর্যশালী রাবণ, একদিন, লঙ্কানগরকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন ; এই সুখের আশায় অন্ধ হইয়া বৃদ্ধ-তারক-শিশুপাল প্রভৃতি বীরগণ কত অসাধ্য-সাধনেই না প্রয়াস করিয়াছিলেন ? কিন্তু তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সংসারকে সুখময় করিবার জন্ত, ঋষি বিখ্যামিত্র মনের মত করিয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু বিদ্বাদ-বিলাসের ছায়, তাহা ঋণকাল বিলসিত হইয়াই কোথায় মিলিয়া গেল ! রাম-যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণ, ভীষ্ম-কর্ণ-অর্জুন,—সকলকেই অন্ন-বিস্তার হুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কদাচ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। হুঃখ-শেল-বিমুক্ত সুখের চিত্র পার্থিব জগতে নাই। হয়ত বিধাতার সৃষ্টিতেও নাই। তাই কালিদাস বিধি-সৃষ্টি-পরিভ্রাংগ-পূর্বক, স্বয়ং এক নূতন সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, এবং তাঁহার সেই নূতন সৃষ্টিকে মনের মত করিয়া, তাঁহার অপার্থিব কল্পনায় যতদূর হইতে পারে, তদপেক্ষাও যেন অধিকতর সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছেন। কৈলাস পর্বতের অত্র-ভেমি-

শৃঙ্গমালার উপরে, সেই নূতন সৃষ্টিকে বসাইয়াছেন । সে সৃষ্টি পৃথিবী হইতে অনেক দূরে—অনেক উচ্চে অবস্থিত । পৃথিবীর কোনও ছায়া সে রাজ্য স্পর্শ করিতে পারে না । কেবল যে কৈলাসের শিখর-স্থিত বলিয়া সে রাজ্য পৃথিবীর উচ্চে, তাহা নহে ; অথৈ, সম্পদে, বিলাসে, প্রেমে,—সর্বাত্মশেই সে কবি-সৃষ্টি বিধাতৃ-সৃষ্টির অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত । জড়-জগৎ সে বিরাট কেবল আনন্দময়ী কবি-সৃষ্টির অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে । পৃথিবীর বিষাদ, পৃথিবীর বেদনা, পৃথিবীর দীর্ঘনিশ্বাস ততদূর উঠিতেই পারে না । তাদৃশ চিরানন্দময়, চিরোৎসাহময় ও চিরোৎসবময় রাজ্য, কালিদাসের প্রিয় যক্ষ ও যক্ষবধূর লীলা-ভূমি । সেই আনন্দোচ্ছ্বাসময় রাজ্যের চিরানন্দময়ী রাজধানীতে যক্ষ-দম্পতির বাস । যে স্থানে চিরদিন ভোগ-সুখের শারদকৌমুদী বসন্তের দক্ষিণ-সমীর ও বর্ষার হৃদয়োন্মাদ বিরাজিত, সেই স্থলে, সেই আনন্দের, উৎসবের, সম্পদের, প্রেমের রাজধানীতে তাহার পরম সুখে দিন বাপন করে । তাহার বিলাসের, ভোগের ও সৌভাগ্যের বিশ্ব-বিমোহন ক্রোড়ে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত । শীত-ছাতি শশাঙ্কের স্নিগ্ধ চক্ষিকাই তাহার দেখে, তাহাই তাহার চিরদিন ভোগ করে, কিন্তু সেই শশাঙ্কও যে মেঘাবৃত হইতে পারে, তাহার হৃদয়োন্মাদিনী চক্ষিকাও যে মুহূর্ত্তে জলদাবরণে আবৃত হইতে পারে, ইহা তাহার বিদিত নহে । অপিচ, সেই শশাঙ্ক যখন আবার মেঘমুক্ত হয়, তখন, তাহার সেই উল্লাসিনী জ্যোৎস্না যে শতগুণ অধিক উল্লাসময়ী ও আনন্দময়ী হয়, পূর্বাগেকা অধিকতর চমৎকারিণী ও মনোহারিণী হয়, ইহাও তাহার বুঝে না । তাহার ভোগের মুষ্টি, ভোগই জানে, কিন্তু সেই ভোগ যে আবার কিয়ৎকাল প্রচ্ছন্ন থাকিলে, ভোগীর আকাজ্জক সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হয়, ইহা তাহাদের জ্ঞান নাই । তাহার এমনই মুগ্ধ, ভোগ-লালসার আবেশময় অঞ্চলে এমনই সুবৃষ্ট । কবিকুল-রবি কালিদাস এবংবিধ

নায়ক নায়িকার প্রণয় এবং বিরহ উপজীব্য করিয়া মেঘদূত প্রণয়ন করিয়াছেন ।

*উন্মাদই মানুষ্যের জীবন । যে হৃদয়ে উন্মাদ নাই, তাবের তরঙ্গ নাই, তাহা স্রোতোহীন শৈবালপূর্ণ আবিল জল-রাশির তুলা ; ঐ জল যেমন অপের, অগ্রাহ ও অস্পৃশ্য, তদ্রূপ উন্মাদ-হীন, তরঙ্গহীন হৃদয়ও সংসারের অযোগ্য, অরম্য, অভোগ্য । তপস্বীর তপস্তায়, বিষয়ীর বিষয়-বাসনায়, ভোগীর ভোগ-লালসায় সমান উন্মাদ বিদ্যমান । হৃদয়ের উন্মাদ-বশতই, দেবর্ষি, বিরক্ত নারদ, নিশিদিন ভগবৎ-সঙ্গীতে আত্ম-বিস্মৃত । হৃদয়ে উন্মাদ ছিল বলিয়াই দাবণ-দুর্যোধন প্রভৃতি তাদৃশ বিমূঢ় ছিলেন । হৃদয়ের উন্মাদ-প্রযুক্তই যক্ষ ও যক্ষ-বধু অহর্নিশ ভোগের আবেশে তন্মগ্ন ও অবশ-চিত্ত । হৃদয়োন্মাদের বশবর্তী হইয়াই, একদা অগ্নি-উপাসক পারসীক-গণ, মুসলমান বলের নিকট পরাভূত হইয়া, ইরান ছাড়িয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন । হৃদয়োন্মাদ-নিবন্ধনই, শক্তিশালী পিউরিটানগণ, জন্মভূমি পরিত্যাগ-পূর্বক, আমেরিকার গহন কাননে আশ্রয় লইয়াছিলেন । তাই বলিতেছিলাম, কি যোগী কি ভোগী সকলের হৃদয়েই উন্মাদ আছে । সেই উন্মাদের পরিমাণানুসারে, তাঁহাদিগকে, স্ব স্ব অভীষিত ফলভোগ করিতে হয় । মেঘ-দূতের নায়ক যক্ষের হৃদয়ে ভোগের উন্মাদ ছিল, অথবা ভোগোন্মাদ বাতীত সে হৃদয়ের যেন পৃথগস্তিত্বই ছিল না, তাই তাহাকে অতিরিক্ত ভোগোন্মাদের ফলভোগও করিতে হইল । যক্ষ ভোগের মোহে কষ্টব্য-বিস্মৃত হইয়াছিল, উন্মত্ত-হৃদয়ে স্বকর্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল, তাহার অত্মরূপ ফলও পাইল । নিবৃত্তির উন্মাদে স্মৃৎ আছে, প্রবৃত্তির উন্মাদে স্মৃৎ আছে বটে, কিন্তু, দুঃখই অধিক । যক্ষ প্রবৃত্তির দাস, উপযুক্ত শান্তি পাইল । অসহ দুঃখ-ভোগ করিল । সে দুঃসহ দুঃখ-ভারে ক্লান্ত হইয়া, নয়নজলে রাম-গিরির পাৰ্বাণময় দেহও যেন ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল । আর

কবির কবি কালিদাস, সেই স্বপ্নের অবসর হৃদয়ের করুণ-ক্রন্দনে বিহ্বল
‘হইয়া নিজেও কান্দিয়াছেন, চলাচল পৃথিবীকেও কান্দাইয়াছেন ।

যক্ষ বিলাস-ভরজিগী অলকার মনের সুখে দিনপাত করিত, সুখে,
মোহে, তজ্জায় অবশ হইয়া ভোগের কুহকস্বপ্ন দেখিত, অকস্মাৎ তাহার
নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সমস্ত স্বপ্ন নিমেষ-মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল ! সে
নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিত, জীবন অনন্ত সৌন্দর্য্যময়, আর জাগরিত হইয়া
দেখিল, সৌন্দর্য্যময় নহে জীবন অনন্ত কর্তব্যময়, জীবনের কর্তব্যের
শেষ নাই । সে সৌন্দর্য্যের মোহে কর্তব্যের ক্রটি করিয়াছিল, তাই
অলকাপতি কুবেরের আদেশে, একবৎসরের জন্ত, তাহাকে একাকী মর্ত্তে
নির্কাসিত হইতে হইল^১ । বাহিত-বিরহ ব্যতীত অলকার অন্ত শান্তি
ছিল না^২ । ভোগীর হৃদয়ে ভোগ-বঞ্চনা অতীব বেদনা-দায়িনী ।
যক্ষকে ভোগ-বঞ্চিত করিয়া, তাহার জন্ত তাহার এত উদ্গাদ, এত আবেশ,
এত মোহ, তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া, যক্ষপতি কুবের, অলকার
প্রাণের এক নূতন চিত্র দেখাইলেন । যক্ষ দেবযোনি, বহু-ঐশ্বর্য্য-যুক্ত,
অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি । কুবের তাহার সে সমস্ত ক্ষমতা এক
বৎসরের জন্ত ‘বাঞ্ছয়াপ্ত’ করিয়া লইলেন । তাহার সমস্ত দৈবশক্তি
চলিয়া গেল । সে সাধারণ মানুষের হ্রায় হইল । সুতরাং তাহার ত-আর
অলকার স্থান হইতে পারে না, অলকা মানুষের স্থান নহে, তাই সে
মর্ত্তে—রামগিরিতে নির্কাসিত । কুবেরের শাসনে, ইচ্ছানুরূপ আকৃতি-
পরিগ্রহের ক্ষমতা, করুণা মাত্রে অগম্য স্থানে গমন করিবার ক্ষমতা,—

১—পূর্ব্বদেখ, ১ ।

২—উত্তর দেখ,—আনন্দোৎসব নয়ন-সলিলং যত্র নাট্টমির্মিতৈঃ

নান্দন্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্ট-সংযোগ-সাধ্যাং ।

নাশ্যন্তস্মাৎ ঐশ্বর্যকলহাৎ বিপ্রযোগোপপত্তিঃ

বিক্লেপান্যং ন চ ধনু বয়ো বৌবনাবতমতি ॥

এ সমুদয় তাহার লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু সে যে রাজ্যের অধিবাসী, সেই রাজ্যের প্রজাগণের হৃদয়ে যে অপার্থিব সম্পদ ও অলৌকিক বস্তু আছে, তাহার লোপ হইল না । বরং এই নির্বাসনে সে সম্পদ আরও উপচিত হইল^১ । তাহার হৃদয়স্থ অসাধারণ প্রেম, অসাধারণ প্রণয়, কুবেরের এই শাসনে যেন আরও বর্দ্ধিত হইল । মিলন-কালে যাহা শতমুখ ছিল, এই বিচ্ছেদকালে সেই অনুরাগ সহস্র-মুখ হইল । তাহার হৃদয়ের অন্তঃকলহাভিনী প্রীতি-সরস্বতী এই গঙ্গায়মুনাক্রপী বিচ্ছেদের সহিত মিলিত হইয়া পূর্বাগেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য-শালিনী হইলেন । মধুর-সলিল দামোদরের অতর্কিত বস্ত্রার আবির্ভাব হইল । প্রেমিক যক্ষ তাহার হৃদয়ের সেই কুলপ্লাবী বস্ত্রায় নিজে ত ভাসিলই, পরন্তু যে স্থানে তাহার অধিষ্ঠান, সে স্থানকেও ভাসাইয়া দিল । আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত্ত, স্থাবর-জঙ্গম—সমস্ত তাহার সে ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল । বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সে নিজের করিয়া লইল । তাহার ক্রন্দনে বন-দেবতারা কান্দেন^২ । তাহার বিলাপে বনস্থলী বিহগ কুজন-চ্ছলে করুণ বিলাপ করিয়া উঠে । সে যখন, তাহার বিরহানল-দগ্ধ-হৃদয়া ভাষ্যার প্রাণ রক্ষা-মানসে, অচেতন মেঘকে চেতন ভাবিয়া দূতরূপে প্রেরণ করে, তখন যক্ষের বেদনায় ব্যথিত হইয়া^৩ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সেই দূতের আহ্বান করে । যাহার যতদূর সামর্থ্য দূতের সহায়তা করে । যখন মেঘ দূত হইয়া অলকায় যাত্রা করিয়াছে, তখন বিস-কিসলয়-মুখী মরালশ্রেণি আকাশে তাহার সহায় হয় ; বিচিত্র ইন্দ্রধনু শূন্যে তোরণ সাজাইয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করে ; সরল জন-পদ-বধূগণ, শ্রামল শস্ত্রক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, তাহাদের সারল্যোক্তাসিত মুখ হইতে মেঘ-নিন্দী অলক ভার অপসৃত করিয়া, আকাশে নবোদিত কালমেঘের দিকে

১—উত্তরমেঘ, ৪৯—বেরহানাছঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তত্ত্বভোগাৎ

ইষ্টে বস্তুদ্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাসীভবন্তি ॥

২—উত্তর মেঘ, ৪৩ ।

অনিমেঘ-নয়নে চাহিয়া হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করে^১ । কোথাও মেঘকে পরিশ্রান্ত ভাবিয়া, তাহার উপবেশনের জন্ত, পাখাণময় পর্কতও সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া ধরে । সর্বসংসহা পৃথিবীও যেন যক্ষের চুঃখ সহ করিতে না পারিয়া, নবজল-সম্পাতোখিত সৌরভে দূতের উৎসাহ-বর্দ্ধন করেন^২ । প্রকৃতিদেবী কোথাও বর্ষার ভূষণ কদম্ব-কুসুমের দ্বারা, কোথাও ভ্রাণ-তর্পণ কেতকীদ্বারা, কোথাও বা কুটজাঞ্জলির দ্বারা যক্ষ-দূতের অভ্যর্থনা করেন^৩ । সৌন্দর্য্যের নিধান নীল-কণ্ঠ ময়ূরগণ, যক্ষের চুঃখে মর্ম্মাহত হইয়াই যেন, সজ্জল-নয়নে কেকা-রবে দূতবরের স্বাগত-জিজ্ঞাসা করে^৪ । এই ভাবে, মর্ত্তের রাম-গিরি হইতে স্বর্গের অলকা পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘ পথের সর্বত্রই সকলে, চেতনাচেতন-নির্কিংশেবে যক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যথিত হইয়া, মর্ত্তের কুটজ-কেতকী হইতে স্বর্গের পারিজাত পর্য্যন্ত, মর্ত্তের মরাল-ময়ূর হইতে স্বর্গের সুর-যুবতীগণ পর্য্যন্ত, মর্ত্তের রেবা হইতে স্বর্গের মন্দাকিনী পর্য্যন্ত, যক্ষের সহিত একপ্রাণ হইয়াই যেন, তাহার দূতের সহায়তা করিতেছে । যেন সমবেদনার করুণ কণ্ঠে, স্বাবর-জঙ্গম সমস্ত ‘ভূতগ্রাম’ বৃগপৎ ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে ।

কখনও যক্ষ, তাহার প্রিয়তমার কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্যও যদি দেখিতে পায়, তবে তাহাতে হয়ত, তাহার হৃদয়-বেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে,— এই আশায়, ঈষচ্চঞ্চল শ্রামা-লতিকায় তাহার প্রিয়ার অঙ্গের, চকিত-হরিনীর তরল-নয়নে দৃষ্টিপাতের, চক্রে বদনের, ময়ূরের সুনীল পুচ্ছরাশিতে কেশ-কলাপের, এবং তটিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার তাহার চঞ্চল জ্র-বিলাসের সাদৃশ্য অন্বেষণ করে, কিন্তু সে সমুদয় তাহার প্রিয়তমার কোনও

১—উত্তর মেঘ, ১১, ১৫, ৮—১৬ ।

২—উত্তর মেঘ, ১২, ১৬ ।

৩—উত্তর মেঘ, ২১ ।

৪—উত্তর মেঘ, ২২ ।

বিষয়েরই সমকক্ষ নহে—দেখিয়া, নীরবে হতাশ-হৃদয়ে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া রোদন করিয়া উঠে^১ ।

কখনও যক্ষ নির্জনে বসিয়া তাহার সেই বড় সাধের জন্ম-ভূমির কথা ভাবে । তাহার কান্তা স্বহস্তে জল-সেচন-পূর্বক যে মন্দারতরুকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, পুত্রাধিকন্নেহে লালন-পালন করিয়াছে সেই মন্দার^২, তাহার গৃহোপকণ্ঠের স্বচ্ছতোয়া দীর্ঘিকা, মরকত-শিলায় বাহার সোপানাবলী রচিত, যথায় বৈদূর্য্য-ময় মৃণালের উপর শত শত সোণার কমল বিকসিত, বাহার জলে বাস করিয়া হংসমালা জলদ-কালেও নিকটবর্তী মানস-সরোবরে যাইতে চাহে না, সেই দীর্ঘিকা^৩, আর সেই দীর্ঘিকার তীরে যে ক্রীড়া-পর্বত, বাহার শিখরমালা সূচাক্ষ ইন্দ্রনীল-মণিদ্বারা বিরচিত, সোণার কদলীতরু-দ্বারা যে পর্বতের প্রান্তদেশ বেষ্টিত, বাহার উন্নত, স্বর্ণ-কদলী-মধ্য-গত, ইন্দ্র-নীল-মণিময় শিখর দেখিলে, মনে তড়িদ-বিলসিত সুনীল মেঘ-মালায় স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেই ক্রীড়া-পর্বত^৪,—আর সেই ক্রীড়া-পর্বতের উপরে, কুরুবক-তরু-বেষ্টিত মাধবী-কুঞ্জের সমীপবর্তী যে চঞ্চল-পল্লব রক্তাশোক ও বকুলতরু^৫, এবং সেই তরুদ্বয়ের মধ্যে যে স্বর্ণ দণ্ড, নীল-মণি-রাশিদ্বারা যে দণ্ডের মূলদেশ বদ্ধ, যে দণ্ডের উপরিস্থিত, স্বচ্ছ, ক্ষুটিক-নির্ম্মিত, পীঠের উপরে সায়ংকালে ময়ূর আসিয়া পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া দাঁড়াইত, আর তাহাকে যক্ষ-প্রিয়া করতালিকা দ্বারা নাচাইত,

১—উত্তর মেঘ, ৪১—ভ্রামাশ্বজং চকিত-হরিণী-শ্রেণ্যে দৃষ্টিপাতঃ

- বজ্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহ্নিতারেষু কেশান্ ।
উৎপত্তানি শতমুখং নদী-বীচিন্ ক্র-বিলাসান্
হস্তৈকস্মিন্ কচিদপি ন তে চণ্ডি । সাদৃশ্যমতি ।

২—উত্তর মেঘ, ১২ ।

৩—উত্তর মেঘ, ১৩ ।

৪—উত্তর মেঘ, ১৪ ।

৫—উত্তর মেঘ, ১৫ ।

ময়ূর তালে তালে নাচি ত', সেই সব—একে একে, যক্ষ একাকী বসিয়া নিবিষ্ট-মনে ভাবে ।

কখনও যক্ষ, পূৰ্ব্বত-পৃষ্ঠে উপল-পটে, গৈরিকাদি দ্বারা তাহার হৃদয়াসীনা প্রিয়া-মূর্তি চিত্রিত করিতে যায়, কিন্তু সে চিত্রাঙ্গসম্পূর্ণ হইবার পূৰ্বেই, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগে, অবরুদ্ধ কর্ণে, ক্রন্দন করিয়া উঠে, সহসা নয়নদ্বয় জলভারাক্রান্ত হওয়ায়, সেই অর্ধ-চিত্রিত মূর্তি একবার আশা মিটাইয়া দেখিতেও পার না^১ । কখনও যক্ষ, উত্তর দিক্ হইতে, সেই অলকার দিক্ হইতে আগত, তুষার-সিক্ত সমীরণকে আগ্রহে আলিঙ্গন করে, ধারণা এ বাতাস যখন অলকার দিক্ হইতে আসিয়াছে, তখন হয়ত, অলকার কোনও সংবাদ এ জানে^২ । এই ভাবে যক্ষ, কখন লতা-কুঞ্জে যায়, কখন বা অদৃশ্য বায়ুকে উন্নত-হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে ছুটে । এক দিন যাহার অত সুখ, অত সম্পদ ছিল, যেমন অভিলাষত হউক না কেন, কল্পতরু তংক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিত, সুখের সম্মোহন অঞ্চলে যে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল, আজ তাহার এই দশা ! সে আজ তরলতা, পশুপক্ষী—সকলেরই কুপা-প্রার্থী । তাহার শোচনীয় দশা দর্শনে সকলেই মর্শ্বাহত । জড় জগৎ আজ নিজের জড়ত্ব-পরিহার-

১—উত্তর মেঘ, ১৬—তদ্ব্যখ্যে চ স্ফটিক-কলক। কাঞ্চনী বাসবষ্টিঃ

মূলে বন্ধা বণিভিরনতিপ্রোঢ়বাণ-প্রকাশৈঃ ।

তালৈঃ শিঞ্জা-বল্লভ-হৃতগৈর্গণ্ডিতঃ কান্তয়া বে

বাসধ্যান্তে দিবস বিগমে নীলকণ্ঠঃ সুরম্যঃ ।

২—উত্তর মেঘ, ৪২—স্বামালিণ্য প্রণয়কুণ্ডিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াং

আত্মানং তে চরণ-পতিভঃ বাবদিক্ষামি কর্ণমুখ ।

অষ্ট্রে স্তাবন্ মুহুরপচিতৈর্দৃষ্টিরাণুপ্যতে মে

ক্রুরন্তম্মিন্নপি ন সহতে সমরং নৌ কৃতান্তঃ ।

৩—উত্তর মেঘ, ৪৪ ।



ব্রাহ্মগিরিতে বিনয়ী যক্ষ

Muhlia Press, Calcutta.

পূর্বক দুর্গত যক্ষের সমবেদনায় আকুল। কি করিলে যক্ষের সাশ্বনা হইবে, ভাবিয়া সকলেই ব্যস্ত ; নদ-নদী-গিরি-অরণ্য, গ্রাম-নগর-রাজধানী, তরু-লতা-পত্র-পুষ্প—সকলেই যক্ষের সন্তপ্ত-হৃদয় শীতল করিতে উৎসুক। তাই মেঘ যখন রামগিরি হইতে অলকার ছুটিয়াছে, তখন উহারা সকলেই প্রাণ দিয়া দূতের সেবা করিতেছে। চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ যক্ষের হৃৎকেন্দ্র হৃৎকিত এবং তাহারই জ্বায়ে উন্নত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। উন্নত যক্ষ একাকী আশান রামগিরিতে পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার প্রাণ যেন ঐ মেঘের সহিত অলকার ছুটিয়াছে। না না, অচেতন মেঘ চেতন যক্ষের প্রাণটি লইয়া, নিজে চেতন হইয়া ছুটিয়াছে, আর এদিকে, প্রাণহীন যক্ষ মূতের জ্বায়ে, রামগিরির বিরহ-তিমিরাবৃত ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে পড়িয়া আছে। তাহার প্রাণময় মেঘ দিগ্বিদিগ্-জ্ঞান শূন্য হইয়া, অলকার দিকে ছুটিতেছে, বাধা-বিঘ্ন সমস্ত উপেক্ষা পূর্বক গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। মেঘ যে স্থানে উপস্থিত হয়, তথায় সমস্তই তাহার আবেশময় ভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া তাহারই মত উন্নত হইয়া উঠে। পর্তত তাহাকে দেখিয়া অগ্রপাত করে, পৃথিবী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে, নদীবক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়। চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের এ প্রকার বাকুলতা আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কবি-কুলপতি কালিদাস তাহার ভাবময়ী উচ্ছ্বাসময়ী আবেগময়ী কল্পনার বলে, যক্ষের যে মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দেখিয়া চেতনাচেতন সমস্ত জগৎ যেন ভাবময় উচ্ছ্বাসময় ও আবেগময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাভাগর মহাশয় বথার্থই বলিয়াছেন যে, মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অল্প কোন কাব্য রচনা না করিলেও কালিদাস ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন।

কালিদাস, মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘে, রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত—সুদীর্ঘ পথের যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, পশ্চিম-পার্শ্ববর্তী নদ-

নদী-গিরি-বন-উপবন-পথ-রাজধানী প্রভৃতির যে অত্যাঙ্কল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয় । অতিক্রুদ্ধ পদার্থের, একটা সামান্য পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশেও যদি কোন সৌন্দর্য থাকে, তবে তাহা কালিদাসের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পড়িবেই পড়িবে । ময়ূরের শুভ্র অপাঙ্গ-দেশে জলবিন্দুর উত্তব কেমন সুন্দর দেখায়, তাহা তিনি জানিতেন । রৌদ্র-শুক কর্ষিত ভূমিখণ্ডে অকস্মাৎ নব-জল-পাতে কিরূপ সৌরভ উদ্ভিত হয়, তাহা তিনি বিদিত ছিলেন^১ । পূর্বমেঘে, তিনি, তাঁহার প্রিয় উজ্জয়িনীর যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার পাঠকালে মনে হয়, যেন সেই কালিদাসের সময়ের উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়াছি । তথাকার সব যেন দেখিতে পাইতেছি । শিশ্রুানদীর স্নিগ্ধ সমীরণে দেহ মন ছুড়াইয়া বাইতেছে । ভবভূতি ব্যতীত আর অল্প কোন কবির বর্ণনায় এ ভাব জন্মে না । অল্প কোন কবি, পাঠককে স্বীয় বর্ণিত সময়ে বা বর্ণিত দেশে ভুলাইয়া লইয়া বাইতে পারেন না । কালিদাসের বর্ণনায় এ শক্তি পরিদৃষ্ট হয় । তিনি তাঁহার ইচ্ছামত পাঠককে আকাশে, পৃথিবীতে, সমুদ্র-শয়ন-সুপ্ত বিষ্ণুর পাদ-প্রান্তে, আবার হিমালয়ের উত্তীর্ণ শিখরে, যখন যে স্থানে অভিলাষ, লইয়া যান । পাঠক মন্ত্র-মুগ্ধের জ্বায় তাঁহার কল্পনা-দেবীর অনুবর্তন করেন । অত্যাশ্চর্য্য কবিগণের বর্ণিত বিষয়, কোন না কোন নির্দিষ্ট সময়ের বা নির্দিষ্ট সমাজের উপযোগী, পরবর্তী কালে তাহার আর তেমন উপযোগিতা থাকে না । কিন্তু কালিদাসের বর্ণনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । তাঁহার রচনা সকল সময়ের, সকল দেশের, সকল রসজ্ঞ পাঠকেরই সমান উপযোগী, সমান তৃপ্তি-প্রদ । বেক্সপ পাঠকই হউন না কেন, তাঁহার বাহ্য আবশ্যক, তিনি বাহ্য ভাল বাসেন, সে সব কালিদাসের বর্ণনায় আছে । ইহা চিরদিন সমান নূতন ।

কবির সৃষ্টি যে কত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমরা মেঘদূতে বেশ দেখিতে পাই। মেঘদূতে সৃষ্টি-নৈপুণ্যের (art) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোক হইতে শেষ শ্লোক পর্যন্ত সমগ্র গ্রন্থে, মহাকবির কল্পনা এক ভাবে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও প্রতিহত হয় নাই। কোকিলের কুলস্বর বা ভ্রমরের গুঞ্জন, তটিনীর কুলকুল ধ্বনি বা কুসুমের সৌরভ, এই সমস্ত, প্রাণে যেমন একটা স্বপ্নময় ভাব আনিয়া দেয়, তদ্রূপ, মেঘদূতের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিও পাঠকের হৃদয়ে কেমন যেন একটা স্বপ্নময় আবেশময় ভাবের উদয় করিয়া দেয়। সে ভাবের বর্ণনা ভাষার করা যায় না। তাহা কেবল সহৃদয়গণের অমুভবগম্য।

ভারতবর্ষের মান-চিত্রে আমরা যে সকল স্থানের কেবল নাম-নির্দেশ দেখিতে পাই, কালিদাসের এই বিচিত্র মান-চিত্রে সেই সকল স্থানের বার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। অথবা মেঘদূত যেন, রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের একখানি বিরাট্ প্রতিকৃতি। ঐ বিশাল ভূমিখণ্ডের যে স্থানে বাহা যেমন ভাবে আছে, তাহা ঠিক সেই ভাবে এই প্রতিকৃতিতে প্রতিকলিত হইয়াছে। কোথায় ময়ূর কণ্ঠ উন্নত করিয়াছে, কোথায় নদীর নীল সলিলে স্নেহ সফরী উদ্ঘর্জন করিতেছে, কোথায় কোন্ রাজপথে, রমণীগণের কবরী হইতে কুসুম অলিত হইয়া পড়িয়া আছে, কোথায় কোন্ রমণী করতালিকা দ্বারা ময়ূর নাচাইতেছে, আর তাহার কর-কিসলয়-স্থিত কাঞ্চন-বলয় রুণু রুণু করিয়া বাজিতেছে—এ সব এই প্রতিকৃতিতে চিত্রিত। কবির তীক্ষ্ণমন এই বিস্তৃত ভূভাগের সমস্ত পদার্থের উপর, সূক্ষ্মসূত্র-নির্বিণ্ণে—পতিত। তাই বলিতেছিলাম, কালিদাস মেঘদূতে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-নৈপুণ্য যে কীদৃশ অলৌকিক, তাহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন। তবে, মেঘদূতে তিনি কোন আদর্শ গঠন করেন নাই, বা করিবার বাসনাও বোধ হয় তাঁহার মনে উদ্ভিত হয় নাই। মেঘদূতের নারক-নারিকা ভোগভূমির অধিবাসী, স্তব্রাং তাহাদের

সমস্তই ভোগময় । তাহাদের প্রতি-নিখাসে, প্রতি-নয়ন-স্পন্দনে ভোগ-
 বাসনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে । লালসার আবরণে তাহাদের সমস্ত
 ক্রিয়াকলাপ আবৃত । ভোগ ভূমির ভোগী দম্পতির প্রণয় এবং বিচ্ছেদের
 সম্পূর্ণ চিত্র যে কতদূর সুন্দর হইতে পারে, তাহাই মাত্র তিনি দেখাইয়াছেন ।
 নতুবা সমাজ-শিক্ষা বা লোক-শিক্ষার উপযোগী কোন আদর্শ-চরিত্র
 মেঘদূতে নাই । রাম-সীতা বা ছবাস্ত-শকুন্তলার আদর্শ-চরিত্রে সমাজের
 বহুল উপকার সাধিত হয়, মেঘদূতের যক্ষ-যক্ষপত্নীর চরিত্রে সেরূপ কোন
 উচ্চ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না ।

কালিদাসের প্রতি বাগ্‌দেবতার অশেষ কৃপা ছিল । বিধাতা তাঁহাকে
 আলৌকিক প্রতিভা দিয়াছিলেন, আর রসিক সামাজিকগণ তাঁহার কবিতা
 পাঠে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন । তিনি তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার সাহায্যে
 পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সুন্দর, সুচারু এবং সুপবিত্র পদার্থের বর্ণন করিয়া
 গিয়াছেন । তাঁহার আবির্ভাব ভারতবর্ষ গৌরবিত, তাঁহার নিম্নলি
 কবিতালোকে সংস্কৃতভাষা আলোকিত এবং সর্বদেশ-পূজিত হইয়াছে ।
 তাঁহার কাব্যে যখনই নয়ন-সংযোগ করি, তখনই আশ্চর্য-বিস্মৃত হই,
 অন্ধা এবং ভক্তিতে, তাঁহার উদ্দেশ্যে মস্তক আপনিই নত হইয়া আইসে ।
 তাঁহার কাব্য পাঠে আমরা ভারতবাসী মাঝেই গৌরবান্বিত, আনন্দিত ও
 পরিপূত হইয়াছি ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

রঘুবংশ ।

“সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ।... রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত । প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে । নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্রিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে । রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত—সর্বাংশই সর্বোৎকৃষ্ট-সুন্দর । যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় । কিন্তু এতদ্বন্দ্বীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃতভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন !” “রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং, তত্ত চ টীকা সাপি চ পাঠ্যা ।” শ্লোক আবৃত্তি-পূর্ব্বক তাঁহারা সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন ।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি-নৈপুণ্য, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর চরিত্র-সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্ট চরিত্রাবলীর দেশ, কাল, ও অবস্থানুযায়ী সমাবেশ-বিষয়ে কৌশল । এই কৌশল বাঁহার নাই, তাঁহার রচনায় অত্র বহুবিধ গুণ থাকিলেও, উক্ত রচনাকে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না । গীত-গোবিন্দ, মহানাটক, ঋতু-সংহার প্রভৃতি কাব্যে বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও উহাদিগকে প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য করা যায় না । যদিও ঐ সমুদয় কাব্যের প্রায় সর্বত্রই প্রসাদ-মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের সম্ভাব আছে, স্বভাবের সুন্দর বর্ণন

আছে, কিন্তু সৃষ্টি-নৈপুণ্য উহাতে এক প্রকার নাই বলিলেও হয়। সৃষ্টি-বিষয়ক নৈপুণ্য বা চাতুর্য্যই কাব্যের জীবন। সৃষ্টি-চাতুর্য্য স্বভাবের অনুরূপ হইলে যেমন মনোরম হয়, স্বভাবের প্রতিকূল অর্থাৎ বাহ্য বিশ্বের সৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয় না, তাদৃশ বিশ্ব-বিরোধী হইলে আবার তেমনই বিরক্তি-জনক হয়। এই জন্তই আরব্যোপভ্রাসের অধিকাংশ ঘটনা বা 'পক্ষিরাজ ঘোটকের' গল্প সহৃদয়-সম্মত নহে। স্বভাবের নিয়মানুসারে, যে সকল ব্যাপার নিত্য ঘটিয়া থাকে, চিরদিন ঘটিয়া আসিতেছে, কবির সৃষ্টিতে তদনুযায়ী ব্যাপারই থাকা উচিত। তবে, কবি যদি তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলে, ঐ ব্যাপার-সমূহকে স্বাভাবিক ব্যাপার অপেক্ষা অধিকতর মনোহর ও বৈচিত্র্য-সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে কবির সে কাব্য আরও সুন্দর হয়। যেমন আত্মত্যাগ, ইহা মানবের একটা প্রধান গুণ, শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সংসারে এই আত্ম-ত্যাগের বহু নিদর্শন আছে। কবি তাঁহার কাব্যে যদি এই আত্ম-ত্যাগের উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে তাহা সুন্দর হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতে সচরাচর যেরূপ পরিদৃষ্ট হয়, কবি যদি তদপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া উহা প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে সেই কবি-সৃষ্টি স্বভাবের সৃষ্টি অপেক্ষা সমধিক চমৎকারিণী ও হৃদয়-গ্রাহিণী হইবে। কিন্তু ঐ চমৎকারিণী কবি-সৃষ্টিতে স্বভাব-বিরুদ্ধ, অর্থাৎ অস্বাভাবিক কিছুই থাকিবে না। তবেই সে সৃষ্টি সর্বাংশে নিরবদ্য হইল। স্বভাবে যাহা যোল আনা আছে, কবি তাহা আঠারো আনা করিতে পারেন, কিন্তু স্বভাবে যাহার এক আনাও নাই, থাকিতে পারে না, তাদৃশ বস্তুর রচনা করিলে, তাহাতে কবির নৈপুণ্যের অভাবই প্রকাশিত হয়। আবার স্বভাবে যাহা আছে, কেবল তাহার অনুরূপ করিয়া চরিত্র-সৃষ্টি করিলেও, তাহাতে কবির কোন প্রশংসার কথা নাই। জগতে, আনন্দের প্রত্যেক যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি, কবি-সৃষ্টিতে যদি

কেবল তাহারই অমুবৃদ্ধি দেখিতে পাই, তবে, তাহাতে কবির চিত্র করিবার ক্ষমতার,—যেমন দেখিয়াছেন, কবি ঠিক সেইরূপ চিত্র করিতে পারেন,—এই ক্ষমতার, কথঞ্চিৎ প্রশংসা করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহাই কবি-সৃষ্টির উৎকর্ষ, একথা বলা যাইতে পারে না । কেননা তাহাতে কবির সৃষ্টি-চাতুর্য্য পরিলক্ষিত হইল কৈ ? আর সেই পরিদৃষ্ট পদার্থের পুনঃ-পরিদর্শনে জগতের, সমাজের তথা পাঠকের উপকার হইল কৈ ! যে কাব্যে সমাজের কোন উপকার সাধিত না হয়, তাহাকে উত্তম কাব্য বলা যাইতে পারে না । সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসিয়া, অন্ত-গমনোন্মুখ স্বর্ঘ্য দেখিতে বড়ই সুন্দর ; পর্কতের শিখরদেশে দাঁড়াইয়া দূরে—অধোদেশবর্ত্তিনী স্তিমিত পৃথিবীর শোভা দেখিতে বড়ই সুন্দর ; কবি, হয়ত তাঁহার চিত্র-সম্পাদিনী ক্ষমতার প্রভাবে, ঐ ছই মূর্ত্তির প্রতিকৃতি নিম্নাণ করিতে পারেন, কিন্তু কবির নির্ম্মিত ঐ প্রতিকৃতির দর্শনে ক্ষণস্থায়ী আমোদ ব্যতীত দর্শকের অন্ত কোনও উপকার সাধিত হয় কি ? দর্শকের কোন শিক্ষা হয় কি ? যে সৃষ্টিতে আমোদ ব্যতিরিক্ত অন্ত কোনই লাভ নাই, তাদৃশ কাব্য উৎকৃষ্ট নহে । সংসারে আমোদ-লাভের ত অনেক উপায় আছে । ক্ষণকালের জন্ত হৃদয়ের তৃপ্তি-সাধনোপযোগী বহু পদার্থই ত ইতস্ততঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে । তবে আবার কাব্যের প্রয়োজন কি ? চিত্তের ক্ষণিক আমোদ সম্পাদনের জন্তই যদি কাব্য পাঠ করিতে হয়, তবে ‘আরব্যোপখ্যাস’ ‘ভূত ও মানুষ’ ‘কঙ্কাবতী’ প্রভৃতি কাব্যই ত একমাত্র পাঠ্য হইয়া উঠে । অথবা যে সকল কার্য্যে মনের সাময়িক আনন্দ জন্মে, সেই সকলের অনুষ্ঠান করাই ত উত্তম । যদি বল, অবিগুহ্য উপারে চিত্ত-প্রসাদ-লাভ অপেক্ষা, কাব্যাদি পাঠরূপ বিগুহ্য উপারে যদি চিত্ত-তৃপ্তি জন্মে, তবে মন্দ কি ! তদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, ভাস, পাশা, দাবা প্রভৃতিও ত অবিগুহ্য নহে, আমোদ লাভই যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে ঐ সকলের অনুশীলনই ত উচিত, কাব্য-

পাঠের আবশ্যকতা কি ? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, পাঠকের হৃদয়ে আমোদ-বিধান ব্যতীত, কাব্যের অন্য উদ্দেশ্যও আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য কাব্য-শরীরে এতই প্রচ্ছন্ন যে, পাঠক অকস্মাৎ তাহার উপলব্ধি করিতে পারেন না। দৈব-শক্তি যেমন অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করে, তজ্জপ কবির সেই গূঢ় উদ্দেশ্য পাঠকের অজ্ঞাত-সারে তদীয় হৃদয়ের উপর একটা গুরুতর কার্য্য করিয়া যায়। পাঠকের অন্তঃকরণে চিরদিনের মত একটা সংস্কার রাখিয়া যায়। কবির যে প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য—পাঠক-হৃদয়ের উৎকর্ষ-বিধান, শুদ্ধি-বিধান, আর জগতের শিক্ষা-দান। কবি প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠী সৃষ্টি করেন। পরে, ঐ প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে পাঠকের হৃদয়ও স্নন্দর করিয়া তুলেন। ফুলের বর্ণ স্নন্দর, দেখিলেই নয়নের তৃপ্তি জন্মে, ঐ ফুলে যদি আবার সৌরভ থাকে, তবে উহাতে মনও পরিতৃপ্ত হয়। কাব্যের বহিঃ-সৌন্দর্য্য নয়নরঞ্জন বটে, সেই কাব্যে যদি আবার অন্তঃ সৌন্দর্য্যও থাকে, তবে তাহা মনোরঞ্জনও হয়। নয়নের তৃপ্তি কণস্থায়িনী, মনের তৃপ্তি-চিরস্থায়িনী। যাহাতে প্রকৃতপক্ষে, হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মে, তাহা চিরদিন মনে থাকে। তবে—কোন-সময়ে, হয়ত জীবনে কি একটা সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে, তখন হৃদয়ের বড়ই পরিতৃপ্তি হইয়াছিল, তাই আজ এই স্মদীর্ঘকাল পরেও যেমন তাহার কথা মনে পড়ে, তজ্জপ কাব্য-বর্ণিত কোন সৌন্দর্য্যময় চরিত্র পাঠ করিতে করিতে, যদি যথার্থই হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মে, তবে তাহারও আধিপত্য চিরদিন হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ থাকে। চিরদিন তাহা মনে পড়ে। সেই জন্যই কবিগণ লোক-শিক্ষোপযোগী আদর্শগুলিকে সৌন্দর্য্য-রূপ হৃদয়-রঞ্জন কল্পকে আবৃত করিয়া জগতে শিক্ষার প্রচার করেন। ধীরতা এবং সত্যপ্রিয়তার ভ্রায় গুণ নাই। তুমি ধীর হও, সত্যপ্রিয় হও—এই সারকথা মহাভারতে ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের নৃসিংহে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারতের কবি, ঐ দুইটি চরিত্র চিত্রণ দ্বারা এই

সার কথা যে রূপ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন, শত শত বাগ্মী তারস্বরে সহস্র বৎসর যাবৎ বক্তৃতা করিয়াও তাঁহাদের শ্রোতৃবৃন্দকে সেইরূপ সুন্দর, সুপরিষ্কটভাবে বুঝাইতে পারিতেন না । রাজার শাসনে যে কাজ না হয়, কবির অষ্ট কোশলে তাহা হইতে পারে । আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা কর, স্বার্থপরতা অতি অপকৃষ্ট—এই কথা ধর্মোপদেষ্টা শত বৎসর পরিশ্রম দ্বারা বহুটুকু বুঝাইবেন, কবি, রাম-কর্তৃক সীতাকে নিরাসিত করাইয়া, এক কথায়, তাহার অনেক অধিক, অনেক সহজে বুঝাইয়া দিলেন । তাই মনে হয়, কবিগণ জগতের সর্বপ্রধান শিক্ষক ও সর্বপ্রধান উপকারক ! ‘রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—সর্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠ ।’ কবি উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দেন না বটে, কিন্তু এমন সর্বাক্ষুন্দর, সর্বলোকহৃদ্য, সুপবিত্র চরিত্র অষ্ট করেন যে, তাহার প্রতি সাধু, অসাধু সকলের হৃদয়ই আকৃষ্ট হয়, সকলেই বিভূষিত হইয়েন । সুন্দর শারদ-কৌমুদী যত ভোগ করিবে তত আরও ভোগের বাসনা জন্মিবে । সুনীল সরসী-বক্ষে সুন্দর শতদল যত দেখিবে, তত আরও দেখিতে আকাঙ্ক্ষা হইবে । সুন্দর পবিত্র মূর্তি যত অবলোকন করিবে, তোমার হৃদয়ে সেই মূর্তি-দর্শন-পিপাসা তত আরও অধিক জাগিয়া উঠিবে । ক্রমে তোমার হৃদয়ে সেই পবিত্র মূর্তি বিষয়ক অনুরাগ জন্মিবে, পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ জন্মিবে । এই ভাবে তোমার হৃদয়, আপনিই পবিত্র হইয়া উঠিবে । তাই বলিতেছিলাম, শত শত উপদেশে, শত শত শাসনে, শত শত অনুরোধে যে কার্য্য না হয়, কবির একটি মাত্র সর্বাক্ষুন্দর চরিত্র অষ্টিতে তাহা সাধিত হয় ।

কাব্যের এই সৌন্দর্য্য কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়ত নহে । কেবল রূপ, গুণ, বা কেবল কোন বিশেষ অবস্থার বর্ণনে সৌন্দর্য্য পরিষ্কট হয় না । দেশ, কাল, পাত্র, রূপ, গুণ, অবস্থা, কার্য্য প্রভৃতির সমষ্টি

যারা যদি কোন স্তম্ভের পদার্থ সৃষ্টি করা যায় তবে তাহার যে সৌন্দর্য্য তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য । তাহাই কবি-সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ । নতুবা অজ্ঞাত সমস্ত উপেক্ষা পূর্ব্বক, কেবল নায়িকার চিকুরবর্ণনাতেই যদি সর্গের অর্ধেক ব্যয়িত হয়, তবে তাহাতে সৌন্দর্য্য ফুটিবে কেন? পরন্তু তাহা বিরক্তিকরই হইবে ।)

সৃষ্টি-নৈপুণ্যই কবির প্রথম এবং প্রধান গুণ । সেই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কোন স্থানে ত্রুটি ঘটিলে, কাবোর যেমন অঙ্গহানি হয়, তদ্রূপ লোক-শিক্ষা এবং সমাজ-শিক্ষারূপ যে উচ্চ উদ্দেশ্যসাধন-বাসনায়, কবি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারও সিদ্ধি বিষয়ে বিষম ব্যাঘাত ঘটে । যাহারা দুই একটি বা দশ-বিশটি শ্লোক রচনা করিয়া কোন পদার্থের কেবল বহিঃ-সৌন্দর্য্যটুকু প্রদর্শন করেন, তাহাদের আসন অনকাংশে নিরাপদ । যাহারা বহিঃ-সৌন্দর্য্যের মধ্যে বর্ণনীয় পদার্থকে স্থাপিত করিয়া, ঐ বাহ্য-সৌন্দর্য্যের আলোকে উহাকে আলোকিত করেন, তাহাদের কার্য্যও তত দৃষ্কর নহে । কিন্তু যাহারা বহিঃ-সৌন্দর্য্যকে দূরে রাখিয়া, বর্ণনীয় বস্তুর কেবল অভ্যন্তর প্রদেশেই দৃষ্টি করেন,—বেশভূষার প্রতি উদাসীন থাকিয়া ভূষিত ব্যক্তির হৃদয়ের দিকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি করেন, যাহারা একটা সম্পূর্ণ বিরাট মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা সমাজ-শিক্ষা দিতে চাহেন—সেই সকল কবিগণের আসন বড়ই সমস্তাপূর্ণ । তাহাদিগকে প্রতিবর্ণে, প্রতিপদে সমাজের কথা ভাবিতে হয়, লোকহিতৈষণায় প্রণোদিত হইতে হয় । যাহা সমাজের অমঙ্গলকর, যাহার আলোচনায়, সমাজের কোন প্রকৃত হিত-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ বিষয় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয় । এই নিমিত্তই আমাদের আর্য্য-সাহিত্যে লেডি ম্যাক্বেথ বা ওথেলোর চিত্র নাই । ওরূপ চিত্র হৃদয় বিশেষের একান্ত উপযোগী বা অঙ্গুরূপ হইলেও উহা সমাজ-শিক্ষারূপ উদ্দেশ্যের ততটা সাধক নহে । এই জন্যই আমাদের সাহিত্যে প্রাচীনকাল হইতে নিয়ম আছে যে সমাজের হিতজনক

চরিত্র নিৰ্মাণ করিতে হইবে । বাহাতে সব উত্তম, সব সৎ তাদৃশ বস্তু সৃষ্টি করিতে হইবে । সেই উত্তম, সাধু বস্তুর উত্তমত্ব ও সাধুত্ব সমধিক প্রকটিত করিবার জন্ত বতটুকু প্রয়োজন, কেবল তৎপরিমিত অল্পতম প্রতিনায়কের সৃষ্টি করিতে পারা যায় । নতুবা অল্পতমত্বের অল্পরোধে অল্পতম চরিত্র বর্ণন সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি-বিরুদ্ধ ।

মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য, অথবা সংস্কৃত ভাষার সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রঘুবংশের বর্ণে বর্ণে এই সত্য বিদ্যমান । লোক-শিক্ষার উপযোগী বিষয়ে রঘুবংশের আদ্যস্ত পরিপূর্ণ । দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, গুরুর বাক্যে অটল বিশ্বাস, মাতৃ-রূপিনী পরশ্বিনী ধেমুর পরিচর্যা, ভিক্ষার্থী অতিথির অভিলাষ পূরণের জন্ত ধরণী-পতির ব্যাকুলতা, লোক-রঞ্জনের জন্ত, রাজ-সিংহাসন নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্ত, নৃপতির স্বহস্তে একপ্রকার হৃৎপিণ্ড উচ্ছেদ প্রভৃতি আত্মত্যাগের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, লোক-হিতকর এবং সমাজ শিক্ষোপযোগী বহুতর বিষয়ে রঘুবংশ অলঙ্কৃত ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

দিলীপ ।

স-সাগরা পৃথিবীর অধিপতি দিলীপ, নিজের অগুত্রকস্বরূপ হুর্দৈব
খণ্ডনের জন্ত, কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে মহিষীর সহিত উপস্থিত ।
মহিষী যে কেবল সূর্য্যবংশীয় নরপতির ভার্য্যা বলিয়া সম্মানিতা তাহা
নহে, তিনি মগধেশ্বরের কন্যা, পিতৃকুল-পতিকুল উভয়কূলের আভিজাত্যে
গৌরবান্বিতা । মহারাজ দিলীপ এতাদৃশী রাজমহিষীর সমভিব্যাহারে,
অযোধ্যার সুখময় রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, গুরুদেবের
তপোবনে উপনীত হইলেন । কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভেই
এই বিরাট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । দ্বোনের ছায়, অনাথের ছায়,
নরনাথ অসুখ্যম্পত্তা কুল-লক্ষ্মীর সহিত তপোবনে গেলেন । তাঁহার
রাজসংসারে কোন যানেরই অভাব ছিল না । তিনি অবাধে, যানপ্রেরণ
পূর্ব্বক, মহর্ষি বশিষ্ঠকে অযোধ্যায় আনয়ন করিতে পারিতেন । ইহাতে
সম্মানের কোনই হানি হইত না, রাজার রাজোচিত বিনয়ও অবাহত
থাকিত । কিন্তু রাজা দিলীপ বিনয়ের নিকট সম্পদের বলিদান করিলেন !
বিনয়ের কোনও নিয়ম নাই, বিনয় কোনও প্রকার অহুশাসনে
অহুশাসিত নহে । উহার যত সেবা করিবে, উহা ততই সুন্দর ও
মনোহর হইবে । ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পর্ণকুটীরে, ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ-
বাসী ক্ষিত্যয় মহিষীর সহিত দ্বীনের ছায় উপনীত হইয়া, জগতে
বিনয়ের এক নূতন মুষ্টি প্রদর্শন করিলেন । এ দিকে, যাহা কুটীরে
আজ মহারাজ চক্রবর্তী সম্রাট উপস্থিত, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের ব্যবহারও
বশিষ্ঠেরই অমুরূপ । দিলীপের ছায় উদার-হৃদয় নরপতির গুরু-
দেবের ব্যবহার যাদৃশ হওয়া উচিত, ঠিক তদ্রূপ । রাজা আসিয়াছেন
তিনি, আশ্রম-বাসী অপরাধ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ অশ্রয় হইয়া রাজ-

দম্পতির অভ্যর্থনা করিলেন । রাজা কিন্তু মুনিগণের নিকটে আসেন নাই, তাঁহার আগমন বশিষ্ঠের সন্নিধানে । বশিষ্ঠ এখন সন্ধ্যা-বন্দনাদি-
 নিরত ।* সুতরাং নরপতিকে কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিতে হইল । তুমি
 কোশল-সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর সত্য, কিন্তু বিষয়-নির্লিপ্ত বশিষ্ঠের
 আশ্রমে তুমি একজন অতিথি বই অত্র কিছুই নও । ঋষি বশিষ্ঠ ‘সর্বত্র
 সম-দর্শন’ । সুতরাং নৃপতিকে অপেক্ষা করিতে হইল । ক্রমে তাঁহাদের
 আলাপ হইল । নিত্য-ক্রিয়ার অবসানে দেবী অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট,
 সাক্ষাৎ অগ্নির দ্বারা তাপস-তেজে প্রদীপ্ত, বশিষ্ঠের চরণে রাজ-দম্পতি
 প্রণাম করিলেন । তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, নৃপশ্রেষ্ঠ দিলীপকে রাজ্যের
 কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । আর দশজনকেও ঋষি এই ভাবে কুশল
 জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন । অযোধ্যাপতি বলিয়া কিছুই অতিরিক্ত করিলেন
 না । রাজা অঞ্জলি-বদ্ধ-করে কত স্তব-জুতি করিয়া, পরে কহিলেন,—
 ‘দেব, আপনার অনুগ্রহে আমরা সর্বত্রই মঙ্গল,—কিন্তু আপনার

‘কিন্তু বধ্বাং তবৈতস্তাং অদৃষ্ট-সদৃশ-প্রজম্ ।

ন মামবতি সধীপা রত্ন-সূরপি মেদিনী’ ॥’

এই বধ্বা অর্থে, আমার বংশের অমররূপ পুত্রবৃদ্ধের অদর্শনে, রত্ন-প্রসবিনী
 পৃথিবীও আমার বিড়ম্বনাময় মনে হয় । আমি জানি, ‘তপোদান-
 সমুদ্ভব’ পুণ্য কেবল ‘লোকান্তরে’ সুখকর, কিন্তু দেব, সৎসংশয় সন্তান,
 ইহলোক পরলোক—উভয় লোকেরই আনন্দের নিদান । আপনি
 ইহার যে হয় একটা প্রতিকার করুন ।’

কুমার-সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে, তারকাসুর কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া, দেবগণ
 যখন প্রতিকার-বাসনার পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্বক, তারকের
 অগ্ন্যাচার-কাহিনী বর্ণন করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদের সাহসনার

জন্ত কত কথা, কত সমবেদনার আলাপ করিয়াছিলেন। আর আজ ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠের নিকট, বশিষ্ঠের শিষ্য, পুত্রাধিক প্রিয়তর, রাজাধিরাজ দিলীপ পুত্র-বিরহে কত দুঃখ-প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ অটল। কোন কথাই কহিলেন না। নীরবে সব শুনিলেন মাত্র। পিতামহ ব্রহ্মা আজ তাঁহার মানসপুত্রের দৈবর্ঘ্যে দৈবর্ঘ্যে পরাজিত হইলেন। কালিদাস যখন কুমার-সম্ভবের কবি, তখন তাঁহার অবাধ কল্পনার গতি অতি প্রথর; আর তিনি যখন রঘুবংশের কবি, তখন তাঁহার সে গতি অনেকটা সংযত। তাই রঘুর বশিষ্ঠ কুমারের ব্রহ্মার ছাত্র হইলেন নাই।

দিলীপের বাক্যাবসানে, মহর্ষি 'ধ্যান-স্তিমিত-লোচন' হইয়া অপুত্র-কতার কারণ বুঝিতে পারিলেন। দিলীপকে বলিলেন, 'মহারাজ! তুমি একদিন স্বর্গের ইন্ড্রের নিকট হইতে যখন মর্ত্তের দিকে আসিতেছিলে, তখন তোমার পথি-মধ্যে কল্প-তরু-চ্ছায়ায় কামধেনু সুরভি শয়ান ছিলেন। তুমি স্বীয় রাজধানী-গমনে ঐশ্বর্য্য নিবন্ধন, পূজার্ত্ত সুরভিকে পূজা না করিয়াই বাগ্র-হৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে। কামধেনু তোমার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, তুমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিলে, তেমন, আমার সন্তানের আরাধনা না করিলে তোমার সন্তান জন্মিবে না। রাজন্! সেই কারণে তোমার পুত্র-মুখ-সন্দর্শন প্রতীত হইয়াছে। পূজনীয়ের পূজা, মানীর সম্মান না করিলে অকল্যাণ ঘটে। সেই কামধেনু সুরভি এখন দীর্ঘকালের জন্ত পাতাল-বাসিনী। তাঁহার কল্পা নন্দিনীর তোমরা সত্বীক আরাধনা কর। নন্দিনীর যদি পরিতোষ জন্মে, তবে তোমাদেরও অভিলাষ পূর্ণ হইবে।' বশিষ্ঠের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই সুরভি-তনয়া নন্দিনী অকস্মাৎ বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অতর্কিতোপনতা সেই নন্দিনীকে দেখিয়া মহর্ষি আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন, 'রাজন্!

তোমার অদৃষ্টে প্রসন্ন জানিবে, কল্যাণী নন্দিনী, নামমাত্রেই এই উপস্থিত । তুমি যাও, 'বস্ত্র-বৃষ্টি' গ্রহণ-পূর্বক এই মেঘের অম্লগমন করিয়া, সর্কাস্তঃ-করণে, ইহার সেবা কর গিয়া । আর বধু সুদক্ষিণা 'ভক্তিমতী' হইয়া প্রত্যহ ধেন ইহার সেবা করেন । বতদিন নন্দিনী প্রসন্ন না হইলেন, ততদিন এই ভাবে, ইহার 'পরিচর্যা' করিও । আশীর্বাদ করি, তোমার পিতা যেমন তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও তজ্জপ উপযুক্ত পুত্রের পিতা হও ।' এই বলিয়াই বশিষ্ঠ বিরত হইলেন । আসমুদ্র কিতী-শ্বরের উপর গোচারণের ভার অর্পিত হইল ! নরনাথ অবনতমস্তকে গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, পুজোর পূজা-বাধ করিয়াছি, ঘোর অপকর্ম্ম করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক । ক্রমে নিশা সমাগত হইল । মহর্ষি তপোবলে, রাজোচিত শয্যা, রাজোচিত আহারাদির বাবস্থা অবাধে করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না । পর্ণকুটীরে পর্ণ-শয্যা রচিত হইল । ফল-মুলাশন-পূর্বক রাজ-দম্পতি সেই পর্ণ-শয়নে রজনী-যাপন করিলেন । রঘুর প্রথম সর্গ এইভাবে শেষ হইল ।

স্বর্ঘ্যবংশের প্রবল-প্রতাপ নৃপতি গুরুদেবের কথায়, স্তম্ভসম্পদ—সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া, সপত্নীক সাধারণ গোপালকের বৃষ্টি গ্রহণ করিলেন । গুরুদেবের প্রতি, পুজোর প্রতি, কর্তব্যের প্রতি, ক্রিতিপতির যে কীদৃশী আস্থা, তাহার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল । পৃথিবীর আদি নরপতি বৈবস্বত মনুর বংশধর দিলীপ গুরুর প্রতি, তথা গুরুতর কর্তব্যের প্রতি, যে অমুরাগ-প্রদর্শন করিলেন, তাহার অমুরাগ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল । আর কবির কবি কালিদাস, এই বশিষ্ঠ-দিলীপ-বৃহাস্তে জগতে যে শিকার প্রচার করিলেন, শত শত উপদেশক, শত বংশের উপদেশ দিয়াও, তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারেন না । কবি বিনয়ের তথা কর্তব্য-নিষ্ঠার একটি উৎকৃষ্ট মূর্তি খোদিত করিলেন ।

সৌর-নৃপতি-গণের রাজ-ধানী অযোধ্যা হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম 'বহুদূরে অবস্থিত । দিলীপ-সুদক্ষিণা এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তপোবনে গিয়াছেন, উভয়েই ক্লান্ত ; কিন্তু কৰ্ত্তব্যের নিকটে ক্লান্তি অক্লান্তি নাই, গুরুজনের আজ্ঞায় সুখাসুখ-বিচার নাই । কোনমতে, রাজিটুকু অতিবাহিত করিয়াই সেই দম্পতি নন্দিনীর সেবায় নিরত হইলেন । রাজ্ঞী সুদক্ষিণা নিজহস্তে কুসুম-দাম রচনা করিয়া খেতুর গলায় পরাইয়া দিলেন । রাজা খেতুর সহিত বনে যাত্রা করিলেন । দিলীপ কত প্রকারেই না নন্দিনীর সেবা করেন । কখন বন-চারিণী নন্দিনীর মুখের নিকটে স্মৃষ্টি তৃণকবল তুলিয়া ধরেন, কখন গাজ-কণ্ডুয়ন করিয়া দেন, কখন মশকাদি নিবারণ করেন । নন্দিনী যখন যেখানে যান, সম্রাটও তখনই তাঁহার অনুবর্তন করেন । এইভাবে দিলীপের দিন কাটিতে লাগিল । তাঁহার যেন একটা পৃথগস্তিভূমি রহিল না । তিনি যেন সেই খেতুর ছায়া-ময় হইয়া গেলেন । কাল যিনি, সাগরাম্বরা ধরণীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন, ছত্র-চামরাদিরূপ রাজ-সম্পদে ঐহার সিংহাসন অলঙ্কৃত ছিল, আজ তিনি, সেই মহারাজ চক্রবর্তী, 'লতা-প্রতান'-দ্বারা কেশ-সংযমনপূর্বক, ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া 'মুনিহোম-খেতুর' পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেছেন । পূর্বে যিনি রাজপথে বহির্গত হইলে পৌর-কন্ডাগণ 'আচার-লাজ' বিকীর্ণ করিয়া রাজ্যার মঙ্গলাঙ্ঘ্বান করিতেন, আজ বনচারী সেই নর-নাথের মস্তকে, বাল-লতিকা-শ্রেণি, মন্দ মন্দ মরুদানোলিত হইয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি কুসুম-রাশি বর্ষণ করিতেছে । পূর্বে ঐহার চতুর্দিকে অগণিত বন্দিবন্দ নিরত স্তুতি-পাঠ করিত, আজ নির্জন-বন-বিহারী নিরন্তর সেই পৃথিবীপতি একাকী খেতুর সহিত বনে বনে পর্য্যটন করিতেছেন, আর তরুণিরে উন্নয়ন শকুন্ত-নিচয় কলকণ্ঠে কুজন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে । মাক্ত-পূর্ণ কীচক-রক্ত মধুর বংশি-স্বরে কানন-ভূমি ঝঙ্কারিত করিয়াছে । নরপতি আজ বিনয়ের যে পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিলেন,

কর্তব্য-নিষ্ঠার ঘে চূড়ান্ত উদাহরণ দিলেন, তদর্শনে প্রীত হইয়াই বুঝি বনদেবতার। ষংশি-স্বর-সংযোগে যশস্বী নৃপতির যশোগান করিতেছেন ।, গিরি-নির্ব্বারের শীকর-বাহী, বন-কুসুম-গন্ধি মৃদল সমীরণ, নিশ্ছত্র, ‘আতপ-ক্লান্ত,’ পবিত্রাচার নরপতির শ্রান্তি-নাশ করিতেছে । রাজ-ভোগ-বঞ্চিত রাজা এইরূপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে, স্নেহের রাজ-সম্পদ বিস্মৃত হইয়া নন্দিনীর সেবা করিতে লাগিলেন ।

সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর সায়ংকালে শরীর যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন নরনাথ, বনস্থলীর সেই অল্পপম সাক্ষ্য-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া দেহের শ্রান্তি-বিনোদন করেন । সন্ধ্যাগমে, বরাহগণ দলে দলে কর্দমান্ত-দেহে জলাশয় হইতে উঠিতেছে ; বিহঙ্গম-গণ মধুর স্বর-লহরীতে দিম্বাঙল মুখরিত করিয়া ‘আবাস-বৃক্ষের’ দিকে ধাবিত হইয়াছে ; মৃগ-রাজি, সুনীল দুর্বা-চ্ছাদিত ভূমিতে স্নেহে শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছে । প্রকৃতির এই স্নন্দর সজ্জিত উদ্যানে সন্ধ্যা-দেবী ধীর-পদ-সঞ্চারে অবতরণ করিতেছেন । সমগ্র বনভূমি একবারে ‘শ্রামায়মান’ হইয়া গিয়াছে ।—নরপতি অনিমেঘ নেত্রে বনস্থলীর এই সাক্ষ্যশোভা অবলোকন করিতে করিতে দিবসের সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়া যান ।

প্রভাতে, যখন নন্দিনী বন-চারণে বহির্গত হয়েন, তখন আশ্রমে, তাঁহার বৎসকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, সমস্ত দিন সে দুগ্ধ-পান করে নাই, দুগ্ধ-ভারে নন্দিনীর আপীন দুর্দ্বহ হইয়া পড়িয়াছে । একে ত নন্দিনী নিজে স্থলাঙ্গী, তাহার উপর আবার দুগ্ধপূর্ণ আপীনের দুর্দ্বহ ভার, তিনি অতি প্রয়াসের সহিত, ছলিতে ছলিতে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, আর স্থলকার নরপতিও দিবাত্রমে ক্লান্ত হইয়া, শরীর-ভার-বহনে যেন অসমর্থতা-প্রযুক্তই ছলিতে ছলিতে, নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে-ছেন, তাঁহাদের উভয়ের এই দোলায়িত গতি দ্বারা তপোবন-পথের এক অভিনব, স্নন্দর শোভা জন্মিয়াছে ।

সেই কখন—প্রভাত্রে, মহারাজ দিলীপ গোচারণে নির্গত হইয়াছেন, এখন সন্ধ্যা, তিনি এখনও ফিরিলেন না, তাই পতিত্ৰতা সূদক্ষিণা আকুল-নয়নে বন-পথের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দূরে, নন্দিনী ও রাজা দেখা দিলেন । সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও নরনাথকে দেখিতে পান নাই, তাই রাজ-মহিষী অনিমেষ-নয়নে, প্রাণ ভরিয়া, তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ।

নন্দিনী আশ্রমে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই রাজী সূদক্ষিণা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন । ক্রমে, রাজা ও রাজী সায়ংকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া, গুরু-গুরু-পত্নীর পাদ-বন্দনা করিলেন । দীপ জালিয়া রাত্রিতেও তাঁহার কত প্রকারে নন্দিনীর সেবা করেন । পরে নন্দিনী যখন নিদ্রিতা হইলেন, তখন তাঁহারও একটু নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করেন : আবার প্রভাত্রে, নন্দিনীর জাগরণের পূর্বেই, তাঁহার দিবসের সেবার জন্য বন্ধ-পরিকর হইলেন । এই ভাবে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল ।

এক দিন নন্দিনী ঘুরিতে ঘুরিতে হিমালয়ের এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । হিমাদ্রির সে স্থানটি অতিশয় মনোরম । তথায় শিখর হইতে পতিত কলনাদিনী গঙ্গার প্রবাহ-ধারায় সমস্ত দেবদারু বন নিয়ত সিক্ত । সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর । মুনির হোমধেনু, তিনি ত দেবতা, তাঁহার আবার বিপদ কি ?—এই ভাবিয়া ক্ষিতীশ্বর ক্ষণকালের জন্য হিমালয়ের সেই অনির্বাচ্য সৌন্দর্য্য দর্শন-বাসনায় যেমন সেই দিকে নয়ন প্রহিত করিয়াছেন, অমনি হঠাৎ কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর সিংহ আসিয়া নন্দিনীকে আক্রমণ করিল । নন্দিনী উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া উঠিলেন । তাঁহার সেই আক্রমণ-ধ্বনি গুহার গুহার প্রতিধ্বনিত হইয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে হইল । আত্মরক্ষার সখা দিলীপও সেই কাতরস্বরে চকিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধনুকে বাণ-সংযোগ করিয়া নন্দিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ।

তিনি দেখিলেন, সেই লোহিতাঙ্গী ধেমুর মাংসল দেহের উপর এক প্রকাণ্ড কেশরী বসিয়া আছে । তাহার ষ্বেত বর্ণ কেশর-কলাপ পার্শ্বতীয় বায়ুপ্রবাহে কম্পিত হইতেছে, দেখিলে মনে হয়, যেন পর্কতের কোন গৈরিক-ধাতু-রঞ্জিত অধিকায় একটি প্রকাণ্ড লোহদ্রুমে অসংখ্য লোহ-কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে, আর সেই ষ্বেতবর্ণ কুসুমরাশিতে সমস্ত বৃক্ষটিও যেন ষ্বেত হইয়া গিয়াছে । আশ্রিত-বৎসল দিলীপ তৎক্ষণাৎ সেই সিংহের বধ-সাধনে উদ্যত হইয়া পৃষ্ঠ-বদ্ধ তুণীর হইতে বাণ তুলিতে গেলেন, কিন্তু এ কি ?—তাঁহার হস্ত একেবারে অবশ হইয়া তুণীর-সংলগ্নই রহিল ! বাণ আর তোলা হইল না ! অপরাধী সিংহ পুরোভাগে গুরুদেবের হোম-ধেমুর প্রাণ-নাশোদ্যত, অথচ কোন প্রতিবিধানের উপায় নাই, রাজার বাহুদ্বয় একেবারে স্তম্ভিত ! তেজস্বী দিলীপ ‘মল্লোষধি-রুদ্ধ-বীৰ্য্য ভোগীর’ জ্ঞায়, আপন তেজে আপনিই দক্ষীভূত হইতে লাগিলেন । কোন প্রতিকার আর করিতে পারিলেন না । তখন পণ্ডরাজ সেই নরাধিরাজকে মানুষ্যের ভাষায় সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল ;—স্তম্ভিত নরপতি এবার বিস্মিত হইলেন ।

সিংহ বলিল ‘মহীপতে ! কেন বৃথা শ্রম ? তুমি আমার প্রতি যেরূপ অজ্ঞই প্রয়োগ কর না কেন, তাহা বার্থ হইবে । তোমার সমগ্র সামর্থ্য-প্রয়োগেও আমার কোন ক্ষতি হইবে না । আমি ‘অষ্টমূর্তির কিঙ্কর’, আমার নাম ‘কুস্তোদর’, কুন্তিবাস আমার পৃষ্ঠে পাদ-শ্রাস-পূর্বক বৃষভে আরোহণ করেন,—আমি তাঁহার এত অমুগ্ধের পাত্র । ঐ যে সমুখ্বে স্নিগ্ধ দেবদারু বৃক্ষ দেখিতেছ, রাজন্ ! ঐ বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত শূলভৃৎ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন । এই গুহা আমার বাসস্থান । মহাদেবের প্রসাদে, আহার্যের জন্ত আমাকে কোথাও বাইতে ন্দ্র না, আমার ধাদ্য আপনি আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হয় । নরেন্দ্র ! আজ আমি বড়ই ক্ষুধার্ত, পরমেশ্বরের বিধানেই, আমার শোণিত-পিপাসা

মিটাইবার নিমিত্ত, আজ এই খেতু লইয়া তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ । আমার খাদ্য আমি গ্রহণ করি, আর রাজন্ ! তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হও । গুরুদেবের চরণে তোমার যে কত তর্কিত, তাহা ত তুমি এই দীর্ঘ বনবাসেই প্রমাণ করিয়াছ, আর কেন ? আয়ুধ-ধারী বীরের আয়ুধ-প্রয়োগ-শৈথিল্য না হইলেই হইল, প্রযুক্ত আয়ুধ যদি কোন দৈবকারণে বিফল হয়, তবে তাহাতে বীরের বীরত্বের কোনই হানি ঘটে না, সুতরাং তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও ।’

বীরবর দিলীপের জীবনে এই প্রথম পরাভব । ইহার পূর্বে আর কখনও তিনি বাণ-প্রয়োগ ‘বিতথ-প্রবল’ হয়েন নাই । তিনি অবাধ হইয়া গেলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—‘মৃগেন্দ্র । এই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় পৃথিবীর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কর্তা সেই চন্দ্রশেখর আমার পরম পূজনীয়, তাঁহার শাসন সর্বথা অলঙ্ঘ্য । আবার এ দিকে, এই খেতু আমার গুরুদেবের প্রধান হোম-সাধন, সুতরাং ইনিও আমার উপেক্ষণীয় নহেন । যে ভাবেই হউক, এই খেতুকে আমার রক্ষা করিতেই হইবে । আরও দেখ, দিনমণি প্রায় অন্তগত, আশ্রমে নন্দিনীর সদ্যোজাত বৎস সমস্ত দিন স্তম্ভ-পান করিতে পায় নাই, সেও অতিশয় কাতর হইয়াছে । অতএব তুমি আমার এই দেহদ্বারা তোমার বুভুক্ষার নিবৃত্তি কর, সকল দিক রক্ষা হইবে । মহর্ষির ক্ষেত্রে পরিত্যাগ কর ।’ উদার নরপতির এই সমুদার বাক্য শ্রবণে, কেশরী মনে মনে বড়ই প্রসন্ন হইল । কিন্তু সে, ভাব-গোপন করিয়া বলিল, ‘রাজন্ ! তোমার কেন এ দুর্বুদ্ধি ? এই বিশাল ধরণীর তুমি একচ্ছত্র অধিপতি, তোমার এই নবীন বয়ঃক্রম এবং অনিন্দ্য কান্তি, ইহাদের প্রত্যেকটিই দুর্লভ । তুমি এক তুচ্ছ খেতুর জন্ত এই সমস্ত সম্পদ বিসর্জন করিতে যাচ্ছ—দেখিরা, আমার মনে হইতেছে, তোমার জ্ঞান কার্য্যকার্য্য-বিচার-শূন্য আর দ্বিতীয় নাই । তাবিয়া দেখ, সত্য সত্যই যদি তোমার

হৃদয়ে জীবের প্রতি অনুকম্পা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও, এই ধেনুকেই তোমার ত্যাগ করা উচিত; কেন না, তোমার প্রাণ বিনিময়ে মাত্র, ইহঁর প্রাণরক্ষা হইতে পারে বটে, কিন্তু হে প্রজানাত! তুমি যদি জীবিত থাকিতে পার, তবে, কত শত সহস্র প্রজাকে কত প্রকার বিয়-বিপদ হইতে পিতার হ্রায় রক্ষা করিতে পারিবে! তাই আবার বলি, ভাবিয়া দেখ, একটি ধেনুর জীবনের জন্ত, শত শত প্রজার জীবনের প্রতি উদাসীন থাকা কি তোমার হ্রায় প্রজা-রঞ্জন নরপতির উচিত? তুমি মর্ত্তের ইন্দ্র ভূলা, এই ইন্দ্র চিরজীবন ভোগ কর, ইহাই আমার বাসনা। তুমি আত্ম-জীবন-দানে ধেনুর জীবন-রক্ষার বাসনা পরিহার কর।' এই ভাবে, সিংহ কত প্রলোভন দেখাইল। সিংহের সেই জলদ-গম্ভীর-স্বরে, সমগ্র হিমালয় যেন কাঁপিয়া উঠিল। এ দিকে দিলীপ-সিংহের উক্তির উত্তর দিতে যাইবেন—এমন সময়ে, সিংহের প্রবল আক্রমণে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, পরস্বিনী নন্দিনী মুহমূর্ছা দিলীপকে কাতর-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ধেনুর সেই কাতর দৃষ্টিতে দয়াময় নৃপতির হৃদয় যেন আরও বিগলিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, 'মৃগেন্দ্র! বিপন্নের বিপজ্ঞাণ রাজার ধর্ম্ম, যে রাজা সেই সনাতন রাজ-ধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ, তাঁহার রাষ্ট্রোদ্ধার্য্যে বা নিন্দা-মলিন জীবনে প্রয়োজন কি? আমি এ বিপন্ন ধেনুকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার এই দেহ-রূপ মূল্য দ্বারা তোমার নিকট হইতে ইহার জীবন ক্রয় করিয়া লইতেছি, তাহা হইলে তোমারও পারণার ব্যাঘাত হইবে না, মুনির হোম-ধেনুরও জীবন রক্ষা হইবে। তুমি মৃগকূলের অধিপতি, তোমার উপর মহাদেব এই বৃক্ষরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন, তোমারও এই বৃক্ষের প্রতি কতই না যত্ন। আর আমি, আমার অবশ্য রক্ষণীয় আত্ম-দ্রাণাক্ষম এই ধেনুকে, তোমার নিকট নিধন করিয়া, বল দেখি, কোন্ মুখে, নিজে অক্ষত-দেহে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইব? মৃগেন্দ্র! যদি সত্য সত্যই তুমি আমার প্রতি

দয়াপরবশ হইয়া থাক, তবে আমার অবিনশ্বর যশঃ-শরীরের প্রতিই দয়ালু হও ; এই নশ্বর পার্থিব শরীরে আমাদের ত্রিল মাত্রও জ্ঞান নাই ।’ নন্দিনীর স্বকোপরি উপবেশনপূর্বক সিংহ দিলীপের এই অলৌকিক বাক্য-বিশ্বাস এক মনে শ্রবণ করিতেছিল, যখন দেখিল যে, দিলীপ ধৈর্য-তাগে কোন মতেই সম্মত নহেন, বরং নিজের প্রাণত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প, তখন সিংহ অগত্যা বলিল, ‘আচ্ছা, আমি ধৈর্য পরিবর্তে তোমাকেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলাম ।’ অমনি রাজরাজেশ্বর দিলীপও তৎক্ষণাৎ ধনুর্কাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, নিমেষমধ্যে তাঁহার ভূজবরে পূর্ব-সামর্থ্য ফিরিয়া আসিল । তিনি মাংস-পিণ্ডের মত নিজের দেহটি ক্ষুধার্ত সিংহের মুখের নিম্নে স্থাপন করিলেন । প্রতিক্ষণে ভাবিতে লাগিলেন, কৈ এখনও সিংহ আমার আক্রমণ করে না কেন ? এমন সময়ে আকাশ হইতে বিদ্যাদরগণ রাজার উপর অভিশপারে কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন ! ইহাৎ শব্দ হইল—‘উঠ বৎস !’ রাজা বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—সে সিংহ নাট, স্নেহময়ী জননীর ভ্রাতা, হৃদ্ধ-প্রস্রবিগ্না নন্দিনী মাত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান ! তখন নন্দিনী মানুষীর মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৎস, আমি মায়ায় সিংহরূপে তোমায় পরীক্ষা করিলাম । তোমার এই আত্মত্যাগে আমি বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি । তোমার কি অভিলাষ ? কি বর প্রার্থনা কর ? বল, আমি তাহা এখনই প্রদান করিতেছি ।’

মহাকবি কালিদাস, এই ভাবে পরার্থে আত্মোৎসর্গের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন । সে বংশের অলঙ্কার স্বয়ং রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী জানকী, যে বংশের উজ্জল রত্ন ভাতৃপ্রেমমত ভরত ও লক্ষণ,— সেই বংশের পূর্বপুরুষ দিলীপের আচরণ সর্বাংশে তদনুরূপই হইয়াছে ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

পুত্র-লাভ ।

নন্দিনীর নিকট হইতে আকাজিত পুত্র-লাভ-বিষয়ক বর-প্রাপ্ত হইয়া, গুরু আদেশে, তাঁহারই আশীর্বাদ মন্তকে লইয়া, দিলীপ-সুদক্ষিণা অষোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । এতদিন বনে বনে নিয়ত পরিশ্রমে রাজার শরীর ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনি যখন সেই ক্ষীণ-দেহে রাজধানীতে পুনরাগমন করিলেন, তখন—

তমাহিতৌৎসুক্যমদর্শনেন

প্রজাঃ প্রজার্থ-ত্রত-কর্ষিতাঙ্গম্ ।

নৈত্রৈঃ পপুস্তৃপ্তিমনাগ্নুবন্তিঃ

নবোদয়ং নাথমিবৌষধীনাম্ ॥

কৃষ্ণ পক্ষের পর, যখন আকাশে ওষধিপতি পুনরুদ্ভিত হয়েন, তখন তিমির-ক্লিষ্ট প্রজা-গণ যে ভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, আজ প্রকৃতিপুঞ্জ ঠিক তেমনই ঔৎসুক্যপূর্ণ-হৃদয়ে এবং অতৃপ্ত-নয়নে, সন্তানের জন্ত ক্ষীণকায় নরনাথকে দেখিতে লাগিল । মহাকবি কালিদাস এই শ্লোকে, “অদর্শনেন, আহিতৌৎসুকাং এবং তৃপ্তিমনাগ্নুবন্তিঃ, পপুঃ”— এই কতিপয় পদের দ্বারা, রাজা ও প্রজার মধ্যে তখন যে কি ভাব ছিল, রাজাকে প্রজাগণ কিরূপ ভালবাসিত, কিরূপ চক্ষে দেখিত, তাহার একটি সমুচ্ছল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । এমন সুন্দর ভাব, দেব-হর্ষভ, রেহ ও ভক্তির এমন প্রোঞ্জল বর্ণনা অন্তত্বে অতি বিরল ।

ক্রমে রাণীর গর্ভ-সঞ্চার হইল । অন্তঃপুরে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না । রাণীর এই গর্ভাবস্থায় যে কতিপয় চিত্র আছে, তাহার

সৌন্দর্য্য অপরকে বুঝান যায় না । কালিদাসের ভাষা ব্যতীত অন্ত্র
সে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ অসম্ভব ।

যথাসময়ে কুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন । যে সন্তানের জন্ম রাজার সেই
গৌচারণ-বৃত্তি-গ্রহণ, বনে বনে ভ্রমণ, পরিশেষে সিংহের মুখে আত্ম-সমর্পণ,
সেই সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে । রাজা প্রহস্ট-হৃদয়ে সন্তানের মুখ
দেখিতে গেলেন । তিনি যাইয়া নির্নিমেষ-নয়নে নব-কুমারের মুখের দিকে
চাহিয়া রহিলেন । সে দৃশ্য, সে ভাব—অতি মধুর, অতি সুন্দর ।
সংস্কৃত-সাহিত্যে বুঝি তেমন ছবি আর এক খানিও নাই । তখন—

নিবাত-পদ্ম-স্তিমিতেন চক্ষুষা

নৃপশ্চ কাস্তং পিবতঃ স্তুতাননম্ ।

মহোদধেঃ পূর ইবেন্দু-দর্শনাৎ

গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি' ॥

রাজ-পুত্র দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন । এতদিন রাজার প্রতি
রানীর এবং রানীর প্রতি রাজার যে অখণ্ড প্রেম, হৃদয়ের যে হৃচ্ছেদ্য
বন্ধন ছিল, আজ এই পুত্র কর্তৃক তাহা বিভক্ত হইল ; কিন্তু সেই
হৃদয়াকর্ষক প্রেম দ্বিধা বিভক্ত হইয়াও ভ্রাসপ্রাপ্ত হইল না, প্রত্যুত
পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ বর্দ্ধিতই হইল । এত দিন রাজা ও রানী—পরস্পর
পরস্পরের হৃদয়াবলম্বন ছিলেন, এক্ষণে, নবকুমার তাঁহাদের উভয়েরই
হৃদয়াবলম্বন হইলেন । কিন্তু তবুও যেন, রাজদম্পতির পরস্পরের প্রতি
পরস্পরের প্রেম আরও উপচিতি হইল ।

যথাসময়ে কুমারের নাম-করণ হইল,—‘রঘু’ । সূর্য্যবংশের ভাবী
অধীশ্বরের ষাটশ শিক্ষা-দীক্ষা হওয়া উচিত, তাহার কিছুই ক্রটি হইল

না । শৈশব-সীমা অতিক্রম করিয়া রাজপুত্র ক্রমে যৌবনের সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন । ক্রমে—

মহোৎসবং বৎসতরঃ স্পৃশন্নিব,
 দ্বিপেন্দ্র-ভাবঃ কলভঃ শ্রয়ন্নিব,
 রঘুঃ ক্রমাদ্ যৌবন-ভিন্ন-শৈশবঃ,
 পুষ্পেণ গাণ্ডীর্থ্যমনোহরং বপুঃ ॥

বৎসতর দিনে দিনে যেমন বলশালী মহান্ বৃষভে পরিণত হয়, করি-
 শাবক দিনে দিনে যেমন বৃষপতি করীন্দ্রে পরিণত হয়, তদ্রূপ শিশু রঘুও
 দিনে দিনে বয়স্ হইলেন, তাঁহার স্বভাবসুন্দর ললিত কলেবর গাণ্ডীর্থ্যের
 সমাবেশে আরও মনোহরতর হইল । উপযুক্ত সময়ে তাঁহার ‘বিবাহ-দীক্ষা’
 নির্বাহিত হইল । যুবরাজ সুদৃঢ় প্রাণ্ড শরীরের দ্বারা, বপুস্মান্ দিলীপকেও
 যেন অতিক্রমণ করিলেন ।

স্বর্গের ইন্দ্র শতশ্রমেণ যাগ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম
 ‘শতক্রতু’ । মহারাজ দিলীপও প্রায় নিরনব্বুইটি অশ্রমেণ যজ্ঞ করিয়া-
 ছেন, আর একটি করিতে পারিলেই তিনিও ‘শতক্রতু’ আখ্যা প্রাপ্ত
 হইবেন, তাই দিলীপ, আর একটি অশ্রমেণ আরম্ভ-পূর্বক, তাহার তুরজ-
 রক্ষণে যুবরাজ রঘুকে নিযুক্ত করিলেন । ইন্দ্র দেখিলেন—প্রমাদ, তাঁহার
 অধিতীয় ‘শতক্রতু’ নামটি এতদিনে বৃদ্ধি বিলুপ্ত হয় । তাই তিনি,
 অকস্মাৎ সেই যুবরাজ রক্ষিত যজ্ঞাশ্বের অপহরণ করিলেন । ক্রমে ইন্দ্র ও
 রঘু—পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল । অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইল । পরিশেষে
 বিষম যুদ্ধ বাধিল । যুবরাজ রঘুর বীরত্ব-দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র পরম
 সন্তুষ্ট হইলেন । গুণের আদর করিয়া রঘুকে কোলে টানিয়া লইলেন ।
 তাঁহার কুশিরাক্ত দেহে করস্পর্শ করিতে লাগিলেন । পরে ইন্দ্র, দিলীপকে
 যজ্ঞ-ফল-যুক্ত করিতে প্রতিক্রান্ত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন । মহারাজ

দিলীপ যজ্ঞ-সমাধি-পূর্বক, সূক্ষ্মবরসে, কুলের চিরন্তন প্রাধিক্যসারে, যুব-রাজকে রাজচ্ছত্র অর্পণ করিয়া শাস্তিলাভের বাসনায় বনগমন করিলেন । মগধ-রাজনন্দিনী সাধবী সুদক্ষিণাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন ।

দিলীপ-চরিত্রে দেখিলাম,—আর্য্য-নরপতিগণের সিংহাসন বিলাসের সামগ্রী নহে । উহা রাজার কঠোর কৰ্ত্তব্যের কেন্দ্রস্বরূপ । রাজা প্রজার মঙ্গলের জন্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন । প্রজামণ্ডলীই তাঁহার অস্তিত্ব । তদতিরিক্ত অশ্রু অস্তিত্ব তাঁহার নাই । দেখিলাম আর্য্য-নরপতি—

প্রজানামেব ভূতার্থং স তাত্যো বলিমগ্রহীৎ ।

সহস্র-গুণমুৎসবকুঃ আদন্তে হি রসং রবিঃ ॥

দেখিলাম—

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘা-বিপর্য্যয়ঃ ।

গুণা গুণানুবন্ধিহাং তন্তু স-প্রসবা ইবং ॥

পরিশেষে যখন আরও দেখিলাম যে,—

প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি ।

স পিতা পিতরন্তাসাং কেবলং জন্ম-হেতবঃ* ॥

১—রঘু—১ম সর্গ, ১৮—প্রজাগণের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে কর-গ্রহণ করিতেন । দিবাকর, পৃথিবী হইতে যে পরিমাণে জল গ্রহণ করেন, তাহার সহস্র গুণ দান করিয়া থাকেন ।

২—রঘু—১ম, ২২—তাঁহার জ্ঞান ছিল, কিন্তু জ্ঞান-বিষয়ক গর্ভ ছিল না, সকলের সকল বৃত্তান্তই তিনি জানিতেন কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতেন না । প্রতীকারের যথেষ্ট সাধার্য্য ছিল, কিন্তু তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন । তিনি ত্যাগী ছিলেন, অথচ তিনি কদাচ নিজকৃত দানের কীর্ত্তন করিতেন না । তাঁহার গুণরাশি, পরস্পর অবিকল্পভাবে, তাঁহার হৃদয়ে বাস করিত ।

৩—রঘু—১ম, ২৪—প্রজাবৃন্দে, শিলা, রক্ষা, ভরণ, পোষণ—এ সমস্তই তিনি করিতেন । প্রকৃত পক্ষে, তিনিই—প্রজাদিগের পিতা ছিলেন । তাহাদের জন্মদাতা পিতা কেবল নামভঃ পিতা ।

তখন বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। কবির চরিত্র-সৃষ্টি-দর্শনে স্তম্ভিত হইলাম। বিধাতার সৃষ্টি এই কবি-সৃষ্টির নিকট অকিঞ্চিৎকরী।

একবার যৌবনে, দিলীপ, ইচ্ছামা-এই রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ-পূর্বক, গুরুর আদেশে ধেনু-পালকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার বৃদ্ধবয়সে, যেমন দেখিলেন যে, জীবনের সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, অমনি রাজ-সিংহাসন ছাড়িয়া বনে যাত্রা করিলেন। আত্ম-ত্যাগের উজ্জল নিদর্শন দেখাইলেন। যাহার হৃদয়ে ত্যাগশক্তি বলবতী, যাহার অন্তঃকরণ আসক্তি-শূন্য, তিনি কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে, সর্বদাই সমান। কাল-ধর্ম্মে তাঁহার ক মুগ্ধ বা বিচলিত করিতে পারে না। জগৎ তাঁহার অধীন, তিনি জগতের অধীন নহেন।

স্বভাবের নয়ন-রঞ্জন সৌন্দর্য্যের মধ্যেও যেমন প্রতি পলে জগদীশ্বরের মহিমা অনুভূত হয় ; বনের প্রতি পত্র পুষ্প পল্লবে, তটিনীর কুল-কুল ধ্বনিতে, বিহঙ্গমের কল-মধুর-স্বর-লহরীতেও যেমন বিশ্বেশ্বরের অপার করুণার, অনন্ত শক্তির উপলব্ধি হয় ; তদ্রূপ কালিদাসের এই সুন্দর চরিত্র-সৃষ্টি-সমূহের মধ্যেও একটা অতুল মহিমা, অনুপম শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহার চিত্রাবলীর বহিঃ-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে, তন্মধ্যে কবির ভুবনহিতৈষণা দেখিতে পাওয়া যায়। কবি সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া পাঠককে একটা পবিত্র পদার্থ—অনুকরণযোগ্য চরিত্র দেখাইয়া দেন। পাঠকের সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হৃদয়ে, সে চরিত্রের প্রভাব, পাব্য-গত রেখার দ্বায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

রঘু ।

মহারাজ দিলীপ চলিয়া গিয়াছেন । নবীন নরপতি রঘু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত । প্রজামণ্ডলী প্রথমে দিলীপের বিচ্ছেদে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল । কিন্তু ক্রমে,

মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ ।

ফলেন সহকারস্ত পুষ্পোদগম ইব প্রজাঃ ১ ॥

প্রজাগণ নব ভূপতি রঘুর দিকে চাহিয়া দিলীপের কথা ভুলিতে বসিল । এই স্থলে, একটি উপমা, একটি নিয়তদৃষ্ট-পদার্থের নূতন সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন-দ্বারা কালিদাস, নরপতি রঘুর সমগ্র চরিত্রটি বুঝাইয়া দিলেন । অল্প কেহ হইলে হয়ত, রঘুর উৎকর্ষ-বর্ণনের নিমিত্ত একটা পৃথক্ সর্গই লিখিয়া ফেলিতেন । এই জগুই বলিয়াছি, কালিদাস ‘কালিদাস’ ।

রঘুর রাজত্ব সকলেই উল্লসিত, সমস্তই সমধিক-ফল-সম্পন্ন । রাজ্যের কোথাও কোন প্রকার অভাব অভিযোগ নাই । বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই সুখের সমীর-হিলোল প্রবাহিত । ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত । সমগ্র রাজ্য আনন্দ ও শান্তির আবেশময় অঞ্চলে সুবৃন্ত । রঘুর ব্যবহারে, রঘুর ভ্রাতৃ-বিচারে, রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সন্তুষ্ট । তাঁহার এমনই সুবশ বে,—কুবক-ললনাগণ যখন শস্ত্র-রক্ষার জন্ত ক্ষেত্রে গমন করে, তখন তাহার দলে দলে, ‘ইক্ষুচ্ছায়ার’ নিবন হইয়া, মধুর ‘গীতকুম’ গুণাবলী তারস্থরে, গান করে ২ । এমনই প্রজাপতির সময়ে রাজ্যের

১—রঘু-৪র্থ—২—আমের মুকুল বড়ই সুন্দর, বড়ই মনোহর, সত্য, কিন্তু যখন সেই মুকুলে আবার আন হয়, তখন, তাহার গুণ-পরিমায় লোকে মুকুলের কথা যেমন কতকটা ভুলিয়া যায়, তদ্রূপ, রঘুর ব্যবহারে, শিষ্টভায়, লোকে ক্রমে দিলীপের কথা ভুলিয়া গেল ।

২—রঘু, ৪—২০ ।

সময়ে, রাজ্যের শক্তির সময়ে, রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন । তাঁহার সে দিগ্বিজয়ের অর্থ পররাজ্য লুণ্ঠন বা পররাজ্য গ্রাস নহে, সে দিগ্বিজয়ের অর্থ,—যিনি প্রতিকূল, তাঁহাকে অহুকূল করিয়া, তাঁহার রাজ্য তাঁহাকেই পুনরর্পণ ।, রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, নানাদেশ, নানা রাজ্য বিজয় করিয়া, শত্রু-দুপতিদিগকে সামন্ত-শ্রেণিভুক্ত করিয়া, ‘কুল-রাজধানী’ অযোধ্যার প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ।

এই দিগ্বিজয়-ব্যাপার-বর্ণনে কালিদাস যে অমাহু্যিক সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয় । কোথায় সেই প্রাচী-দিকের প্রান্তবর্ত্তি রাজ্য ! কোথায় সেই ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ !—তখন বাষ্পীয় জল-যান বা বাষ্পীয় শকট ছিল না, তাড়িত-বার্তাবহ ছিল না, অ-তার-তাড়িত-বার্তাবহের আবিষ্কারও হয় নাই, সেই সময়ে কালিদাস, ভার-তের প্রাচী দিক হইতে প্রতীচী পর্য্যন্ত যত প্রধান প্রধান রাজ্য ছিল, সে সমস্তেরই প্রত্যক্ষবৎ বর্ণন করিয়াছেন । তিনি, সুস্কদেশ ও গঙ্গা-প্রবাহ-বিধৌত বঙ্গদেশ প্রভৃতির এমন সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠক নিজের গৃহে উপবেশন-পূর্ব্বক, কালিদাসের কবিতাকুণী দিব্য ‘দূরবীক্ষণের’ সাহায্যে যেন কালিদাসের সম-সাময়িক তৎতৎ দেশ-সমূহের প্রতিকৃতি দর্শন করিতেছেন । তাঁহার শক্তিমতী কল্পনা কখন ছিন্নদাবলীর দ্বারা সেতু-নিৰ্ম্মাণ-পূর্ব্বক, গভীর ‘কপিশা’ পার হইয়া, উৎকল রাজ্যের মধ্যদিয়া ‘কলিঙ্গাভিমুখে’ চলিয়াছে ; কখন আবার ‘ফলবৎ-পুগ-মালিনী’ বেলা ভূমির উপর দিয়া, ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে ছুটিয়াছে । কখন তাঁহার কল্পনা-সুন্দরী, পথি-শ্রমে যেন একটু ক্লান্ত হইয়াই,—মলয় পর্ব্বতের যেন উপত্যকায় মারীচ-বনে মরীচ-লোলুপ হারীত-পক্ষি-গণ নিয়ত বিচরণ করে, সেই কমণীয় স্থানে মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিতেছে, কখন বা চন্দন-কাননে ভ্রমণ করিতেছে । আবার কখন দেখিতেছি, পশ্চিম-ঘাট-শ্রেণির পাদ-দেশ-বাহিনী ‘ভাঙ্গপর্ণী’ তটিনী, যে স্থানে সমুদ্রে সঙ্গত

হইয়াছে, তথায় বাইরা, তাঁহার উৎসুক করনা বালিকার জায় সমুদ্র-বেলা হইতে রাশি রাশি মুক্তা সঙ্কলন করিতেছে । কখন কেবল-কামিনী-বৃন্দে অলক-মালায় কুঙ্কম-চূর্ণের অভাব দেখিয়া, হৃৎশিত-হৃদয়ে, তপায় সেনা-পদ-সমুখিত লোহিতাভ পার্শ্ব-রজঃ ছড়াইয়া দিতেছে । কখনও কেবল-দেশ-বাহিনী মুরলা-তাটিনীর সুশীতল-সমীরণাখিত কেতকী-পরাগে, তাঁহার কল্পনা-সুন্দরী রঘুর সেনাগণের গাত্র মার্জনা করিতেছে । তাঁহার অনিন্দ্য-কল্পনা পারস্ত-দেশের যবনীগণের মদ-রক্ত মুখকমলের শোভা দেখিতে চায় না, ঘৃণায় প্রতিনিবৃত্ত হয় । এইভাবে, মহাকবি সমগ্র ভারতের,—না-না, শুধু ভারত নয়, ভারতের বহির্ভূত রাজ্য সমূহেরও এমনই সুন্দর, এমনই অল্পমাত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যে রাজ্যের বাহা বাহা প্রধান সামগ্রী, প্রধান দ্রষ্টব্য, প্রধান উল্লেখ-যোগ্য পদার্থ, তাহা তিনি এমন ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন যে, যখন রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ পাঠ করি, তখন একখানি বিশাল আলেখ্য-পটে যেন সমগ্র ভারতের প্রতীমূর্তিটি দেখিতে পাই । পাঠক ! যদি প্রাচীন ভারতের প্রকৃত মান-চিত্র দর্শন করিতে চান, যদি নিত্য-সুন্দরী ভারতভূমির প্রাচীন রাজ্য সমূহের লুপ্ত সৌন্দর্য্য কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে চান, আর যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব-মাধুরী উপভোগ করিতে চান, তবে একবার রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ পাঠ করুন । মহাকবি কালিদাসের ভারত-ব্যাপিনী কল্পনার প্রভাব দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হউন ।

ক্ষিতীশ্বর রঘু দিগ্বিজয়-প্রত্যাশিত হইয়া অযোধ্যায় ‘বিশ্বজিৎ যজ্ঞের’ অনুষ্ঠান করিলেন । এই মহাযজ্ঞের দক্ষিণা যথাসর্বস্ব । মহা সমারোহে বিশ্ব-বিজয়ী নরপতির বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পন্ন হইল । পৃথিবীর বিজিত নৃপতি-গণ, বিজয়ী সম্রাটের চরণে, উপহাররূপে, কত মণি-মুক্তা-হীরকাদি অর্পণ করিয়াছিলেন, সূর্য্য-বংশের প্রাচীন রাজকোষেও কত অনর্থ রত্ন-রাজি হইল, কত ধন—কত সম্পদ ছিল, এই যজ্ঞের দক্ষিণা-রূপে সে

সমস্তই উৎসৃষ্ট হইল। অত বড় রাজাধিরাজ চক্রবর্তীর গৃহে একটা কপর্দকও রহিল না। কল্পতরু রঘুর সকাশে কোন প্রার্থীই কোন বিঘ্নের বিফলাশ হইল না। তিনি ক্ষয়শীল সম্পদের বিনিময়ে, অক্ষয় পুণ্য অর্জন করিলেন। এই মহাযজ্ঞে মহারাজ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে, মহর্ষি বরতস্তুর এক কুতবিদ্যা শিষ্য গুরুদক্ষিণাসংগ্রহের জন্ত রঘুর সমীপে প্রার্থী-রূপে উপস্থিত হইলেন। পরম আতিথ্যের মহারাজ রঘুও ‘উপারু-বিদ্যা’ ‘বরতস্তু শিষ্যের’ যথাবিধি সংকার পূর্বক কুতাজলিপুটে বলিলেন,—

তবাহতো নাভিগমেন তৃপ্তং

মনো নিয়োগ-ক্রিয়য়োঃসুকং মে ।

অপ্যাজ্ঞয়া শাসিতুরাত্মনা বা

প্রাপ্তোহসি সম্ভাবয়িতুং বনান্ মাম্ ॥

‘হে পরম-পূজ্য! আপনি কৃপা-পূর্বক, আমার আশ্রয়ে যে পদার্পণ করিয়াছেন, মাত্র ইহাতেই আমি পরিতৃপ্ত নহি। আপনার কোন আদেশ পালনের জন্ত আমার হৃদয় একান্ত উৎসুক হইয়াছে। হয় আপনি স্বয়ং কোন আদেশ করিয়া, না হয় আপনার গুরুদেবের কোন আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া আমাকে কুতার্থ ও সম্মানিত করুন।’—এই বলিয়াই স-সাগরা পৃথিবীর অধিপতি, ‘সমাপ্ত-বিদ্যা’ ব্রাহ্মণ-যুবার নিকটে আত্ম-দীনতা প্রকাশ করিলেন। কি সুন্দর চিত্র! বিশ্ববিজয়ী, প্রবল-প্রতাপ, সূর্য্য-বংশাবতঃ পৃথিবীপতি, একজন দীন-হীন, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের আগমনে যে ব্যবহার করিলেন, যে প্রকার বিনয়-প্রদর্শন করিলেন, তাহা জগতের শিক্ষণীয়। এরূপ মহৎ চিত্র পাঠক আর কোথাও দেখিয়াছেন কি!

কালিদাস চিরদিন সরস্বতীর উপাসনা করিয়া গিয়াছেন । যাহারা সরস্বতীর সেবক, তাঁহাদের মর্যাদা-জ্ঞান তাঁহার বিশেষরূপ ছিল । তাই বিদ্বান্ বরতন্ত-শিষ্যের সন্মান করিবার জন্ত, তাঁহার শতমুখী কল্পনা যেন সহস্র-মুখী হইয়া উঠিয়াছে ।

যখন বরতন্ত-শিষ্য কোৎস রাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন, উৎকৃষ্ট-সৰ্বস্ব নরনাথ রঘু, যুগ্ম-পাত্রে অৰ্ঘ্যস্থাপনপূর্বক, কোৎসের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । পৃথিবী-পতির অক্ষয় ভাণ্ডারে এমন একটি ধাতব পাত্র পর্য্যাপ্ত ছিল না, যাহাতে, সমাগত অতিথির অভ্যর্থনার নিমিত্ত পাদ্যার্ঘ্য স্থাপন করেন । ঋষি-যুবক কৃত-বিদ্যা, ব্যবহারজ্ঞ । তিনি নৃপতির অৰ্ঘ্য-পাত্র-দর্শনেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার চতুর্দশকোটি স্তবর্ণ-মুক্তা-ভিঙ্কার স্থান এ নহে । আসিয়াছেন, নির্ঝাক-বদনে ফিরিয়া গেলে, রাজার অসন্মান করা হয়, এবং আত্মগোপন করিবারও কোন কারণ নাই ; সুতরাং স্বাধীন-হৃদয় নবীন কোৎস প্রত্যুত্তরে বলিলেন—‘রাজন্ ! আমাদের সৰ্ব্বাঙ্গীন কুশল জানিবেন । আপনি যাহাদের রক্ষাকর্তা, তাহাদের আবার অশুভের সম্ভাবনা কোথায় ? দিবাকর যখন প্রকাশমান, তখন কি অন্ধতমসের আবির্ভাব লোকে কল্পনাও করিতে পারে ? নরনাথ ! পূজ্যের প্রতি ভক্তিপ্রকাশ আপনার কুলের চিরাভ্যন্ত, আজ নূতন নহে ; কিন্তু আপনি অদ্যকার ভক্তি দ্বারা আপনার পূর্বপুরুষ দিগকেও অতিক্রমণ করিলেন । যদি বলেন যে, ‘তবে তুমি একটু বিমনা কেন ?’ রাজন্ ! খুলিয়াই বলি,—আমি অসময়ে আপনার নিকটে প্রার্থিক্রমে আসিয়াছি, ইহাই আমার বিষাদের একমাত্র কারণ । আপনি সৎকার্য্যে সৰ্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন, ইহাতে দুঃখিত হইবেন না, কেননা’—

শরীর-মাত্রেণ নরেন্দ্র । ভিষ্ঠন্

আভাসি তীৰ্ঘ-প্রতিপাদিতর্জিঃ ।

আরণ্যকোপান্ত-ফল-প্রসূতিঃ
 স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্ঠঃ^১ ॥
 স্থানে ভবানেক-নরাধিপঃ সন্
 অকিঞ্চনত্বং মথজং ব্যনক্তি ।
 পর্যায়-পীতস্ত স্মরৈ হিমাংশোঃ
 কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃক্ষেঃ^২ ॥
 তদন্ত্যস্তাবদনন্ত্য-কার্য্যঃ
 গুৰ্ব্বৰ্ধমাহৰ্ত্তুমহং যতিষ্যে ।
 স্বস্ত্যস্ত তে নিৰ্গলিতানুগৰ্ভং
 শরদ্বনং নার্দতি চাতকোহপি^৩ ॥

এই বলিয়া কোৎস গমনোদ্ভাত হইলে, নৃপতি, অতিশয় বিনয়-সহকারে, তাঁহার গমনে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বিদ্বন্! আপনার

১—রঘু, ৫—১৫—হে নরেন্দ্র । আপনি সংগাত্রে সৰ্ব্বত্র দান করিয়াছেন, এক্ষণে শরীরটা ব্যতীত, আপনার নিগ্নের বলিতে আর কিছুই নাই, তবুও, অরণ্যচর মুনিপণ বধন সমস্ত ফল আহরণ করিয়া লইয়া যান, তখন সেই ফলহীন নীবার-কাণ্ড কাণ্ডবাজ্রে পর্যাবসিত হইয়াও যে প্রকার শোভা পায়, আপনারাও আজ সেইরূপ শোভা জন্মিয়াছে ।

২—নরনাথ । আপনি অধিতীয় নৃপতি হইয়াও, আজ যজ্ঞে সৰ্ব্বশাস্ত্র হইরাছেন, ইহাতে আক্ষেপ অপেক্ষা আনন্দই অধিক । কুরুপক্ষে দেবগণ পর্যায়ক্রমে হিমাংশুর কলা পান করিয়া থাকেন, আমার মনে হয়, নশাবতের পক্ষে গুরুপক্ষীয় বুদ্ধি অপেক্ষা কুরুপক্ষীয় এই ‘কলাক্ষয়’ ‘শ্লাঘ্যতর’ ।

৩—রাজন্ । গুরুদেবের আজ্ঞা-পালন ব্যতীত আমার এখন আর অন্য কার্য্য নাই, স্তবরাগ আমি বাই । গুরুর আদিষ্ট অৰ্ঘ্যের আহরণে যত্ন করি দিয়া । আপনার বদল হউক । বহীপতে । চাতক জলদ-জল ব্যতিরিক্ত অন্য জল পান করে না সত্য, কিন্তু তবুও সে, জলশূন্য ‘শরদ্বনেন’ নিকটে কদাচ জল প্রার্থনা করে না । আমি অন্তঃস্থ বাই ।

অভিলষিত গুরুদক্ষিণার পরিমাণ কত ? , মহর্ষি-শিষ্য কহিলেন—‘রাজন্ ! চতুর্দশ কোটি স্ববর্ণমুদ্রামাত্র । নরেন্দ্র ! আপনার অর্ঘ্য-পাত্র-দর্শনেই বুঝিয়াছি যে, আপনি এখন নামতঃ রাজা, বস্তুতঃ আপনি নিঃস্ব, স্ত্রতরাং আপনাকে কোন উপরোধ করা বুধা । আমি বাই ।’ কোণসর এই নিরাশ-বচনে মর্মে মর্মে আহত হইয়া, দয়াদ্র-হৃদয়, ‘জগদেক-নাথ’ রঘু কাতরমনে ও স্থলিতকণ্ঠে কহিলেন—

গুরুবর্ধমণী শ্রুত-পার-দৃশ্য।

রঘোঃ সকাশাদনবাণ্য কামং ।

গতো বদান্ত্যন্তরমিত্যয়ং মে

মা ভূং পরীবাদ-নবাবতারঃ ॥

রাজর্ষি রঘুর এই উদার বাক্য পাঠ্য নাত্রৈশ শরীর কণ্টকিত হয় । দান-বীর রঘুর সহিসু হৃদয়ের যে সমুদায় মূর্ত্তি কালিদাস চিত্র করিয়াছেন, তাহার তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যে অতি দুর্বল ।

এক দিকে,—তেজস্বী ঋষিপুত্র, পৃথিবী-পতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অকুতোভয়ে ও সরল-প্রাণে বলিতেছেন—‘আমি বাই, নিঃস্ব আপনি, আপনার নিকটে কালক্ষেপে লাভ কি ?’—ঋষি-তনয়ের নবীন হৃদয় সংসারের ছল-কোশলে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, প্রকৃত ব্রাহ্মণের হৃদয় যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তদ্রূপ । ‘তুমি স-সাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইতে পার, কিন্তু তাহাতে আমার কি ? তোমার নিকটে আত্ম-গোপন করিব কেন ? আমি প্রাণ-পাত করিয়া বিদ্যার্জন করিয়াছি, এখন দক্ষিণা-

১—রঘু, ৫ম—২৪—হায় ! বেদ-বিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণ, গুরুর অস্ত্র অর্থ প্রার্থনা করিতে আসিয়া, আজ রঘুর নিকটে বিফলাগ হইয়া, অস্ত্র দাতার সমীপে যাইতেছেন,—এইরূপ ‘পরিবাদ’ আমার এই নূতন, আমার এ নিম্নার আর অবধি থাকিবে না । প্রার্থনা করি, এমন নিম্না বেন আমার কদাচ না হয় । ব্রাহ্মণ ! আপনি স্থির হউন ।

দানের প্রয়োজন, আমি নিঃস্ব, ভূমিধনবান্, আমি নিজের ভোগের জন্য প্রার্থী নহি। 'শুরুদক্ষিণার প্রার্থী। তোমার নিকট আসিয়াছি, দাও, ভীল, 'নচেৎ চলিয়া যাইব। ইহাতে কুষ্ঠার বিষয় কি? আত্মার্থেই কুষ্ঠা জন্মে, পরার্থে কুষ্ঠা কিসের?'—তাই ব্রাহ্মণযুবক অতি প্রাজ্ঞভাবে নিজের বক্তব্য জানাইলেন। জগৎপতির স্তুতি-বাদের নামও করিলেন না। তখন ভারতে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণাধর্ম জীবিত ছিল, তাই কালিদাসের রূপায় এ চিত্র আমরা দেখিলাম। দেখিয়া পূত হইলাম। অল্প দিকে,—
 হাসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর একটি ঋষি-তনয়ের আগমনে শশবাস্ত হইয়া, তাহার প্রীতি-সাধনে তৎ-পর। কি করিলে—তাহার সম্মান রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় আকুল। সমাগত ব্রাহ্মণ-তনয়ের সম্মুখে, মহারাজ ভূতোর স্থায় আজ্ঞা-পালনোন্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান। রাজা এবং মহারাজদিগের উপর বনবাসী, নিঃস্ব, চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব যে কতদূর ছিল, ইহা তাহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইলে, কিরূপ তেজস্বী, কিরূপ অকুতোভয় হওয়া আবশ্যক, তাহা, এবং প্রকৃত রাজা হইতে হইলে, কেবল ভূমি-পুঞ্জের নহে, প্রজাবৃন্দের হৃদয়ের রাজা হইতে হইলে, কিরূপ নম্র, কিরূপ নৃত্য-হৃদয় ও কীদৃশ নিঃস্বার্থ এবং কর্তব্য-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক, তাহা, এই কোৎস-রবু-বাণীতে কালিদাস অতি সুস্পষ্ট-রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

স্ব-প্রভাত ।

ইহার পরবর্ত্তী চিত্র আরও বিস্ময়-জনক । বীর-শ্রেষ্ঠ রঘু কুবেরকে জয় করিয়া অর্থাহরণের বাসনা করিলেন । কুবেরবিজয়ার্থ যাত্রা করিবেন । সমস্ত প্রস্তুত । এমন সময়ে, দৈবক্রমে, রঘুর কোষাগারে প্রচুর মণি-মাণিক্যাদির, অজস্র রত্ন-সুবর্ণ প্রভৃতির সমাগম হইল । ব্রাহ্মণ-যুবকের যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অনেক অধিক ধনাগম হইল । তখন, হর্ষোৎফুল্ল নরনাথ সেই সমস্ত অর্থ-রাশি কোৎসকে প্রদান করিতে উদ্যত । এদিকে, কোৎস গুরু-দক্ষিণার অতিরিক্ত এক কপর্দকও গ্রহণ করিতে পরাভুখ । অবোধার সমবেত জনমণ্ডলী কোৎস এবং রঘুর এই বিচিত্র আশ্চ-ভাগ-দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া অবাক হইয়া— চিত্রলিখিতের স্থায় দাঁড়াইয়া রহিল ।

ঋষিপুত্র গুরু-দক্ষিণা-গ্রহণ-পূর্বক, প্রস্থান-সময়ে, ‘আনতপূর্বকায়’ রঘুর শিরঃস্পর্শ করিয়া, আশীর্বাদচ্ছলে বলিলেন, রাজনু !—

আশান্তমগ্নং পুনরুজ্জ-ভূতম্

শ্রেয়াংসি সর্বগাণ্যধিজগ্মুষস্তে ।

পুত্রং লভস্বাত্ম-গুণানুরূপম্

ভবন্তুমীড়্যং ভবতঃ পিতেবং ।

১—রঘু. ৫৪—৩১ ।

২—রঘু. ৫৪—৩৪—হে নরনাথ ! অগতে বত প্রকার সম্পদ হইতে পারে, আপনি সে সকলেরই ভাজন হইয়াছেন, আপনার সৌভাগ্যের ইয়ত্তা নাই ; হৃতরাং বেক্স আশীর্বাদই করিলেন কেন, তাহা পুনরুজ্জ হইবে । অতএব এই আশীর্বাদ করি, যে, আপনার পিতা যেমন আপনাকে তদীয় আশ্রয়পাত্ররূপ পুত্ররূপে গ্রহণ হইয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ আশ্রয়পাত্ররূপ পুত্র লাভ করুন ।

ব্রাহ্মণের অমোঘ আশীর্বাদ অচিরেই সফল হইল। যথাসময়ে, রাজ-মহিষী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। শুভক্ৰমে কুমারের নাম-করণোৎসব সম্পন্ন হইল। নাম হইল ‘অজ’। শুক্ল-পক্ষের শশীর ত্রায়, সে কুমার, দিনে দিনে, সর্বজন-মনোরঞ্জন হইতে লাগিলেন। কি ‘ওজস্বি’ রূপে, কি বীৰ্য্য-সম্পাদে, কি সমুন্নত কলেবরে, সর্বাংশেই কুমার রঘুর ত্রায় হইলেন’।

ক্রমে কুমার যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করিলেন। তাঁহার যৌব-রাজ্যাভিষেকের কাল উপস্থিত প্রায়। এমন সময়ে বিদর্ভদেশের অধিপতি, তদীয় সহোদরা ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের নিমিত্ত ভারতের অত্রাত্র নরপতিগণের ত্রায়, কুমার অজকেও আনয়ন করিবার জন্ত দূত প্রেরণ করিলেন। পিতা রঘু, পুত্রের পরিণয়কাল এবং বিদর্ভ-পতির উচ্চকুলমর্যাদার বিষয় চিন্তা করিয়া, সৈন্ত-সামন্ত সমভিব্যাহারে অজকে বিদর্ভরাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। বিদর্ভপতি মহাসনারোহের সহিত অজকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কুমার অজের বাসের জন্ত নূতন প্রাসাদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, কুমার তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত যে সমুদয় বন্দিপুত্রগণ গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতাহ স্তুতি-গান করিতেন। একদিন প্রত্যুষে, তাঁহারা নিজালস অজের নিজাভঙ্গের জন্ত, সকলে সমস্বরে গাহিতে লাগিলেন—

‘রাত্রিগতা মতিমতাং বর । মুঞ্চ শয্যাং
যাত্রা দ্বিধৈব নমু ধূজগতো বিভক্তা ।

১—রঘু ৫৮—৩৭—রূপং তরোজস্বি তদেব বীৰ্য্যং তদেব নৈসর্গিকমুরতধ্বনং ।

ন কারণাৎ স্বাধ্বিভিনে কুমারঃ প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ ।

তামেকত স্তব বিভক্তি গুরুবিনিত্যঃ

তস্তা ভবানপরধূর্য্য-পদাবলম্বী ॥

তদ্বল্লুনা যুগপদুশ্মিষিতেন তাবৎ

সদ্যঃ পরস্পর-তুলামধিরোহতাং ঘে ।

প্রস্পন্দমান-পরুষেতর-তারমস্ত-

শচক্ষুস্তব প্রচলিত-ভ্রমরঞ্চ পদ্মমং ॥

বৃস্তাৎ শ্লথং হরতি পুষ্পমনোকহানাং

সংসৃজ্যতে সরসিজৈররুণাংশু-ভিন্নৈঃ ।

স্বাভাবিকং পরগুণেন বিভাত-বায়ুঃ

সৌরভ্যমীপ্সুরিব তে মুখ-মারুতস্তা ॥

যাবৎ প্রতাপ-নিধিরাক্রমতে ন ভানুঃ

অহায় তাবদরুণেন তমো নিরস্তম্

১—রঘু, ৫ম—৬৬—হে জ্ঞানিগ্ৰেষ্ঠ ? নিশ, অবমান হইয়াছে, আপনি শয্যা-ত্যাগ করুন । বিধাতা এই বিশাল ধরণীর দুর্ব্বহ ভার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । আপনার বৃদ্ধ পিতা সেই গুরুভারের এক অংশ দিবারঞ্জন নিরলসভাবে বহন করিতেছেন, অপর অংশ আপনাকে বহন করিতে হইবে । উভয়-এ বস্তু একজন—বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তি কি বহন করিতে পারেন ?

২—রঘু, ৫ম—৬৮—অতএব গাত্রোখান করুন । হে যুবরাজ ! মনোজ্ঞ নয়ন উন্মীলন করুন । তদ্ব্যবর্তিনী তরল তারকা প্রস্পন্দিত হইয়া, প্রচলিত-ভ্রমর, প্রভাতবায়ু-বিকম্পিত, কমলের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইক ।

৩—রঘু, ৫ম—৬৯—যুবরাজ ! প্রাতঃসন্ধ্যায়, তরুরাজি হইতে শিথিল বৃন্ত কুহুমরাশি উড়াইয়া লইতেছে, “অরুণাংশু” বিকসিত সরসিজাবলীর সহিত খেলা করিতেছে, বুধি সে উহাদের সম্পর্কে, আপনার ‘মুখ-মারুতের’ ‘স্বাভাবিক সৌরভ লাভ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছে ।

আয়োধনাগ্রসরতাং বয়ি বীর ! যাতে

‘কিংবা রিপুংস্তব গুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনত্তি’ ।

বন্দিপুত্রগণের এই ব্যঙ্গাত্মক উপদেশপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণমাত্রেই কুমার, —‘সপদি বিগত-নিদ্রস্তম্নমুজ্জ্বাং চকার।’ তৎক্ষণাৎ, নিজ-পরিহার পূর্বক, শয্যা ত্যাগ করিলেন। কি সুন্দর চিত্র। বৃদ্ধ রঘু তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুভারে থিন্ন হইতেছেন, আর যুবরাজ তুমি সুখ-শয্যায় নিদ্রিত ! এই কি তোমার নিজের সময় ? বর্তমান কালেও অধঃপতিত ব্রাহ্মণগণ, নানাকারণে ঐশ্বর্য্য-মত্তদিগের স্তব করিয়া থাকেন, কিন্তু সে স্তব নহে, তোষামোদ। আর কালিদাসের সৃষ্ট বন্দিপুত্রগণও স্তব করিয়াছেন, উহা স্তব নহে, শিষ্যের প্রতি যেন আচার্য্যের উপদেশ। দেশের যত দিন অধঃপতন না হয়, তত দিন, সকলেরই মনোবৃত্তি উন্নত ও উদার থাকে, তাহাতে নীচতা আসিতেই পারে না। আর যখন দেশের মজ্জা ভাঙ্গিয়া যায়, সমাজের মেরুদণ্ড শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই, লোকের মনে নীচতা প্রবেশ করে, অকুতোভয়তার বিলোপ ঘটে।

শরতের মধুর প্রভাতে, যখন দিগ্-বালিকাগণ কুঞ্জটিকার গুল-বসন পরিধান করিয়া, শ্রামল ক্ষেত্র-সমূহে, শাক্ সর্জিত ডালা সাজাইয়া বসিয়া থাকে, যখন তরুলতার প্রতি পত্রাঞ্ছ হইতে, প্রকৃতির আনন্দাঞ্ছ তুল্য বিন্দু বিন্দু শিশির ক্ষরিতে থাকে,—যখন কল-কণ্ঠ বিহগ-শ্রেণি, উন্মাদ-হৃদয়ে পর্য্যটকের শ্রবণবিবরে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে থাকে,—তখন সেই মধুর শারদ প্রভাতে যেমন, তুমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিবে, সেই

১—রঘু, ৫৪—৭১—প্রতাপনিধি ভানু বতকণ পর্য্যন্ত আকাশে সমুদিত না হয়েন, ততক্ষণই, অরণ্য তমোনাশ করিয়া থাকেন ! হে বীর ! আপনি এখন সবরে অগ্রগী হইয়াছেন, আপনার স্তায় শূরোত্তম পুত্র বিদ্যমান থাকিতেও কি আপনার বৃদ্ধ পিতা এখনও স্বয়ং রিপুগুলের উচ্ছেদে ক্লিষ্ট ও ব্যস্ত থাকিবেন ? ইহা কি সম্ভব ?

দিক হইতে আর তোমার নয়ন আকর্ষণ করিতে পারিবে না, যে দিকে মনোনিবেশ করিবে, সেই দিক হইতে আর মন ফিরাইতে পারিবে না, তজ্জগৎ, মহা কবি কালিদাসের অল্পপম চিত্রাবলীর যে খানিতেই যখন নয়ন-পাত করিবে, তাহা হইতে আর নয়ন পরাবর্তন করিতে পারিবে না, যত দেখিবে, তত আরও দেখিতে আকাজক্ষা জন্মিবে । এমনই সুন্দর সে চিত্র-সমূহ । সৌন্দর্য্যের সহিত ভাবের অপূর্ব সন্মিলনে কালিদাস-রচনা সকল সাহিত্যের শিরোদেশ-বর্ত্তিনী হইয়াছে ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর ।

আজ ইন্দুমতীর স্বয়ংবর । ভারতের তাবৎ রাজকুলবর্গ ঐশ্বর্য্যোচিত বেশভূষায় সু-সজ্জিত হইয়া, স্ব স্ব নির্দিষ্ট মঞ্চোপরি, নানা রত্ন-খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন । কালিদাসের এই বর্ণনা-পাঠে, ভারতের—সেই তদানীন্তন প্রাচীন ভারতের সূত্বের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে । রাজকুল-গণ—সকলেই যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন । কে যেন এখনও আসেন নাই । সকলেরই মুখে একটু উৎকণ্ঠার ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে । এমন সময়ে—কুমার অজ উপস্থিত হইলেন । কন্দর্প-কল্প বীর কুমারকে দর্শন করিয়া, সমবেত নৃপতি-বৃন্দের প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝিলেন যে, না, ইন্দুমতী লাভ আর আমার তদৃষ্টে নাই* ।

বিদর্ভ-পতি, অগ্রে অগ্রে, মঞ্চের সোপান-পথ-নির্দেশ করিয়া গাইতেছেন, আর তদনুসারে, কুমার, ধীর-পদ-সঞ্চারে, সোপান-পথ বাহিয়া মঞ্চে উঠিতেছেন । সে এক অপূর্ব দৃশ্য । দেখিলে মনে হয়, বুঝি কোন দৃষ্ট সিংহ-শাবক, মহুর-চরণে, স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট শিলাখণ্ড অতিক্রম করিয়া উত্তুঙ্গ ‘নগোৎসঙ্গে’ আরোহণ করিতেছে । সেই ‘মহার্হ-আসন-সংস্থিত’ ‘উদার-নেপথ্য’ রাজকুমার-গণের মধ্যে, অজের দেহই তেজো-দীপ্তিতে অধিকতম উদ্ভাসিত হইতে লাগিল* ।

পৌরগণ এককণ অপরাপর রাজকুলদিগকে দেখিতেছিলেন । কিন্তু কুমার অজের প্রবেশ মাত্রেই, তাঁহাদের নয়ন-পঙ্ক্তি ভ্রমর-পঙ্ক্তির স্থায়, যুগপৎ অজের বদন-কমলে পতিত হইল । সকলে নিম্পন্দ-নয়নে, কুমারের নিরবদ্য সৌন্দর্য্যামৃত পান করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে,

ভূপতি-বৃন্দের কুল-শীলাদি-বৃত্তান্তবিৎ স্ততি-পাঠক-গণ, ক্রমে স্ততিচ্ছলে, সমাগত চন্দ্রস্বর্য্যবংশীয় রাজহু-গণের বধায়থ পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সুগন্ধি 'অশুরু-সার'-মিশ্রিত ধূপ-গুগ্গুলাদির ত্রাণ-তর্পণ সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইল । মৃদঙ্গ শব্দ প্রভৃতির বাদ্য-শব্দে দিগ্ভঙ্গল মুখর হইয়া উঠিল । স্বয়ংবর সভার উপকণ্ঠ-বস্তু উপবনে, কলাপি-গণ, মৃদঙ্গ-ধ্বনিকে মেঘ-ধ্বনি জ্ঞান করিয়া সহস্র-চন্দ্রক-শোভিত কলাপ-বিস্তার-পূর্ব্বক, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । বিশাল রাজ-প্রাসাদ যেন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল । স্বয়ংবর-সভাসীন নৃপতিবৃন্দ—সকলেই যেন একটু উদ্বিগ্ন—চঞ্চল হইয়া উঠিলেন,—এমনই সময়ে,—

মনুষ্য-বাহুং চতুরশ্র-যানং

অধ্যাস্ত কন্যা পরি-বার-শোভি ।

বিবেশ মঞ্চাস্তর-রাজ-মার্গম্

পতিংবরা কুণ্ড-বিবাহ-বেশাং ॥

স্বয়ংবরার্থিনী রাজ-কন্যা বিবাহোচিত সাজ-সজ্জায় বিভূষিত ও সমবয়স্ক সহচরী-বৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া, রাজ-কুমার-পরিপূর্ণ স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করিলেন ।

ভারতবর্ষের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রিয় পুত্রগণ, কুমারী ইন্দুমতীর সভাপ্রবেশে, সত্য সত্যই যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন । তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের আসনে এমন ভাবে উপবেশন করিলেন, এমন ভাবে, অতি সাবধানে, ভাব-ভঙ্গি কল্পিত লাগিলেন, বাহাতে সর্ব্বাঞ্চে সেই দিকেই ইন্দুমতীর নয়ন আকৃষ্ট হয়* । কেহ করস্থিত লীলা-কমল কম্পন করিতে লাগিলেন । কেহবা বক্র-কণ্ঠে, স্বীয় রত্ন-খচিত প্রাবারক

দ্বারা, সম্বলিত কলেবর পুনরাবরণচ্ছলে, একবার নিজের চম্পকভ
দেখানি দেখাইলেন। কোন যুবা হৈম-পাদ-পীঠ বিলেখন করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ আবার আসন হইতে দ্রুততর হইয়া, কঠোর
রত্ন-হার দোলায়মান করিয়া, পার্শ্ববর্তী অত্র এক রাজকুমারের
সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কোন নবীন রাজ-কুমার নথ্যে
আপাঙুর কেরকদল ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন^১। প্রত্যেকেই মন
ইন্দুমতীর দিকে, অথচ প্রত্যেকেই যেন আবার ঘোর অগ্রমনস্ক। কেহই
ধরা দিতে চান না। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। স্বয়ংবর সভাস্থ রাজ-
কুমারগণের এই বর্ণনা অতীব চমৎকারিণী। প্রত্যেক কবিতাই যেন
এক একখানি অতি সুন্দর ফ্রেমে আবদ্ধ ছবি। প্রতি শ্লোক পাঠের সঙ্গে
সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ে একখানি পূর্ণাবয়ব নিরুপম ছবি জাগিয়া উঠে।

ইন্দুমতী উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রধান দ্বার-পালিকা দ্রুতগতির
হইয়া রাজনন্দিনীর পার্শ্বদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নাম সুনন্দা।
তিনি পরম-বাগ্মিনী। সভাস্থ নৃপতিরূপের—সকলের বংশ-বৃত্তান্ত—
চরিত্র-বৃত্তান্তই তিনি স-বিশেষ বিদিত ছিলেন^২। তিনি সর্বপ্রথমে,
রাজকন্যাকে মগধেশ্বরের নিকট-বর্ত্তিনী করিয়া, অঙ্গুলি-নির্দেশ-পূর্বক
কহিলেন,—‘ইন্দুমতি ! মগধরাজ্যের যে পরম আশ্রিতবৎসল, ‘অগাধ-সত্ত্ব’,
‘প্রজারঞ্জন’ নরপতির নাম শ্রবণ করিয়াছ, ইনিই সেই মহাত্মা। ইহার
নাম ‘পরস্তপ,’ কার্য্যেও ইনি পরস্তপ। রাজকুমারি ! আকাশে অসম্ভ্য
গ্রহ-নক্ষত্র উদ্ভিত হইলেও, যেমন তমস্বিনী রজনী চন্দ্রমার দ্বারাই চন্দ্রিকা-
শালিনী হয়েন, তদ্রূপ, পৃথিবীতে অত্র শত সহস্র নৃপতি বিদ্যমান
থাকিলেও, ইহার দ্বারাই পৃথিবী গৌরব-শালিনী। যদি বাসনা
হয়,—মগধরাজধানী কুসুমপুরের অভ্রংলিহ প্রাসাদ-সমূহের বাতায়ন-
বিলাসিনী রমণী-দগের যদি নয়ন-রঞ্জন করিতে চাও, তবে ইহার কণ্ঠে

মাণ্য অর্পণ করিতে পার। যদিও পাটলিপুত্রের সীমন্তিনীরা অনিন্দ্য-
সুন্দরী, কিন্তু তথাপি, তুমি যখন ইহার সহিত নগর প্রবেশ করিবে,
তখন তাঁহারাও তোমার স্তায় সৌন্দর্য্যাত্রঙ্গিনীকে দর্শন করিয়া নন্দন
সার্থক করিবার আশায়, নিশ্চয়ই রাজপথের উচ্চ অট্টালিকার গুবাক্স-পার্শ্বে
আসিয়া দাঁড়াইবেন^১ ।

প্রতিহারী সুনন্দা বিরত হইলে তদ্বী ইন্দুমতী মগধেশ্বরের দিকে একবার
দৃষ্টিপাত করিয়াই, সরলভাবে তাঁহাকে একটি প্রশ্নাম করিলেন, কথাবার্ত্তা
কিছুই কহিলেন না^২ । ভারতের রাজত্ববর্গের মধ্যে মগধেশ্বর পরম
সম্মানী, চতুর সুনন্দা তাই সর্ব্বাশ্রেষ্ঠ তাঁহারই নিকটে ইন্দুমতীকে লইয়া
গেলেন । তারপর প্রগলভ সুনন্দা, ক্রমে, অঙ্গ, অবন্তি, অনুপ, রেবা-
তটবর্ত্তিনী মাহিষ্যতী, মথুরা, কলিঙ্গ ও পাণ্ডু^৩ এই কয়েকটি প্রদেশের
অধিপতিগণের সম্মুখে যাইয়া, ইন্দুমতীকে তাঁহাদের পরিচয়-প্রদান
করিলেন । এই সমুদয় নরপতিবৃন্দের মধ্যে যাহার রাজ্যে যে লোভনীয়
বস্তু আছে, যে সকল বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য পদার্থ আছে, নিরপেক্ষ-ভাবে
সে সব বর্ণন করিলেন । সুনন্দা-প্রদত্ত নিজের নিজের পরিচয় এবং নিজ
নিজ রাজ্যের পরিচয়-শ্রবণে কোন নৃপতিরই আর মনে ক্ষোভ রহিল না ।
কোন রাজার প্রতি লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর সমান কৃপা^৪ । সিপ্রা-তটিনীর
তীরে কোন রাজার মনোহর উদ্যান-পরম্পরা বিরাজমান^৫, কোন রাজার
অস্তঃপুর-কামিনীগণের অবগাহন-কালে, তাঁহারের চন্দন-চর্চিত-কলেবর-
সংসর্গে নীল-সলিলা যমুনাও গঙ্গাজল-মিশ্রিতার মত প্রতিভাত হইলেন^৬,
সে সব, সুনন্দা, একটি একটি করিয়া, রাজকুমারীকে বুঝাইয়া
দিলেন । কোথার কুসুম-সুগন্ধি শিলাতলে উপবেশন-পূর্ব্বক, রমণীর

১—রঘু, ৬—২১, ২০, ২৪ ।

২—রঘু, ৬—২৫ ।

৩—রঘু, ৬—২৭, ৩২, ৬৭, ৪৩, ৪৫, ৫৩, ৬০ ।

৪—রঘু, ৬—২৯ ।

৫—রঘু, ৬—৩৪

৬—রঘু, ৬—৪৮ ।

গোবর্দ্ধন-গিরির গুহাসমূহে, নব-বর্ষা-সমাগমে, উদ্ভদ-কলাপি-নিচয়ের
মনোহর নর্ত্তন দেখিতে পাইবেন, —কোন্ রাজ্যের ‘অম্বরশির’ ‘তালী-
বন-মর্ফর’ বেলা-ভূমিতে বিরচন-কালে, শীকর-বাহী সমীরণ, দূরবর্তী
দ্বীপ হইতে, লবঙ্গ-কেশর উড়াইয়া আনিয়া, ইন্দুমতীর ঘর্ম্মবিন্দু মার্জনা
করিয়া দিবে? ; কোন্ রাজ্যে, মলয়-পর্বতোপরি, তাষ্মূল-বল্লী-পরিগন্ধ-
পুগ-বৃক্ষপরিশোভিত, ‘এলা-লতালিজিত-চন্দন-তরু-বিভূষিত ও ‘তমাল-
পত্রাস্তরণ’-সম্বলিত উপবন সমূহে, নিয়ত ভ্রমণ করিয়া আশ্ব-প্রসাদ-লাভ
করিতে পারিবেন ; —তাহা বিশেষরূপে রাজনন্দিনীকে নির্দেশ করিয়া
দিলেন* । ইন্দু-প্রভা ইন্দুমতী, দীর-ভাবে, সুনন্দা উক্তি গুলি শুনিয়া
গেলেন মাত্র । তাঁহার হস্তাবলম্বিত বরমালা হস্তেই রহিল । অভুল-
রূপশালিনী রাজ-কুমারী এক এক জন রাজাকে যেমন যেমন অতিক্রম
করিয়া আর এক নৃপতির সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, অমনি পূর্ববর্তী
নরপতির স্মৃজিত দেহের উপর—আশোক্তাসিত বদনের উপর যেন
একটা বিষাদের—মালিন্যের গাঢ় আবরণ পড়িতে লাগিল । সে অতি
অপূর্ব চিত্র !

সঞ্চারিণী দীপ-শিখের রাত্রে

‘যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা ।

নরেন্দ্র-মার্গাউ ইব প্রপেদে

বি-বর্ণ-ভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

ক্রমে সুনন্দা, রাজ-নন্দিনীকে লইয়া কুমার অজের সম্মুখবর্ত্তিনী
হইলেন । এপর্য্যন্ত যত নরপতির সম্মুখেই ইন্দুমতী উপস্থিত হইয়াছেন,
কোথাও ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়ান নাই, ‘দোলাচল-চিত্তে’ তাঁহার

পরিচয়টি শ্রবণ করিয়া, অল্প নৃপতির দিকে অগ্রসর হইয়াছেন । আর এখন—কন্দর্প-কাস্তি রাজ কুমার অজের পুরোবর্তিনী হইয়াই, ‘পতিংবরা’ রাজ-কুমারী প্রস্তর-প্রতিমার স্থায় নিশ্চল-নিষ্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন । সে অতি সুন্দর দৃশ্য ! বুঝি কল্পনা-কাননের সমস্ত-সম্পদ,—সমস্ত কুসুম-রাশি সংগ্রহ করিয়া, তদ্বারা, ‘বাণীর বরপুত্র’ কালিদাস, অজ-ইন্দুমতীর এই প্রথম সন্দর্শন-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ।

‘প্রফুল্ল-সহকার’ পরিত্যাগ করিয়া, ভ্রমর-পঙ্ক্তি যেমন অল্প বৃক্ষের দিকে যাইতে চাহে না, তজ্জপ, ভ্রমর-নীল-নয়না ইন্দুমতী কন্দর্প-সুন্দর অজকে পরিত্যাগ করিয়া আর অস্ত্রাঘ্র যাইতে বাসনাই করিলেন না । স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন* । প্রেতিভাশালিনী সুনন্দার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না । তবুও কর্তব্যবোধে, তিনি, সূর্য্যাবশেষের সবিস্তর পরিচয়-প্রদান পূর্ব্বক, যুবরাজ অজের গুণাবলীর কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন—‘ইন্দুমতি ! আর কেন ?

কুলেন, কাস্ত্যা, বয়সা নবেন,
 গুণৈশ্চ তৈ স্তৈর্বিনয়-প্রধানৈঃ,
 স্বমাত্মনস্তন্যামমুং বৃণীষ,
 রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন* ॥

সমুন্নত কুল, অনবদ্য কাস্তি, নবীন বয়ঃক্রম, এবং ‘বিনয়-প্রধান’ অনন্ত গুণাবলী—সর্ব্বাংশেই, এ রাজকুমার তোমার অনুরূপ, অতএব ইহাকেই বরণ কর । রত্ন কাঞ্চনের সহিত সম্মিলিত হউক ।’ সুনন্দা বিরত হইলে, ‘নরেন্দ্র-কন্তা’ তাঁহার সেই হৃদ্য-ধবল অমল-দৃষ্টি-দ্বারা, একবার অজকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন* । তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সুনন্দাও অমনি মহাত্ম বদনে কহিলেন,—‘রাজকুমারি ! এক স্থানে আর কতক্ষণ দাঁড়াইবে ?

চল, অস্ত্র নৃপতির নিকটে যাই।' ইন্দুমতী এ কথাই কোনই উত্তর দিলেন না, 'কেবল একবার জৈষ্ঠ্য কুটিল-নয়নে, সখী সুনন্দার প্রীতি কটাক্ষ করিলেন।

• আৰ্য্যে ব্রজামোহন্যত ইত্যধৈনাঃ বধূরসূয়া-কুটিলং দদর্শ।

এই কয়েকটি পদের দ্বারা, কবির কবি কালিদাস, যেন একেবারে, ইন্দুমতী ও সুনন্দার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত উদঘাটন করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণতত্ত্বের বহির্বিকাশ করিয়া দিলেন।

রাজ-কুমারী রাজ-কুমারের কণ্ঠে বরমালা অর্পণ করিলেন। লোকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'অতি উত্তম হইয়াছে', কেহ বলিল, "তীর্থরাজ জননিধির' সহিত পবিত্র-নীরা 'জঙ্ঘুকত্যা' সঙ্গতা হইয়াছেন"। চতুর্দিকে মহোৎসবের প্রবাহ বহিল। রাজ্যের সকলেই আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। কেবল, স্বয়ংবরার্থী সমাগত রাজন্ত-বর্গের হৃদয়াকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন করিল।

কালিদাস, এই স্বয়ংবর-ব্যাপারে, ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতিদিগকে এক স্থানে সম্মিলিত করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যের তথা সংকীর্ণতর সখামথ বর্ণন-পূর্ব্বক, স্বকীয় ভারতব্যাপিনী কল্পনার পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়াছেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ মতাবলম্বিগণের অন্ততম যুক্তি এই যে, কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ংবর উপলক্ষে যে কয়জন নৃপতির বর্ণন করিয়াছেন, যে সকল রাজ্যের বর্ণন করিয়াছেন, ঐ ঐ নৃপতি-বৃন্দের তৎ তৎ রাজ্য-সমূহ ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই অভ্যাদিত হইয়াছিল। ৫ম এবং ৬ষ্ঠ

শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-গগনে যে কয়টি প্রধান প্রধান নক্ষত্র সিমুদিত ছিল, কালিদাস সে সমস্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, পাঞ্জাব এবং ব্রহ্মদেশের ছায়া ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে যে কয়টি প্রধান প্রধান স্থান ছিল, রাজ-শক্তির কেন্দ্র ছিল, কালিদাস, সে সকল ক'টিরই পরিদৃষ্টব্য বর্ণন করিয়াছেন। যদি কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রোহুভূত না হইতেন, তাহা হইলে কদাচ তিনি, তদানন্তন রাজ্য-সমূহের নামোল্লেখ এবং নরপতিবৃন্দের ওরূপ প্রত্যক্ষ-দৃষ্টব্য বর্ণন করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ তিনি মগধেশ্বরের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও উক্ত মতের একটি প্রধান পরিপোষক প্রমাণ। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার আর সে পূর্ব সম্পদ নাই। এক সময়ে 'মগধ' বলিলে যাহা বুঝাইত, সে বিশাল রাজশক্তির কথা, রাজ্যের প্রতিপত্তির কথা মনে জাগিয়া উঠিত, এখন আর সে মগধ নাই, তবে তাহার নাম একেবারে লুপ্ত হয় নাই, কিংবা সে রাজবংশেরও সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই। অত্যাশ্চর্য্য অনেক নূতন নূতন রাজ্যে নব নব ভূপতি অভ্যুদিত হইলেও, প্রাচীন গৌরব স্মরণ করির, মগধেশ্বরেরই সর্বোচ্চে উল্লেখ করিতে হয়। সমবেত, নবাত্মাদিত, রাজত্ব-বর্গের মধ্যে যদি লুপ্ত-গৌরব মগধ-পতির একটু বিশেষ সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে, প্রাচীন রাজবংশের অবমাননা হয়। তাই কালিদাস, প্রথমেই মগধেশ্বরের সম্মুখে ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়া, সুনন্দা দ্বারা নৃপতির পরিচয় প্রদান করিলেন। বর্তমান সময়ে, বিগত হওয়া স্বত্ত্বেও যেমন কালীঘাটের গজাকে 'আদিগজা' বলিয়া সম্মান করিতে হয়, তদ্রূপ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ-রাজ্য পতিত হওয়া স্বত্ত্বেও আদি রাজ্য বলিয়া মগধের এবং আদিম রাজা বলিয়া মগধপতির নামোল্লেখ করা হইয়াছে।—প্রত্নতত্ত্ববিদগণের এই যুক্তি

তত ভূয়োদর্শন-সম্ভূত বলিয়া মনে হয় না । কেন না ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় সমবেত রাজন্ত-গণের পরিচয়-কালে, মগধ, অঙ্গ, অবন্তি, পাণ্ড্য, অ'নুপ, মথুরা, কলিঙ্গ প্রভৃতি যে কতিপয় রাজ্যের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, মহাভারতেও ঐ ঐ রাজ্যের নির্দেশ পরিদৃষ্ট হয় । মহাভারতের যে স্থলে, যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়-যজ্ঞের পূর্বে পাণ্ডবগণের চারি ভ্রাতার চতুর্দিক বিজয় করিতে বহির্গত হওয়ার এবং দিগ্‌বিজয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবার বর্ণন আছে, সেই স্থলে তাঁহাদের বিজিত রাজ্য-সমূহের মধ্যে, কালিদাসবর্ণিত অঙ্গ-অনুপ-অবন্তি রাজ্যেরও নামোল্লেখ আছে । যদি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেও উক্ত রাজ্য-সমূহ অজ্ঞানিত না থাকিত, তবে বাস-কৃত মহাভারতে উহাদের নির্দেশ থাকিল কি প্রকারে ? প্রকৃত-স্বয়ং মহাশয়দিগের কালিদাস-বিষয়ক মতটি স্বীকার করিতে গেলে, বাস-দেবকেও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অধঃপাতিত করিতে হয় । কেন না যুক্তি ত উভয়ত্রই তুলা । কোন কোন সাহসিক ঐতিহাসিক আবার মহাভারতের ঐ উৎকৃষ্ট দিগ্‌বিজয় ভাগটিকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া স্বমত দৃঢ় করিতে আগ্রহ করেন । এ কথার আর উত্তর কি ? 'তত্র মোনং হি শোভনম্ ।' ক্রমে অনেক অবাস্তর কথায় আসিয়া পড়িয়াছি, এইক্ষেণে প্রকৃতের অনুসরণ করি ।

কালিদাস, প্রাচীন ভারতের বড় স্পর্ধার স্থল—উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় বর্তমান ছিলেন, বিদ্যায়, ধনে, মানে, সর্ব প্রকারে, যিনি ভারতের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি, সেই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন । উজ্জয়িনী-পতির রাজধানীতে কত উৎসব, কত বিবাহ দেখিয়াছিলেন । ভারত তখন এক অদ্বিতীয় অধিপতির অধীন । খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ভারতবর্ষ তখন বিভক্ত ছিল না । স্মৃতরাং ভারতের একচ্ছত্র নৃপতির প্রাসাদে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের পরিণয়োৎসবে যে কি প্রকার সমারোহ, কি প্রকার ঘটনা হইত, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না ।

কালিদাস স্বচক্ষে সে সমুদর দর্শন করিয়াছেন, তাই, তাহাদেরই আদর্শে অজ-ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-ব্যাপার অত সুন্দর করিতে পারিয়াছেন । রঘুংশের চতুর্থ সর্গের ছায়, ইহার ষষ্ঠ সর্গেও প্রাচীন ভারতের অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র পরিদৃষ্ট হয় ।

সংসারে সাধারণতঃ যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা ক্ষুদ্র হউক, আর বৃহৎ হউক, কালিদাস কবির চক্ষে সে সমুদয় দেখিতেন, আর চিত্রকরের চক্ষে তাহা চিত্রিত করিতেন । নবপরিণীত বর-বধু যখন রাজ-পথে শোভাযাত্রা করিয়া গমন করেন, তখন পথি-পার্শ্ব-বর্তী অট্টালিকা সমূহের বাতায়নে, ললনাগণ বর কণ্ঠা দেখিবার নিমিত্ত কিরূপ উৎসুকভাবে আসিয়া দাঁড়াইতেন, কত বাস্তব হইতেন, তাহা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিদিত ছিলেন । অচিরোদ্ধাহিত জায়া-পতি-সন্দর্শনে পুরমহিলাদিগের যে কি পরিমাণে কৌতূহল, তাহা তিনি যেন রমণীসুন্দর মনের মধ্যে প্রবেশ-পূর্বক, দেখিতে পাইতেন^১ । তাই দেখি, তাঁহার অজ-ইন্দুমতীর স্বয়ংবরাস্তে অন্তঃপুর-যাত্রা-কালে, কোন ভামিনী হয়ত, অঙ্ক-সংঘত কেশ-কলাপ এক হস্তে ধারণ করিয়া, অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত, নবদম্পতির দর্শনাশায় গবাক্ষের দিকে ছুটিয়াছেন ; কেহ বা প্রসাধিকার হস্ত হইতে তরল-অলঙ্ক-রঞ্জিত চরণ বল-পূর্বক আচ্ছিন্ন করিয়া, সমস্ত পথ চরণের অসম্পূর্ণ অলঙ্ক-রাগে রঞ্জিত করিতে করিতে দ্রুত-পদে যাইতেছেন ; কেহ আবার একচক্ষে অঞ্জন পরিয়াই স্বরিত-চরণে গবাক্ষ-পার্শ্বে উপস্থিত হইতেছেন, অস্ত্র নয়নে অঞ্জন-দানের আর অবসর পান নাই । কেহ দ্রুত-গতি নিবন্ধন স্থলিত-জ্যেষ্ঠ বসন হস্ত-দ্বারা নিতম্ব দেশে চাপিয়া ধরিয়াছেন^২ । বর্তমান সময়ে রাজপথে যখন কোন ধনিক-তনয়, পরিণয়ান্তে নব বধুর সহিত সমারোহে চলিয়া যান, এবং সেই সময়ে উভয় পার্শ্ব প্রাসাদবাসিনী

কামিনীরা যেরূপ যেরূপ করেন, কালিদাস, অজ-ইন্দুমতীর এই শোভা-
যাত্রাতেও অবিকল সেইরূপ সেইরূপ করাইয়াছেন। প্রতি শ্লোকেই
এক একখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছবি। তাহা দর্শন করিতে করিতে আত্ম-
বিশ্বাস্তি ঝুটে, মনে হয় যেন সত্য সত্যই সেই সময়ের সেই বিবাহ-
যাত্রা প্রত্যক্ষ করিতেছি। পাঠকের এইরূপ আত্মবিশ্বাস্তি-বিধান
কালিদাসের নিজস্ব।

রঘুবংশের সপ্তমসর্গের শেষভাগে, মহাকবি কালিদাস, 'ইন্দুমতী-নিরাশ'
অপরাপর নৃপতি বৃন্দের সহিত, ইন্দুমতী-বল্লভ অজের যে যুদ্ধবর্ণনা
করিয়াছেন, তদর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণের কোমলতা অনেকটা অহুতব
করিতে পারি। যুদ্ধবর্ণনায় তিনি তাঁহার বিশ্ববিমোহিনী কল্পনার তেমন
লীলা দেখাইতে পারেন নাই। ও বিষয়ে, কবিগুরু বাণীকি সিদ্ধহস্ত
ছিলেন। তিনি ঐ সকল স্থলে, যে প্রকার অদ্বুত রচনা-কৌশল প্রদর্শন
করিয়াছেন, তাহা অগ্ৰত্ব দুর্গভ। বোধ হয়, এই জন্তই কালিদাস,
যুদ্ধাদিবর্ণনায় কোথাও তত প্রয়াস করেন নাই। বাণীকির সবিস্তর
বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণনা করা সম্ভব মনে করেন নাই।

বিংশ অধ্যায় ।

ইন্দুমতী-বিয়োগ ।

পরিণয়ের পর অবোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত যুবরাজ অজের হস্তে, বৃদ্ধ মহারাজ রঘু বিশাল কোশল-সাম্রাজ্যের গুরুভার গ্রস্ত করিলেন^১ । কালিদাস এই স্থলে, পুরাকালে ভারতের রাজত্ববর্গের মধ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া যে সকল বাণীর ঘটিত, তাহা অতি কোশলে বলিয়া গেলেন । কবিগণই দেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক । অশ্রান্ত রাজ-সংসারের অনেক স্থলেই হয়ত, নবীন যুবরাজগণ সিংহাসনাধিরোহণের নিমিত্ত একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া নানাবিধ পাপ-সঞ্চয় পূর্বক, রাজচ্ছত্র অধিকার করিতেন । কোন স্থলে বা বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা রাজ্যের প্রকৃত অধিকারীর বিনাশ-সাধন পর্যন্তও ঘটিত । হৃদয়ে যখন ভোগ-তৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠে, তখন সে রাক্ষসীর আকার ধারণপূর্বক ভগদ-গ্রাসে সমুদাত হয় । যুবরাজ অজ যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন, তখন তাদৃশ কোন অন্তত ঘটনা হয় নাই, পিতার আজ্ঞা বলিয়া তিনি সিংহাসন স্বীকার করিলেন^২ । নতুবা সে মহাপুরুষের অস্বঃকরণে ভোগ-তৃষ্ণার অস্পষ্ট ছায়াও পতিত হইতে পারে নাই । অজের নবীন যৌবন অতুণম বিনয় ভূষণে বিভূষিত হইয়া, যেন আরও সুন্দর হইয়া উঠিল । তিনি পিতার রাজশ্রী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তদীয় সমস্ত গুণাবলীও প্রাপ্ত হইলেন । প্রজামণ্ডলী এই রাজ-পরিবর্তন অল্পভব করিবারও অবসর পাইল না । তাহাদের মনে হইল, যেন মহারাজ রঘুই পূর্ববৎ সিংহাসনে অধিরূঢ় আছেন^৩ । অজের কোন বিষয়েই কোন প্রকার চাঞ্চল্য নাই । তিনি নিস্তরঙ্গ জলধি-বক্ষেঃস্তায় স্থির । পাছে রাজ্যের কোথাও কোনরূপ উষ্মেণের আবির্ভাব হয়,

এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদাই অতি সাবধানে রাজ্য-ভোগ করিতেন¹।
তাহার বিনয়-প্রধান চরিত্রের এমনই মাহাত্ম্য যে—

‘অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্বঃ প্রকৃতিষচিস্তয়ত্।

উদধৌরিব নিম্নগা-শতেষ্ভবম্নাস্তু বিমাননা কচিৎ² ॥

• প্রজাপুঞ্জের প্রত্যেকেই মনে করিত, ‘আমিই মহীপতির প্রিয়তম।’
শত সহস্র নদী সমুদ্রে পতিত হয়, সমুদ্রের নিকটে কিন্তু সকল নদীই
সমান। কোনস্থলে কোন প্রকার ইতরবিশেষভাব নাই। অজেরও
ঠিক সেইরূপ ছিল। সকল প্রজাতি তাহার চক্ষে পুত্র-নির্বিশেষে
পরিদৃষ্ট হইত। রাজচরিত্র যদি সর্বত্র সমদর্শন হয়, তবেই তাহাকে
সর্বাত্মক নিরবদ্য,—প্রকৃত রাজোচিত বলা যায়। নতুবা রাজা
যদি আবার কোনও ব্যক্তিবিশেষের কর-সঞ্চালিত পুত্রলিকার ছায়
হয়েন, তবে তাহা রাজা এবং রাজ্য—উভয়েরই পরিণামে ঘোর অমঙ্গলের
কারণ হয়। পার্থিব ভূমিখণ্ডের ভোগে রাজার যে সুখ, প্রকৃতিপুঞ্জের
অপার্থিব হৃদয়ের রাজত্বে তদপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দ। মহারাজ
অজ সে সর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পাইতেন।

বৃদ্ধ নৃপতি রঘু, কুলের চিরন্তন নিয়মানুসারে, যখন তপোবন গমনে
কৃত-সংকল্প হইলেন, তখন অজ,—

পিতরং প্রণিপত্য পাদয়ো-

রপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ³।

‘আমাকে তাগ করিয়া যাইবেন না’—এই প্রার্থনা, কাতর-বচনে ও
অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, পিতৃচরণে কৃতাজলি-পুটে নিবেদন করিলেন। পুত্রবৎসল
রঘুও পুত্রের এ অভিলাষ বা ‘আবদার’ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

স্বীকার করিলেন । কিন্তু সৰ্প যেমন পরিত্যক্ত নিম্নোক্তের পুনর্গ্রহণ করে না, তদ্রূপ তিনিও পরিত্যক্ত রাজশ্রীর আর পুনরাদান করিলেন না । তিনি নগরের বহির্দেশে, এক নির্জন স্থানে, আশ্রম-ভাগী সন্ন্যাসীর ভ্রাতৃ দিনপাত করিতে লাগিলেন । সে এক অপূৰ্ণ দৃশ্য ! যেন গমস্ত রাজি, পৃথিবীকে শীতল চঞ্জিকামৃতে স্নাত করাইয়া, ঐ এক দিকে স্ফূটকর অন্তগমনোন্মুখ, আর ঐ পূৰ্ব্বাকাশ উষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত করিয়া, অস্ত্র দিকে তরুণ সূর্য্য জগতে নূতন আলোক বিতরণের জন্ত অভূদিত^২ ! স্নেহের রাজ্যের সৰ্ব্বত্রই শান্তি, সৰ্ব্বত্রই আনন্দ বিরাজমান । যশু আসমুজ পৃথিবীর আধিপত্য নিমেষ-মধ্যে পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক, নির্লিপ্ত ভাবে নির্জন-বাস করিতে লাগিলেন । অজ পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনাসক্ত-ভাবে রাজ্য-পালনে ব্যাপ্ত হইলেন । সূর্য্যবংশীয় নরপতি-গণের হৃদয়ে আসক্তির যেন কোন অধিকারই নাই । প্রত্যুত, আসক্তিই যেন তাঁহাদের কিঙ্করী । যখন ইচ্ছা, তাহাকে ত্যাগ করিতেছেন । যখন ইচ্ছা, একটু আদর করিতেছেন । আদর্শ নরপতি হইতে হইলে সৰ্ব্বাঙ্গে আসক্তি-শূন্য হওয়া আবশ্যক । আশ্র-হৃদয় রঞ্জনের পিপাসা থাকিলে পর-হৃদয়-রঞ্জন করা যায় না । আশ্র-ত্যাগ ব্যতীত পর-ভৃষ্টি-বিধান হয় না । সৰ্ব্বত্র সমদর্শন হওয়া যায় না । সৌর-বংশীয় নৃপতি-গণের চিত্তে এই গুণ অতিশয় প্রবল ছিল । কালিদাস, স্বকীয় অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশলে আদর্শ-রাজ-চরিত্র প্রদর্শন করিলেন । প্রকৃত রাজার মূর্তি দেখাইলেন । ‘রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ’,—এই কথা আরও সুস্পষ্ট-রূপে বুঝাইয়া দিলেন ।

মহারাজ অজ, পরম উৎসাহের সহিত, নিরপেক্ষ-ভাবে রাজ্য-শাসন ও অশ্র-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । কিন্তু বিধাতার বৈচিত্র্যময় সংসারে কাহারও অদৃষ্টে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লিখিত হয় নাই !

এই স্বন্দীয়ক জগতে, রাজা প্রজা—সকলেই এই নিয়মের অধীন। মহারাজ অজ বধাসময়ে পুত্র দশরথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুত্র-লাভে তাঁহার সুখের রাজ-সংসার যেন আরও অধিকতর সুখময়—শান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে, অজের সুখের স্নিগ্ধ-চল্লিকা-স্নাত অদৃষ্ট-গুণনে হঠাৎ কাল মেঘের উদয় হইল। অথবা মেঘ বলি কেন? তাঁহার ইহজীবনের সমস্ত শান্তি, সমস্ত সুখ, সমূলে বিধ্বস্ত করিবার জন্ত, যেন কাশ্মিক ধুমকেতু অবিভূত হইল। আনন্দের মণিময় প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার নিমিত্ত, যেন ‘বিনামেঘে বজ্রাঘাত’ হইল। ‘বোমচর’ নারদের কর-স্থিত বীণা হইতে, অকস্মাৎ একছড়া পারিজাত মালা ঝলিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল, না—না, পৃথিবীতে নহে, পৃথিবী-পতির হৃদয় ভগ্ন করিবার জন্ত, তদীয় রাজ-লক্ষ্মীর দেহে পতিত লইল। মহারাজ, রাজা পালন-চিন্তা-ক্লান্ত হৃদয়ের কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্য-বিধানের জন্ত, মহিষী ইন্দুমতীর সহিত একদিন নগরোপকণ্ঠবর্তিনী উদ্যান-বাটিকায ভ্রমণ করিতেছিলেন; দেবর্ষি নারদের বীণা-ঝলিত কুসুম-শ্রব, তথায়, ইন্দুমতীর দেহে পতিত হইল। অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, তখন অমৃতও গরলে পরিণত হয়, চন্দন-তরুণও বিষক্রমের আকার ধারণ করে। আজও তাহাই হইল। ‘ঐ অকস্মাৎ ঝলিত কুসুম মালিকার স্পর্শমাত্রেই, কুসুমধিক-কোমলা, বিহ্বলা ‘নরোত্তম-প্রিয়া’ চিরদিনের মতন নয়ন নিমীলন করিলেন। অকস্মাৎ যেন দূরন্ত রাহু আসিয়া, নির্মূল আকাশ-বক্ষ হইতে শারদ কোমুদীকে বিলুপ্ত করিল! কালিদাস, পৃথিবীর মধ্যে যে বিপদ সর্বাঙ্গীক ভয়ঙ্করী, অজকে সেই বিপদে পাতিত করিয়া, জগতে হুঃসহবেদনার একটা খরশোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সে বেদনার ভয়ঙ্কর প্রভাব চিন্তা করিতেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। ক্রন্দন বা বিলাপ প্রভৃতি, সংসারের প্রত্যেককেই, নানা কারণে, কখন না কখন করিতে

হয় । সেই ক্রন্দন-বিলাপের মধ্যে যে'টি সর্কাপেক্ষা অক্লান্ত, সর্কাপেক্ষা হৃদয়গ্রাবী, কালিদাস তাহা বর্ণন করিলেন । সকল বিষয়েই যে'টি সর্কাংশে শ্রেষ্ঠ, সেইটিই কালিদাসের বর্ণনীয় ছিল । সুখের মধ্যে যে'টি সর্কাপেক্ষা হৃদয় বিমোহন, দুঃখের মধ্যে যে'টি সর্কাপেক্ষা যাতনাদায়ক, সেই উভয়েই তাঁহার সমান বর্ণনার বিষয় । তিনি দুঃখ বর্ণনা করিতেন, কিন্তু সৌন্দর্যাহীন দুঃখ কল্পনাও করিতেন না । যে দুঃখে চমৎকারিতা নাই, যে রোদনে পৃথিবী রোদন করিবে না, যে বিলাপে পাষণ্ড বিগলিত হইবে না, তাহার দিকে তিনি দৃষ্টি করিতেন না ।

পৃথিবীপতি অজ যখন—তাঁহার সেই স্বয়ংবর-গৃহীতা ইন্দুমতীর অকস্মাৎ মৃত্যু, উন্মত্তবৎ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন, সেই উপবনবর্তিনী বৃক্ষ-বল্লরীও যেন তাঁহার দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল । দৃঢ়কায় পর্বতকন্দর হইতে যখন অগ্ন্যাদগম হয়, তখন যেমন, সেই অগ্নিপাতে পর্বতের চতুর্পার্শ্ববর্তী অরণ্য-জনপদ প্রভৃতিও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তজ্রূপ, দৃঢ়চিত্ত অজ যখন—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ

প্রিয়-শিষ্যা ললিতে কলা-বিধৌ,

করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা

হরতা স্বাং বদ কিং ন মে হতম্ ?

বলিয়া তারকর্থে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাওও যেন বিলাপ করিয়া উঠিল ।

ক্রমে একে একে, সেই সমস্ত ঘটনা, মহাজ্ঞ অজের স্বপ্নে তাহার মনে পড়িতে লাগিল । সেই স্বয়ংবর ও স্বয়ংবরান্তে ‘ইন্দুমতী-নিদ্রাশ’

১—রঘু. ৮—৬৭—সংসার কর্ণে তুমি আমার গৃহিণী, নন্দনায় তুমি আমার সচিব, রহন্তে তুমি আমার সখী, ললিত-কলা-বিধয়ে তুমি আমার প্রিয়-শিষ্যা, অথবা তুমি আমার করুণ, অক্লান্ত মৃত্যু তোমাকে হরণ করিয়া, বল, আমার কি না হরণ করিল ?

ভগ্নমনোরথ রাজলক্ষ্মীর সহিত যুদ্ধ, সেই রাজলক্ষ্মীর সহিত ‘সমর-বিজয়-লক্ষ্মীর’ স্তম্ভ সন্মিলন,—সেই জীবনের সুখ, বার্ককোর অনন্ত-সাধারণ অবলম্বন, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ,—তার পর, —তার পর, সেই সুখে, দুঃখে, হর্ষে, বিষাদে, একমাত্র অংশভাগিনী ইন্দুমতীর সেই স্বর্গীয় হৃদয়, অপার্থিব প্রেম, অলৌকিক সহিষ্ণুতা ও অনুপম পাতিত্ব—সব আজ অজের হৃদয়ে ছায়ার ছায় ভাসিতে লাগিল। প্রশান্ত-গম্ভীর বারিধি-বক্ষে, যেমন, হঠাৎ প্রবল ঝটিকার আবির্ভাব তাকে উপর তরঙ্গ, তাহার উপর তরঙ্গ আসিয়া, অনন্ত জল-রাশিকেও সংক্ষোভিত করিয়া তুলে, তরুণ আজ, প্রশান্ত হৃদয় মহীপতির অন্তঃকরণে, এই সুদীর্ঘ জীবনের, ইন্দুমতীময় জীবনের কত কথা, কত ঘটনা যুগপৎ উদ্ভিত হইয়া, তাঁহাকে একান্ত অধীর করিয়া তুলিল। তাই আসমুদ্র ধরণীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর প্রাকৃতজনের ছায়ারোদন করিলে লাগিলেন। শোকে, দুঃখে, সুখে, যখনই মানব-হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন তাহার ধীরতা বিলুপ্ত হয়, আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে। অজ-হৃদয়েরও আজ সেই অবস্থা। মহারাজ অজ যৌবনের প্রারম্ভে, বিদর্ভরাজের উদ্যান-বাটিকায় যে অনর্থ-রক্ত লাভ করিয়াছিলেন, যে রক্তের স্মৃতিতল-কিরণ-জালে, তাঁহার হৃদয় সংসারের কোন তাপ, কোন ক্লান্তিই কখনো অনুভব করে নাই, আজ অযোধ্যার উদ্যান-বাটিকায় সেই রক্তের বিসর্জন দিলেন। তাঁহার জীবনাকাশের শারদী চন্দ্রিকা চিরদিনের মত তিরোহিত হইল। তিনি ‘বাম্প-স্তম্ভিত-কণ্ঠে’ ও শূন্ত-হৃদয়ে, রাজ-লক্ষ্মী-শূন্ত বিষাদ-কালিমাবৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দুমতী-বিহীন হইয়া রাজ-পুরীতে এই তাঁহার প্রথম প্রবেশ। উৎসব-দায়িনী রজনীর অবসানে, রজনী-পতি শশাঙ্কের যেমন সমস্ত জ্যোতিঃ তিরোহিত হয়, কেবল তাঁহার নিম্নত দেহে মালিন্যের একটা ছায়া থাকিয়া যায়, তরুণ আজ ইন্দুমতী-বল্লভের দেহেরও যেন সমস্ত তেজ, সমস্ত

লাবণ্য তিরোহিত হইল, কেবল—তদীয় কলেবরে গুরুশোক-কৃত কালিদাসের একটা গাঢ় আবরণ পড়িয়া রহিল। তাঁহার হৃদয় শোকভারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

আশ্রম-বাসী কুল-গুরু বশিষ্ঠ, ধ্যান-বলে শিষ্যের এই আকস্মিক বিপৎ-পাতের বিষয় বিদিত হইয়াই, তৎক্ষণাৎ, অজ্ঞের প্রবোধের জন্ত একজন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া, তিনি স্বয়ং আসিতে পারিলেন না, তাই শিষ্যের মুখে স্বকীয় বক্তব্য বলিয়া পাঠাইলেন^১। কালিদাসের সৃষ্ট পাত্রসমূহে দেখিতে পাই, কোথাও কোন কারণে,—শোকে, মোহে, হর্ষে, বিবাদে—কিছুতেই—কেহ কর্তব্যের প্রতি উদাসীন নহেন। যথাসময়ে বশিষ্ঠ গুরু কর্তব্য করিলেন। কিন্তু গুরু কর্তব্য করিতে বাটয়া, তিনি ঋষির কর্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। যজ্ঞ-ভঙ্গ করিয়া নিজেই আসিলেন না।

শিষ্য আসিয়া ইন্দুমতীর প্রাণ-বিয়োগের সমস্ত কারণ প্রকাশ-পূর্বক বলিলেন—‘রাজন্! অভ্যাদয়ের সময়ে, সকল বিষয়েই আপনার যে প্রকার সৈধ্য ও বৈধ্য দেখিয়াছি, আজ এই বিপদের সময়েও, তদ্রূপ আত্ম-সামর্থ্য প্রকাশ করুন। নর-নাথ! আপনি চিরজীবন রোদিন করিলেও আর রাজ-মহিষীর সন্দর্শন পাইবেন না। অমুমরণেও আর তাঁহার লাভ হইবে না। দেহিগণ স্ব-স্ব-কর্মফলের অনুসারে, লোকান্তরেও বিভিন্ন পথে গমন করে^২। তাই বলি নরেন্দ্র!—

অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীঃ অনুগৃহীষ নিবাপ-দন্তিভিঃ ।

‘স্বজনাত্মা কিলাতি-সমুত্তং দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে ॥ ৮।৮৬

মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ ।

‘ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে খসন্ যদি জন্তুনু লাভবানসৌ ॥ ৮।৮৭

অপগচ্ছতি মৃত-চেতনঃ প্রিয়-নাশং হৃদি শল্যমর্পিতম্ ।

স্থিরধীস্থ তদেব মন্যতে কুশলদ্বারতয়া সমুদ্বৃতম্ । ৮৮৮

ন পৃথগ্-জনবচ্ছূচো বশং বশিনামুত্তম ! গন্তুমহসি ।

দ্রুম-সান্ন্যমতাং কিমন্তরং যদি বায়ো দ্বিতয়েহপি

তে চলাঃ' ॥ ৮৯৯

গুরুদেব-কর্তৃক শিষ্য-মুখ প্রেষিত উপদেশাবলী ইন্দুমতী-বরভ, শুল্ক-হৃদয়ে শ্রবণ করিয়া গেলেন । তাঁহা প্রিয়া-হীন জীবনের সুদীর্ঘ অষ্ট পরিবৎসর কাল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক কুমারের বয়ঃ-প্রাপ্তির অপেক্ষায় অতিবাহিত হইল । জীবনের তার তাঁহার পক্ষে একান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল । তিনি একাকী ইন্দুমতীর প্রতিকৃতি দর্শন করিতেন, একাকী ভক্তভাবে বসিয়া থাকিতেন, কখনো বা, একটিবার যদি স্বপ্নেও ইন্দুমতীর দর্শন পান, এই আশায় নিদ্রা কতই না আনাশ করিতেন ?

১—রঘু, ৮৫—৮৬—শোক সংবরণপূর্ব্বক, নহবার গুরু-দেহিক ক্রিয়াবি সম্পন্ন করুন । ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যত রোদন করা যায়, ততই তাহার পরলোকে কষ্ট হইতে থাকে ।

৮৭—দেহ ধারণ করিলেই মরণ আছে, বরঞ্চ বেঁচে থাকাই আশ্চর্য্য । জন্মগণ এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কিছুদিনও আনন্দ-প্রসাদে কাটাইতে পারে, তবে সেই তাহাদিগের বখেটে লাভ ।

৮৮—মহারাজ ! শোকে এক্সপ অভিলুত হওয়া আপনার উচিত নহে । দেবুন, সৎ-পুরুষেরা কদাচ শোকের বশীভূত হইয়েন না ! মৃত্যুহই প্রিয়নাশকে হৃদয়ের শলা-স্বরূপ বোধ করিয়া থাকে । বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ, ইষ্টনাশ হইলে, শোকের কথা মূরে থাকুক, বরঞ্চ হৃদয়ের শলোদ্ধার হইল, এই বিবেচনা করিয়া থাকেন ।

৯১—মহাজন ! প্রাকৃত লোকের মায় আপনকার শোক মোহের বশীভূত হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে ; যদি বায়ু-স্তরে উত্তয়েই বিচলিত হয়, তা'র বৃক্ষ ও পর্ব্বতের বিশেষ কি ?

(চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ কৃত রঘুবংশাবাদ)

২—রঘু, ৮৫—৯২ ।

সুদৃঢ় সৌধ-গাত্রে একটি ক্ষুদ্র অশ্বখ তরু অঙ্কুরিত হইয়া, দেখিতে দেখিতে যেমন প্রাসাদটিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ, ইন্দুমতীর অসহ্য ‘শোকশলা’ অতি অল্প-কাল-মধ্যেই মহারাজ অজ্ঞের স্বায়-পঞ্জর ভগ্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল । তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন । ক্ষতি-পতি ভাবিতে লাগিলেন, ‘মৃত্যুই তাঁহার পক্ষে ভাল, আর কেন ?’ ক্রমে শোকাচ্ছন্ন নৃপতির সকল শোকের শাস্তি হইল । তিনি যুব-রাজ দশরথের হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ-পূর্বক, গঙ্গা এবং সরযূর পবিত্র সঙ্গমে প্রায়োপ-বেশনে নখর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সকল যাতনার অবগান করিলেন ।

যাহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া,—যে শাস্তি-প্রতিমার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে সংসার-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিসর্জন দিয়া, কঁাদিতে কঁাদিতে মহীপতি সংসার পরিত্যাগ করিলেন । স্বর্ঘ্যবংশের রাজ-সংসারে একটা প্রবল শোকের ঝড় বহিয়া গেল । সেই তুমুল ঝড়ে স্বাবর-জন্ম জগৎও বেন আন্দোলিত ও আকুলিত হইল, বিবাদের প্রগাঢ় অন্ধতমসে ডুবিয়া গেল । আর কবির কবি কালিদাস সেই শোক-গাথা গান করিয়া, ত্রিজগৎকে কঁাদাইলেন, নিজেও করুণ-কণ্ঠে কঁাদিয়া কঁাদিয়া, অশ্রু-প্রবাহে, তাঁহার উপাস্ত-দেবতা সরস্বতীর চরণ প্রক্ষালিত করিলেন । বিগত প্রেমের দৃষ্টান্তে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিমুগ্ধ করিলেন ।

একবিংশ অধ্যায় ।

দশরথ ।

যুবরাজ দশরথ, মহারাজ অজ্ঞের শোকাশ্র-দিত্ব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । প্রজারঞ্জন অজ্ঞের প্রায়োপবেশন-মরণে অযোধ্যার রাজধানীস্থ সকলেই মর্শ্মাহত । রাজসংসারে গভীর শোকের একটা গাঢ় আবরণ পড়িয়াছে । মহারাজ দিলীপের সময় হইতে অজ্ঞের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, যে অযোধ্যায় কেহ কখন বিশাদের মুখ দেখে নাই, এই সুদীর্ঘকাল, আমোদ আহ্লাদের অমৃত-সাগরে যে অযোধ্যা নিরন্তর নিমগ্ন ছিল, আজ সেই সুখের অযোধ্যায় কালকীট প্রবেশ করিল । অযোধ্যাবাসিগণের সুখরূপ নির্মল আকাশে ঘন-ক্লম্ব মেঘের আবির্ভাব হইল । হয়ত, কালে এই মেঘ ‘অগ্নিবর্ণ’-প্রলয় মেঘে পরিণত হইয়া, অনল-বর্ষণ-পূর্বক, সোণার অযোধ্যা ভস্মসাৎ করিবে ।

চিরদিন কখন সমান যায় না । তোমার জীবনে একবার যদি বিবাদের রেখাপাত হয়, তবে, আমরণ তোমাকে ঐ রেখা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে । কত সোণার সংসার,—সুখ-শান্তির আবেশময় উৎসঙ্গে সুবৃন্দ .সংসার, হঠাৎ একটা হৃদৈব-সম্পাতে চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! হৃদৈব, অজুর-রূপে প্রবেশ-পূর্বক, প্রকাণ্ড মহীকহের আকার ধারণ করিয়া, সূদৃঢ় সংসার-ভিত্তি শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ! আজ অযোধ্যার রাজ-সংসারেরও সুখের স্বপ্ন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল । তথায় বিবাদ ভূজঙ্গ-শিশু এই প্রথম প্রবেশ করিল । কালে ইহার প্রভাবে যে কতদূর কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

রাজ্য দশরথ সংসারে প্রবেশ করিবার সময়েই একটা মহা অমঙ্গলের ছায়া-স্পর্শ করিলেন । সূর্য্যবংশের চিরপবিজ্ঞ রাজসিংহাসনে, পূর্বে কোন যুবরাজ বখন অভিষিক্ত হইতেন, তখন কত আমোদ, কত সমারোহ হইত;

আর এই দশরথের অভিষেক হইয়া গেল, তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইলেন, কিন্তু প্রজাগণের আর সে আনন্দ নাই, সে প্রীতি নাই ; কর্তব্যের অনুরোধে তাহার দশরথের অভ্যর্থনা করিল মাত্র, কিন্তু প্রাণের সহিত উৎসবে যোগ দিতে পারিল না । এই সমস্ত পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, যাহার জীবনের প্রভাত, এই প্রকার অবসাদ-কুস্রাটিকার মধ্যবর্তী, তাহার জীবনের সায়াংকাল না জানি কতই ভীষণ ।

সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী ইন্দুমতীর সহসা অন্তধানের পর অবোধ্যার রাজ-সংসারে যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিল, সে—কোমল-হৃদয় দশরথের জীবন বিভ্রম্যনাময় করিবে, শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতির সংসার ভাঙ্গিয়া দিবে, সোণার অবোধ্যা-রাজ্যে অশানে পরিণত করিবে, পরিশেষে, তরুণ নরপতি অগ্নিবর্ণের প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া, সে আত্মতৃপ্তি সাধন করিবে ।

মহারাজ অজ, জীবিতকালে, যুবরাজ দশরথকে সকল বিষয়েই বশেষরূপে শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । দশরথ রাজা হইয়া, পিতৃপদাঙ্ক অমুসরণ পূর্বক, দক্ষতার সহিত বিশাল কোশল-সাম্রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন । তাহার হৃদয় অতিশয় কোমল । আমোদ-প্রমোদ তাহার অতিশয় প্রিয় ছিল । ঋতুরাজ বসন্তের সনাগমে রাজ্যের সর্বত্রই নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ-উৎসবের তরঙ্গ । রাজার অন্তঃকরণও অতিশয় প্রফুল্ল । তিনি ভোগময় বসন্তকে রাজোচিত ঐশ্বর্য্য সহকারে ভোগ করিলেন । কালিদাস সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের অপৰ্য্যন্ত কোনরূপ ভোগ-তৃষ্ণার পরিচয় প্রদান করেন নাই । দশরথের এই বসন্ত-সন্তোগ-বৃত্তান্ত-বর্ণনে, কালিদাস, অতি কৌশলে, দশরথ-চরিত্রের একটা দিক একটু দেখাইয়া গেলেন । এই দিকটা, হয়ত দশরথের একটু দুর্বল ছিল । এই জন্তই বুঝি, বুদ্ধ বয়সে, তাহার উপর তরুণী মহারানী আধিপত্য একটু প্রবল হইয়াছিল ?

দশরথ মৃগয়া-প্রিয় ছিলেন । মৃগয়ায় নির্গত হইলেন । কোমল-হৃদয় নৃপতি মৃগয়া করিতে গিয়াও কোমলতার হাত এড়াইতে পারিতেন না । মৃগয়াকারী যদি লক্ষ্যীকৃত শরবো বাণ-নিষ্ক্ষেপে কোন কারণে বাধা-প্রাপ্ত হইলেন, কিংবা শরবাই যদি কোন প্রকারে, সেই অব্যর্থ-সন্ধান বধকর্তার নিশিত বাণ ব্যর্থ করিতে পারে, তবে তাহাতে মৃগয়াকারীর যে প্রকার মনোবেদনা জন্মে, তাহা বর্ণনীয় নহে । কিন্তু দশরথের অন্তঃকরণ এমনই কোমল ছিল যে, তিনি লক্ষ্যীকৃত মৃগকে বাণ-বিদ্ধ করিতে করিতেও করেন নাই, করুণ-হৃদয়ে তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন । নিজের উত্তোলিত ধনু হইতে বাণ সংহার করিয়াছেন । সে অতি বিচিত্র দৃশ্য । তিনি, হয়ত কোন হরিণকে লক্ষ্য করিয়া বাণ-সন্ধান করিয়াছেন, বাণক্ষেপ করেন আর কি, এমন সময়ে দেখিলেন যে, হরিণী আসিয়া তাহার প্রাণেশ্বরের দেহ স্বদেহে অন্তরিত করিয়া রাজার বাণের পথে দাঁড়াইল । অমনি নরেন্দ্র কৃপা-বিগলিত-চিত্তে হরিণ-দম্পতিকে মুক্তি দিলেন । অমন প্রণয়ে বাঘাত করিতে প্রণয়ী দশরথের প্রবৃত্তি হইল না । ধনু-যোজিত শর প্রতিসংহারপূর্বক, তুণীয়ে পুনঃস্থাপিত করিলেন । এতই কোমল তাঁহার অন্তঃকরণ ।

তিনি কতবার কত মৃগের প্রতি বাণক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়করে ধনু-ধারণ পূর্বক, আকর্ণ শিজিনী কর্ষণ করিয়াছেন, প্রাণ-ভয়াৰ্ত্ত মৃগ, অতিভ্রমে, তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়াছে, বাণ-পাতের আর বিলম্ব নাই, এমন সময়ে দশরথ তাঁহার কর্ণাস্ত-বদ্ধ দৃঢ়মুষ্টি শিথিল করিলেন, বাণক্ষেপ আর করা হইল না । পলায়মান মৃগের সেই ভয়-চকিত নয়ন-দর্শনে, তাঁহার হৃদয়ে, তদীয় মৃগাক্ষী মহিষীর চঞ্চল নয়ন ভাসিয়া উঠিল : স্নিগ্ধ-হৃদয়, নরনাথের আর সে মৃগ হনন করা হইল না । এমনই কোমল তাঁহার অন্তঃকরণ ।

কালিদাস বহির্ভাগতের প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্য যেমন তন্ন তন্ন করিয়া নিজে দেখিতেন, অপরকেও দেখাইতেন, অন্তর্ভাগতের অল্পম সৌন্দর্য্য-সমূহও তেমনই পুষ্পানুপুষ্পরূপে দেখিতে পাইতেন, অন্তর্ভাগেও দেখাইতেন । মহারাজ দশরথের হৃদয়-বৃত্তি যে কিরূপ মুহু, কিরূপ নবনীতবৎ কোমল ছিল, তাহা কবি, উপরি-স্থত ঐ দুইটি চিত্রের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন । হৃদয়ে এতাদৃশ মুহুত্বের অতিপ্রভাব পরাক্রান্ত নরপতির পক্ষে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থল-বিশেষে ইহাতে অনেক কুফলও ফলিয়া থাকে । এই অতিমূহুত্ব-রূপ রশ্মি আকর্ষণ করিয়াই, কৈকেয়ী রাজহৃদয় বশীভূত করিয়াছিলেন ও রামচন্দ্রকে নির্বাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । কোন বিষয়েই অতি-প্রিয়তা ভাল নহে । যুগয়া দশরথের অতি প্রিয় ছিল । তিনি সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষও ছিলেন । পরোক্ষে কোন প্রকার শব্দ হইলেও, সেই শব্দ উদ্দেশ করিয়া দশরথ বাণক্ষেপ করিতেন । নিমেষমধ্যে, বাণ শব্দকারীর প্রাণ সংহার করিত । অন্ধমুনি-তনয় সিন্ধুর ‘কুন্ত-পূরণ-সম্ভব’ শব্দ শুনিয়া সেই নির্জন গহন বনে, করিশব্দভ্রমে, দশরথ তাঁহার শব্দপাতী বাণক্ষেপ করিয়া অন্ধের বাট সিন্ধুর জীবন-শেষ করিলেন । সূর্য্যবংশের সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কুবলয়দল সহসা মলিন হইবার উপক্রম করিল । নরহত্যা হইল । ইন্দুমতীর অপঘাত-মরণে এবং অজ্ঞের প্রায়োপবেশনে অযোধ্যার রাজসংসারে যে অমঙ্গলের ছায়া-পাত হইয়াছিল, এবার দশরথকৃত এই নরহত্যায় তাহার মূর্ত্তি আরও একটু ফুটিয়া উঠিল । বুঝিতে পারা গেল ‘সে, সূর্য্যবংশের সুগঠিত প্রাসাদ-মন্দিরে অশ্বখ-প্ররোহ জন্মিয়াছে, ক্রমে বাড়িতেছে । অজ্ঞের শোকাশ্রতপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়াতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, দশরথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নহে । তার পর এই ঘটনায় আরও বুঝা গেল যে, মহারাজ দশরথ ছরদৃষ্ট । সূর্য্য-বংশের ভবিষ্যৎ

স্বপ্নের নহে । জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, সূর্য্যবংশীয় নৃপতির কৰ্ম্ম-
দোষে আজ পবিত্রকূলে পাপস্পর্শ হইল ।

দশরথের প্রবল প্রতাপ । ভারতের তাবৎ রাজত্ব-বন্দ তাঁহার অধীন,
সামন্ত নৃপতি-রূপে গণ্য । তিনি যখন যজ্ঞাভিষ্ঠান করিতেন, তখন,
স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্ত দশরথের যজ্ঞভূমিতে স্বয়ং
অবতীর্ণ হইতেন । তাঁহার এমনই সম্মান, এতই প্রভাব । ইন্দের
নিকটে তাঁহার মন্তক অবনত হইত, নতুবা পৃথিবীর অন্ত কোন নৃপতির
নিকট তাঁহার শির নত হইত না^১ । এই একটি চিত্রে কালিদাস মহারথ
দশরথের বীরত্বকাহিনী বিবৃত করিলেন । এত অল্প কথায়, এমন পরিম্ফুট-
ভাবে, একজন প্রবল-পরাক্রম মহাপতির বীরত্ববর্ণন অল্পত্র চূর্ণভ ।

এইভাবে, অতি তেজস্বিতার সহিত, দশরথ বহুকাল রাজত্ব করিলেন ।
চূর্তাগাক্রমে, তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি জন্মিল না । কোশল-সাম্রাজ্যের
ভাবী অধিপতির অভাব-চিন্তায় মনস্বী দশরথ তদীয় প্রপিতামহ দিলীপের
শ্রায় মধ্যে মধ্যে একটু বিমনা হইয়া পড়েন^২ । কালিদাস জীবহৃদয়ের
প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কৈশিকা পর্য্যন্ত এত সূক্ষ্মভাবে চিনিতেন যে, কখন
কোন্ শিরায় কি রক্ত প্রবাহিত হয়, কখন হৃদয়ের কোন্ প্রান্তে কিরূপ
ভাবের উদয় হয়,—তাহা তিনি অভিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববিদের শ্রায়, নিপুণ
জ্যোতির্বিদের শ্রায় বুঝিতে পারিতেন । সংসারের সর্বপ্রধান আকর্ষণ
অপত্য । কালিদাস, যখনই অবসর পাইয়াছেন, তখনই এই আকর্ষণী
ধারা তাঁহার সামাজিকগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন ।

সংসারের এই ‘সদ্যঃশোক-তমোপহ’ সন্তানের অভাবে দশরথ বড়ই
দুঃখ । এমন সময়ে, অত্যাচারি-রাবণ-কর্তৃক একান্ত বিড়ম্বিত হইয়া,
প্রতিকার-বাসনার দেবগণ জীরোদ-শয়ন-সুপ্ত বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত

হইলেন । সমবেত দেববৃন্দ, মর্ষের বেদনা জ্ঞাপন করিয়া সেই জলশায়ী বিশ্বরূপের কত স্তব করিলেন ।

কবি কুল-কেশরী কালিদাস স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভার মোহনমঞ্চে বেন, পাঠকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া অকস্মাৎ অযোধ্যার রাজধানী হইতে, নিমেষমধ্যে, সেই সমুদ্র-তলে, ‘ভোগিভোগসমাসীন’ মহাবিশ্বুর পাদ-প্রান্তে লইয়া গেলেন ।

একবার কুমার-সম্ভবে, কবি, ইন্দ্রাদি-দেব-গণের সহিত পাঠক-দিগকেও, হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা ব্রহ্মার চরণ-প্রান্তে লইয়া গিয়াছিলেন । হ্রস্ব তারকাসুরের কারাগারে বন্দীকৃত সুরললনাগণের লাজনার বর্ণন করিয়া নির্বিকার স্বয়ম্ভুর সহিত পাঠকদিগকেও কাঁদাইয়াছিলেন । হিন্দুর ধর্ম-প্রবণ হৃদয়ের অন্তস্তলে বেদনার একটা থরশ্রোণ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন । আবার এখন, এই রঘুবংশের দশমসর্গে, প্রবীণ কবি কালিদাস, হ্রস্ব-রাবণ-কৃত অত্যাচারে ব্যথিত দেবগণের আন্তরিক বেদনা বর্ণন-দ্বারা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমকেও ব্যথিত করিয়া তুলিলেন । দয়ার্ণব মধুসূদন অবধ্য রাবণের অত্যাচার স্মরণ করিয়া, জগতের মঙ্গলের জন্ত কত কষ্ট—কত লাজনা স্বীকার করিলেন । বলিলেন—‘দেবগণ ! ভয় নাই, আশ্বস্ত হও, আমিই প্রতিবিধান করিব !’

সোহং দাশরথিভূত্বা রণ-ভূমের্বলিঙ্গমম্ ।

করিয়ামি শরৈস্তীকৈস্তচ্ছিরঃ-কমলোচ্চয়ম্ ॥

. অমিতপরাক্রম রাবণ স্বকীয় পাশব-ক্ষমতা-বলে জগতের কত অকল্যাণ—কত অমঙ্গল করিতেছিল । জগন্নাথের মঙ্গলময় রাজ্যে যথাসময়ে

১—রঘু, ১২-৩৪-সংপ্রতি আমি সূর্য্যবংশাবতঃস দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া নির্ণিত গরের দ্বারা সেই পাণিষ্ঠ রাবণের মস্তকাবলী ছিন্ন করিব, এবং সেই মস্তকারূপ কমলের দ্বারা রণভূমির অর্চনা করিব ।

তাহার প্রতিকারের স্বরূপাত হইল। বিধাতা অত্যাচারীর অত্যাচার-শাস্তির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

• রঘুবংশের কবিতাবলী-রূপ মধুর উদ্যানের মধ্যে, সর্বত্রই দেখিতে পাই, যে একটা প্রবল সমাজ-হিতৈষণা, লোক-হিতৈষণা, ততোধিক,— একটা প্রবল ধর্ম্মভাব যেন অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ত্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঐতিহ্যে, প্রতিকথায়, প্রতিবর্ণে কবির লোক-শিক্ষা প্রবৃত্তি এবং জগতে সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব-প্রচার-বাসনা জাগরুক রহিয়াছে। পবিত্র চরিত্রের আলোচনায় দেশের তথা সমাজের যে অশেষ মঙ্গল হয়, ইহা কবি বিদিত ছিলেন, তাই অবসর পাইলেই, তিনি তাদৃশ চরিত্র-চিত্রণ দ্বারা জগতের অসীম হিতসাধন করিয়াছেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

রাম ।

দশরথের রাজ-প্রাসাদে, মাহেন্দ্রক্ষেপে রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্ন—কুমার-চতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করিলেন । এ দিকে ঠিক সেই সময়ে,—রামচন্দ্রের উৎপত্তি-ক্ষেপে, দশাননের কিরীট-বদ্ধ মণি-মালিকার স্থল-স্বচ্ছ মণিগুলি ঝর ঝর করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল । যেন রোহদ্যামানা রাক্ষস-কুল-রাজলক্ষ্মীর মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু, এই প্রথম, পৃথিবীতে পতিত হইল ।

কবি তদীয় রঘুবংশের ভবিষ্যৎ নায়কের জন্ম-মুহূর্ত্তেই তাঁহার শক্তিমত্তার বিলক্ষণ আভাস প্রদান করিলেন । রামচন্দ্রের অন্ত কোন বিশেষ বীরত্ব-গাথা কীর্ত্তন না করিলেও কেবল এট বর্ণনাটার দ্বারা, সে সমস্ত অনুমান করিতে পায়া যায় ।

কালে ছরস্ত রাবণের সহিত রামচন্দ্রের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে, এবং সেই যুদ্ধের যে ফলাফল হইবে, তাহা জ্ঞাত হইবার আকাঙ্ক্ষা পাঠক-মাত্রেই জন্মিবার কথা । সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইলেই ত রঘুবংশেরও প্রতিপাদ্য সূ-সম্পূর্ণ হইল, অথচ সে আকাঙ্ক্ষার যদি বিলোপ ঘটে, তবে সেই সঙ্গে, কাব্যপাঠেরও উৎসাহ-হানি হইবার সম্ভব; তাই মহাকবি মধো মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা একটু একটু বৃদ্ধি করিতেছেন । সেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পূর্বাভাস-স্বরূপে, প্রসঙ্গক্রমে, রাম-রাবণের প্রতিযোগিতার একটু একটু উল্লেখ করিতেছেন । পাঠক মধো মধো বুঝিতে পারিতেছেন যে, কালে রাম-রাবণের মধ্যে কি ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইবে । পাঠকের কৌতূহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে । রচনা-নৈপুণ্যের ইহা পরম উৎকর্ষ ।

যখন রামের শরে, ‘বহল-কপা-ছবি’ ‘নর-কপাল-কুণ্ডলা’ ‘পুরুষাভ্র-মেখালা’-ধারিণী তাড়কা পতিত হইল, তখন তাহার বিরাট দেহের ভারে কেবল যে বনভূমিই কম্পিত হইয়াছিল, তাহা নহে, ত্রিলোক-বিজয়-পূর্বক, রাবণ যে চঞ্চলা কমলাকে চিরস্থির! মনে করিয়া স্থানয়ে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তিনি পর্য্যন্তও হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিলেন^১ । রাম-রাবণের ভবিষ্যৎ সঙ্ঘর্ষের যে পরিণাম, তাহার একটা সাধারণ আভাস দিয়া, কবি পাঠকদিগকে আশস্ত করিলেন ।

কালিদাস তাঁহার বর্ণিত চরিত্রের কোন স্থলেই কোন প্রকার ক্রটি রাখিতেন না । দুর্বলতার কোন চিহ্নই তদীয় নায়ক-নিচয়ে পরিলক্ষিত হয় না । তিনি বিলক্ষণ-রূপে জ্ঞাত ছিলেন যে, বাহা অসুন্দর, তাহার সমস্তই অসুন্দর, অসুন্দরের আর শ্রেণী-বিভাগ চলে না । তাই তাঁহার বর্ণনায়, কোন স্থানে অসুন্দরের রেখা মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না ।

যজ্ঞের বিঘ্নভূত রাক্ষসদিগের বধের নিমিত্ত, বিশ্বামিত্র যখন বালক রাম-লক্ষ্মণকে যজ্ঞভূমিতে লইয়া গেলেন, তখন ধনুর্ধর রাম একবার উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, আকাশমণ্ডল শত সহস্র রাক্ষসে সঙ্কুল, বুঝি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সমগ্র যজ্ঞ-স্থলে একটা প্রলয় করিয়া বসিবে । বালক রামচন্দ্র কিন্তু, তাহাদের যে দুইজন অধিপতি, কেবল তাহাদিগকেই শরবা করিলেন । গুরুত্ব যেমন ‘মহোরগ’ ব্যতীত, দুর্বল নগণ্য জল-সর্পের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না, তজ্জপ রাম অপরাপর রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করিলেন না^২ । দাস্ত রাম-চরিত্রের অল্প একটা বিশেষ ভ্রষ্টব্য অংশ কালিদাস এইবার অতি সুস্পষ্ট-ভাবে প্রদর্শন করিলেন ।

১—রঘু. ১১শ—১৫, ১৬ ।

১১—বাণ-ভিন্ন-হৃদয়া নিপেতুর্বা সা সন্ধানভুবা ন কেবলাৎ ।

বিষ্টপ-ত্রয়-পরাজয়-স্থিরাং রাবণ-জিয়মপি ব্যাকুলানং ।

২—রঘু. ১১শ—২৭—ভজ বাধবিপতী বধ-বিধাং ভৌ শরব্যমকরোং স নেভরান্ ।

কিং মহোরগবিসর্পি-বিক্রমঃ স্নানিলেহু গুরুভঃ প্রবর্ত্ততে ?

নির্ঝর্যে বজ্র-সমাপ্তি হইলে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের নিকট মিথিলাপতির সেই অশক্যভঙ্গ ‘হরধনু’ বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন । বালক-সুন্দর-কৌতূহল-নিবন্ধন এবং ক্ষাত্রতেজের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে রাম সেই অনন্ত-দুরানম চাপ দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন । বিশ্বামিত্রও তাঁহাদিগকে মিথিলার রাজসভায় লইয়া গেলেন । মিথিলেশ্বর, ‘প্রথিত-বংশ’-সম্বৃত বালক রাম-লক্ষণের ‘ললিত’ কলেবর এবং অনন্ত-দুরানম হরধনু,—এতদুভয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিষম হইয়া পড়িলেন । মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, ‘আমি কেন আমার ছুহিতার পরিণয়ে এই ধনুর্ভঙ্গ-পণ করিয়াছিলাম ? আহা, বালকের কি মধুর আকৃতি ! যদি ইহারা ধনুর্ভঙ্গ করিতে না পারে, তবে উপায় ?’ পবিত্র আকৃতির এমনই একটা ঐশী শক্তি যে, তাহার নিকট সকলকেই পরাজিত হইতে হয় । যাহা সুন্দর, তাহার জয় সর্বত্র ।

রামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে সেই বিশাল হর-চাপ ভগ্ন করিলেন । সভাস্থ অপরাপর নৃপতি-বৃন্দ ‘বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে’ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন । পৃথিবীর অন্তান্ত অনেক দৃঢ়কায় নৃপতি যে ধনু উত্তোলন করিতে না পারিয়া সলজ্জবদনে প্রোহান করিয়াছেন, সেই ধনু শিশু রামচন্দ্র ভগ্ন পর্য্যন্ত করিলেন, ইহাতে জনকের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না । তিনি, যে ধনু-ভঙ্গ-পণের জ্ঞাত পূর্বে অনুশোচনা করিয়াছিলেন, এইক্ষণ তাহারই আবার মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন—‘এরূপ কঠোর পণ যদি না করিতাম, তবেত এমন জামাতা পাইতাম না’ ।

রামচন্দ্র বালক । এই বাল্যকালেই তিনি যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিলেন, তাহা জগতে দুর্লভ । সূর্য্যবংশের অস্ত্র কোন নরপতি, বাল্য

১—রঘু, ১১শ—৩৬—ভক্ত বীক্ষ্য ললিতঃ বণুঃ শিশোঃ পার্শ্বিকঃ প্রথিত-বংশ-জয়নঃ ।

স্বং বিদিত্বা চ ধনুর্হু রানমঃ পীড়িতো ছুহিত-শব্দ-সংহরা ।

২—রঘু, ১১শ—৪৫, ৪৬ ।

ত দূরের কথা, যৌবনেও এমন বীরত্ব অতি কমই প্রদর্শন করিতে পারি-
রাছেন । তাড়কা-বধ, যজ্ঞ-বিঘ্ন-কারী রাক্ষসদিগের নিধন এবং হরধনুর্ভঙ্গ
—এই ঘটনাট্রয়ে শিশু রামচন্দ্র স্বকীয় অতুল বীরত্বের যে পরিচয় দিলেন,
তাহাতে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইল । এই শিশু যৌবনে যে কীদৃশ
শক্তি-সম্পন্ন হইবে, এষ্ট চিন্তায় অপরাপর নৃপ-তিগণ একটু স্তান হইলেন ।

• জনক প্রথম-চিন্তে রামচন্দ্রের হস্তে সীতা-সম্প্রদান করিলেন । লক্ষণ
জানকীর কনিষ্ঠা, জনকের ঔরসী-কন্যা উশ্মিলার পাণিপীড়ন করিলেন ।
ভরত এবং শত্রুঘ্ন পূর্বেই দশরথের সহিত মিথিলায় আনীত হইয়াছিলেন,
তাহাদের করে যথাক্রমে কুশধ্বজ-ছহিতা মাণ্ডবী এবং শ্রীতকীর্তি অর্পিত
হইলেন । দশরথ আনন্দ-পূর্ণ-হৃদয়ে, পুত্র-পুত্রবধূগণের সহিত অবোধায়
যাত্রা করিলেন । পশ্চিমধ্যে ক্ষত্রিয়-কুলাস্তকারী পরমবিক্রম পরশুরাম
উপস্থিত হইয়া, ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, “রাম ! শুনিলাম জগতের
অস্ত্রান্ত নৃপতি-গণ, মিথিলাপতির পণীকৃত যে ধনু উত্তোলন করিতেও
পারেন নাই, তুমি নাকি সেই মহাধনু হাসিতে হাসিতে ভাঙ্গিয়াছ ? এই
কথা শ্রবণ করা অবধি, আমার মনে হইতেছে যে, এতদিনে আমার
বীৰ্য্যরূপ উন্নত পর্বতের শৃঙ্গ যেন ভগ্ন হইল । এতকাল জগতে ‘রাম’
বলিলে আমাকেই বুঝাইত, তোমার এই অভ্যুদয়ে, আজ হইতে সেই
রামনামে তুমিই বোধিত হইবে,—এই কথা ভাবিতেও আমার লজ্জা
জন্মে । অতএব, আমার এমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি তাহার
শৈশবেই নিধন করিব ।” ক্রমে উভয়ে বিষম যুদ্ধ বাধিল । প্রৌঢ় দশরথ,
ক্ষত্রিয়-কুল-ধুম-কেতু ভার্গবের অতীত বীরত্ব-কাহিনী স্মরণ করিয়া

১—রঘু, ১১শ—১২—মৈথিলস্ত্র ধনুর্ভঙ্গ-পাণ্ডিবিঃ স্বং কিলানমিতপূর্ববক্ষণোঃ ।

ভদ্রিশ্য ভবতা সমর্থয়ে বীৰ্য্য-শৃঙ্গনিব ভগ্নশৃঙ্গনঃ ।

১৩—অস্ত্রাণা জগতি রাম ইত্যয়ং শব্দ উচ্চারিত এব মানবাণঃ ।

ব্রীড়নাবহতি যে স সম্প্রতি ব্যস্তবৃত্তিরদ্যোদ্যুতৌ হরি ।

মুহূৰ্হঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন । তিনি বড় আশ্চর্য করিয়া, জ্যেষ্ঠ তনয়ের ‘রাম’ এই নাম রাখিয়াছিলেন । আজ ভাবিতেছেন যে, অজ্ঞ নামও ত অনেক ছিল, তবে আমি কেন আমার পুত্রের ‘রাম’ নাম রাখিলাম ? কিন্তু অচিরেই রামচন্দ্র বিজয়ী হইলেন । তিনি পরাজিত পরশুরামকে ক্ষমা করিলেন । পরশুরামও রামের অনুগ্রহে চিরনিৰ্কাণ প্রাপ্ত হইলেন । কবি, রামের চরিত্র-রূপ সমুন্নত সৌধের আর একটি কক্ষ যেন খুলিয়া দিলেন । সামান্য শত্রু নয়, যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন, তাদৃশ মহাবল-সম্পন্ন শত্রুকেও ক্ষত্রিয়-কুল-ভূষণ রাম ক্ষমা করিলেন, ইহাতে বীরত্ব অপেক্ষা রাম-হৃদয়ের মহনীয়ত্বই সমধিক প্রকাশিত হইল । রামের সমস্তই যেন অদ্ভুত—আশ্চর্য্যাপূর্ণ । তাহার যেমন শৌর্য্য তেমনই গান্ধীৰ্য্য, যেমন উৎসাহ তেমনই ক্ষমা, সবই অলৌকিক ।

কতিপয় দিনের মধ্যেই দশরথ, পুত্র-পুত্রবধূগণের সহিত অযোধ্যায় উপনীত হইলেন । রাজলক্ষ্মীরূপিণী বধূদিগের রাজধানী প্রবেশে অযোধ্যায় যেন আনন্দের হাট বসিল । এত আনন্দ, এত সুখ অযোধ্যায় বুঝি আর কখনও হয় নাই । প্রজাকুল পরমোৎসাহে রাজপুত্র রামচন্দ্রের বিজয়-গাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল । মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশের একাদশ সর্গে, রামচরিত্রে প্রকাণ্ড, কোমলত্ব এবং তেজস্বিত্বের সহিত মধুরত্বের সমাবেশ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পাঠকদিগকে বিন্মিত করিয়াছেন ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

বনবাস ।

দিনে দিনে রামচন্দ্রের অভ্যাদয় হইতে লাগিল । এ দিকে বৃদ্ধ রাজা দশরথেরও ক্রমে বিষয়-ভোগে বিরক্তি জন্মিয়া আসিল । উষাকালের প্রদীপ-শিখার ছায়, তাঁহার নির্বাণ ক্রমে সমীপবর্তী হইতে লাগিল । বার্কক্যাগমনের খেত বৈজয়ন্তিকারূপে, প্রথমতঃ মানবের কর্ণমূলের কেশ পরিপক্ব হয় । দশরথেরও তাহাই হইল । অথবা—

তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্ততামিতি ।

কৈকেয়ী-শক্য়েবাহ পলিতচ্ছদ্যনা জরা' ॥

প্রগল্ভা রাজ্ঞী কৈকেয়ীর ভয়ে, বুঝি জরা বৃদ্ধ মহারাজের কর্ণমূলে আসিয়া গোপনে বলিল যে, 'আর কেন ? রামচন্দ্রের হস্তে রাজ-লক্ষ্মীকে অর্পণ কর ।' কিয়ৎকাল পরেই কৈকেয়ীর যে মর্শ্বচ্ছেদিনী ক্রিয়া দর্শন করিতে হইবে, কবি, পূর্ব হইতেই তজ্জ্ঞাত, পাঠকদিগকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের উপর প্রোড়া কৈকেয়ীর আধিপত্যও যে ক'ত দূর, তাহাও আতি কৌশলে ঈঙ্গিত করিয়া গেলেন ।

উপযুক্ত সময় ভাবিয়া, দশরথ রামের বৌব-রাজ্যাভিষেকে অভিলাষ করিলেন । এই সুখ-সংবাদ কণমধ্যে রাজ্যের সর্বত্র প্রকাশিত হইল । রাজ্যের সমগ্র অধিবাসী প্রজা-হৃদয়-রঞ্জন রামের এই অভ্যাদয়-শ্রবণে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল । অযোধ্যার অপ্রতিরথ বীর রামচন্দ্রের অভিষেকোৎসব যে ভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত, প্রবীণ দশরথ তদনুরূপ আয়োজন করিলেন । সমস্ত প্রস্তুত । রাজধানীর বন, উপবন, প্রাসাদ,

বীথিকা-বিপণি—সমস্ত সজ্জিত হইল। অযোধ্যায় এত আনন্দ কেহ কদাচ দেখে নাই। দীপালোকে অযোধ্যানগরী রাঁকা-রজনীর ছায়া হাসিতে লাগিল। কাল তাহার রাম রাজা হইবেন। কিন্তু তাহা আর হইল না। ‘ক্রুর-নিশ্চয়া’ কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রাম নির্বাসিত হইলেন। বিমাতা কৈকেয়ী রাহুর আকার ধারণ করিয়া, যেন অযোধ্যার শারদ-পূর্ণ-শশীকে অতর্কিতভাবে গ্রাস করিল^১। অকস্মাৎ সমগ্র কোশলরাজ্য বিবাদের ‘স্থিতি-ভেদ্য’ অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। কাল রাজা হইবেন—বলিয়া, যিনি, অধিবাস-দিবসীয় মঙ্গল ক্ষোভাদি ধারণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি বনবাসোচিত বক্সাদি পরিধান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কোন ভাবান্তর ঘটিল না। রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন—ভাবিয়া, যেমন রাম অতি প্রসন্ন হইবেন নাই, বনবাসী হইবেন—ভাবিয়া তেমনই তিনি অতি অপ্রসন্নও হইলেন না। রামের সমস্তই অদ্ভুত^২ ! তিনি প্রসন্ন-হৃদয়ে মাতাপিতৃ-চরণে প্রণাম পূর্বক বনবাসের জন্ত দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। সাধবী জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অযোধ্যায় যেন জীবন চলিয়া গেল। সোণার অযোধ্যা মৃতদেহের ছায়া হত-স্ত্রী হইয়া পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ পুল-শোকের গুরুভার সহ্য করিতে পারিলেন না। জন্মের মত নয়ন-মুদ্রণ করিয়া, কৈকেয়ীর হস্ত হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিলেন^৩।

১—রঘু, ১২শ—৪।

২—রঘু, ১২শ—৭—পিত্রা দত্তাং রদন্ রামঃ প্রাচ্যহীং প্রভাপদাত।

পশ্চাদ্ বনায় গচ্ছতি তদাজ্ঞাং মুদিতোহগ্রহীৎ।

৩—দধতো মঙ্গলকৌমে বসানন্ত চ বক্সলে।

দদুগুর্কিন্মিতান্তস্ত মুখরাগং সমং জনাঃ।

৩—রঘু, ২শ—১০।

দিষ্টাস্তমাপ্ততি ভবানপি পুত্র-শোকাৎ

অস্ত্যে বয়স্হমিব' ।

বলিয়া, পুত্র-শোক-কাতর মুমূর্ষু অকুমুনি দশরথকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, এতদিনে সেই—ব্রহ্মশাপ সফল হইল। অযোধ্যায় মহা অরাজক উপস্থিত হইল। ছিদ্রাধ্বেশী প্রতি-পক্ষ নৃপতিগণ অবসর বুঝিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে, অযোধ্যারাজ্যের সুখ-সম্পদ স্বপ্নের স্থায় কোথায় উড়িয়া গেল !

কবিশঙ্কর বাম্বীকি এই সকল স্থলে, শোকের যে সমুদয় অপ্রতিম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। রামের বনগমন-সময়ে, সীতা, অনুগামিনী হইবেন বলিয়া, রামচন্দ্রকে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, লক্ষণ যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা এতই করুণ, যে পাঠ করা যায় না। যখন রাম লক্ষণ ও সীতা অযোধ্যা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, প্রজাবন্দ, তাঁহাদিগকে কিয়দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া, রোদন করিতে করিতে রাম-শূন্ত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল, তখনকার চিত্র দর্শন করিলে পাষাণও বিগলিত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বুঝি শতধা বিদীর্ণ হয়। কবিকুলপতি কালিদাস দেখিলেন যে, না,—বাম্বীকি-বর্ণিত ঐ সকল অনুপম চিত্রের আর পুনশ্চিত্রণের আবশ্যকতা নাই, আর উহা অতি দুষ্করও বটে;—তাই তিনি মাত্র দুই তিনটি শ্লোকে, রামায়ণের প্রায় ৫৭টি অধ্যায় বিবৃত করিলেন। বাম্বীকির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন না।

সংসারে স্বার্থের করাল-ছায়া-পাত হইলে, তাহার পরিণাম যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হয়, কবি তাহা বর্ণে বর্ণে বুঝাইয়া দিলেন। কৈকেয়ী ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইবার আশায় রামকে নির্বাসিত করিলেন,

১—রঘু, ৯২—৭২ ।—আবার স্তায় তুমিও বৃদ্ধ বয়সে দুঃসহ পুত্র-শোকে প্রাণত্যাগ করিবে।

মহাপাপ সঞ্চয় করিলেন । ভরত 'রাজ্য-ভূষণ-পরাবৃত্ত' হইয়া জননী-কৃত সেই মহাপাপের যেন প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । অপরাধিনী কৈকেয়ী পুত্রের এই দেবোচিত ব্যবহারে মর্মে মর্মে মরিয়া গেলেন ।

নির্দাসিত রাম, সীতা এবং লক্ষণের সহিত, অযোধ্যা ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন । নির্জন বনে, তাঁহারা তিনজনে, পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান । ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, বহু ফলমূলের দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ প্রশমন করেন । এই ভাবে যৌবনেই তাঁহারা বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুগণের কুলত্রত বানপ্রস্থ আশ্রয়-পূর্বক, দিনপাত করিতে লাগিলেন । রাজ-পুত্র রামচন্দ্র যখন আতপ-তাপে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন বনস্পতির ছায়ায় কখনো উপবেশন করেন, কখনো বা বন-চারিণী মিথিলা-রাজ-নন্দিনীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন-পূর্বক অবসন্ন-দেহে ঘুমাইয়া পড়েন^১ । সমস্ত দিন বনপর্যটনের পর, সায়ংকালে সৌর-কুল-বধূ জানকী যখন আর চলিতে পারেন না, তখন হয়ত, কোন মহীকুহের মূলে, রাম উপবিষ্ট হয়েন, এবং পরিশ্রমালসা সীতা রামের উরুদেশে মস্তক স্থাপিত করিয়া ঘুমাইয়া পড়েন, আর সুলীল লক্ষণ, সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মকীর্ণ করে লইয়া, প্রহরীর ছায়, রামসীতার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান । এইভাবে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল । বনবাসে তাঁহাদের যেন কোনই কষ্ট নাই । বিশেষতঃ রাম,—সম্পদ, বিপদ—সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাব, অবিচলিত । তাঁহার উদার বলিষ্ঠ হৃদয় সর্বদাই সাগর-বক্ষের ছায় প্রশান্ত ।

রাম বনে প্রস্থান করিবার কিছু দিন পরেই ভরত সটৈসত্তে রামের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন । বাসনা, একবার প্রাণান্ত যত্ন করিবেন, যদি কোন মতে রামকে অযোধ্যার ফিরাইয়া আনিতে পারেন । রাম এক এক

১—রঘু, ১৩শ—৩৫—অত্রাহ্মণোদঃ সৃগয়া-নিবৃত্তন্তরঙ্গ-বাতেন বিনীত-খেদঃ ।

রহন্তরুৎসঙ্গ-নিবন্ধ-বুর্ধা স্রগামি বানীর-গৃহেবু হন্তঃ ।

রজনী, এক একটি বৃক্ষের তলে কাটাইতে কাটাইতে চলিয়াছেন, আর ভরত দূরে—পশ্চাৎ পশ্চাৎ, রামের অনুসরণ-পূর্বক, সেই সেই তরুর নীচে ঘাইয়া, রামাদির পরিত্যক্ত পর্ণশয্যা প্রভৃতি দর্শন করিয়া কান্দিয়া, বিলাপ করিয়া, বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন* । এই ভাবে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন । রোক্তদ্যমান ভরতকে দেখিয়া বীর-হৃদয় রঘুভ্রমও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না । ভ্রাতৃবৎসল রামের প্রাণ ভরতের জন্ত অস্থির হইয়া উঠিল । সে যাত্রায়, রাম কত প্রয়াসে, ভরতকে ফিরাইয়া দিলেন । ‘আবার যদি ভরত আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তবেই ঘোর বিপদ’—এই ভাবিয়া, রাম দূরে, অনেক দূরে, যে স্থান অযোধ্যার লোকের অগম্য, তথায় ঘাইবার মানসে, ‘চিত্রকূটস্থলী’ পরিত্যাগ করিলেন । রাম-সীতা-লক্ষ্মণ যখন প্রকৃতির প্রিয় বসতি চিত্রকূট ত্যাগ করেন, তখন তত্রতা হরিণ-হরিনীগণ পর্য্যন্তও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল* । রাম-হৃদয়ের সম্মোহন আকর্ষণে বনের পশুপক্ষি-গণেরও চিত্ত বিচলিত হইল । কিন্তু অযোধ্যার মহারানী কৈকেয়ী অবিচলিতা ।

রাম ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আর বকুল-বসনা জনক-তনয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন : যেন কৈকেয়ী-কর্তৃক প্রতিষেধা হইয়াও গুণানুরাগিনী অযোধ্যা-রাজলক্ষ্মী রামচন্দ্রের অনুগমন করিতেছেন* । এই ভাবে তাঁহারা মহর্ষি অত্রির আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, অত্রি পত্নী অনুসূয়া আসিয়া নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য, মনের সাধ পুরাইয়া সীতার অঙ্গাগ করিয়া দিলেন । জানকী-দেহের ‘পুণ্য গন্ধে’ সমস্ত তপোবন আমোদিত হইল । কুসুম-নিষধ ভ্রমর-পঙ্ক্তি, চঞ্চলচিত্তে কুসুম-গুচ্ছ হইতে সীতার দেহের দিকে দাবিত হইল* । এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে তাঁহারা পঞ্চবটী বনে উপনীত হইলেন ।

১—রঘু, ১২—১৪ ।

২—রঘু, ১২—২৪ ।

৩—রঘু, ১২—২৬ ।

৪—রঘু, ১২—২৭ ।

হুট্টা ব্যাসী যেমন নিদাঘতাপ অত্যন্ত উদ্ভাপিত হইয়া চন্দন বৃক্ষের সন্নিকটে যায়, তজ্জপ, পঞ্চবটীবাসিনী, কলুবিতক্কায়া শূর্ণগণা রামের নিকটবর্তিনী হইল। রাম এবং শূর্ণগণার উক্তি প্রতুক্তি-শ্রবণে জানকী স্নেহ হস্ত করিলেন। ইহাতেই পাপিনী রাবণামুজা ক্রোধাপরবশ-চিত্তে অকস্মাৎ নিজের বিকট-মূর্তি-পরিগ্রহ করিল। তাহার সেই ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে, ভীত হইয়া মৈথিলী রামের অঙ্কে মুখ লুঙ্ঘায়িত করিলেন। মুহূর্ত পূর্বে যে রমণী কোকিলার আয় মঞ্জুবাদিনী ছিল, হঠাৎ তাহার এই প্রকার রূপ, আর এবংবিধ গুহ্যবিদারী কণ্ঠস্বর! লক্ষণের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি কর্ণাদিচ্ছেদন-পূর্বক সেই পাপিনীর আতিথ্য করিলেন^১। শাস্ত দণ্ডকারণে সহসা যেন দাবানল জলিয়া উঠিল। শূর্ণগণার রক্ষক-রূপী রাক্ষসগণের সহিত বিষম যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে, রামের নিশিত-শায়কে ধর-ত্রিশিরঃ প্রভৃতি প্রাণত্যাগ করিল। তখন হতভাগিনী শূর্ণগণা কাদিতে কাদিতে রাবণের নিকটে বাইয়া আদ্যস্ত সমস্ত বিবৃত করিল। ক্রোধে লঙ্কাধিপতির বিশাল-বপুঃ কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, যেন কেহ আসিয়া তাঁহার দশটি মস্তকেই যুগপৎ পদাঘাত করিল^২। তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইল। আশ্রয়-গিরির আয় যেন অগ্ন্যুদ্গম করিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিকার-পরায়ণ হইয়া মায়ামুগের ছলনা দ্বারা রামময়-জীবিতা জানকীকে হরণ করিলেন। লঙ্কার রাক্ষস-কুল-রাজ-লক্ষ্মীও যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিলেন।

রাম রাজ-সিংহাসন উপেক্ষা করিয়া বনে আসিয়াও সীতার সংসর্গে সকল কষ্টই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লক্ষণের সোভ্রাজ্যে এবং সীতার পাতিব্রত্যে রামের সকল ক্লেশেরই এক প্রকার অবসান হইয়াছিল। রাজ্যাপেক্ষা বনবাসই যেন তাঁহার অধিকতর অভিপ্রেত হইয়া উঠিয়াছিল। সীতার ভক্তি-স্নেহ-পূর্ণ পরিচর্যায় রামের চিন্তে রাজ্য-পরিত্যাগ-জন্ত কোন

দুঃখই কদাচ উদ্ভিত হইত না । নিৰ্ম্মম রাক্ষস, অত্যাচারী রাক্ষস রামের সেই 'প্রিয়স্বাক-বাদিনী' 'অরণ্যবাস-প্রিয়সখী' জানকীকে হরণ করিল । বনবাসে সমস্ত দুঃখ,—সীতা মুখ দর্শনে এতদিন যে সমুদয় দুঃখক্লেশ রাম বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, সে সব যেন যুগপৎ উপস্থিত হইয়া, সীতা-বিচ্ছেদ-কাতর রামচন্দ্রকে আঁও কাতরতর করিয়া তুলিল । আজ সীতাকে হারাইয়া রামের সেই সব কথা মনে পড়িল । যৌবরাজ্য-ভিষেকের পূৰ্ব্বদিনে, অধিবাসকালের সেই ক্ষোম-বসন-ধারণ, আবাস-পরদিন প্রভাতে তাহা ত্যাগ করিয়া সেই বস্ত্র-পরিধান, সেই পুত্র-বিচ্ছেদ-বিধুরা কৌশল্যা ও স্নমিত্রার কাতরা আৰ্ত্তনাদ, বারংবার প্রতিষেধসম্বন্ধে প্রতিপ্রাণ জনক-তনয়া সেই প্রবল অনুগমনেচ্ছা—সেই বাদ-প্রতিবাদ,—সমস্ত আজ রাম-হৃদয়ে যুগপৎ সমুদ্ভিত হইল ।

বন-গমনে বাঁ বাঁ বাঁগাপ্রাপ্ত হইয়া, সজল-নয়নে সেই যে সীতা বলিয়াছিলেন—

‘ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ ।

ইহ প্রেতা চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥

যদি ইং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদৌব রাঘব !

অগ্রতন্তে গমিষ্যামি মৃদনস্তী কুশ-কণ্টকান্ ।

সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ ।

অচিন্তয়ন্তী ত্রীন লোকান্ সিন্ধয়ন্তী পতিব্রতম্ ॥

১—বানারণ অধোধ্যাকাণ্ড, ২৭শ সর্গ, শ্লোক ৬—রামণীর কি ইহকাল কি পরকাল পতি ভিন্ন অন্য গতি নাই । কোন কালেই আত্মা, পিতা, মাতা, পুত্র কি সখীজন—কেহই তাহাদের আশ্রয় হান নহে ।

২—ই, ই, শ্লোক—৭—হে রাঘব ! যদি তুমি আজই দুর্গর গহন বনে প্রস্থান কর, তবে আমিও তোমার অগ্রে অগ্রে গাধের কুল কণ্টক প্রভৃতি বর্ধন করিতে করিতে যাইব ।

৩—ই, ই, শ্লোক—১২—হে দয়িত ! আমি ত্রিলোকের সুখ বিস্মৃত হইয়া, কেবল

ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখ-দুঃখয়োঃ ।

নেতুমহঁসি কাকুৎস্থ ! সমান-সুখ-দুঃখিনীম্ ॥

সেই সমস্ত কথাগুলি, আজ একটি একটি করিয়া রামের মনে জাগিতে লাগিল । রাম একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন । সেই—

মহাবাহু-সমুদ্ভুতং বন্যামবকরিষ্যতি ।

রজো রমণ ! তন্মাত্রে পরাধ্বমিব চন্দনম্ ॥

শাবলেষু যদা শিষ্যে বনাস্তে বন-গোচরা ।

কুশাস্তুরণ-যুক্তেষু কিং শ্রাৎ সুখতরং ততঃ ॥

যন্তুয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যন্তুয়া বিনা ।

ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ নাথ ! ময়া সহ ॥

পতিব্রতা-ধর্ম-চিন্তা করিয়া, তোমার সহিত পরম সুখে বাস করিব । আমার পিতৃ-ভবনের স্নান গহন কানন আমার পক্ষে অশেষ আনন্দ-দায়ক হইবে ।

১—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৯শ সর্গ, শ্লোক-২০ । হে কাকুৎস্থ ! আমি তোমাকে একান্ত ভক্তিমতী, আমি পতিব্রতা, দীনা তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ । তুমি কেন তবে তোমার এই সমান-সুখ-দুঃখিনীকে সঙ্গে লইবে না ? ভাবিয় দেখ, তোমার ইহা অবশ্য কর্তব্য ।

২—ঐ, ঐ, ৩১ সর্গ, শ্লোক ১৩—হে হৃদয়রঞ্জন ! মহাবাহু-পরিচালিত রেণু দ্বারা আমার শরীর ধুসরীকৃত হইলেও, আমি মনে করিব যে, আমার অঙ্গ স্পর্শক চন্দনে চর্চিত হইল ।

৩—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৩১শ সর্গ, শ্লোক ১৪—নাথ ! তোমার সহচারিণী হইয়া বনে ভ্রমণশয্যা শয়ন করা, আর তোমাকে ছাড়িয়া, বিচিত্র আস্তরণ-যুক্ত শয্যা শয়ন করা মনে দেখি, ইহার কোনটি আমার অধিকতর প্রিয় ?

৪—ঐ, ঐ, শ্লোক ১৮—হে দয়িত ! তোমার সহিত বাস করাই আমার ধর্ম, তোমার বিরহই আমার প্রত্যক নরক, আমার হৃদয়ের এ প্রীতি ত তোমার অবিরত নহে, তবে কেন আমার ব্যথা দাও ? আমাকে লইয়া চল ।

প্রভৃতি সীতার আর্তিনাদ-কাহিনী^১ শ্রবণ করিয়া শূভহৃদয় রাম মুহুমূহঃ মুচ্ছিত হইতে লাগিলেন, আর দীন-হৃদয় লক্ষ্মণ সাক্ষ-নরনে অগ্রজের পরিচর্যায় রত হইলেন ।

এদিকে পাপিষ্ঠ দশানন সাধ্বী জানকীকে লইয়া গিয়া, লঙ্কার অশোক উপবনে আবদ্ধ করিয়া রাখিল । সেই অশোকবনে, পরমহুঃখিনী সীতা, 'বিষবল্লী'-পরিবেষ্টিত সঞ্জীবনী লতিকার ত্রায় অত্যাচারিণী রাক্ষসীদিগের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া, দিবস-রজনী নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিতেন^২ । রাবণ যখন সীতাকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করিবার নিমিত্ত, তাঁহার সম্মুখে মায়া-কল্পিত রাম-মূর্তির শিরশ্ছেদ করিত, আর পতিগত-প্রাণা সীতা তদর্শনে ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত হইতেন, তখন পাষাণের আনন্দের আর অবধি থাকিত না । যখন সীতা-পক্ষপাতিনী রাক্ষসী ত্রিজটা বুঝাইয়া দিত যে, উহা বাস্তব রাম নহে, তখন সীতা কথঞ্চিৎ স্নেহ হইতেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতেন যে, ত্রিজটার কথা শুনিবার পূর্বেই ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আমার আর্ষ্য-পুত্রেরই শিরশ্ছেদ হইল, হায়, এ ভাবনার পরও আমি জীবিত ছিলাম, ষিৎ আমার জীবনে !—এই ভাবিয়া তিনি লজ্জা এবং ঘৃণায় মনে মনে যেন মরিয়া যাইতেন^৩ । এইরূপে লঙ্কার অশোকবনে শোকাকর্ষী পতি-দেবতা সীতার দিন কাটিতে লাগিল ।

রাম দারাপহারীর প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়া, দুস্তর-জলধি-বন্ধন-পূর্বক, সদলবলে লঙ্কায় উপনীত হইলেন । তুমুল সংগ্রাম বাধিল । সেরূপ সংগ্রাম বুঝি জগতে আর কখনও হয় নাই । মহাবলপরাক্রমশালী রাম, ইতঃপূর্বে তাঁহার আজামূলস্থিত ভূজের সামর্থ্য প্রকাশ করিবার

১—ঐ, শ্লোক ২২—ইতি সা শোক-সন্তপ্তা বিলপা করণং বহ ।

চুক্রোশ পতিমায়স্তা ভূশমাগিভা স-স্বরম্ ।

২—রঘু, ১২শ—৬১—জানকী বিষবল্লীতিঃ পরীতেষ মহৌষধিঃ ।

৩—রঘু, ১২শ—৭৪, ৭৫ ।

উপযুক্ত কোন অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই । মহাবল-পরাক্রমশালী রাবণও স্বীয় বাহুবল প্রকাশের প্রকৃতক্ষেত্র এতদিনে পান নাই । তাই আজ ‘বীর-যুগল পরস্পরের বীরত্বে পরম আপ্যায়িত হইলেন’ ।

রাবণ নিহত হইয়াছে । রাবণ দুর্কৃদ্ধি-বশে নিজের মজ্জা, সোণার লঙ্কা নগরীকেও মজাইল । সবংশে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল । ভাৰ্য্যাবমর্য্যার যথোচিত শাস্তি-বিধান-পূর্ব্বক, মিত্র বিভীষণকে লঙ্কার রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া, অনল-পরিপ্লব জানকীকে লইয়া, সানুজ রামচন্দ্র অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন । দেব-যজন-সম্ভবা সীতার পাতিব্রতো সীতা-পতির কদাচ কোন প্রকার সংশয় জন্মে নাই । তিনি বিদিত ছিলেন যে, আকাশ-গাত্রে কলঙ্কস্পর্শ সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সীতা-চরিত্রে কলঙ্ক-লেশ-স্পর্শও অসম্ভব । তথাপি, লোক-রঞ্জন রবু-শ্রেষ্ঠ, অনেক চিন্তা করিয়া, পূর্বাগর অনেক ভাবিয়া, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা করিলেন । অনল-বিপ্লব হেমের ত্রায় হেমপ্রভা সীতার দেহ-কান্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল । অনেক দিন পরে, অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে, অপহৃত রত্নের উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক, রাম অযোধ্যায় চলিয়াছেন^১ । যে অযোধ্যা হইতে একদিন রাম,—

‘যচ্চিস্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি ।
প্রাতঃপ্রাণি বনুধাধিপ-চক্রবর্তী
সোহহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী’^২

১—রঘু. ১২—৮৭—অজ্ঞানস্ত-দর্শন-প্রাপ্ত-বিক্রমাবসরং চিত্রাভ ।

রাম-রাবণদ্বয়-দ্বন্দ্ব চরিতার্থনিবাত্তবৎ ।

২—রঘু. ১২—১৪ ।

৩—মহাভাটক—বাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা হুয়ে চলিয়া গেল । বাহা কখনো

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বন-যাত্রা করিয়াছিলেন, আজ সেই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতেছেন । তাঁহার সেই হর-ধনুর্ভঙ্গ-বিজিতা পতিপ্রাণা সীতাকে লইয়া, চুরন্ত রাবণের শক্তিশেলে আহত-পুনরুজ্জীবিত লক্ষ্মণকে লইয়া, আর যাহারা যাহারা, তাঁহার হৃদয়সর্বস্বীভূতা সীতার উদ্ধারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, সেই সকল কপি-রাক্ষসদিগকে লইয়া, রাম পরম আনন্দে অযোধ্যায় চালায়াছেন ।

অগ্রেও ভাবি নাই, অকস্মাৎ তাহাই আজ উপনত হইল । যে আমি কাল প্রাতঃকালে বন্যার একচ্ছত্র সম্রাট্ হইব, সেই আমি আজ স্রটাবকল পরিধান করিয়া বন যাত্রা করিতেছি, অদৃষ্টচক্রে কি বিচিত্র গতি ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

আকাশপথে ।

রামের হৃদয় আজ বড়ই উৎফুল্ল । জীবনের শাস্তি-প্রতিমাকে, সংসারের প্রধান আকর্ষণকে হারাওয়া, রাম বড় ব্যতনাতেই ছিলেন । তাঁহার বক্ষঃ ধারা-যন্ত্রের জ্বায় শতচ্ছিদ্র—জীর্ণ-জীর্ণ হইয়াছিল । আজ অনেক কষ্টের পর, অনেক সাধাসাধনার পর, আবার রামচন্দ্র সেই প্রনষ্ট প্রতিমার পুনর্দর্শন পাইয়াছেন । রামের হৃদয় আনন্দে, আকাজকায়, আবেশে ক্ষীত হইয়া উঠিয়াছে । সেই জন্মভূমি প্রিয় অযোধ্যা—এক দিন সীতার সহিত কান্দিতে কান্দিতে বাহাকে ছাড়িয়াছিলেন, আজ আবার হাসিতে হাসিতে সেই সীতার সহিত সেই অযোধ্যায় চলিয়াছেন । রামের অপার আনন্দ ! আর আনন্দময়ী বাগ্‌দেবতার বরপুত্র মহাকবি কালিদাস, তাঁহার বিশ্বমোহিনী কল্পনা-বীণা বাদন করিতে করিতে, যেন সেই দেব-দম্পতির অনুসরণ পূর্বক, কবিতারঙ্গী লাজ-কুসুমাজলি বিকীর্ণ করিতেছেন ।

সীতার সহিত পুষ্পক-রথে আরোহণ পূর্বক, রাম শাস্ত আকাশ পথে চলিয়াছেন । জগতের অনেক উর্দ্ধে—অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছেন । রাম-সীতার চরিত্র, রাম-সীতার প্রণয়, রাম-সীতার হৃদয় জগতের অনেক উর্দ্ধের বস্তু । মর্ত্যের কোন মলিন বাসনায় বা মলিন ভাবনায় সে স্বর্গীয় বস্তু কলুষিত নহে । তাই তাঁহারা জগতের উর্দ্ধদেশ দিয়া বাইতেছেন । আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের নীচে, অনেক নীচে পড়িয়া রহিয়াছে । পৃথিবীর উচ্চ সমীরণ সে শাস্ত আকাশের তত দূরে উঠিতেই পারে না । দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন, ইহাই জগতের নিয়ম । রাম জীবনের সেই সুখের দিন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে সীতার সজ্জিত কাটাইয়াছেন ।

অকস্মাৎ—সেই স্নেহের দিনের মধ্যাহ্নেই দৈবদুর্ভাগে, গাঢ় তমস্বিনী নিশা আসিয়াছিল, তাই কত কষ্টে, কত লাহনায় এই সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর কাল বনে বনে বিষাদ-রজনী যাপন করিয়াছেন। আজ আবার মধুর প্রভাতের অরুণরাগ হাসিয়া উঠিয়াছে। রাম স্নেহের দিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

পতি-দেবতা সীতা শত নিষেধ সঙ্কেত রামের ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া, উন্মাদিনী হইয়া পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন ; সুবর্ণ-মুগের কুহকে বিমূঢ় হইয়া, জীবিতেশ্বরকে মৃগানুসরণে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন ; পাণিষ্ঠ রাক্ষস তাহাকে কোথায়—কোন সাগর-পারে হরণ করিয়া লইয়া গেল ! আর পতি-মুখ-দর্শনের আশাও ছিল না। নিজের দোষে নিজের বিপৎ-সাগরে ডুবিয়াছিলেন। তিনি সেই অশোককাননে বসিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতেন, আর নিজের দুর্ভাগ্যস্মরণ করিয়া, নিজেকেই দিক্কার দিতেন। পিতা জনক ধনুর্ভঙ্গপণ করিয়া, যে রত্নাহার জানকীর কণ্ঠে পরাইয়াছিলেন, স্বদোষে জানকী তাহা হারাইয়াছেন। তাঁহার আর দুঃখের অবধি ছিল না। দীর্ঘকাল পরে, তাঁহার সেই চিরধাত হৃদয়েশ্বরের সহিত সীতা মিলিত হইয়াছেন। সেই কল্পনাভীত, আশাভীত, প্রনষ্ট-হৃদয়রত্নের সহিত পুনঃসঙ্গত হইয়াছেন, আজ সীতার পরম আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—যাহা কাল তাঁহার নয়নে কক্ষ ‘জীর্ণ অরণ্যবৎ’ ভীষণ শ্মশানবৎ, গত-জীবিত শবদেহবৎ প্রতীয়মান হইত, আজ সেই জগৎ নূতন—অনন্ত-সৌন্দর্য্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে। কেমন যেন একটা স্বপ্নময়, মোহময়, আবেশময় ভাবে আজ স্থাবর জঙ্গম জগৎ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আর সেই জগতের নবীন সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে জগদ্ধাত্রীকুপিণী সীতাও যেন কেমন আজ স্বপ্নময়ী, মোহময়ী, আবেশময়ী হইয়া পড়িয়াছেন। চির-সুন্দর রাম, স্বয়ং তাঁহাকে একটি একটি করিয়া অধোবর্তিনী সুন্দরী পৃথিবীর অল্পম শোভা দেখাইতেছেন। সেই

বনবাস কালে, ছুইজনে মিলিয়া যে স্থানে বসিতেন, যে স্থানে নিজা যাইতেন, যে স্থানে সীতার অঙ্গে মস্তক রাখিয়া রাম, এবং কখনো বা রামের অঙ্গে মস্তক রাখিয়া সীতা শ্রান্তি-বিনোদন করিতেন, সেই সব আজ সীতাপতি সীতাকে দেখাইতেছেন । সীতা দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে মজিতেছেন, একেবারে আত্মহারা হইতেছেন । পৃথিবীর আজ সকলই সুন্দর । বিশ্বনাথ যেন তাঁহার সৌন্দর্য্যের অক্ষয়-ভাণ্ডার খুলিয়া । আজ বিশ্বেশ্বরীকে দেখাইতেছেন, আর বিশ্বেশ্বরী আনন্দ-পারিল্লব-হৃদয়ে, সেই শোভা দেখিতে দেখিতে সুখ-তজ্জায় নিমোলিতাক্ষী হইয়া পড়িতেছেন । এমন সুন্দর ছবি আর আছে কি ?

যে জন্ত মনুষ্য-দেহ ধারণ, এই পক্ষিগ সংসার ক্ষেত্রের কণ্টকময় পথে বিচরণ, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে ; ত্রিজগতের পরম শত্রু, হৃদ্বর্ষ অত্যাচারীর শাস্তি-বিধান হইয়াছে । ইন্দ্রাদিদেবতাবৃন্দের নানামুখে আবার প্রসাদের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, জগতের একটা প্রধান কার্য— দেবদানব-গন্ধর্বেদেরও অসাধ্য কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাই রামের আজ অপার আনন্দ ! তিনি নারায়ণের পূর্ণ অবতার, আর স্বয়ং লক্ষ্মী সীতারূপে অবতীর্ণা, সম্মিলিত লক্ষ্মী-নারায়ণ আজ পুষ্পকরথে উঠিয়া উর্দ্ধে আকাশ-পথে, নিম্নস্থ পৃথিবীর শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন, তুচ্ছ জড়-জগতের অনেক উর্দ্ধ দিয়া নক্ষত্র-বেগে চলিয়াছেন, আর সমস্ত জড় জগৎ তাঁহাদের নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে ; না—না, নিম্নে থাকিয়া বাহার যতটুকু ক্ষমতা, জড় জগতের তাবৎ পদার্থ রাম সীতার পরিচর্যা করিতেছে । কোথাও পর্বতের নিতম্বে ঘননীল পশোদ-মালা নর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদের নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেছে । কোথাও আকাশে, সারস-পক্ষিগণ, চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে বিমানের সমীপবর্তী হইয়া, যেন শূভ্রে তোরণ সাজাইয়া রাম-সীতার প্রত্যাগমন করিতেছে । কোথাও গিরি-নির্বর-ধ্বনি গহ্বরে গহ্বরে ঐতিধ্বনিত হইয়া, যেন বিজয়-চুমুভি-দ্বারা রাম-সীতার

পুনরাগমন-সংবাদ ঘোষিত করিতেছে। এইরূপে, সমস্ত জড়-জগৎ আজ সচ্চিদানন্দ রাম-সীতার সেবা করিবার নিমিত্ত, প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত, যেন চৈতন্যময় হইয়া উঠিয়াছে। মহতের সংসর্গে আজ জড়ের জড়ত্ব দূর হইয়াছে। পাতাল হইতে ‘নবকন্দলী’ উঠিয়াছে, পৃথিবী হইতে সমুদ্র-নদ-নদী-গিরি-বন-উপবন,—কোথাও হরিণ-হরিণী, কোথাও মঞ্জ-জলহন্তী-ভূজঙ্গ, কোথাও বা ‘স্তবকাভি-নত্র’ লতাকুঞ্জ, যেখানে যে যেমন পারিতেছে, রাম সীতার হৃদয়রঞ্জে তৎপর হইয়াছে। আকাশে কখনো মেঘ, কখনো বিদ্যুৎ, কখনো বা মলয় পবন আসিয়া রাম-সীতার শুশ্রূষা করিতেছে। চরাচর জগৎ আজ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। রাবণ বধ হইয়াছে, সীতার উদ্ধার হইয়াছে, জগতের আতঙ্ক-নিবৃতি হইয়াছে। তাই সর্বত্রই আনন্দের উচ্ছ্বাস।

সীতা—মিথিল-পতি রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিক-দুহিতা সীতা যেমন রামের হৃদয়ের অধিদেবতা, তেমন জগতেরও পরম আরাধ্য-দেবতা। সীতার সম্পর্কে কেবল রামের সংসার নহে, অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদ নহে, —সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও পবিত্র এবং আনন্দিত ছিল। সীতার বিরহেও কেবল রামের হৃদয়ে নহে, অযোধ্যার বা মিথিলার রাজ-সংসারে নহে, সমগ্র ভারতে, না—না, সমগ্র জগতে দুঃখের, শোকের, বিষাদের প্রবল ঝটিকা বহিয়াছিল। সেই সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন হইয়াছে, তাই এই মিলনের দিনে, চেতনাচেতন-নির্কিশেষে সকলেই আনন্দে উন্মত্ত-প্রায়। নারীকুল-দেবতা অনল-বিগ্ধা সীতা আজ ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই অতিশয়িত আনন্দ-নির্ভরে সমস্ত পৃথিবী যেন রোমাঞ্চিতাজী হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যের একটা প্রবাহ বহিয়াছে। আর কবির কবি কালিদাস, সেই চৈতন্যের সহিত, তাহার চিরচৈতন্যময়ী কল্পনাকে উদ্ভাদিনী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলিত হইলে জগৎ যে কত সুন্দর দেখায়, তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সমস্ত জগৎকে যেন একটা স্বপ্নময়—আবেশময় ভাবে বিভোর করিয়া
 তুলিয়াছেন । ভারতীর প্রিয়পুত্রের অনুরোধে, আমরাও যেন একটা
 অননুভূতপূর্ব আবেশময় ভাবে বিমুগ্ধ হইতেছি । কি সুন্দর চিত্র !

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

পূর্ব-স্মৃতি ।

রাম-সীতার পুনর্নির্মলন হইয়াছে । সূর্য্যবংশের অসূর্য্যম্পত্তা কুল-
লক্ষ্মীকে পাপিষ্ঠ শত্রু হরণ করিয়া, নির্মলকুলে কলঙ্কলেপন করিয়াছিল,
সে কলঙ্ক ক্ষালিত হইয়াছে । বহু কাল পরে সন্মিলিত রাম-সীতা আনন্দ-
রসে আপ্ত হইয়া—এক-প্রাণ হইয়া আকাশ-যানে চলিয়াছেন । কখন
বিদ্রাৎ-বিলসিত মেঘো মধ্যো ডুবিতে ডুবিতে, কখন অমৃত-শীকর-বর্ষা
মেঘের অধোদেশে আনন্দ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে, কখন বা, মেঘ
যতদূর উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহারও উর্দ্ধদেশে, শান্তগগনের প্রশান্ত
গম্ভীর উৎসঙ্গতলে বসিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইতে হইতে দেব-দম্পতি
চলিয়াছেন । দূর আকাশ পৃষ্ঠ হইতে, অধোদেশে—অতিদূরে সমুদ্রের
নীলকান্তি দেখা যাইতেছে । সীতা উদ্ধারের জন্ত হস্তর সাগরে যে
সেতু-বন্ধন করিতে হইয়াছিল, সেই সেতু দেখা যাইতেছে । সেই সেতু-
গাত্রে আহত হইয়া, সমুদ্রের জলরাশি অনন্ত ফেনপুঞ্জ উদ্‌গিরণ করিতেছে,
সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! শরতের মধুর রজনীতে সুনীল আকাশে যেমন
কুদ্র কুদ্র নক্ষত্র-রাশি উদিত হয়, এবং সেই নক্ষত্রাবলীর মধ্যভাগে
লক্ষ্যমান ছায়াপথ শোভা পায়, আজ সেতুবন্ধ সমুদ্রেরও ঠিক তদ্রূপ
শোভা জন্মিয়াছে । ভূ-পৃষ্ঠস্থ ব্যক্তির চক্ষে শারদ গগন যেমন সুন্দর,
আজ আকাশ-বিহারী রামের নয়নে অধোদেশ-বর্তী সুনীল অম্বরশিও
তদ্রূপ সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । ‘গুণজ’ রাম প্রাণ ভরিয়া
সমুদ্রের এই অনির্ব্বাচ্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহার

১—রঘু, ১৩শ—২—বৈদেহি । পদ্মাবলয়াদ্ বিভক্তং বৎসেভুনা কেনিলনম্বরশিম্ !

ছায়া-পথেনেব শরৎ-প্রসন্নাকাশাবিকৃত-চাকরায় ।

প্রাণাধিকা বৈদেহীকেও দেখাইতেছেন । সীতা-উদ্ধারের জন্ত রামকে সমুদ্র পর্য্যন্তও বন্ধন করিতে হইয়াছিল,—ভাবিয়া, সীতার অন্তঃকরণে, অনুরাগ, প্রেম এবং কৃতজ্ঞতা—ইহাদের সম্মিলিত উৎস সহস্র-ধারে সমুখিত হইতেছে । কোথাও তরঙ্গ-ভরে নৃত্য করিতে কারিতে তটিনী তটিনী-পতির সহিত সঙ্গত হইতেছে । কোথাও প্রবল-কায় তিমি-মৎস্যের রক্ত-যুক্ত মস্তক হইতে সহস্র-ধারে জল উখিত হইতেছে, দেখিলে ধারা-বস্ত্র বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে । কোথাও সমুদ্রের স্বচ্ছ-দৰ্পণ-সন্নিভ উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া, জল-হস্তী নক্র প্রভৃতি জন্তু উৎপত্তিত হইতেছে । কোথাও বা বেলা-পরিবাহী স্নানীতল বায়ু পান করিবার আশায় ভুজঙ্গ-গণ নির্গত হইতেছে, ‘সূর্য্যাংস্ত-সম্পর্কে’ তাহাদের ইন্ধ শিরোমণি-সমুদ্র যেন আরও সমীকৃত হইয়াছে । প্রিয়দর্শন রাম, একটি একটি করিয়া, এই সমস্ত প্রিয়-দর্শনা জানকীকে দেখাইতেছেন¹ । সীতা দেখিতে-ছেন,—একবার সুন্দর সমুদ্রের দিকে চাহিতেছেন, আবার চির-সুন্দর রামের দিকে চাহিতেছেন । শ্রামল-কাস্তি সমুদ্রের শোভায় সীতা নয়ন-মন আকৃষ্ট হইতেছে, আবার নব-দূরী-দল-শ্রাম রামের প্রকুল-কাস্তি দর্শনে সীতার অতৃপ্ত-নয়নের আকাঙ্ক্ষা আরও বর্দ্ধিত হইতেছে । জল-পান করিবার জন্ত মেঘ যেমন সমুদ্রবক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে, অগ্নি ভীষণ আবর্তের বেগে মেঘও আবর্তিত হইতেছে, দেখিলেই মনে হয়, বৃষ্টি জলদাভ পর্বতের দ্বারা জলধি পুনরায় প্রমখিত হইতেছে । রাম দেখিতেছেন, দেখাইতেছেন² ।

দূর আকাশ হইতে, ভূ-পৃষ্ঠে একটি কাল রেখার স্থায় সমুদ্রের ‘তরুরাজি-নীলা’ বেলা-ভূমি দেখা যাইতেছে, দূরে—ভূ-লগ্ন আকাশ-গাত্রে যেন কেহ একটি মলিন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, গাঙ্গীর্ষ্য এবং

১—রঘু, ১৩শ—২, ১১, ১২, ১২ ।

২—রঘু, ১৩শ—১৪ ।

নাথুর্য্যের সমাবেশে সে সৌন্দর্য্য অপ্রতিম, রাম দেখিতেছেন, আশ্চ-
বিহ্বল হইয়া তাঁহার সীতাকেও দেখাইতেছেন'।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার, বিমান-পথে প্রায় সমুদ্র পার হইয়া
বেলাভূমির' নিকটবর্ত্তী হইলেন। বেলা-বর্ত্তিনী কেতক-বীথিকা হইতে
পরাগ আনিয়া শীকর-বাহী বায়ু, আয়তাকী জানকীর মুখে লেপন করিয়া
দিল^১। যেন বন-দেবতাগণ অনল-পায়িকিতা জানকীকে অগ্রসর হইয়া
অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। রাম অনিমেষ-নয়নে, সেই পরাগ-পাণ্ডুর
সীতা-মুখচ্ছবি দর্শন করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে পুষ্পক, ইত্যন্ত
বিক্ষিপ্ত-মুক্তা-খচিত, 'ফলাবজ্জিত-পুগ-মান' সমুদ্রকূলে উপনীত হইল।
বিমানের অতিশয়-দ্রুত-গতি-নিবন্ধন মনে হইল, যেন 'সকাননা'
পৃথিবী দূরস্থিত জনপি-প্রান্ত হইতে ক্রমে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক নিজপ্রান্ত
হঠতেছে। সে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এ যাবৎ সীতা পুষ্পকের পুরোবর্ত্তিনী
শোভাই দেখিতেছিলেন; অকস্মাৎ রাম, পশ্চাদ্ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
বধন পৃথিবীর এই সমুদ্র-নিষ্ক্রমণ-শোভা দর্শন করিলেন, তখন অমনি,
'এমন সুন্দর ছবি সীতাকে দেখান হইল না'—ভাবিয়া কহিলেন,—

কুরুষ তাবৎ করভোরু। পশ্চান্

মার্গে মৃগ-প্রেক্ষিণি! দৃষ্টি-পাতম্।

এষা বিদূরী-ভবতঃ সমুদ্রাৎ

সকাননা নিম্পততীব ভূমিঃ^২ ॥

সীতা বিমুগ্ধ-নেত্রে রাম-প্রদর্শিত শোভা দেখিতে লাগিলেন।

১—রঘু, ১৩—১৫—সুহৃদয়শ্চক্র-নিভস্ত তদী তথাল-তালী-বন-রাজি-মোলা।

আভাতি বেলা লবণাবুরাশেখঁরা-নিবদ্ধেব কলঙ্ক লেখা।

২—রঘু, ১৩—১৫—বেলানিলঃ কেতক-রেণুভিঃ সজাবয়ত্যাননমায়তাক।

৩—রঘু, ১০—১৮।

কনক-কান্তি মৈথিলী কখনো কোতুলক বশতঃ পুষ্পকের বাতায়ন-পথে, তাঁহার মৃণাল-কল্প কর দোলাইয়া মেঘ স্পর্শ করিতে যান, আর অমনি মেঘেরও বিদ্যায় বিলসিত হয়, তদর্শনে রাম আনন্দ-বিহ্বল হইয়া বলেন—‘সীতে ! ঐ দেখ, মেঘ তোমার হস্তে বিদ্যাতের বলয় পরাইতে আসিতেছে’ ।

মনোরথ-গতি পুষ্পক-রথ দেখিতে দেখিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল ! নিম্ন-দেশে দণ্ডকারণ্যের সেই জনস্থান, যে স্থানে সীতার সহিত রাম অনেক দিন কাটাইয়াছিলেন, যে স্থানে সূবর্ণমৃগের লোভে জানকী রামকে গহন অরণ্যে পাঠাইয়াছিলেন, যে স্থানে তুরঙ্গ রাক্ষস অতিথিচ্ছলে আসিয়া জানকীকে হরণ করিয়া লইয়াছিল—সেই জনস্থান ! জনস্থানের আর এখন সে দিন নাই ; বনবাস-কালে, রামচন্দ্র, তত্রতা তাবদ্ বিঘ্নভূত রাক্ষস-দিগকে নিহত করিয়াছেন । জনস্থান এখন একপ্রকার বিঘ্নশূন্য । তাই পূর্বে যে সকল তপস্বিগণ আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, ‘নিরুপদ্রব’ ভাবিয়া তাঁহারা আবার জনস্থানে ফিরিয়া আসিয়া, নূতন নূতন পর্ণশালা রচনা করিয়াছেন । ‘জনস্থান’ সত্যি এখন জন-স্থান হইয়াছে* । সেই পূর্ব-পরিচিত জনস্থানের উদ্ধভাগে আসিয়া যখন পুষ্পক উপস্থিত হইল, তখন করুণাময় রামের হৃদয়ের কবাট যেন সহসা খুলিয়া গেল । সেই সমস্ত একে একে, তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল ! সেই সীতার অঙ্কে মন্তক-স্থাপন-পূর্বক স্নেহ তরুচ্ছায়ায় নিদ্রা!,—সেই সীতার সহিত পর্বতের নির্ঝরে নির্ঝরে অভিষেক,—সেই বন-কুসুম-স্বরভি কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ ও শীতল-শিলা-ফলকে উপবেশন,—সব মনে পড়িল । নদীতে সহসা ‘বান’ আসিলে

১—রঘু, ১৩—২১ করণ বাতায়ন লম্বিতেন স্মৃষ্টকরা চণ্ডি ! কুতূহলিনী ।

আবুতীবাভরণং দ্বিতীয়মুদ্ভিগ্নবিন্ধ্যাবলয়ো বনন্তে ।

২—রঘু—১৩—২২ ।

যেমন নদীর জল স্ফীত হইতে হইতে তাহার উভয়কূল ভাঙ্গিয়া
হতস্ততঃ বহিয়া যায়, তদ্রূপ, আজ জনস্থান দর্শনে রামের হৃদয়েও যেন
পূর্নস্বত্বের কূল-প্লাবিনী বহা উপস্থিত হইল। সে বহ্যায় তাঁহার গভীর
হৃদয় ভাসিয়া গেল। তিনি উন্মুক্ত চিত্তে সীতাকে জনস্থানের সেই সকল
পূর্বানুভূত স্থান-সমূহ দেখাষ্টতে লাগিলেন। জনস্থানে রামের যেমন
অনেক স্থানের স্মৃতি বিদ্যমান, তেমন তাহার দুঃখময় জীবনের অনন্ত দুঃখের
স্মৃতিও জনস্থানের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি বক্ষে, প্রতি পল্লবে, প্রতি পত্রে
বিস্তারমান। মায়ী-মৃগের চলনা হইতে পরিভ্রাণ পাঠিয়া রান বখন কুটারে
পতাবর্তনপূর্বক দেখিলেন যে তাঁহার সীতা নাট, তখন ‘সীতে! সীতে!’
বলিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে কত সন্বেষণ করিয়াছিলেন, ‘কোথায় সীতে! কোথায়
তুমি জনক-নন্দিনি!’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তখন
রামের দুঃখে বনের তরল-পত্র-পক্ষী পর্যন্তও অশ্রু-বিসর্জন করিয়াছিল।

রাজ-সিংহাসন পরিহা করায় রামের কোনই কষ্ট হইয়াছিল না।
পতিভ্রাতা সীতা এবং ভ্রাতৃ ভক্ত লক্ষণের স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহারে তিনি সকল
দুঃখই এতপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রান সীতার সহিত পরস্পর
আলাপিত করিতেছিলেন, উভয়ে আশ্রয় সীতাকে হরণ করিয়া,
রামের জনস্থান-সংস্রাণ অবসান হইল। সেই সময়ে বাহার জন্ত যে স্থানে
সীতা কাদিয়াছিলেন, আজ এখানে লইয়া সেই স্থানে আসিয়াছেন, এখানে
সীতার জীবিত রামের গভীর হৃদয়-সমুদ্রও উল্লসিত হইয়াছে। তিনি মৃদ্ধা
নয়নকে বলিতে লাগিলেন,—‘দেখ জনক! এই সেই স্থান, হোমাকে
সন্বেষণ করিতে করিতে যে স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলাম যে,
তাঁহার চরণের একখানি নুপুর, যেন তেমনা অঙ্গচূত হইয়াই
যায়। দুঃখে মৃত্যুকাতে নীরবে পড়িয়াছিল,—এই সেই স্থান’।

রঘু, ১৩—২৩—সৈবা স্থলী যত্র বিচিন্ততা ত্রাং ভ্রষ্টং নয় নুপুরমেকমুর্ঝাম্।

অদুঃখত হ্রস্বগার-বিলম্ব-বিলেব দুঃখাশ্রিত বদ্ধমোনম্।

‘ঐ দেখ, ঐ সম্মুখে মালাবান্ পর্বতের শিখর-মালা আকাশ ভেদ
করিয়া উঠিয়াছে, ঐ সকল শিখর-গাত্রে নূতন মেঘ দেখিয়া, জানকি !
তোমাকে স্মরণ করিয়া কতই না কাঁদিয়াছিলাম, মেঘও তখন নবজল-
বর্ষণচ্ছলে আমার হৃৎখে কাঁদিয়াছিল’ । জনকনন্দিনি ! ঐ দেখ, ঐ
সেই স্থান, যেখানে—

গন্ধশ্চ ধারাহত-পম্বলানাং

কাদম্বমর্দোদগতকেশরঞ্চ ।

স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবু-

র্ষস্মিন্নসস্থানি বিনা ত্বয়া মেং ॥

ঐ দেখ, ঐ সেই স্থান—

পূর্ববানুভূতং স্মরতা চ যত্র

কম্পোত্তরং ভীৰু ! তবোপগৃহম্ ।

গুহা-বিসারিণ্যতিবাহিতানি

ময়া কথঞ্চিদ্ ঘন-গর্জিতানি* ॥

১—রঘু, ১৩—২৬—এতদগিরেমালাবতঃ পুরস্তাদাবিভবত্যধরলেখি শৃঙ্গম্ ।

নবং পশ্যে। যত্র ঘনৈর্ময়। চ তদ্বিপ্রয়োগাশ্চ-সমং বিশৃষ্টম্ ॥

২—রঘু, ১৩—২*—“তোমার সম্মুখে যে সকল বস্তু আমার নিত্য হৃৎজনক ভিঃ
বিরহাবস্থায় তাহারাই সান্ত্বনয় কষ্টকর হইয়া উঠিল । নব-বারি-সিক্ত মৃদঙ্গক, অর্দ্ধোৎকট-
কেশর কদম্বমুকুল এবং ময়ূরগণের মনোহর কেকারব—এই সকল পদার্থ স্মরণ হইলেও
তৎকালে বিষত্বল্য বোধ হইত ।”

৩—রঘু, ১৩—২৮—“পূর্বে গভীর ঘন-গর্জন কালে তুমি চকিত হইয়া আমায় সে
আলিঙ্গন করিতে, বিরহাবস্থায়, গিরি-গন্ধর-প্রতিধ্বনিত মেঘ-শব্দ শ্রবণে তাহা মনে পড়িয়-
আমার হৃদয় বিবীর্ণ হইয়া যাইত ।” (চন্দ্রকান্ত ভরতভূষণ কৃত রঘুবংশের অনুবাদ) !

ঐ দেখ, ঐ সেই স্থান—

• আসার-সিক্ত-ক্ষিতি-বাম্পযোগান্

• মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্ন-কোশৈঃ ।

• বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে

• বিবাহ-ধুমারুণ-লোচন-শ্রীঃ ॥

এইভাবে রাম ও না জনস্থানের সেই ‘পুষ্কাত্তুত’ পদার্থ নিচয়ের সহিত একেবারে মিশয়া, তন্ময় হইয়া, মীত্বে দেখাইতে লাগিলেন । এদিকে অরিতগ পুষ্পকও দেখিতে দেখিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল । দূরে হু হু শব্দে নয়নাভিরাম পম্প-সংগেবঃ সুনীল ছবি দৃষ্টি-গোচর হইল । তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে মঞ্জুল বাণীর লতিকা জলে ছেলিয়া পড়িয়াছে । আর নরসীর নীল-হৃদয়ে সারস-পঙ্ক্তি বীচি-ভরে মন্দ মন্দ আনন্দ সহিতেছে । সে নয়ন-রঞ্জনী সুষমা দর্শন করিয়া, আনন্দ-বিহ্বল মীত্বে তাহা দেখাইলেন^১ । পম্পার শোভা দর্শন করিতে রামের মনে বিরহ-কালের সেই সমস্ত ঘটনার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল । সেহ যে পম্পার জলে চক্রবাক-চক্রবাকী তরঙ্গের খালে খালে না নাচিতে ভাসিতেছিল, পরস্পর পরস্পরকে উৎপল-কেশর প্রদান করিয়া চলি, আর মীত্বে-বিরহিত রাম কাতর-নয়নে সেই মিলনের ছবি দেখে ছলেন^২, সেই পম্পা-সলিলঃ—সেই যে পম্পার

১—রঘু, ১৫—একায় নবজল-সম্পাত হওয়ায়, তাহা হইতে ধূস্রবর্ণ বাষ্প উৎপন্ন হইত এবং সেই বাষ্পে পুষ্পক নবকন্দল মিশ্রিত হইত, জানকী । তদ্বর্ণনে তাঁহার ‘বিবাহ-ধুমারুণ-লোচন-’ পড়িত, আর আসার বুক কাটিয়া যাইত ।

২—রঘু, ১৩—৩১—সু-বানীর বনোপগৃহস্থালক্ষ্য-পারিপ্লব সারসানি ।

৩—৩২—গর্গা পিবতী বখোদানুনি পম্পা-সলিলানি দৃষ্টিঃ ॥

৪—রঘু, ১৩—৩১—অত্রা বযুক্তানি রথাস্ত্রনাম্মাত্তোত্তোৎপল-কেশরাণি ।

দম্পান দুঃস্বপ্নবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে ! সম্পূহ্মীকিতানি ॥

সরস-তীরে কিসলয়-ভ্রম-নমিতাজী, তম্বী অশোক-লতিকা,—বিরহোন্মত্ত
রাম সীতা-ভ্রমে কঁদিতে কঁদিতে যাহার নিকটে ছুটিয়া গিয়াছিলেন,
আর অনুজ লক্ষণ সজন-নয়নে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন^১, সেই
অশোক-লতিকা প্রভৃতি, একটি একটি করিয়া জানকী বলন্ত-জানকীকে
দেখাইতে লাগিলেন । সীতা তাঁহার বশংবদ আরাধ্যপুত্রর সেই পূর্বাবস্থা
স্মরণ করিয়া অশ্রু-আরাধিত-নেত্রে একবার রামের প্রতি দৃষ্টিপাত^২
করিলেন ।

কণকাল-মধ্যেই বিনাম পঞ্চবটীর নিকটবর্তী হইল । গোদাবরীর
বক্ষোবিহারিণী সারসপঙ্ক্তি আকাশে উঠিয়া পঞ্চবটীর সেই পূর্বপরিচিত
অতিথিদের অভ্যর্থনা করিল^৩ । কৃশাজী জানকী বনবাস-ক্লেশ একান্ত
কাতর থাকিয়াও পঞ্চবটী বনে কলসে কলসে জল সেচন-পূর্বক যে
সকল বাল সহবাস সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, নবীন তৃণ-কবল দানে যে
সমুদয় হরিণ-শিশুর জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন, এফালে সেই বাল-সহকার
সমুহ প্রকাণ্ড মজিকৃত পরিণত হইয়াছে, আর এতাদেরই স্মৃতিতল
ছায়ায়, সেই সীতা-সংবর্দ্ধিত হরিণ-শ্রেণী উদ্ধমুখে পাড়ান্না আছে^৪ ;
বেন দূরে—আকাশে, এতাদের কোন চিরপরিচিত ব্যক্তিকে তাহার
দেখিতে পাঠিয়াছে । করণানয় রান পঞ্চবটী এই মৌলিক দর্শনে, কেনন
বেন একটা আনন্দময় ভাব অলস হঃস-সীতাকে উত্তা দেখাইলেন
সীতা দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে এতবার বিগলিত হইলেন ।

বিনাম গোদাবরীতে উপনীত হইল । এখন রামের সেই মুগ্ধতা

১—রঘু, ১৩—৩২—ইয়া ত্যাগশোকতাপ তথাঃ স্তন্যভিহাঃ-স্তবকাভিনয়াদ্ ।

২—প্রাপ্তিবুদ্ধাঃ পরিদ্রক্ষু কানঃ সোমসিগাঃ সাক্ষরহঃ নিশিচ্চঃ ॥

৩—রঘু, ১৩—৩৩ ।

৪—রঘু, ১৩—৩২—এন ভয়ঃ পেশল-মধ্যায়ঃপি যদাপু সংবর্দ্ধিত-বাল-চূতা ।

অনন্দময়ভ্রামুগ কৃষ্ণ-সারা দৃষ্টা চিরাৎ পঞ্চবটী মনো মে ॥



THE GARDEN OF THE GODS

কথা মনে পড়িল । রামের জীবনে সে এক অরণীয় দিন । বুঝি তেমন সুখের দিন আর আসিবে না । রাম অঙ্গুলী নির্দেশপূর্ব্বক কহিলেন,—

অত্রানুগোদং মৃগয়ানিবৃত্ত

স্তরজ্জ্বাভেন বিনীতখেদঃ ।

রহস্ত্বদুঃসঙ্গ-নিষঙ্গ-মূৰ্দ্ধা

স্মরামি বানীর-গৃহেষু স্তপ্তঃ ॥

ক্রমে পুষ্পক পঞ্চবটী, তপোবন, আশ্রম, চিত্রকূট প্রভৃতি কত স্থান অতিক্রম করিয়া, প্রয়াগে উপস্থিত হইল । রাম গঙ্গা-যমুনার সেই সপূৰ্ণ সঙ্গম-শোভা সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন । সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস সে স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যের যে অনুপম বর্ণন করিয়াছেন, সংস্কৃত-ভাষায় তাহা অদ্বিতীয় ।

বিমান বিহ্বদ্বংগে ছুটিয়াছে । দূরে চণ্ডাল-গড় গুহকের পুরী । বন-গমনের সময়ে সারথি স্তম্ভ এই পর্য্যন্ত রামের সঙ্গে আসিয়াছিলেন । এই স্থানও রামের চিরঅরণীয় । আজ চণ্ডাল-গড় দর্শনে রামের সেই মুকুট-পরিতাগ-কাহিনী মনে পড়িল । অমনি বলিলেন, ‘জানকি ! মনে পড়ে কি ? এই সেই নিষাদাধিপতির আবাস ভবন । এই স্থানেই আমি ‘মৌলিমণি’ পরিতাগ করিয়া মস্তকে জটা-বন্ধন করিয়াছিলাম । আর তদদর্শনে, করুণ-হৃদয় স্তম্ভ ‘কৈকেয়ি ! তোর অভিলাষ এত দিনে পূর্ণ হইল’ বলিতে বলিতে কতই না ক্রন্দন করিয়া ‘ছিলেন ?’

১—রঘু. ১০—৩ঃ—‘আমি মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই গোদাবরীর তীরস্থ বেতসকূঞ্জে স্থপীতল বায়ু সেবন করিয়া শ্রান্তিদূর করিতাম, এবং তদীয় উৎসঙ্গদেশে মন্তক স্থাপন পূর্ব্বক স্থখে নিদ্রা যাইতাম । সম্প্রতি পুনর্ব্বার সেইরূপ শয়ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে ।’

(চন্দ্রকান্ত)

২—রঘু. ১৩—৪ঃ—‘পুরং নিষাদাধিপতিবিন্দং তৎ বন্দিং বয়া মৌলিমণি বিহায় ।

জটাস্থ বদ্ধাধরদং স্তম্ভঃ কৈকেয়ি ! কাব্যঃ কলিতান্তবেতি ।

দেখিতে দেখিতে ‘বিমান-রাজ’ অযোধ্যা-তল-বাহিনী সরযুর তটে উপস্থিত হইল । রাম আজ চতুর্দশ বৎসর দেশ-ভাগী, স্থির-সৌন্দর্য্যমণী সরযুর শাস্তোজ্জল-মূর্তি দর্শনে বঞ্চিত । রাম ভারতের কত দেশ, কত নদ-নদী, কত পর্বত-সমুদ্র দেখিয়াছেন কিন্তু সরযুর কথা এক মুহূর্তের জন্তও বিস্মৃত হয়েন নাই । বহুকাল পরে জননী দর্শনে প্রবাস-প্রত্যাগত সন্তানের হৃদয়ের যে অবস্থা হয়, সরযু-দর্শনে আজ রাম-হৃদয়েরও সেই দশা ঘটিল । তাঁহার অন্তঃকরণ-বাহিনী জন্ম ভূমি-প্রীতি-রূপিণী মহানদী একেবারে যেন উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । রাম প্রীতি প্রফুল্ল-চিত্তে বলিলেন ‘সীতে ! ঐ আমাদের সরযু, উনি উত্তর-কোশল-পতিদিগের সকলেরই যেন জননী । জননী যেমন সন্তানকে স্তন্য দান করেন, অঙ্কে ধারণ করেন, সম্যুও তেমনি স্বকীয় ছদ্মধিক সজীবন সলিলের দ্বারা অযোধ্যাপতিদিগকে সজীবিত রাখেন । উঁহার তট-রূপ-উৎসঙ্গ-বর্ত্তিনী অযোধ্যা পৃথীতে আমার পূর্বপুরুষ-গণ মহাসুখে কালান্তি-পাত করিয়াছেন । আমার না কোশল ; যেমন নদীয় পরমারাধা পিতা কর্তৃক বিযুক্ত হইরা, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে আমার পথের দিকে চাহিয়া আছেন, তদ্রূপ মাতৃ-রূপিণী সরযুও, ঐ দেখ, যেন এতদিন উৎসুক-হৃদয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; আজ বহুদিন পরে আমি আসিতেছি, তাই নাতার ছায়, আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত যেন তাঁহার তরঙ্গরূপী স্নেহ-শীতল কর প্রসারণ করিতেছেন’ ।

বহুকালপরে অযোধ্যার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ, প্রসন্ন-সলিলা, ‘তটশালিনী, স্নন্দর’ সরযু দর্শন করিয়া রামের হৃদয় আনন্দ স্রোদে আপ্ত হইল । তিনি

১—রঘু. ১৩—৬২—বাং সৈকতোৎসঙ্গ-স্থগোচিতানাং প্রাট্যোঃ পরোভিঃ পরিবর্দ্ধিতানাং ॥

সামান্ত-ধাত্রীনিব মানসং মে সম্ভাবয়ত্যন্তর-কোশলানাম্ ॥

—৬৩—সেয়ং নদীয়া জননীব তেন নাস্তেন রাজা সরযু বিযুক্তা ।

দূরে বসন্তঃ শিশিরানিলৈর্মাং তরঙ্গ-হস্তৈরুপগৃহ্যতীব ॥

তঁাহার আদরিণী সীতাকে, কত প্রকারে, সরযুর চিরমধুর স্রবসা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তখন রাম-সীতার হৃদয়ে যে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । ভাষার বুঝি তত সামর্থ্য নাই ।

রাম-সীতা আসিতেছেন—সংবাদ পাইয়াই জটা-চীর-ধারী ভরত অগ্রসর হইয়া তঁাহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিলেন । রাজ্যের প্রবীণ প্রবীণ অগাভ্যাগণ ভরতের সহিত রাম-সীতা-দর্শনে আসিলেন । সেই কবে, কত দিন, কত বৎসর হইল রাম বন-যাত্রা করিয়াছেন, আর এই দীর্ঘকাল রামানুরক্ত ভরত, রামের পাছুকা তদীয় প্রতিনিধিরূপে সিংহাসনে স্থাপন-পূর্ব্বক, ভূত্যের দ্বায়, অনাসক্ত-ভাবে রাজ্য-পালন করিতেছেন ! আজ অবোধার রাম অবোধায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ভরতেরও কঠোর ‘আসিধার ব্রত’ উদ্ঘাষিত হইল । ভরতের অসীম আনন্দ । অবোধার রাজ-প্রাসাদে যেন একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল^১ ।

“ইনি আমার বিপৎকালের পরম বন্ধু ‘হরীশ্চর’ সূত্রীব, ইনি রাক্ষস-বুদ্ধে আমার অগ্রসর যোদ্ধা মহাবীর বিভীষণ, ইঁহাদিগকে অভিবাদন কর” বলিয়া রাম ক্রমে ‘রাজ্যাশ্রম-মুনি’ ভরতকে, সমাগত কপিরাক্ষস-দিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন । ভরত তঁাহার জটিল মস্তক অবনত করিয়া, তঁাহাদিগকে বন্দনা করিলেন । সে অতি আনন্দের চিত্র^২ । বহুকাল পরে হৃত রত্নের উদ্ধার করিয়া রাম ঘরে ফিরিয়াছেন, সকলেই

১—রঘু, ১৩—৬৬—অসৌ পুরস্কৃত্য ভরত পদাতিং পশ্চাদবহাগিত-বাহিনীকঃ ।

বৃদ্ধৈরবাতৈতঃ সহ চীরবাসাঃ মানর্ঘ্যপাণিভরতোহভ্রুপৈতি ॥

—৬৭—পিত্রা বিহৃষ্টাং মদপেক্ষয়া যঃ স্মিন্নঃ বুধ্যাপ্যক-গতামভোক্তা ।

ইরন্তি বর্ধানি তয়া সহোগ্রং অভ্যন্ততীৰ দ্রতনাসিধারম্ ॥

২—রঘু, ১৩—৭২—দুর্জাত-বন্ধুরয়মৃকহরীষরৌ মে গৌলন্ত্য এষ সমরেযু পূর্নঃ প্রহর্ভা ।

ইত্যাদৃভেন কথিতৌ রঘু-মন্দনেন ব্যুৎক্রম্য লক্ষণমুভৌ ভরতো ববলৈ ॥

অপার সুখ-সাগরে নিমগ্ন । ক্রমে ভরত লক্ষণের সমীপবর্তী হইলে, বিনীত লক্ষণ তাঁহাকে আনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন । ভরতও অমনি লক্ষণকে উঠাইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন । দুর্ভব ইন্দ্রজিতির বিধন শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষণের বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল । লক্ষণের সেই বক্ষুর বক্ষে যখন ভরতের বক্ষ সংলগ্ন হইল, তখন, ভরত অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না ।

ক্রমে, ধীরপদ-সঞ্চারে ভরত আসিয়া, আৰ্য্য জানকীর চরণে প্রণাম করিলেন । তখন—

লক্ষেশ্বর-প্রগতি-ভঙ্গ-দৃঢ়-ব্রতং তৎ

বন্দ্যং যুগং চরণযোজনকাঙ্ক্ষজায়াঃ ।

জ্যোষ্ঠানুবৃদ্ধি-জটিলঞ্চ শিরোহস্ত সাধো

রত্নোত্ত-পাবনমভূতভয়ং সমেত্যং ॥

জানকীর যে চরণ-যুগল লক্ষেশ্বরের অভ্যর্থনা ভঙ্গ করিয়া, সুদৃঢ় পাত্তি-ব্রতা ধর্ম প্রকাশ করিয়াছে, এবং দাস্ত ভরতের যে মস্তক প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ দুর্ভব জটাবার ধারণ করিয়াছে, সম্প্রতি সেই পবিত্র বস্তুদ্বয় মিলিত হইয়া পরস্পর যেন পবিত্রতর হইল ।

১—রঘু, ১৩—১৩—সৌমিত্রিণা তদনু সংসমুজ্জৈ স চৈন মুখাপ্য নম্র-শিরসং ভূষামালিজ্জ ।

রূঢ়েন্দ্রজিৎ-প্রহরণ-ব্রণ-কর্কশেন ক্লিশ্বদ্রিবাশ্ত ভূষমধ্যমুরঃস্থলেন ॥

২—রঘু, ১৩—৬৮ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

বজ্রাঘাত ।

রাম-লক্ষণসীতা বনে গমন করা অবধি কৌশল্যা ও সুমিত্রা আর ঐন্দ্রপুত্র কক্ষের বহির্ভাগে আসেন নাই । সীতা-শূন্য সংসারের মুখ দর্শন করেন নাই । কাদিতে কাদিতে তাঁহাদের নয়ন অন্ধ হইয়াছে । যখন বন-বাস-নিবৃত্ত রাম-লক্ষণ আসিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন, তখন তাঁহারা রাম-লক্ষণের মুখ দেখিতে পাইলেন না । বুকের মধ্যে জুড়াইয়া ধরিলেন । তাঁহাদের এই চতুর্দশ বর্ষের সমস্ত বেদনা—যন্ত্রণা যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল । এতক্ষণে তাঁহারা বুঝিলেন যে এই তাঁহাদের রাম, আর এই তাঁহাদের লক্ষণ । তাঁহারা ধীরে ধীরে পুত্র-দ্বয়ের কলেবরে কর-চালনা করিতে লাগিলেন । পুত্র-দ্বয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ স্পর্শ করিয়া জননীর প্রাণ কাদিয়া উঠিল । ‘বীর-প্রসবিনী’ শব্দ, কত্রিয়-কামিনীগণের একান্ত অভিপ্রেত হইলেও, তাঁহাদের কিন্তু আর উহাতে স্পৃহা রহিল না । জানকী এতক্ষণ একপাশে চিত্রিতার ছায়া নিম্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন । এইক্ষণে, ‘আমি স্বামীর অনন্ত ক্লেশ-কারিণী সীতা প্রণাম করিতেছি’—বলিয়া, মহিবীহ্বয়ের চরণ-প্রান্তে পতিত হইলেন । তখন কৌশল্যা এবং সুমিত্রা উভয়ে যুগপৎ সীতাকে গিয়া বলিলেন,—‘মা ! উঠ, তোমার পবিত্র চরিত-প্রভাবেই, রাম-লক্ষণ এই দুস্তর বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন । ভাগ্যবতি ! রঘু-কুল-রাজ-লক্ষ্মি ! উঠ’ !

ক্রমে বৃদ্ধ অমাত্য-গণ, মহা-সমারোহে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিলেন । দশরথ, কৈকেয়ীর প্রতিবন্ধকতায় প্রজাপুঞ্জের যে আশ

পূর্ণ করিতে না পারিয়া, ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আজ সে আশা পূর্ণ হইল । কিন্তু দশরথ দেখিলেন না !

অভিষেকান্তে, রাম আকুল-হৃদয়ে, দশরথের আলেখ্য-যুক্ত কক্ষে প্রবেশ-পূর্বক, অশ্রু-ভারাক্রান্ত-নয়নে পিতার প্রতিকৃত্তিক প্রণাম করিলেন । এই কক্ষে দশরথ বাস করিতেন । একদিন এই বিশাল কক্ষ ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল, আর এখন একেবারে শূন্য । কেবল একপার্শ্বে দশরথের একখানি জীর্ণ প্রতিকৃতি দোলায়মান । পিতার ঐ প্রতিকৃতিদর্শন করিয়া রাম উচ্ছলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ প্রশমন করিলেন^১ ।

রামের সেই প্রতিহতরক্ত অভিষেকের উৎসবে অযোধ্যা-নগরী নিমগ্ন । দেখিতে দেখিতে মাসার্দ্ধকাল অতিবাহিত হইল । সমাগত তপোধনগণ স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন । সীতা স্বহস্তে নানাবিধ উপহার দানে, পরমোপকারী রক্ষকপীড়দিগকে আপ্যায়িত করিলেন । রাম ক্ষুধা-হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রস্থানে সম্মতি দিলেন ।

রামরাজ্যে সকলেই সুখী । রামের ব্যবস্থাশুণে দরিদ্রেরও ধনাগম হইল । তাঁহার শৌর্য্যে রাজ্যের সমস্ত উপদ্রব প্রশমিত হইল । তিনি পিতার স্মার, প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । তিনি পুত্রহীনের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, অনাত্মের নাথ হইলেন^২ । অনেক দিন পরে,—অনেক দুঃখ, অনেক অবসাদ, অনেক বিড়ম্বনার পরে, অযোধ্যা-রাজ্য আবার শান্তির উৎসঙ্গে সুযুগ্ম হইল । রাম ধর্ম্মৈক-শরণ হইয়া, পৌরকার্য্য নির্বাহ করেন, রাজ্যের সমস্ত অভাব অভিযোগ নিজে বিদিত হইয়া, তাহার প্রতিকার-ব্যবস্থা করেন । আর দিনান্তে

১—রঘু. ১৪—১৫, ১৬ ।

২—রঘু. ১৪—২৩—তেনার্থবান্ লোভ-পরাজ্জ-মুখেন তেন স্নতা বিয়তঃ ক্রিয়ান্ ।

তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেজ্জ তেনৈব শোকাপমুখেন পুত্ৰী ।

কখনও বা রাজ্য-চিন্তাবসন্ন হৃদয়ের কথঞ্চিৎ বিনোদনের নিমিত্ত, বৈদেহীর সহিত চিত্রশালিকায় প্রবেশ করিয়া নানাবিধ চিত্র দর্শন করেন।

দণ্ডকারণ্যে সীতাকে হারাইয়া রাম উন্মত্ত-হৃদয়ে কত বিলাপ করিয়াছিলেন, কুণ্ডে কুণ্ড, লতায় লতার, পত্রে পত্রে, সীতার কত অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বিরহ-বিলাপ-অন্বেষণের অবস্থাগুলি বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া, সেই সেই সময়ের পৃথক পৃথক চিত্র রচিত হইয়াছে। তৎপরে দিনের সেই সমুদয় চিত্রে গৃহভিত্তি সজ্জিত। আজ সূতের দিনে, গিলনের দিনে, রান-সীতা সেই সকল চিত্র দেখিতেছেন। একপ্রাণ হইয়া দেখিতেছেন, আর দুই জনে তৎকালের সেই সেই অবস্থাগুলি ভাবিতেছেন। পরস্পরে জল্প পরস্পরের সেই আকুলতার ছবি দেখিতে দেখিতে, পরস্পরের ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছেন। অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। সে এক সূতের মুহূর্ত্ত^১। রাম-সীতার জীবনে তেমন সূতের মুহূর্ত্ত বুঝি আর আসে নাই। আসিবেও না! রাম আজ অযোধ্যার অধীশ্বর, আর জনকনন্দিনী অযোধ্যার অধীশ্বরী, আনন্দের পরিসীমা নাই। তাহারা সেই পূর্কামুভূত ঘটনাবলীর ছবি, সেই নিৰ্জন-বনবাস কালের গিলনের এবং বিরহের ছবি দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দুই-জনেই যেন নিজের নিজের পৃথগস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, সূত্রে, মোহে, বিস্ময়ে, জড়তায়—কেমন যেন অলস হইয়া পড়িতেছেন। গর্ভ-ভরালসা জনক-শ্রমিয়া ক্রমে আনন্দ-তজ্রাবেশে নিমীলিতাক্ষী হইতে লাগিলেন। তাহার নিদ্রার আবেশ আসিল। এই প্রকার আনন্দালসভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, নিজের সত্ত্বা যেন সীতার নিকটে আসবৎ গচ্ছিত রাখিয়া, রাম রাজধানীর আনন্দময়ী বহিরবস্থা দর্শনেচ্ছু হইয়া অত্রংলিহ

১—রঘু, ১৪—২৫—তদ্ব্যর্থিখাপ্রার্থিতমিল্লিয়ার্থানাসেদ্বয়ঃ সমস্ত চিত্রবৎস্।

প্রাপ্তানি ছুঃখান্তপি নওকেষু শক্তিষ্ঠামানানি হুঃখান্তভবন।

প্রাসাদে আরোহণ করিলেন । আর তাঁহার প্রাণ যেন সেই চিত্র-শালিকা-শায়িনী সীতার নিকটে পড়িয়া রহিল ।

এমন সময়ে, দুর্নুধ আসিয়া, ‘রক্ষোভবনোষিতা’ জনকাত্মজার চরিত্রে হুলদর্শী প্রজাগণ যে কলঙ্কারোপ করিতেছে, তাহা অতি গোপনে অযোধ্যা-পতির নিকটে প্রকাশ করিল । তখন—

কলত্র-নিন্দা-গুরুণা কিলৈবং
অভ্যাহতং কৌন্তি-বিপর্য্যয়েণ ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং
বৈদেহী-বন্ধোহুর্দয়ং বিদদ্রে ॥

তখন সেই ‘দেব-যজ্ঞ-সম্ভবা, স্বজন্মাত্মহুতপিত্রি ত-বসুন্ধরা, অরণ্য-বাসসহচরী, প্রিয়স্তোক বাদিনী, নিমি-জনক-বংশ-নন্দিনী, রামময়-জীবিতা,’ অনল-পরীক্ষিতা দেবীর চরিত্রে প্রজাগণের দোষারোপ-কথা চিস্তা করিয়া, বৈদেহী-বল্লভের হৃদয় শতদা বিদীর্ণ হইল । রাম অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, প্রজারঞ্জন যে বংশের চিত্রত, সেই বংশের অবতংস, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়াও প্রকৃতি-পুঞ্জের হৃদয়-রঞ্জে বদ্ধপরিকর হইলেন । রাম তৎক্ষণাৎ—

নিশ্চিত্য চানন্ত-নিবৃত্তি বাচ্যং
ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্চ্ছুমৈচ্ছৎ ॥

যেমন প্রজাগণের সন্দেহ-বার্ত্তা-শ্রবণ, অমনি সেই সন্দেহের মূলোচ্ছেদে কৃতনিশ্চয় হইলেন । সীতা যে কি প্রকার গুরুশীলা, তাহা রাম জানিতেন, রাম যে কিরূপ সীতাময়-প্রাণ, তাহাও সীতা জানিতেন । রাজার কঠোর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া, রাম একপদে সে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন । একদিকে জীবনের সুখ, অন্যদিকে রাজার কর্তব্য,

একদিকে শুদ্ধিমতী জানকী, অত্রদিকে প্রাচীন এবং নিষ্কলঙ্ক অযোধ্যা-
রাজ-বংশের কীর্ত্তি প্রভৃতি তোলকরিয়া, বলিষ্ঠ-হৃদয় রাম নিমেষ-মধ্যে
কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। ভাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ‘ভাতৃগণ!
একদিন পিতা প্রীত্যর্থেষু সমুদ্ৰ-মেখলা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম,
আর আজ প্রজার প্রীত্যর্থেষু বৈদেহীকে পরিত্যাগ করিতেছি’। তোমরা
আমার এ কার্য্য বাধা দিও না। তোমরা ত জান যে,—

অবৈগি চৈনামনঘেতি কিন্তু

লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।

ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলহে

নারোপিতা সিদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ^২ ॥

রক্ষো-বধাক্তো ন চ মে প্রয়াসঃ

ব্যর্থঃ—স বৈব-প্রতিমোচনায়।

অমর্ষণঃ শোণিত-কাঙ্ক্ষয়া কিং

সদা স্পৃশন্তং দশতি দিজিহবঃ^৩ ॥

তাঁহি ২. ১১ করি আমার এ কার্য্য তোমরা বাধা দিও না।
আমি জানি, তোমরা নিরতিশয় বরুণ-হৃদয়। যদি তোমরা আমার

২—রথঃ—৪১—‘আমি জানি, সাত কোন দেবে দুষিত নহে। কিন্তু দুর্নিবার
লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।’ থেকে কি না বলিতে পারে, দেখ, তাঁহার পৃথিবীর
ছায়ায় কে কি এক শব্দধরের কলঙ্করূপে আত্মপা করিয়াছে?’

৩—রথঃ—৪২—‘সীতাকে পরিত্যাগ করিলে হৃদ্যন্ত দশাননকে সবংশে বিনাশ
করা পণ্ডিতেরা বলেন যে হেতু সে কেবল বৈর-নিষ্যাতনে নিবৃত্তই করিয়াছি। সপকে
গদাহত করিয়া পদে পদে অপরাধকে দংশন করে, সে কি রুধির পান করিবার আশয়ে
না বৈর-নিষ্যাতনে নিবৃত্ত?’

(চন্দ্রকান্ত)

নিন্দা-বিমুক্ত প্রাণের আশ কর, তবে আমার এ কার্যেরও অনুমোদন কর' ।' সংক্ষোভিত সনুদ্রবং ক্ষুব্ধহৃদয় রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভ্রাতৃ-ত্রয় নীরবে অধোবদন হইলেন । তখন—

ন কশ্চন ভ্রাতৃষু তেষু শক্ভঃ

নিষেক্ষু মাসীদনুমোদিতুং বাং ।

ক্রমে 'লোকত্রয়-গীত-কীর্তি' নাম তাহার প্রাণাধিক লক্ষণের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন,—‘ভাঃ, ভোগার ভ্রাতৃজায়া জানকী তপোবন-দর্শন-বাসনা জানাইয়াছিলেন, তুমি সেই ছলে, তাঁহাকে এখনই বাস্তবিক আশ্রমে লইয়া যাও এবং তথায় পরিত্রাণ করিয়া আইস ।’ লক্ষণ শুনিলেন, পরশুরাম যেন পিতৃমুখে মাতৃ-হত্যার আদেশ শুনিয়া-ছিলেন, সেই ভাবে লক্ষণ শুনিলেন । গুরুজনের আদেশ ‘অবিচারণীয়’ মনে করিয়া অগ্রজের শাসন স্বীকার করিলেন* । অমোঘ্যার সমুচ্চসৌখ-তল-শায়িনী শাস্তি দেবতার বক্ষে যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল । স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে এপর্যন্ত কেহ যাচ কল্পনাও করিতে পারে নাট, রাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন । পৃথিবীতে পদের জন্ত জীবন-দানের কথা কচিৎ শুনা যায় বটে, কিন্তু এত প্রকার, পরের একটু সম্ভ্রাম-বিধানের জন্ত জীবনাদিক বস্তুর বর্জনের কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না ।

কবিগুরু বাস্তবিক এটো একটা বিরাট চরিত্র গঠন করিয়াছেন, ইহার উপমা অত্যাঁচ নাট । ভাঃের অমর কবি কালিদাস সেই বিরাট চরিত্রের,—বাস্তবিক কর্তৃক সর্বস্তুর বর্ণিত সেই মহৎ চরিত্রের

১—রঘু. ১৪—৪২ ।

২—রঘু. ১৪-৪৩ তাঁহারা কেহই পরজের বাক্যের প্রতিবাদ বা অনুমোদন কিছুই করিতে পারিলেন না !

৩—রঘু ১৪-৪৬ ।

(চন্দ্রকান্ত)

অতি সজ্জেক্ষেপে এমন ছায়াময়ী মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন যে, সেই ছায়াময়ী, তড়িৎময়ী, আবেশময়ী মূর্তি যখনই দর্শন করি, যখনই সেই রামচরিত্রের আলোচনা করি, তখনই স্তম্ভিত হই, বিস্মিত হই, উদ্ভ্রান্ত হই। দশরথ, প্রিয়তমা মহিষীর কথায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, আর আজ, সেই দশরথ-তনয়, সেই জ্যেষ্ঠপুত্র রাম, প্রজার কথায় নিজের সংসারের শাস্তি, জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের তৃপ্তি, নয়নের দীপ্তি, পবিত্র-শীলা সহধর্মিণীকে চিরনির্বাসিত করিলেন।

দশরথ ইন্দুমতী-বিরোগ-কাতর অজের তপ্তাশ্রু-দীপ্ত সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। মহারাজ অজ কাদিতে কাদিতে দশরথের অভিষেক করিয়াছিলেন। দশরথও কাদিতে কাদিতে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। অজ জীবনের দুর্ব্বল ভারে একান্ত কাতর হইয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলেন; আর দশরথের পুত্রশোকে অপমৃত্যু ঘটিল। রাম বন-প্রত্যাগত হইয়া, পিতৃশোক-কাতরমনে ও সজল-নয়নে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোধ করিয়াছিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহার জীবনের সুখ, স্বপ্নের মত কোথায় চলিয়া গেল। কেবল তাহার স্মৃতিমাত্র পড়িয়া রহিল। সিংহাসন রানের কাল হইল। একবার সিংহাসনে উঠিতে বাইয়া, নিজে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আবার সেই সিংহাসনে উঠিয়াই জীবনের শাস্তি-প্রতিমাকে নিজেই নির্বাসিত করিলেন। কুক্ষণে দশরথ রাজা হইয়াছিলেন, কুক্ষণে রাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ-সিংহাসন পিতা-পুত্র উভয়েরই কাল হইল। দিলীপের সেই সুখময়, শাস্তিময়, উৎসবময় সংসার এতদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অযোধ্যা-রাজ্যের রাজ-লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

বিসর্জন ।

সীতার আজ বড় আনন্দের দিন । তিনি একবার ভাগীরথীর 'তীর-তপোবন'-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন । সীতা-পতি বুঝি প্রসন্ন-চিত্তে অল্পমতি দিয়াছেন, সেই সমুদয় 'পূর্বাহ্নভূত' 'রুচির প্রদেশ' সীতা আবার দেখিতে পাইবেন, তাই তাঁহার এত আনন্দ । সীতার প্রিয়-কার্য সাধনে রাম সর্বদাই তৎপর—ভাবিয়া সীতার হৃদয়ে আজ অতুল আনন্দ । কিন্তু সীতা—

• নাবুক কল্প-ক্রমতাং বিহায়

জাতং তমাত্মন্যসি-পত্র-বৃক্ষম্ ॥

বুঝিতে পারিলেন না যে, কল্পবৃক্ষ আজ তাঁহার অদৃষ্ট-দোষে বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে ।

সীতা লক্ষণের সহিত স্নানস্থ-পরিচালিত রথে আরোহণ করিলেন । রথ নক্ষত্র-বেগে ছুটিল । লক্ষণ অতিকষ্টে হৃদয়ের ভাব-গোপন-পূর্বক, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন । কিন্তু সীতার দক্ষিণ-নয়ন বারংবার স্পন্দিত হইয়া ভাবী গুরুতর দুঃখের সূচনা করিতে লাগিল । মুহূর্মুহুঃ দক্ষিণাফি-ক্ষুরণ-নিবন্ধন সীতার হৃদয়ে একটা ঘোর আতঙ্কের উদ্বেক হইল । তাঁহার 'মুখারবিন্দ' অকস্মাৎ 'পরিপ্লবন' হইল । সাধবী জানকী অস্তঃকরণে রাজা এবং রাজভ্রাতৃগণের নিরন্তর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন । রথ অনেক দূরে আসিয়া পড়িল । সম্মুখেই বীচি-মালিনী ভাগীরথী । গুরুর আদেশে, সাধবী বনিতাকে, 'সুমিত্রাতনয়' আজ জন্মের মত বনবাস দিতে চলিয়াছেন, ঘোর অকার্য্য করিতে উদ্যত

হইয়াছেন, তাই যেন পুরোবাহিনী জাহ্নবী তদীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপ
কর-পল্লব কম্পিত করিয়া লক্ষ্মণকে প্রতিবেদ্য করিলেন^১। লক্ষ্মণ
অতিশয় প্রীত হইয়া তাহা-জাহ্নবীকে পুলিনে অবতীর্ণ করিয়া, কীরাত-
বাহিত নৈকো-যোগে গঙ্গা পার হইয়া, মহীপতির কালকূটবৎ ভীষণ
আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন। লক্ষ্মণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই,
ধিক্রো-দুহিতা সীতা মুচ্ছিত হইয়া, শেল-বিদ্ধা হরিণীর আয়, পরশু-
নিকৃত শাল-যষ্টির আয়, স্বর্গচাতা দেবতার আয়, জননী পৃথিবীর ক্রোড়ে
পতিত হইলেন^২। কিন্তু জননীর প্রাণও যেন আজ কঠিন হইল।
'তোমার পতি অতিশয় সাধু-চরিত্র, পবিত্র সূর্য্যবংশে তাঁহার জন্ম,
তাদৃশ সচ্চরিত্র ব্যক্তি কেন আজ অকস্মাৎ তোমাকে ত্যাগ করিলেন'
—এইরূপ সংশয়িতা হইয়াই যেন জননী দুহিতাকে একটু স্থানও
দিলেন না^৩। লক্ষ্মণ অনেক যত্নে সীতার চৈতন্ত্য-সম্পাদন করিলেন।
অন্তঃকরণের প্রজ্বলিত দুঃখানলে সীতা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন
সীতার—'মোহাদভুং কষ্টতঃ প্রবাসঃ'^৪। মোহ অপেক্ষা চৈতন্ত্য লাভ
অধিকতর কষ্টের কারণ হইল। বিনাদোষে নিরপরাধা সাক্ষী সহ-ধর্ম্ম-
চারিণীকে রানচক্র পরিত্যাগ করিয়াছেন বলয়া, আত্মা জানকা
তাহার প্রতি কোনই দোষাতোপ করিলেন না। কেবল তিনি মুহুমূহঃ
আপন অদৃষ্টকেই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ তিষ্ঠ
রানের অনুজ্ঞায় আয় দৃঢ় হইয়া, সাক্ষী রাজ-নন্দিনীকে সমীপবর্তী

১—ঋগ্বেদ, ১৪—৫১—জুবোনিয়াপাদ্ বনিতাং বনান্তে সাক্ষাং স্থানিকা-তনয়ো বিহাস্তন্।

অতঃপরে বোধিত-মতি-হইন্তু জাহ্নবী-হিরা হিতয়া পুরস্তাং ॥

২—ঋগ্বেদ, ১৪—২২, ৫৩, ৫৪।

৩—ঋগ্বেদ, ১৪—৫২—ইক্ষুকু-বংশ-প্রভবঃ কথং হ্যং তাজেদকস্মাৎ পতিতার্থাবুত্তঃ।

ইতি ক্ষিত্তিঃ সংশয়িতেন তেষু দদৌ প্রবেশঃ জননী ন তাবৎ ॥

৪—ঋগ্বেদ, ১৪—৫৬।

বান্দীকি-তপোবনের পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং আনত-বদনে ও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, ‘দেবি ! আমি পরাধীন, প্রভুর আদেশ শালন করিতে বাইয়া, যে ঘোর নৃশংস প্রকাশ করিলাম, তাহা ক্ষমা করুন’—বলিয়া রঘু-কুল-বধুর চরণতলে ছিন্ন তরুর স্তায় পতিত হইলেন^১ । ভাগীরথীর পবিত্র-সৈকত-বর্ষি তপোবনে সীতা-লক্ষণের এই বিবাদময় অভিনয়ে যেন একটা গভীর শোকের, অনন্ত ছঃখের ঝটিকা উথিত হইল । সীতা রোদ্ধাযমান লক্ষণের কথঞ্চিৎ সাস্থনা-বিধান-পূর্বক কহিলেন, ‘বৎস ! তোমার অপরাধ কি ? উঠ, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও । আশীর্বাদ করি, চিরজীবী হও । স্বশ্রমিগকে এজ্ঞয়ের মত আমার শেষ প্রণাম জানাইও^২ । আর’—অশ্রু-নয়না সীতা কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, ‘আর লক্ষণ ! তুমি আমার এই কয়েকটি কথা তোমাদের সেই নূতন রাজাকে বলিও,— বলিও, আৰ্য্যপুত্র স্বয়ং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই অগ্নিতে আমার সতীত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন । আর আজ অলীক লোকাপবাদ শ্রবণ-মাত্রেই, সেই তিনিই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি জগদ্-বিখ্যাত সূর্য্যবংশের কিংবা ত্রিজগদ্-বন্দ্য আৰ্য্যপুত্রের অনুরূপ কার্য্য হইল^৩ ?’

“বলিও, ‘জানবান্ তুমি, তোমার দোষ কি ? আনি জন্মান্তরে কত পাপই করিয়াছিলাম, এই সমুদয় তাহাদেরই বিষময় পরিণাম ।” বলিও ‘যখন তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলাম, তখন তপস্বিগণ নিশাচর কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাপস-কামিনীরা আমার শরণাগত হইতেন, আর তুমি, আমার অনুরোধে তাহাদের বিপদ নিবারণ করিতে, আর এক্ষণে

১—রঘু, ১৪—৫৮ ।

২—রঘু, ১৪—৬০ ।

৩—রঘু, ১৪—৬১—বাচ্যস্বরা নববচনাৎ স রাজা বহৌ বিদুষ্মাসিৎ বৎ সৰ্বকম্ ।

সং লোক-বায়ু-শ্রবণ-বাহিনীঃ প্রভৃতি কিং তৎ সদৃশং কুলস্ত

অযৌধ্যার অধীশ্বর তুমি বিদ্যমান থাকিতে, সেই আমি, গহন বনে কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব ? কে আমাকে রক্ষা করিবে ? তুমি তাগ করিয়াছ, কর, কিন্তু আমি অনন্তহৃদয়ে একমাত্র তোমারই ধ্যান করিব । অস্বাস্ত্রে যেন তোমা-কই স্বামী পাই, তোমার সহিত আর যেন বিচ্ছেদ না হয় ।

“লক্ষণ, আর বলিও, ‘বর্ণাশ্রম-পালনই রাজার ধর্ম, সুতরাং আমি এখন অযৌধ্যা-বাসিনী না হইলেও আশ্রমবাসিনী বলিয়া যেন তোমার রূপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হই । পতির চক্ষে আমাকে না দেখিলে, কিন্তু রাজার চক্ষে দেখিতে ভুলিও না ।’” এই বলিয়া সীতা বিরত হইলে, লক্ষণ বিদায়-গ্রহণ করিয়া শূন্তমনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন । অবসন্ন-দেহা সীতা অনিমেঘনয়নে লক্ষণের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বতদূর পর্য্যন্ত লক্ষণকে দেখা গেল,—চাহিয়া চাহিয়া পরিশেষে বাণ-বিদ্ধা কুরুরীর শ্রাব মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন^১ । করুণ-বিলাপিনী জানকীর দুঃখে সমগ্র বনস্থলীও যেন কান্দিয়া উঠিল । তখন—

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি রক্ষাঃ

দর্ভানুপাস্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ ।

১—রঘু, ১৪—৬২—কলাগণবৃক্ষেরথবা তবায়ং ন কাম-চারো নমি শঙ্করীঃ ।

নৈবৈব অস্বাস্ত্র-পাতকানাং বিপাক-বিক্ষুর্জিতপ্রসহঃ ॥

—৬৪—নিশাচরোপন্নত-ভর্জুকানাং তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ ।

ভূত্যাশরণ্যাশরণার্থবস্তু কথং প্রপৎস্তু স্বমি দীপামানে ?

—৬৬—ভূয়ো যথা মে জনবাস্তবঃ পি ত্বমেব ভর্তা নচ বিপ্রযোগঃ ॥

—৬৭—নৃপত্ব বর্ণাশ্রম-পালনং যৎ স এব ধর্মো নমুনা প্রণীতঃ ।

নির্ধাসিতাপোবনভস্মরাহং তপস্বি-সানাস্তমবেক্ষীয়া ॥

২—রঘু, ১৪—৬৮—তথ্যেতি তন্তুঃ প্রতিগৃহ বাচং রামানুজে দৃষ্টি-পথং বাতীতে ।

স। মুক্তকণ্ঠঃ বাসনাতিভারায় চক্ষুশ্চ বিদ্ধা কুরুরীব ভূয়ঃ ॥

তত্ৰাঃ প্রপন্নে সমদুঃখ-ভাবম্

অত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেহপি ॥

অশেষ দুঃখ-ভোগ করিবার জন্ত বিধাতা জানকীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আর নিরন্তর দুঃখভোগ করিবার জন্তই বুঝি রামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন !

জীবনের প্রারম্ভে, পরম সুখের দিনে—যখন সীতা কোশল-সাত্বাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে তাপসীবেশ ধারণ-পূর্বক গহন বনে গমন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কোন কষ্ট ছিল না। রামের সহিত একত্র বাসে, তাঁহার সমস্তই আনন্দময় বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু সে বন-বাস-সুখও তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অতিরিক্ত মধোহিরাবণ তাঁহার সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন করিল। আজন্ম দুঃখিনী সীতা ক্রেশের আর অবশিষ্ট রহিল না। বহুবালের পর রাম-চক্রে সম্মুখীন পাইয়া সীতা ভাবিয়াছিলেন, বুঝি এইবার তাঁহার দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু বিধাতা যে তাঁহার অদৃষ্টে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়াছেন, তাহা তিনি যথেষ্ট জানিতে পারেন নাই। রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মন্থী হইয়া, কে কবে তাঁহার জায় চিরদুঃখিনী হইয়াছে? বুঝি দাবছাবন দুঃখভোগের নিমিত্তই তাঁহার নারীজন্ম হইয়াছিল।”

কবি, এ সবই সীতার কোন বিশেষ কথাবার্তার উল্লেখ করেন নাই। কদাচিৎ রাম-চরিত্রের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ প্রদর্শন-কালে, সীতা-রূপিণী স্থির-সোদানিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। এতক্ষণে নারী-জীবনের এই ভয়ঙ্কর দুঃখের সময়ে, রাজকন্যা সীতার করুণ-মোদনে কবি,

১—১৪—৬২—ময়ূরগণ প্রমোদন-ভাষ্যে পরিভাগ পূর্বক উক্তমুখ হইয়া রহিল। ময়ূরগণ

গৃহীত কুশ কবল পরিভাগ করিল এবং পাদপগণ কুম্ববর্ষণচ্ছলে

অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

সমস্ত জগৎ—চেতনাচেতন নির্বিশেষে যেন দুঃখের অতল সাগরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ‘জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পুনরায় পতিক্রমে প্রাপ্ত হই, তোমার সহিত এ জন্মের জ্ঞায় পরজন্মে যেন আর বিচ্ছেদ না ঘটে, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা’—বলিয়া পবিত্র-শীলা সীতা যখন সজল-নয়নে, শোকাকুল লুপ্তগণকে আশ্ববক্তব্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, তখন সীতা-হৃদয়ের সেই অল্পপন সৌন্দর্য্য,—সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, রাগের প্রতি তাঁহার যে অটল অনুরাগ, অসীম নির্ভর, তাহা চিন্তা করিয়া, সেই সাধুর চরণোদ্দেশে কাহার মস্তক না অবনত হয়? যে দেশে সীতার জ্ঞায় সতীর জন্ম হয়, সে দেশ ধন্য, তীর্থ-কর। যে দেশের সাহিত্যে আবার সীতার জ্ঞায় দেবীর চরিত্র চিত্রিত, সেই সাহিত্য এবং সেই চরিত্রের যিনি চিত্রকর,—উভয়েই পূজ্য।

সীতাকে বনবাস দিয়া, লক্ষণ নিত্যস্ত দীন-হৃদয়ে অগোধ্যায় প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া, সৰ্ব্বাঙ্গে রামচন্দ্রের বাস-ভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং চিন্তানতবদনে রামের সম্মুখে কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্র-লোচনে কহিলেন—‘আর্য্য! হুগায়া লক্ষণ আপনার আদেশ পালন করিয়া আসিল।’ লক্ষণের নিদারুণ বাক্য শ্রবণমাত্রেই—

বভূব রামঃ সহসী সবাপ্প-

স্তুষার-বর্ষীব সহস্র-চন্দ্রঃ।

কৌলীন-ভীতেন গৃহান্ নিরস্ত।

ন তেন বৈদেহ-সুতা মনস্তঃ’ ॥

শিশির মাসের তুষারবর্ষী হিমাংশুর জ্ঞায় রাম বাপ্পভরাপ্লুত হইলেন। ‘দেবযজ্ঞ-সম্ভবা’ সীতাকে তিনি অপবাদ ভয়েই গৃহ হইতে নির্বাসিত

করিয়াছিলেন, নতুবা, ক্ষণকালের জন্তও তাঁহার হৃদয় হইতে সীতার ধ্যান
বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া
'অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। সংসার তাঁহার নিকট যেন নিশ্চায়োজন
বোধ হইতে লাগিল। তবুও তিনি দৃঢ়-হৃদয়ে রাজ-কার্য্য-পর্যালোচনায়
প্রবৃত্ত হইলেন'। যখন একটু অবসর পান, তখন সেই হিরণ্ময়ী সীতা-
প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া, তাঁহার বাষ্প-দিগ্ধ চক্ষুর কথঞ্চিৎ বিনোদন
করেন। এইভাবে সীতা-পতি রামচন্দ্র শূন্য-হৃদয়ে 'রত্নাকর-মেখলা পৃথিবীর'
পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার আর আসক্তি
রহিল না^১। এইস্থলে বায়ীকির রামের সহিত, কালিদাসের রামের
কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বায়ীকির রাম, 'সীতাকে বনবাস
দিয়া যারপর নাই অধৈর্য্য ও শোকাভিভূত হইলেন; এবং আহার,
বিহার রাজকার্য্য-পর্যালোচনা-প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে একবারে বিসর্জন
দিয়া, অন্তের প্রবেশ-প্রতিবেশ-পূর্ব্বক একাকী আপন বাসভবনে অব-
স্থিতি করিতে লাগিলেন'। আর কালিদাসের রাম,—

নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্

বর্ণাশ্রমাবেক্ষণ-জাগরুকঃ ।

স ভ্রাতৃ-সাধারণভোগমুদ্বং

রাজ্যং রজো-রিক্তমনাঃ শশাস' ॥

বায়ীকির রাম প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত 'সাধু-শীলা,' 'সরলান্তঃকরণ'

১—রঘু, ১৪—৮৭।

২—রঘু, ১৫—১ কৃত-সীতা-পরিত্যাগঃ স রত্নাকর-মেখলাম্ ।

বুভুজে পৃথিবী-পালঃ পৃথিবীসেব কেবলাম্ ।

৩—বিদ্যাসাগর-কৃত সীতার বনবাস, ৫ম পরিচ্ছেদের আরম্ভভাগ।

৪—রঘু, ১৪—৮৫।

সহশ্র্মণীকে নির্বাসিত করিয়া, শোকাভিভূত-হৃদয়ে কিয়ৎকালের জন্য রাজ-কার্য্য-পর্যালোচনা পরিত্যাগ করিলেন। আর কালিদাসের রাম, সীতার আয় সহশ্র্মণীকে বিসর্জন দিয়াও, অন্তঃস্থ লিতানল শমীতরুর আয় দগ্ধ-হৃদয়ে ও অনাসক্ত ভাবে ভ্রাতৃগণের সহিত প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। শোকাবেগে রাজার কর্তব্য প্রতিহত হইল না।

কালিদাস তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ গঠন করিলেন : কর্তব্যের নিকট মহাপুরুষের সমস্তই অকিঞ্চিৎ-কর। পৃথিবীর এমন কোন পদার্থই নাই, জীবনের এমন কোন আকাঙ্ক্ষা বস্তুই নাই, বাহ্য মহাপুরুষ কর্তব্যের অনুরোধে পরিত্যাগ করিতে না পারেন। এই উদার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কবি কালিদাস, মহাপুরুষ রামের আয়, নিজেও অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন, চূর্ণভ্রমরত্ত রত্নে বিভূষিত হইলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহার একান্ত প্রিয় সংস্কৃত সাহিত্যকেও অক্ষয়-কীর্ত্তি-মণ্ডনে বিমণ্ডিত করিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

যবনিকা-পতন ।

বাঈকির তপোবনে সীতার দুইটি কুমার প্রসূত হইয়াছে । সত্য-প্রিয় দশরথ বাঈকির পরম স্নহদ ছিলেন । সীতা যে পতিব্রত কামিনীদিগের শিরোবর্তিনী, ইহাও মহর্ষি বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন । তিনি সেই সাধ্বী দশরথ কুল-বধূর সন্তানদ্বয়কে অতিশুদ্ধ লালন পালন করিতে লাগিলেন । ক্রমে নব-কুমার-যুগল কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, কল্পণাময় মহর্ষি, তাহাদিগের দ্বারা স্বরচিত রাম-চরিত গান করাইতে আরম্ভ করিলেন । সেই কোমল-কণ্ঠ বালকদ্বয় যখন তাহাদের আজন্ম-দুঃখিনী জননীর সনক্ষে, শৈশব-স্মৃতি-নৃত্য-করতালিকা-দিসহযোগে ও অপ্রবুদ্ধভাবে রাম-চরিত গান করিত, তখন তাহাদের বনবাসিনী জননী, সজল-নয়নে এবং নিবিষ্ট-মনে সেই গান শুনিতেন শুনিতেন, হৃদয়ে অহর্নিশ প্রজ্জ্বলিত রাম-বিরহানলের কথঞ্চিৎ শাস্তি করিতেন^১ । তখন তপো-বনের চঞ্চল-নয়ন হরিণগণও নিম্পন্দ হইয়া কুমারযুগলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই স্নমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত^২ ।

রামের অল্পকাল অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমগ্ন হইয়া মহর্ষি বাঈকি তখন অযোধ্যার রাজ-সভায় আগমন-পূর্বক, সেই নব-দুর্কাদিকৃত্যাম ত্রাপস-কুমার-বেশী বালকযুগলের দ্বারা রাম-চরিত সংগীত করাইলেন, তখন অযোধ্যার সমৃদ্ধিশালিনী মহাপরিষৎ একাগ্রমনে সেই অমৃতময় সংগীত শ্রবণ করিতে লাগিল । সমগ্র পারিষদ-মণ্ডলী ‘অশ্রুমুখী’ হইলেন । শিশির কালের প্রভাতে, বিন্দু বিন্দু হিম-নিশ্বাসিনী, বাত-রহিত

১—রঘু, ১৫—৩৪ রামস্তু বধূরং বৃত্তং গায়ন্তী মাতুরগ্রতঃ ।

তদ্বিষ্যোগ-ব্যাধাৎ কিঞ্চিৎ শিথিলীচক্রতঃ সূতো ।

২—রঘু, ১৫—৩৮ বৈথিলী তনয়াদলীত-নিম্পন্দ-সুগমশ্রবণম্ ।

বনস্থলীর ভ্রায়, সেই সভা আনন্দে, বিষয়ে, মোহে, অশ্রুগারাগ্রতা ও স্পন্দন-রহিতা চিত্র-লিখিতার ভ্রায় প্রতীত হইতে লাগিল।

‘রাম,’ লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রাজ-সভায় উপবেশন করিয়া কৌতূহলা-বিশ্তে-চিত্তে ঐ বালক-সংগীত শ্রবণ করিতেছিলেন। বীত-স্পৃহ গুণজ্ঞ রাম হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে, বালকযুগলকে অসংখ্য ধন-রত্নাদি দান করিলেন। বালক-দ্বয়ের প্রবেশ তা এবং জগৎপতি রামের দান-শীলতা দর্শন করিয়া সেই লোক প্রবাহ নিরতিশয় বিস্তৃত হইল। বাল্মীকি ধীরভাবে এ সমুদয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংসার-মালিন্য-মুক্ত অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি আনন্দের উদ্বেক হইল। কোমলকায় শিশুদ্বয়ের তাপস-বেশ-দর্শনে রামের বরুণাময় হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। তিনি তখন স্নেহ-পূর্ণ-বচনে ঐ বালকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা কাহার সম্ভান? কে তোমাদিগকে এমন সুমধুর সঙ্গীত শিখাইয়াছেন? কোন্ মহাকবি এ সঙ্গীতের রচয়িতা?’

এ দিকে তাপসবেশী বালক-যুগল, রামের সম্মুখে, নৃত্য করিতে করিতে রামায়ণ-গানে উন্মত্ত। জ্ঞান হওয়া অবধি, বাল্মীকির আশ্রমে, রামায়ণে যে রামের অশেষ কীর্তি-বিবরণ পাঠ করিয়াছে, ইনিই যে সেই রাম, সেই রামায়ণের নায়ক রাম, ইহা তাহার বুঝিতে পারিল না। কি সুন্দর চিত্র! রামের মত পিতাকে লব-কুশ পিতা বলিয়া চিনিতে পারিল না বা লব-কুশের ভ্রায় পুত্রদ্বকেও রাম চিনিতে পারিলেন না; নিরপরাধা দেব-যজ্ঞ-সম্ভবা সীতার নির্বাসনের, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত দ্ব্যবংশপতি রামের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। হিন্দুর চরম প্রায়শ্চিত্ত ‘চতুর্বিংশতিবার্ষিক প্রাজাপত্য’ ইহার নিকট উল্লেখ-

১—রঘু. ১৫—৬৬ তদগীত-প্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রমুখী বভৌ।

হিম-নিম্ভদ্বিনী প্রাতর্বির্বাতেব বনস্থলী।

২—রঘু. ১৫—৬৯।

যোগ্যই নহে। মহাকবি, অতি কৌশলে, ‘দারভাগী’ নৃপতির শাসন করিলেন ।

রাম-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, লব-কুশ বিনয় সহকারে, ঐ মহর্ষি এই মহাকাব্যের রচয়িতা এবং আমাদিগেরও শিক্ষক বলিয়া বায়ীকিকে নির্দেশ করিলেন । লব-কুশের বাক্য-শ্রবণ-মাত্রেরে সাহসে, রাম মহর্ষির চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, বিশাল আয়োণা রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন । তখন পরম-কারুণিক কবি বায়ীকি, ‘লব-কুশ যে মৈথিলীর গর্ভ-সমুত পুত্র’—ইহা প্রকাশ-পূর্বক সীতার পুনঃপরিগ্রহণ-প্রার্থনা জানাইলেন ।

মহাকবি-কালিদাসের অলোক-সামান্য করনা সুন্দরী, এই স্থলে যেন দশভুজার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সুন্দর রামচরিত্রের প্রমাণে নিযুক্ত হইয়াছেন । প্রজাগণের মনে সীতা-চরিত্র-সম্বন্ধে দ্বৈত সন্দেহের অঙ্কুরোৎপত্তিমাট্রেই, রাম কর্ত্তোরহুদয়ে সীতা-বর্জন করিয়াছিলেন । এই সামান্য সন্দেহের পরিণাম যে এমন ভয়ানক হইবে, তাহা প্রজাপুঞ্জ তখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই । সীতা-নির্বাসনের পরক্ষণ হইতেই অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছেন । শুদ্ধ-শীলা জানকীর বিগুহ-চরিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া, আর সেই শারদ-চন্দ্রিকাও সুনির্মল চরিত্রে দোষারোপের বিষয় চিন্তা করিয়া, প্রজাবৃন্দ, লজ্জায়, যুগায়, অনুশোচনায়, মর্মে মর্মে মরিয়াছিল । কি করিলে অযোধ্যার বিসর্জিত শারদা প্রতিমা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কি করিলে সেই নিফলক-প্রকৃতি অগ্নি-পরীক্ষিতা দেবীর পুনঃ সন্দর্শন পাওয়া যায়, এই ভাবনায় প্রজাপুঞ্জ অহর্নিশ ব্যাকুল ছিল । রাম প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন আর তাহার প্রতিবিধানের পছা নাই । হস্তচ্যুত অক্ষ আর প্রত্যাবৃত্ত হইবে না । রামের এবারকার জীবনের খেলা শেষ

হইয়াছে তিনি যথাসৰ্বস্ব হারিয়াছেন । আর জিতিবার আশা নাই ।
এ সমস্ত বিষয় অযোধ্যার 'জা' বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । তিনি
বুঝিয়াছিলেন যে, প্রজা-গণে এতদিনে ভ্রান্তি-নিরাস হইয়াছে ; জানকীর
পবিত্র চরিত্রে তাহাদের যে অলীক সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহা দূর হইয়াছে ।
তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, এক্ষণে যদি জনক-হৃহিতাকে পুনরায়
গ্রহণ করেন, তবে তাহাতে প্রজাগণের সন্তোষের আর অবধি থাকিবে
না । এ সমস্ত বিদিত থাকিয়াও নৃপতি রামচন্দ্র, ইচ্ছানুরূপ কার্যের
অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না । জল-বিন্দু লোল প্রজা-হৃদয়ের অস্থৈৰ্য্য
চিন্তা করিয়া, জানকী-সম্বন্ধে, তিনি একেবারে ঔদাসীত্য অবলম্বন
করিলেন । রাজার রাজা-পালন এবং প্রজা-রঞ্জন যে কীদৃশ কঠোর কার্য,
গহা কবি এই রাম-চরিত্রে বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিলেন । মহর্ষি
বাগ্মণীকী সীতাগ্রহণের জন্ত স্বয়ং অনুরোধ করিতেছেন বলিয়াই রামচন্দ্র
কর্তব্য-ভ্রষ্ট হইলেন না । তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

তাং ! শুদ্ধা সমক্ষং নঃ স্মৃষ্য তে জাত-বেদসি ।

দৌরাত্ম্যাদ্রক্ষসস্তাং তু নাত্রত্যাঃ শ্রদ্ধধুঃ প্রজাঃ ॥

তাঃ স্বচারিত্রমুদ্दिष्टा प्रत्याययतु मैथिली ।

‘ততঃ পুত্রবতীমেনাং প্রতিপৎস্তে ত্বদাজ্ঞয়া’ ॥

জানকীর তথাবিধ নির্দাসনে রামের অন্তঃকরণ নিরন্তর অসহ
বেদনাপূর্ণ ছিল । বাগ্মণীকী অনুরোধ করিতেছেন, প্রজাবৃন্দও তাহাদের

১—রঘু, ১৫—১২, ৭৩।—হে পরমপূজ্য ! আমাদের সমক্ষেই আপনার স্মৃষ্টি-
পরীক্ষা হইয়াছিল । তিনি নিজেই নিজ-চরিত্রের বিপত্তি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । কিন্তু
হৃদয় রাক্ষসের দৌরাত্ম্য-শঙ্কা অত্রতা প্রজা-বৃন্দের অন্তঃকরণ হইতে বোধ হয় এখনও
সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই । অতএব মৈথিলী প্রথমতঃ তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আপনার
প্রজাদিগের প্রত্যয়োৎপাদন করুন, তাহা হইলেই, আমি পুত্রবতী সীতাকে, আপনার
আদেশে, পুনরায় গ্রহণ করিতে পারি ।

ভাস্তি বুঝিতে পারিয়াছে, তবুও কিন্তু প্রজারঞ্জন রাম অকথাৎ সীতা-
পরিগ্রহ স্বীকার করিলেন না ।

রামের কথা শ্রবণমাত্রেই, বাম্মাকি শিষ্য-প্রেরণ-পূর্বক আশ্রম হইতে
মৈথিলীকে আনয়ন করিলেন । একদা রামচন্দ্র, পূর্ব-প্রতিশ্রুতি-স্মরণ-
পূর্বক, পৌরজানপদদিগকে একত্র সমবেত করিয়া মহর্ষির নিকট সংবাদ
পাঠাইলেন । পরম-কারুণিক বাম্মাকি পুত্রবতী জনকতনয়াকে লইয়া
রামের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন । মলিন-মুখী সীতা যখন স্পন্দনরহিত
সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার পরিধানে কাষায় বসন, নয়নদ্বয়
স্বকীয় চরণমূলে অর্পিত, অঙ্গলতিকা ক্ষীণ অথচ প্রশান্ত । দেখিলেই
মনে হয়, বুঝি সত্যীত্ব রমণী-মূর্তি পরিগ্রহ-পূর্বক অবোধার রাজসভায়
উপস্থিত হইলেন । তখন—

জনাস্তদালোক-পথাৎ প্রতिसংহত-চক্ষুষঃ ।

তস্থস্তুহবাস্থাঃ সর্বৈ ফলিতা ইব শালয়ঃ ॥

বাম্মাকি বলিলেন ‘না ! তোমার চরিত্র-সম্বন্ধে লোকের বাহাতে
সকল সংশয় দূর হয়, অচিরে তাহার অন্তর্ধান করা ।’ বাম্মাকির আদেশ
শ্রবণ করিয়াই দেব-যজ্ঞন-সম্ভবা বিগ্ৰহশীলা সীতা, মহর্ষি-শিষ্য-প্রদত্ত
পবিত্র-সলিলে আচমন পূর্বক, একাগ্র-মনে, হৃৎ-ভরাধাত-হৃদয়ে এবং
কৃতাজলিপুটে কহিলেন,—

বান্ধনঃ-কৰ্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে ।

তথা বিশ্বস্তরে দেবি ! মামস্তুর্ধাতুমর্হসিঃ ॥

‘না ভূত-ধাত্রি ! যদি আমি বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, কিংবা কন্মের

১—রঘু, ১৫—৭৮—জানকী উপস্থিত হইলে, সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব নয়ন সীতার দৃষ্টিপথ
হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক, ফলভরনত শস্ত্রের দ্বায় অধোবদন হইল ।

২—রঘু, ১৫—৮১ ।

দ্বারাওঁ জীবনে কদাচ আমার পতির চরণে কোন প্রকার অপরাধ করিয়া না থাকি, আমার চরিত্র যদি নিকলঙ্ক হয়, তবে মা ! তোমার অঙ্কে আমায় স্থান দাও । এ চিরভুংখিনীর দক্ষ-হৃদয় নির্ঝাপিত কর ।'

পতিদেবতা সীতার কণা শেষ হইতে না হইতেই, হঠাৎ সভা-মধ্যবর্তিনী ভূমি দ্বিা ভিন্ন করিয়া, শতভুদার প্রভার ছায়া অভ্যাজল প্রভামণ্ডল উদ্গত হইল । সেই অভ্যাজিত জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যে, 'নাগকণাৎক্ষিপ্ত-সিংহাসনে' আসীনা, সমুদ্র-মেখলা, মূর্ত্তিনতী বসুন্ধরা আবিভূত হইলেন । কণিমালায় উজ্জল-শিরোমণি সমূহের বিমলালোকে ভূত-ধাত্মীর স্নিগ্ধ দেব-দেহ সমুদ্ভাসিত হইল । অমৃত-বর্ষি-চক্রবৎ স্নেহ-বর্ষী নয়নে তিনি সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ।

পৃথিবী আবিভূত হইয়াই, ভূহিতা সাতাকে স্বকীয় অঙ্কে ধারণ করিলেন । আজন্ম ভুংখিনী সাধবা জানকী অনিমেষ-নয়নে একবার জন্মের নতুন ঝলক দেখিয়া দাঁটলেন । দেখিতে দেখিতেই,—'না না'—এই কথা রানো মুখ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই, বসুন্ধরা, সীতাকে লইয়া নিমেষ মধ্যে সেই আলোকপথে পাতাল-প্রবেশ করিলেন । রামের চিরবিষাদময় জবন ভিনয়ের এক প্রকার শেষ দবনিকা পতিত হইল ।

সীতার মণ্ডিত জর হইল । রামের প্রজারঞ্জন বক্ষে এতদিনে পূর্ণাছতি প্রদত্ত হইল । রাম সীতার চরিত্রোদাহরণে সমাজের একটা অশেষ মঙ্গল সাধিত হইল । চরিত্র-মাধবো সীতা জগদ্বাসীর হৃদয়ের চিরানন্দ ।

১—এত, ১৫—৮২—এখনকে তথা সাধবা রক্ষাৎ সন্দেহ-ভবাহুঃ ।

শতভুদারিণি জ্যোতির্মণ্ডলমুদ্রণো ॥

—৮৩—এত নাগ-কণাৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেছাং ।

সমুদ্র-রশ্মি সাধবা প্রাচুর্যাসীৎ বসুন্ধরা ॥

—৮৪—সীতা-মঙ্গল-রোপা ভর্তৃ-প্রতিপাদকণাং ।

না মেতি বাহ্যন্তোষ ভস্মিন্ পাতালমভ্যাগাং ॥

দেবতা হইয়া রহিলেন । চরিত্র-প্রভাবে রাম-চন্দ্র জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হইলেন । রাম-সীতার পূজার ব্যাপদেশে রাম-সীতার চরিত্রের পূজা হইতে লাগিল । বহুবৎসর, সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ, রাম-সীতার পবিত্র চরিত্র পূজিত হইতেছে । ভারতের প্রতি নগরে, প্রতি জনপদে, প্রতি হৃদয়ে রাম-সীতা পূজিত হইতেছেন । যত দিন বিধাতার সৃষ্টি বিদ্যমান থাকিবে, সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ভারতবাসীর দেহে জীবন থাকিবে, তত দিন রাম-সীতার অনর্থ চরিত্র সর্বত্র ভক্তিতে অর্চিত হইবে ।

কবিশুক্র বাম্বীকি, বিস্তৃত ভাবে, রাম-সীতার যে বিরাট চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাকবি কালিদাস, কবিশুক্রর সেই চির-সুন্দরী সৃষ্টি হইতে, রসজ্ঞ ভাবুক পাঠকের উপযোগী করিয়া, সংক্ষেপে রাম-সীতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । কালিদাসের চিত্রিত এই সংক্ষিপ্ত মূর্তি সর্বাংশে নিরবদ্য হইয়াছে । ইহাতে কালিদাসের লেখনী যত্ন হইয়াছে, সরস্বতীর বরদান সার্থক হইয়াছে, ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল ও গৌরব-যুক্ত হইয়াছে, আর আমরা—নীরস পাঠকেরাও কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি । তিনি রাম-চরিত্রে যে অলোক-সামান্য আশ্চ-তাগের এবং সীতা-চরিত্রে যে অনন্ত-রমণী-সুগভ সত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বারা, নিঃস্বার্থ আদর্শ মহাপুরুষের এবং সতী ললনার জন্মভূমি বলিয়া ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছে । কবিশুক্র বাম্বীকি এবং মহাকবি কালিদাস, সমগ্র জগতে, সীতার জন্ম চিরকালের মত, যেন পবিত্রতার এবং সমবেদনার ধারা-দ্বয়বতী একটি নির্ঝরিনী প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন । যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে সীতার নামোচ্চারণ করিলেই, তাঁহার অন্তঃকরণে যুগপৎ পবিত্রতার এবং সমবেদনার উৎস উদ্ভিত হয় । ‘সীতা’ এই কতিপয় বর্ণের স্মরণ মাত্রেই হৃদয়ে পবিত্রতার এক অতি সুশীতল ছায়া পতিত হয় । পতিদেবতা সীতার উদ্দেশে মন্তক নত হইয়া আইসে ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

নিশীথ-স্বপ্ন ।

অযোধ্যার আর এখন সে দিন নাই । এখন আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই । ভগতের কার্য্য করিতে রাম আসিয়াছিলেন, কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তিনিও চলিয়া গিয়াছেন । ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন—সকলেই অগ্রজের অনুগমন করিয়াছেন । আদর্শদেবী সীতার স্মৃতি বক্ষে লইয়া আদর্শদেব রাম লীলা-সংহার করিয়াছেন । যাইবার সময়ে, তিনি, লঙ্কাপতি বিভীষণকে দক্ষিণে চিত্রকূটের এবং পবন-তনয়কে উত্তরে হিমালয়ের আধিপত্য প্রদান করিয়া, ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে যেন দুইটি অত্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন^১ ।

তঁাহাদের ভ্রাতৃত্বভ্রাতৃত্বের পুত্রগণের মধ্যে বয়ঃক্রমে এবং গুণ-গরিমায় কুশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; তাই কুমার-গণ ঐকমত্য-সহকারে তঁাহাকেই রাজ্যের বিশেষ বিশেষ ধনরত্নাদি অর্পণ করিলেন, পরে তঁাহারা সকলে স্ব স্ব নির্দিষ্ট রাজ্যে গমন করিয়া, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্ত, সেতুবন্ধন, কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যাদি, গজ-গ্রহণ প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্যে নিবিষ্ট হইলেন^২ ।

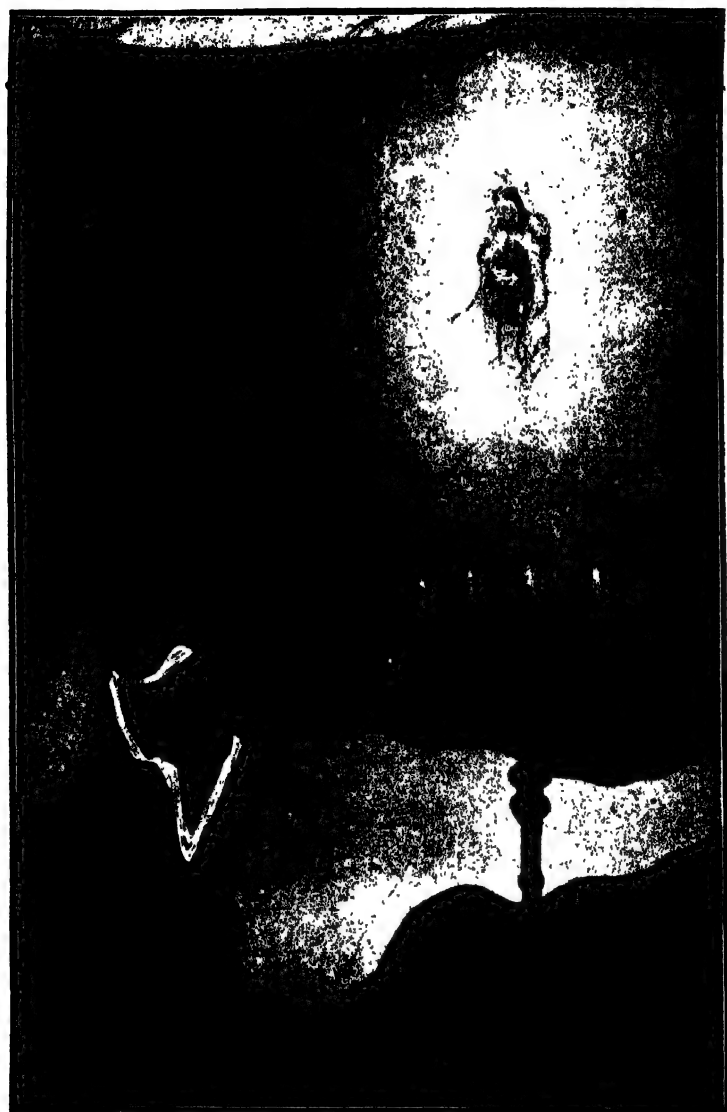
রাম কুশাবতী-নগরে কুশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । কুশ তথায় পরম উৎসাহে রাজত্ব করিতেছেন । অত্যাশ্র কুমারগণের প্রত্যেককেই এক একটি পৃথক রাজ্য অর্পিত হইয়াছিল ; তঁাহারাও নিজের নিজের রাজ্যের শাসনে ব্যাপৃত হইলেন । এদিকে অযোধ্যা-নগরী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল । রামের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যারও সকল সম্পদ বিলুপ্ত হইয়াছে । দ্রুস্ত কাল, ক্রমে অযোধ্যাকে মহারণ্যে পরিণত করিতে বসিয়াছে । যেন অযোধ্যায় একটা মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে ।

সূর্য্যবংশের রাজধানী, ভারতবর্ষের স্পর্ধার স্থল, পুণ্য-সলিলা সরস্বতী-তীর-শোভিনী অযোধ্যার দুর্দশার একশেষ ঘটয়াছে । অথবা যেন রাজ্য-সীতার আয় সাক্ষী দেবতার প্রতি ঐরূপ বিচার, তাহার পরিণামও বুঝি এষ্ট প্রকারই হয় ।

যত্র ত্রিয়ম্ভু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।

যে স্থানে সাক্ষী রমণীয় পূজা হয়, তথায় দেবতাঃ আবির্ভাব হয় থাকে । অযোধ্যার প্রজাগণ তাহাদের সাক্ষী রাজ-লক্ষ্মীর অচ্চনা করে নাহ, তাই বুঝি তথায় এখন দেবতার মন্দিরে অপদেবতার প্রাভাব হইয়াছে । অযোধ্যার সকল সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে । অযোধ্যার রাজপথ জনশূন্য, সোণাবলী হতশ্রী, উদ্যান-সমূহ জঙ্ঘলাকীর্ণ, বাপী-তড়াগাদি প্রায় বিহীন, কচিং বা ঘন-পঙ্কিল-জল-পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । অযোধ্যার সকল সম্পদ—সকল সৌভাগ্যই যেন রান মাতার সহিত তিরোহিত হইয়াছে । জনসঞ্চার-শূন্য, গহন অরণ্যে পরিপূর্ণ, হিংস্র-ঋপদ-সঙ্কুল অযোধ্যার কাহার সাধ্য প্রবেশ করে ।

অযোধ্যার রাজবংশের প্রধান পুরুষ কুশ, বহুদাশ্য দাবৎ তাহা নিজ-রাজধানী কুশাবতীতে আছেন । সৌভাগ্য-সম্পদে কুশাবতী পুষ্প-ভর অযোধ্যার তুল্য । কুশের দিন পরম আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে । এমন সময়ে, একদা গভীর রজনীতে, যখন রাজ-প্রাসাদে প্রায় সব-কিছ নিদ্রিত, আলোকনালা নিকাপিত, কেবল, মহারাজ কুশ যেন কক্ষে শয়িত, তথায় কএকটি প্রদীপ অতিশুষ্কিতভাবে জ্বলিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ কুশের নিদ্রা ভঙ্গ হইল । তিনি দেখিলেন, তাহার শয়নকক্ষের এক পাশে একটি বিনতা উদ্বার্পিতার আয় ছিন্নভাবে দণ্ডায়মান । উৎপূর্ণ কুশ যেন ললনাকে আঁখি-বন্ধনও দেখেন না । ললনায় নুর্তি বিদ্যাদময়ী, পরিচ্ছদাদি প্রোদিতভরুকা কামিনীর অলুরূপ ।



নিশীথে কুশ ও অযোধ্যার অধিদেবতা

Mohila Press, Calcutta.

দেখিলেই মনে হয় বুঝি বিবলতা শরীর-পরিগ্রহ-পূর্বক, মহারাজ কুশের সমীপে উপনীত হইয়াছেন^১।

• অর্গল-বদ্ধ কক্ষে অকস্মাৎ গভীর রজনীতে ললনা সমাগমে অত্যন্ত বিস্ময়াব্বিত হইয়া, শয়ান নরপতি, শয্যা হইতে দেহের পূর্বোক্ত দৈবভ্রমত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন^২। “অর্গল-বদ্ধ কক্ষে কি উপায়ে তুমি প্রবেশ করিলে? কৈ? তোমার ত কোন যোগ-প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না; শিশির-মখিতা মৃণালিনীর ছায় তোমার আকৃতি বিবাদময়ী কেন? তুমি কি শরীরিণী করুণা? ভদ্রে! কে তুমি? কাহার ভাৰ্যা? আমার নিকটে তোমার কি প্রয়োজন? জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের হৃদয় নিয়ত পরজী-পরায়ুখ^৩—এইটি বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া, তোমার বাহা বক্তব্য থাকে—বল^৪।”

তখন সেই বিবাদিনী ললনা সজল-নয়নে ও ক্লতাজলি-পুটে কহিলেন—“রাজন্! আপনার পিতা তাঁহার স্বধাম বৈকুণ্ঠে গমন-কালে যে নগরের সমস্ত পৌরবর্গকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এই হত-ভাগিনী সেই জন-হীন নগরের অনাথা অধিদেবতা^৫।” “নর-নাথ! সম্পদ এবং সৌভাগ্য-গরিমায়, ইন্দ্রের অমরাবতী বা ধন-পতি কুবেরের অলকা-নগরীও এক মুমুর্ষু আমার নিকট পরাজিত ছিল। আর আজ সেই আমি—সেই অতীত-গৌরব-সাক্ষিণী হতভাগিনী আমি, আপনার ছায়

১—রঘু, ১৬—৪ অশাক্ষরায়ে স্তিমিত প্রদীপে শয্যা-গৃহে হৃৎ-জনে প্রবুদ্ধঃ।

কুশঃ প্রবাসস্থ-কলত্র-বেশানদৃষ্টপূর্ব্বাঃ বনিতাবপজ্ঞাৎ।

২—রঘু, ১৬—৬।

৩—রঘু, ১৬—৭—সদ্ধান্তরা সাবরণেহপি গেহে যোগ-প্রভাবো ন চ লক্ষতে তে।

বিভর্ষি চাক্ষরানির্বৃত্তানাং মৃণালিনী হৈমনিবোপরাগম্।

—৮—কা হং শুভে! কস্ত পরিগ্রহো বা কিংবা বদভাগ্য-কারণং তে?

আচক্ষুঃ নভা বশিষ্ঠাং রঘুনাং ননঃ পরজী-বিমুখ-প্রবৃতিঃ।

৪—রঘু, ১৬—৯।

‘সমগ্র-শক্তি’-সম্পন্ন অধীশ্বর বিরাজমান থাকিতেও এই প্রকার ‘করণ অবস্থা’ প্রাপ্ত হইয়াছি । আমার ছুঃখের ইয়ত্তা নাই । নরেন্দ্র ! আমি যখন আমার সেই অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করি, তখন বক্ষঃ শতধা বিদীর্ণ হয় ।”

“পূর্বে আমার যে নগরে, রজনীতে দীপ্তিমৎ-নুপূর-ধারিণী সীমন্তিনীরা রাজ-পথে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন, আর তাঁহাদের রক্ত-খচিত নুপুরালোকে রাজ-বস্ত্র আলোকিত হইত, পৃথগালোকের আর প্রয়োজনই হইত না, এখন সেই নগরের সেই সকল রাজপথে আমিষলোলুপ উন্মাদ শৃগাল-শ্রেণি বিকট শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে* ।

“মহারাজ ! পূর্বে আমার যে সকল বাপী-দীর্ঘিকায় প্রমদাগণ স্রুখে সম্ভরণ করিতেন, আর তাঁহাদের বাহুবল্লী-গ্রহত হইয়া নীল-জল-রাশি মৃদঙ্গবৎ ধীর ধ্বনি করিত, এখন সেই সকল দীর্ঘিকায় জলে বস্ত্রমহিষাদি অবতরণ পূর্বক, তাহা তাহাদের কঠিন শৃঙ্গের দ্বারা নিয়ত আহত করিতেছে, এখন আর তাহার সে ‘স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্বোধ’ নাই, দীর্ঘিকা যেন সর্পাস্তিক যাতনায় অস্থির হইয়া একটা কঠোর চীৎকার করিতেছে* ।

“নর-নাথ ! পূর্বে প্রতি অট্টালিকার সম্মুখে ময়ূরের উল্ল-বেশনের জন্ত ‘বাস-বষ্টি’ প্রোথিত থাকিত, যখন ঐ সকল প্রাসাদে নাগরিক-গণ মৃদঙ্গ-বাদন করিতেন, তখন মৃদঙ্গ-ধ্বনিকে মেঘ-ধ্বনি মনে করিয়া,*

১—রঘু, ১৬—১০—বম্বোক্ষ-সারামভিভূয় সাহং সৌরাজ্যবক্ষোৎসবদা বিভূত্যা ।

সমগ্র-শক্তৌ দ্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্ ।

২—রঘু, ১৬—১২—নিশাহু ভাংকল-নুপুরাণাঃ যঃ সঙ্করোহুভূভিসারিকাপাম্ ।

নন্দমুখোকাবিচিত্তামিবাভিঃ স বাহুতে-রাজ-পথঃ শিবাভিঃ ।

৩—রঘু, ১৬—১৬—আশ্কাগিতং যৎ প্রমদা-করাগ্রেদ্বৃন্দধীরধ্বনিবদগচ্ছৎ ।

বৈভৈরিদানীং মহিবৈভবতঃ শৃঙ্গাহতঃ ক্রোশতি দীর্ঘিকাপাম্ ।

ময়ূরগণ ঐ সমস্ত ‘বাস-বষ্টি’ উপরে উঠিয়া, গৃহবিস্তার পূর্বক কত নৃত্য করিত, কত আনন্দ করিত। এখন আর সে বাস-বষ্টি নাই, সে ‘মৃদঙ্গ’ নাই, সব বিলুপ্ত হইয়াছে; আছে শুধু সেই শূন্য অষ্টালিকা সমূহ। নগর এখন গহন-বনে পরিণত! আর সেই গহন-কানন-জাত দাবানল-ক্ষুদ্রিজে আমার সেই রমণীর-কাস্তি কলাপি-নিচয়ের কলাপ-উজ্জ্বল বিদগ্ধ! হায়, আমার সেই সুন্দর ‘ক্ৰীড়াময়ূর’-সমূহ এখন ‘বন-বর্ষীর’ ভার হত-শ্রী হইয়াছে’।”

“রাজন! পূর্বে বিলাসিনীগণ, হর্ষ্যমালায় যে সকল সোপান তাহাদের অলঙ্কার-সিক্ত চরণ-বিজ্ঞানে সুরঞ্জিত করিতেন, সেই সকল সোপান, এক্ষণে, মৃগঘাতী ভীষণ ব্যাঘ্র-সমূহের শোণিত-দিগ্ধ চরণাঘাতে আহত হইতেছে। প্রভো! প্রাসাদ-ভিত্তিতে পূর্বে নানাবিধ পদ্মবন অঙ্কিত ছিল, সেই সকল পদ্ম-বনে বৃহৎ বৃহৎ দ্বিপেঙ্গু অঙ্কিত ছিল, আর তাহাদিগকে তাহাদের প্রিয়তমকরেণুরা প্রীতিভরে মৃণাল-ভজ অর্পণ করিতেছে,—অঙ্কিত ছিল। সেই সব চিত্রাবলী দর্শন করিলে মনে হইত, সত্যই বুঝি কমল-বনে অবতীর্ণ হইয়া করীর সহিত করি-বধুগণ ক্রীড়া করিতেছে। সে অতি অপূর্ব দৃশ্য! হায়, এক্ষণ, সেই সকল আলিখিত মাতঙ্গকে বাস্তবমাতঙ্গরূপে, কুপিত মৃগেশগণ, সশব্দে লক্ষ প্রদান-পূর্বক, তাহাদের কুস্তের উপর পড়িতেছে। সিংহের প্রথর নখাঘাতে সেই চিত্রাবলী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে”।”

১—রঘু, ১৬—১৪—বৃক্ষেণয়া বষ্টি-নিবাস-ভজাৎ মৃদঙ্গশালাপগমাহলাভাঃ।

প্রাপ্তা দবোকাহত-শেববর্ষাঃ ক্রীড়াময়ূরা বন-বর্ষিণবন ॥

২—রঘু, ১৬—১৫—সোপান-বার্গেরু চ য়ে রামা। নিকিপ্তবাস্তরগান। সরাগান।

সদ্যো হতশ্রুতিরপ্রবন্ধাঃ ক্যাত্রৈঃ পদং ভেদু নিবীরতে সে।

—১৬—চিত্র-বিগাঃ পদ্ম-বনাবতীর্ণাঃ করেণুতির্ভ-মৃণাল-ভজাঃ।

নখাঘাতাভিচ্ছিন্ন-মুতাঃ সংরক্ত-সিংহ-প্রথতঃ বহতি।

“রাজন্ ! সৌখন্তস্তে যে সকল দারুণময়ী রমণীমূর্তি সংযোজিত ছিল, বজ্রাভাবে তাহাদের বর্ণ-বিশ্রাস বিনীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং চিত্রাবলীও ধূসর হইয়াছে । আর সেই সমুদয় মূর্তির উপরে সর্পকুল তাহাদের নির্মোহ-মোচন করিয়া, সে গুলিকে একান্ত হত-শ্রী করিয়াছে, সেই ছবিগুলির দশা দেখিলে কে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে ?”

“নরপতে ! আমার অবোধ্যার হস্ত্যামালার এখন আর সে সুখা-ধবলী কান্তি নাই । সংস্কারের অভাবে তাহাদের সমুচ্চ ধবলকায় এখন গাঢ় জ্ঞামবর্ণে আবৃত হইয়াছে, তাহাদের সর্বোজ্জ্বল তৃণাবলী জন্মিয়াছে । চন্দ্র-কিরণ! এখনও ‘মুক্তা-গুণ’ ধবল আছে সত্য, কিন্তু তাহা ঐ সকল প্রাসাদে আর পূর্ববৎ প্রতিফলিত হয় না* ।”

“রাজন্ ! বলিতে বুক্ ফাটিয়া যায়,—আমার যে সকল কোমল উদ্যান-লতিকা কুসুম-গুচ্ছে অলঙ্কৃত হইলে, পূর্বে বিলাসিনীগণ, সদয়-হৃদয়ে, ধীরে ধীরে তাহাদের শাখা আনত করিয়া কুসুম চয়ন করিতেন, এক্ষণে বানর এবং বানর-কল্প নির্দয় নিষাদ-সমূহ সেই সকল কুসুমাভরণা ললিত-লতিকা শ্রেণীকে যথেষ্ট ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে* ।”

“প্রভো ! আমার সেই পুণ্য-প্রবাহিনী সরযুর আর এখন সে অবস্থা নাই । এখন আর পূর্বের জায়, তাহার তটে নিয়ত নানাবিধ পুজোপহার সজ্জিত থাকে না । স্বানীয় সুগন্ধি-দ্রব্যে এখন আর তাহার জল সুবাসিত

১—রঘু. ১৬—১৭—স্তুভেবু যোবিৎপ্রতিষাতনানাং উৎক্রান্তবর্ণ-ক্রম-ধূসরাণাং ।

স্তনোত্তরীয়াপি ভবন্তি সঙ্গাৎ নির্মোহ-পট্যাঃ কপিভির্বিমুক্তাঃ ।

২—রঘু. ১৬—১৮—কালান্তরজ্ঞান-হৃদেবু নক্তং ইত্যন্ততোন্নত-তৃণাভূরেবু ।

ত এব মুক্তা-গুণ-গুচ্ছরোহপি হর্ষ্যেবু বৃহন্তি ন চন্দ্রপাথাঃ ।

৩—রঘু. ১৬—১৯—আবজ্যা শাখাঃ সরযুর্ক বাসাং পুশ্যাপ্যাপাতানি বিলাসিনীভিঃ ।

যন্তৈঃ পুলিনৈরিব বানরৈস্তাঃ ক্রিয়ান্ত উদ্যান-লতা বদীয়াঃ ।

হয় না। তাহার সকল সৌভাগ্যই বিলুপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল সেই সরযু-তটবর্তী স্নিগ্ধ বেতস-লতা-মণ্ডপগুলি। কিন্তু রাজন্! সে গুলিও শূন্য, জন-প্রচার-বর্জিত! সরযুর দশাদর্শনে বুক ফাটিয়া যায়! তাই প্রার্থনা করি, নরনাথ! আপনার পিতা রামচন্দ্র যেমন তাঁহার নৈমিত্তিক মাহুষ-দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, স্বকীয় সনাতনী ঐশী তনু গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জপ, আপনিও আপনার এই নৈমিত্তিক নিকেতন পরিহার করিয়া, আপনার সনাতনী কুল-রাজধানীর অধিদেবতা আমাকে অনুগ্রহ করুন।

‘অযোধ্যা রাজ্যে ফিরিয়া চলুন’।

অকস্মাৎ স্তব্ধ বিতস্তী-ঝঙ্কারের জ্বাৰ, অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার করুণকণ্ঠ-স্বর নিরুদ্ধ হইল। মহারাজ কুশও মন্ত্র-মুগ্ধবৎ অযোধ্যা-প্রতিগমনে প্রতিশ্রুত হইলেন। অমনি সেই ‘অদৃষ্ট-পূর্বা’ নগরাধিদেবতাও মানবী মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেবী-দেহ ধারণ করিয়া, প্রসন্ন-বদনে তিরোহিত হইলেন। মহারাজ কুশের এ সমস্তই স্বপ্নের জ্বাৰ বোধ হইতে লাগিল। ‘কুল-রাজধানী’ অযোধ্যার দুর্দশার কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি বিবাদে, লজ্জায়, দুঃখে ঘেন মর্মে মর্মে মরিয়া গেলেন। সেই মানবী দেবীর উদাত্ত বর্ণন শ্রবণে, কুশের নয়নের সম্মুখে ঘেন সেই প্রাচীন অযোধ্যার সমৃদ্ধিমতী মূর্ত্তি এবং বর্ত্তমান অযোধ্যার এই বিবাদিনী মূর্ত্তি যুগপৎ ভাসিতে লাগিল।

মহাকবি কালিদাস এ যাবৎ অযোধ্যার কোন বিশেষ বর্ণন করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, কাব্যের প্রতিপাদ্য-বিষয়-সমূহ এমন ভাবে বর্ণিত হওয়া উচিত, যাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে না পারেন যে, ‘কণির

১—রঘু, ১৬—২১—বলিক্রিয়াবর্জিতসৈকতানি স্নানীয়-সংসর্গ মনামু-বন্তি।

—উপান্ত-বানীর-পূর্বাণি দৃষ্টে। শূন্যনি দুরে সরযু-জলানি।

—১২—ভদ্রহীমাং বসতিং বিদ্যায়া মাহুত্যাগেতুং কুলরাজধানীং।

বিদ্যা তনুং কারণমাহুত্যাং তাং বখা ভকন্তে পরমাহুত্বিন্।

অভিপ্রায় এখন অমুক পদার্থের বর্ণন।’ কবির উদ্দেশ্য কাব্যের সর্বত্রই একান্ত নিগূঢ় থাকে উচিত। নতুবা, কোন বিষয় বর্ণন করিবার পূর্বেই কবি যদি মুখ-বন্ধ করিয়া বলেন যে, আমি এখন অমুক বিষয় বর্ণন করিব,—তবে তাহা অতীব অশ্রদ্ধের হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহাকবি কালিদাস তদীয় কাব্যাবলীর সর্বত্রই ঐ দোষ বর্জন করিয়াছেন। এমন কৌশলে তাঁহার প্রতিপাদ্য বস্তুর বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকবৃন্দ কবির সে কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই, তদীয় বর্ণিত বিষয়ের মনোরমতার বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন কালিদাসের ইন্দুমতী-সৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কোথাও ইন্দুমতীর কেবল রূপ বা গুণের বর্ণনায় তত প্রয়াস করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে, মধ্যো মধ্যো ইন্দুমতীর এমন এক একটি বিশেষণ দিয়াছেন যে, তদ্বারাই তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর বর্ণন হইতে যদি ইন্দুমতীর সেই সকল বিশেষণগুলি একত্র সমাহৃত করা যায়, তবে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, শ্রীহর্ষের দময়ন্তীর শতশ্লোক-ব্যাপিনী সৌন্দর্য্যবর্ণনাও ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকরী। গ্রন্থমধ্যে সর্বত্রই কবির উদ্দেশ্য অতি রহস্যপূর্ণ রাখিতে হইবে। সেই রহস্য-ভেদ হইলেই কাব্যের একটি বিশেষ চমৎকারিতার ব্যাঘাত হইল।

বর্তমান সময়ে দেখিতে পাই, অনেক গ্রন্থে লিখিত থাকে, ‘পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ইনিই আমাদের আলোচ্য নাটকের (বা গ্রন্থের) নায়ক (বা নায়িকা) অমুক।’ ইহা অত্যন্ত অশ্রদ্ধার, রীতি-বিরুদ্ধ। কৌশলে সামাজিকদিগের সম্মুখে পাত্রের পরিচয় দিতে হইবে। যে স্থানে সেই কৌশলের অভাব ঘটে, তথায় কাব্যেরও সন্ধিভঙ্গরূপ একটা প্রধান দোষ জন্মে। এই দোষের জন্ত গ্রন্থকার অপরাধী। গ্রন্থ-কারের মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন, সৌন্দর্য্য-স্রষ্টা করা তাঁহার প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং যাহা কিছু সৌন্দর্য্যের

আবির্ভাব হইতেছে । তখন পাঠক তাঁহার সেই সঙ্ক-প্রধান চিত্তে ভক্তুর
সম্পদের নথরতা উপলব্ধি করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন—

‘যদু-পতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী,

রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর-কোশলা ।

ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং

ন সদিদং জগদিত্যবধারণয়’ ॥’

১—যদু-পতি শ্রীকৃষ্ণের সেই মথুরাপুরী আজ কোথায় ? শ্রীরামচন্দ্রের সহৃদিশালিনী
উত্তর-কোশলাই বা এখন কোথায় ? কাল-সাগরের অভলগর্ভে সমস্তই নিমগ্ন হইয়াছে ।
অতরাং এই সকল চিন্তা করিয়া মনঃস্থির কর । এ জগৎ যে নিতান্ত অসৎ, ক্ষণভঙ্গুর,
ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া লও ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

অধঃপতন ।

মহারাজ কুশ, প্রভাতে সভাস্থ হইয়া অমাত্য-পরিষদদিগের নিকট পূর্ব-রজনীর অঙ্কিত কাহিনী বর্ণন করিলেন । রামচন্দ্রের অযোধ্যার অধিদেবতার সেই ছঃখময়ী উক্তি, সেই বিষাদময়ী মূর্তি এবং সেই দীন অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া, কুশ মুহুমূহঃ বিষম হইতে লাগিলেন । মন্ত্রিবর্গ স্থির করিলেন যে, না—কুশাবতীতে আর থাকা উচিত নহে । অচিরেই অযোধ্যাগমন আবশ্যক । অত্যন্তকাল মধ্যেই কুশাবতী ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিয়া, কুশ সদলবলে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অতি অল্প কাল মধ্যেই, নরনাথ, রাজ্যের ও রাজধানীর অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিলেন এবং একান্ত সাবধানতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । নিরন্তর রাজ-কার্য্য-পর্যালোচনায় যদি কখনও কুশের শ্রান্তি অনুভূত হইত, তবে তখন, তিনি, সঙ্গীতাদির আলোচনা করিতেন, মৃগয়াদ্বারা চিন্ত-বিনোদন করিতেন, কখনও বা, বীচি-মালিনী সরস্বর বক্ষে নৌকারোহণে, সলিল-বিলাসিনী রমণীদিগের জল-বিহার দর্শন করিয়া, স্বকীয় অতুল-ঐশ্বর্য্য-উদ্বেজিত হৃদয়ের প্রীতিবিধান করিতেন । জল-বিহারিণীগণের জল-ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে, যখন আনন্দভরে, তাঁহার হৃদয় স্তিমিত হইয়া আসিত, তখন নর-নাথ পার্শ্ব-বর্ত্তিনী চামর-ধারিণী কিরাত-বালাকে সেই জল-তরঙ্গিণী-সমূহের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেন । সরল-হৃদয়া কিরাত-তনয়া, মুগ্ধ-নয়নে, তরঙ্গিণী সরস্বর বক্ষে, নৃপতি-প্রদর্শিত সেই তরঙ্গ-চঞ্চল-রাজহংসীবৎ রমণীদিগের অজহার দর্শন করিত ।

আমরা, ইতঃপূর্বে, সূর্য্যবংশীয় অল্প কোন নৃপতির এবং বিধ
ক্ৰীড়াদর্শনোৎসবের কোনরূপ পরিচয় পাই নাই । অবিবাহিত তরুণ
কুশ,—যিনি সেই কুশাবতীতে, নিশীথ-সময়ে, অকস্মাৎ নির্জন শয়ন-
কক্ষে উপনতা অযোধ্যার অধিদেবতাকে দৃঢ়-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—

আচক্ষু মম্বা বশিনাং রঘুণাং

মনঃ পরস্ত্রী-বিমুখ-প্ররুতি ॥

“জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের মন নিয়ত পর-কলত্র বিমুখ—এই কথাটি
ভাবিয়া । ‘তামার যাহা বক্তব্য বলিতে পার ।’ তাদৃশ জিতেন্দ্রিয় মহারাজের
পক্ষে এই প্রকার আমোদ প্রমোদ দোষাবহ না হইলেও, শুদ্ধশীলা পতি-
দেবতা সীতার অগ্নিপরীক্ষাতেও যে রাজ্যের প্রজাগণ একসময়ে আস্থা
স্থাপন করিতে পারিয়াছিল না,—

‘অবৈমি চৈনামনঘেতি কিস্তু

লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে ।

ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলম্বে

নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ ॥

বলিয়া সীতাম্বর জীবিত রামচন্দ্র, লোকাপবাদ-ভয়ে, যে রাজ্যের সাক্ষাৎ
রাজলক্ষ্মীকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই অযোধ্যা-রাজ্যের অপরিণীত রাজার
পক্ষে,—সেই রাম-সীতার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্রের পক্ষে এবং বিধ আমোদ
যে কদাচ অভিপ্রেত এবং প্রশংসনীয় নহে, ইহা মহাকবি অতি কৌশলে
ইঙ্গিত করিলেন ।

রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধান সম্পূর্ণ হইলে নিশ্চিন্ত-হৃদয় কুশ,
কুম্বতী-নামিকা একটি পরমসুন্দরী নাগ-কন্যার পাণি-পীড়ন করিলেন ।*

ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতির,—মগধ-বিদর্ভ-মিথিলা প্রভৃতির পরম সম্মানিত প্রাচীন রাজ্য-সমূহের অধিপতিগণের ছুটিতারা যে রাজ্যের রাজ-মহিষী হইতেন, রাজ্যের মুক্তিমতী লক্ষ্মীজ্ঞান করিয়া, প্রজামণ্ডলী ভক্তিভরে বাহাদের চরণে প্রণাম করিত, দেবীর দেবী সীতা যে বংশের কুলবধু, সেই বংশের অবতংস, রাম-সীতার জ্যেষ্ঠ-তনয়, মহারাজ কুশ, নাগ-নন্দিনী কুমুদতীর পাণি-গ্রহণ করিলেন, অযোধ্যার বৈবস্বতমন্ডুর বংশের পক্ষে ইহা কল্যাণকর হইল কি না, তাহা ভাবিবার বিষয় ।

কলতঃ, আমরা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, রাম-রাজত্বের পর হইতেই অযোধ্যার সুখ-স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । মহারাজ দিলীপ হইতে রাম পর্য্যন্ত নৃপতিগণের মধ্যে যে সমুদয় গুণ, যে সমুদয় হৃদয়-সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই গুণাবলী রামের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটি একটি করিয়া ক্রমে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ।

মহারাজ কুশ শৌর্য্য-বীর্য্যের অদ্বিতীয় আধার হইয়াও, দুর্জয়নামক এক দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া স্বয়ং নিহত হইলেন, তাহাকেও নিহত করিলেন । সাধবী রাজ-মহিষী কুমুদতীও কুশের অলুগমন করিলেন । 'সীতার পুত্র-বধু তাঁহার অলুরূপ কার্য্য করিয়া অক্ষয়-পতি-লোক-প্রাপ্ত হইলেন' ।

বীরের সহিত সন্মুখযুদ্ধে নিহত হইলে, অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয়, অনন্ত কীৰ্ত্তি জন্মে ? যশোজ্যোতিতে উভয়-লোক আলোকিত হয় । কুশেরও তাহাই হইল । সব সত্য, কিন্তু আহবক্ষেত্রে শত্রু-শায়কে প্রাণ-পরিহার, সৌরবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ইতঃপূর্বে আর ঘটে নাই, এই প্রথম । রামের আত্মজের এই মৃত্যু অযোধ্যার রাজবংশের যেমন গৌরব-জনক, তেমনই কিষ্কিৎ অগৌরবেরও পরিচায়ক । চিরদিন বাঁহারা শত্রুকে

পদ-দলিত করিয়া মহোন্নায়ে রাজ-ধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন, আজ সেই বংশের প্রধান পুরুষ শত্রু-দলন করিলেন সত্য, কিন্তু নিজেও দলিত হইলেন । এই ব্যাপার যে অযোধ্যার রাজ-বংশের ভবিষ্যৎ সৰ্বনাশ পরম্পরার একটা প্রধান দোতক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

অযোধ্যার অভ্যভ্যন্তরীণ গৌরবস্তম্ভের সমুন্নত শির যে কি প্রকারে, ক্রমে, ক্রমে, লবণ-জর্জর সৌধ-শিরের ত্রায় ক্ষীণ ও স্থলিত হইতেছিল, তাহা মহাকবি অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিলেন ।

কুশ, যুদ্ধযাত্রার সময়ে, ‘মন্ত্রি-বৃদ্ধ’দিগকে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন যে যদি আর প্রত্যাবর্তন না করি, তবে আমার পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিও ।^১ তদনুসারে কুমার অতিথি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন । কুশনন্দন অতিথির রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র-রাজ্য আনন্দে হাসিয়া উঠিল । তিনি—

‘বন্ধচ্ছেদং স বন্ধানাং বধার্হাণামবধাতাম্ ।

ধূর্যাণাঞ্চ ধুরৌ মোক্ষমদোহকাদিশদ্ গবাম্ ॥

ক্রীড়া-পতত্রিণোহপ্যস্ত পঙ্করস্বাঃ শুকাদয়ঃ ।

লব্ধ-মোক্ষাস্তদাদেশাং যথেষ্ট-গতোয়োহভবন্ ॥

মহারাজ অতিথি, রাজ্যে যাহার যে ছুঃখ ছিল, যে অভাব ছিল, সে সমস্তের মোচন করিয়া, কেবল পার্থিব রত্ন-খচিত রাজ-সিংহাসনে নহে, প্রজার অপার্থিব হৃদয়-সিংহাসনেও অধিষ্ঠিত হইলেন ।

১—রঘু, ১৭—৮ ।

২—রঘু, ১৭—১২—} অতিথি রাজা হইয়া বন্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিলেন, বাহাদুরের

৩— ২০—} প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদিগের সে দণ্ড রহিত

করিলেন, যে সমুদয় জন্ত, ভার বহন করিত, তাহাদের মুক্তি দিলেন, আর তাহাদিগকে ভার বহিতে হইত না । হৃদয়বতী খেদুর হৃদয়-দোহন নিবেদন করিলেন । ক্রীড়া-বিহঙ্গম-গণ, তাহার আদেশ-ক্রমে, পঙ্কর-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যে দিকে প্রাণ বায়,—উড়িয়া গেল ।

স্বকীয় অভ্যুজ্জ্বল-প্রজ্ঞালোক-প্রভাবে তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, নিয়ত কূট-নীতির আশ্রয় গ্রহণ-পূর্বক রাজ্য-শাসন কার্যের লক্ষণ, ভীক্বেয় চিহ্ন, এবং একান্ত নীতি-বিরহিত পাশববলে রাজ্য-শাসনও হিংস্র-ব্যাত্তাদের নিরীহ যুগ-শাসন-তুল্য^১। রাজ্যের সুশাসন করিতে হইলে—নীতি এবং শৌর্য্য—উভয়ই আবশ্যক। অতিথি বুঝিয়াছিলেন যে, পাশব-বলে রাজ্য-জয় হয় বটে, কিন্তু রাজ্যবাসীর হৃদয়-জয় হয় না।

যশস্বী অতিথি, সূর্য্যবংশের চির প্রথামুসারে, পুত্র নিষধের হস্তে, রাজ্য-ভার অর্পণ পূর্বক, ধর্ম্মকন্মাদির অমুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিয়া, যথাসময়ে পুণ্যার্জ্জিত লোকে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নিষধের পর, নল, নভ, পুণ্ডরীক, দেবানীক, অহীনশু, পারিষাদ্র, শিল, উন্নাত, বজ্রগাত, শঙ্খন, অশ্বিরূপ, বিশ্বসহ, হিরণ্যাত, কোশলা, ব্রহ্মিষ্ঠ, পুল, পুষ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন এবং সুদর্শন-তনয় অগ্নিবর্ণ^২—এই কয়জন নৃপতি অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে ক্রমে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অগ্নিবর্ণ আসন্ন-প্রসবা মহিষীকে অকুল শোক-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াই কালিদাস তদীয় রঘুবংশের শেষ করিয়াছেন।

মহারাজ ধ্রুব-সন্ধির সংসারে তত আসক্তি ছিল না। তাঁহার পুত্র সুদর্শন যখন অতি শিশু, তখন ধ্রুবসন্ধি ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রবীণ জৈমিনির শিষ্য স্বীকার-পূর্বক, যোগবলে নির্ঝাণ-প্রাপ্ত হইলেন^৩। তাঁহার নির্ঝাণের পর, প্রজাকুল অনাথ হইল দেখিয়া, অমাত্যবর্গ সেই এক মাত্র ‘কুলতন্তু’ সুদর্শনকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

১—রঘু. ১৭—৪৭—কাণ্ডব্যং ভেদল। নীতিঃ শৌর্য্যং ষাণ্ড-চেষ্টিতম্।

২—রঘু. ১৮—, (যথাক্রমে) ১, ৫, ৬, ৮, ১০, ১৪, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, এবং ১২০।

৩—রঘু—, ৮৭ ২৩।

প্রজাপুঞ্জের হৃদয় আকৃষ্ট হইল। ভারতবাসিগণ চিরদিনই রাজাকে দেব-তার অংশ-জ্ঞানে অর্চনা করিয়া থাকেন, রাজাও প্রজাদিগকে পুত্রাধিক-স্নেহে পালন করিয়া থাকেন। অযোধ্যার শিশু নরপতিকেও 'প্রজাগণ দেবশিশুতুল্য জ্ঞান করিয়া, উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিত'। কুমারের বয়ঃক্রম বধন মাত্র ছয়বৎসর, তখন তিনি হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজ-বীথিকায় ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন। শৈশবসুলভ চাক্ষু্য-নিবন্ধন যদি বা ভূষিত হইয়েন, এই ভয়ে, পরিচালক সেই 'উজ্জ্বল-নেপথ্য' মুখকান্তি কুমারকে ক্রোড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। আর প্রকৃতিপুঞ্জ চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া, অনিমেঘ-নয়নে ও ভক্তি-পূর্ণ মনে, তাহাদের সেই ভাবী অধীশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইত'।

ক্রমে কুমার যৌবন-সীমায় উপনীত হইলেন। পৌরগণেরও অন্তঃকরণ আশায় উৎক্লু হইল। চতুর্দিকে দূতী প্রেরিত হইল। তাহারা নানা দিগ্-দেশান্তর হইতে রাজ-কুমারীগণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া লইয়া আসিল। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকাম অমাত্য-বৃন্দ, আভিজাত্যে এবং সৌন্দর্য্যে সর্বোত্তমা সুদর্শনা এক কুমারীর সহিত 'সুদর্শনের' বিবাহ দিলেন^১। বালক নৃপতি সুদর্শনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এতদিন যে রাজলক্ষ্মী অমূর্ত্ত অবস্থায় অলক্ষ্যে থাকিয়া পরিচর্যা করিতেছিলেন, কালের অপেক্ষায় ছিলেন, এইক্ষণে যেন তিনি অভূদিত নৃপতির সেবার জন্ত মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।

১—রঘু, ১৮—২৯—ভং রাজবীণ্যামধিহস্তি যাস্তং আধোরণালম্বিতমগ্র্যবেশনং ।

বদ্বর্ষদেয়ীমপি প্রভুত্বাৎ প্রৈক্ষন্ত গৌরাঃ গিত্তগৌরবেণ ॥

২—রঘু, ১৮—৫৩ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

দীপ নির্বাণ ।

যথাসময়ে বিজ্ঞ সুদর্শন আত্মজ অগ্নিবর্ণের হস্তে বিশাল কোশল সাম্রাজ্যের ভার স্তম্ভ করিয়া, নৈমিষারণ্যে প্রস্থানপূর্বক, স্বকীয় সংসার-বিরক্ত হৃদয়ে শান্তিবিধান করিলেন । হৃৎ-ফেননিভ কোমল শয্যা, মনি-মুক্তা-মণ্ডিত প্রাসাদ, গম্বর-সোপানবদ্ধ দীর্ঘিকা প্রভৃতি যাহার ভোগের সাধন ছিল, নৈমিষারণ্যের কুশময় শয়নে, পর্ণ-শালায় এবং তীর্থ-সলিলে, তিনি সে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন^১ । ইক্ষাকু-বংশের চিরাচরিত নিয়মানুসারে, যোগবলে সুদর্শন মোক্ষলাভ করিলেন । তাঁহার সকল বিরক্তির অবসান হইল ।

তেজস্বী কুমার অগ্নিবর্ণ অযোধ্যার পরম পবিত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু নবীন-রাজ্যের নবীন নরপতিকে রাজ্যশাসনে যে প্রকার প্রয়াস করিতে হয়, মহারাজ সুদর্শনের ব্যবস্থা-শৃঙ্খলে, তাঁহাকে কোন বিষয়েই সেইরূপ প্রয়াস করিতে হইল না । রাজ্যের সর্বত্রই শান্তি, সকলেই রাজার প্রতি অশেষ-ভক্তি-সম্পন্ন^২ ।

তিনি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যাকে তাঁহার ভোগের সামগ্রী মনে করিলেন । ভোগী অগ্নি-বর্ণের ভোগাসক্ত হৃদয়ে রাজ্যপালনের গুরু চিন্তার উন্মেষও হইত না, বা হইলেও, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বিষয়াস্তর-প্রসঙ্গে বিস্মৃত হইতেন । নিরন্তর নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে তাঁহার কাল অতিবাহিত হইত । ধন্যাসনে উপবেশন পূর্বক, রাজ-কার্য্য-পর্যালোচনার অবসর তাঁহার প্রায়ই ঘটিত না । ক্রমে ব্যাধি অতিশয় সাংঘাতিক

১—রঘু, ১৯—২—তত্র তীর্থ-সলিলেন দীর্ঘিকাঃ তন্নবস্তরিতভূমিত্তিঃ কুশৈঃ ।

সৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ সঙ্কিকায় কল-নিম্পৃহস্তপঃ ।

২—রঘু, ১৯—৩ ।

হইয়া উঠিল । বিলাসী অগ্নিবর্ণ, কন্দকান্ত মস্ত্রি-বৃদ্ধদিগের উপর ক্রোড়ের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, একেবারে অন্তঃপুরবাসী হইলেন । সভামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি রাজ-সিংহাসন,—যে সিংহাসনে দিলীপ, রঘু, রাম প্রভৃতি উপবিষ্ট হইয়া রাজ-কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, যে সিংহাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই সিংহাসন শূন্য পড়িয়া থাকিত ! প্রকৃতি-পুঞ্জ রাজ-দর্শন-বাসনায় উপস্থিত হইয়া, শূন্য সিংহাসন দর্শন করিয়া বিষম-হৃদয়ে ফিরিয়া যাইত । মহারাজ অগ্নিবর্ণ যদিও কখনও প্রবীণ অমাত্য-বৃন্দের বিশেষ অনুরোধ-ক্রমে শুদ্ধান্তঃশয্যা ক্ষণকালের জন্ত পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতেন, কিন্তু অন্তঃপুরের বহির্দেশে কদাচ আসিতেন না । অন্তঃপুর-প্রাসাদের গবাক্ষ-পথে একখানি চরণ প্রদর্শিত করিতেন ; অযোধ্যার চিরানুগত প্রকৃতি-পুঞ্জ, দূর হইতে, রাজার সেই চরণ-পঙ্কজ লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিত । নরপতির মুখ-কমল-সন্দর্শন আর তাহাদের ভাগ্যে ঘটিত না ।

অগ্নিবর্ণ, কখন জলাশয়-মধ্যবর্ত্তি মোহন-গৃহে, কখন অন্তঃপুরের পর্য্যন্ত-বর্ত্তিনী বৃক্ষ-বাটিকায়, কখনও বা নিশান্ত-পরিশোভিনী নৃত্য-শালিকায় কালাতিপাত করিতেন । তিনি এমনই দুর্গভ-দর্শন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারই মহিষীগণ নানাবিধ ছলনা করিয়া, কখনও বা কোন প্রকার মহোৎসবের নাম করিয়া, কদাচিৎ তাঁহাকে স্বকক্ষে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতেন^১ । সাধ্বী মহিষীদিগের ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, তরল-

১—রঘু, ১২—৪, ৬, ৭—গৌরবানু শব্দপি ছাত্ত্ব মন্ত্রণাং দর্শনং প্রকৃতি-কাজিকং দদৌ ।

তদগবাক্ষ-বিবরাবলম্বিনা কেবলেন চরণেন কল্পিতম্ ।

৮—তং কৃত-প্রণতদ্বোহনুর্জ-বিনঃ কোষলান্সনখ-রাগ-রবিতম ।

ভেজিরে নব-দিবাকরাতপ-স্মৃষ্ট-পঙ্কজ-ভুলাধিরোহণম্ ।

হৃদয় অগ্নিবর্ণ বধন দূতী-প্রদর্শিত-পথে কুম্ভ-শয়ন-ময় লতা-গৃহে গোপনে প্রবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া, অন্তরাল-বর্তিনী অবাধ্যার অধিদেহতা দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত অশ্রুপাত করিতেন । কুম্ভাকর যেমন, রাত্রিতে প্রহুলা এবং দিবসে নিদ্রিত হয়, তদ্রূপ বিলাস-ময় অগ্নিবর্ণও ক্রমে ‘রাত্রি-জাগর-পর’ ও ‘দিবাশয়’ হইতে লাগিলেন* । অতিভোগে কদাচিৎ যদি তাঁহার বিমূঢ়-চিত্তে অবসাদ উপস্থিত হইত, তবে, তখন তিনি সৌধমালার বাতায়ন-পথে, একাকী রাজ-হংস-মেখলা সরস্ব শোভা দর্শন করিতে চেষ্টা করিতেন । কিন্তু বিষয়ীর মনে শ্মশান-বৈরাগ্যের ভ্রায়, তাঁহার আবিল হৃদয়ে স্বভাবের অনাবিল শোভা প্রসাদ উৎপাদন করিতে পারিত না* ।

পরাজয়-ভয়ে, অত্র কোন পার্থিব অগ্নিবর্ণের বিকল্পে উত্থান করিলেন না বটে, কিন্তু দক্ষের অভিসম্পাত যেমন শশাঙ্ককে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ ‘রতি-রাগ-সম্ভব’ খল-ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল । অচিরেই তিনি আত্ম-কৃত অত্যাচারের বিষময় পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন । তথাপি তিনি কিন্তু, পর্বত-শিখর-চ্যুত বৃহৎ শিলাখণ্ডের ভ্রায় স্বকীয় পতিত হৃদয়ের আর গতিরোধ করিতে পারিলেন না । উন্মার্গ-গামী চিত্তের সংঘমনিধান তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইল* । পাপের অঙ্কুর দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড মহাক্রূহে পরিণত হইল ! হায় ! ক্রমে—

১—রঘু, ১২—৩৪—যোষিতামুড় পতেরিবার্জিবাং স্পর্শ-নিবৃত্তিমসাবান্ব বন ।

আররোহ কুম্ভাকরোপমাং রাত্রি-জাগর-পরো দিবাশয়ঃ ॥

২—রঘু, ১২—৪০ ।

৩—রঘু, ১২—৪৮—তৎ প্রবত্তবপি ন প্রভাবতঃ শেকুরাক্রমিতুমন্ত-পার্শ্বিবাঃ ।

আনয়ন্ত রতিরাগ-সম্ভবঃ দক্ষ-শাপ ইব চক্রমক্ষিপোৎ ॥

৪২—দুষ্ট-দোষবপি তন্ন সৌভাগ্যং সঙ্গ-বস্ত্ত্তি বজ্রানাজ্রবঃ ।

বাহুভিস্ত বিবরৈহ*ভন্ততো হুঃখনিদ্রিহ-পণো নিবার্যতে ॥

তস্য পাণ্ডু-বদনান্ন-ভূষণা
 সাবলম্ব-গমনা মৃদু-স্বনা ।
 রাজ-যক্ষ্ম-পরিহানিরাঘযো
 কাময়ান-সমবহুয়া তুলাম্ ॥

ক্ষয় রোগে তাঁহাকে ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল । তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল । আভরণ ভার বোধ হইতে লাগিল । কণ্ঠস্বর ক্রমশই মৃদু, মৃদুতর, মৃদুতম হইয়া আসিল । বিনাবলম্বনে গমন করিতে তিনি একান্ত অশক্ত হইয়া পড়িলেন । অসাধ্য রাজ-যক্ষ্মা-রোগে তাঁহার হৃদয়-যন্ত্র জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িল । অযোধ্যার পুণ্যকন্ধ্যা রাজ-বংশের সমুজ্জ্বল প্রদীপ ক্রমে নির্বাক্ষণোন্মুথ হইল ! বৈদ্যাগণের সকল যত্ন—সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল । দিলীপের রাজ-সিংহাসন এত দিনে শূন্য হইল ! অযোধ্যার রাজ-সূর্য্য অস্তমিত হইলেন ! সোণার অযোধ্যায় শ্মশানের ক্রন্দন উঠিল ! সীতা-নির্বাসনের প্রায়শ্চিত্ত হইল ! প্রকৃতি-পূজা বিষাদের গাঢ় অন্ধতমসে নিক্ষিপ্ত হইল ! রাম-রাজ্য অন্ধকার হইল ! ভারতের জন্ত কৈকেয়ীর চিরাকাজ্জিত সেই অযোধ্যার রাজসিংহাসন নিবিড়-অরণ্য-মধ্যগত শিলাধস্তের আয় শূন্য পড়িয়া রহিল ! !

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

উপসংহার ।

এতক্ষণে সংস্কৃত-ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য রঘু-বংশের আলোচনা সমাপ্ত হইল। যে সমাজ-হিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া, মহাকবি রঘুবংশের স্বত্র-পাত করিয়াছিলেন, রঘুবংশের প্রতिसর্গে, প্রতিচরিত্রে, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে।

আদি কবি বাম্বীকির রামায়ণ কালিদাসের রঘুবংশের উপজীব্য হইলেও কালিদাস রঘুবংশে শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। “বাম্বীকি, রামায়ণ মধ্যে আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ রাজা ও আদর্শ পরিবার দেখাইয়াছেন। কালিদাস আরও একটু ছাড়াইয়া উঠিলেন। কালিদাসের উদ্দেশ্য আদর্শ বংশ বর্ণনা। ঐ বংশের যে কোনও ব্যক্তিকে লও, তিনিই কোন না কোন বিষয়ের আদর্শ। রঘুরাজা দ্বিজজয়ীর আদর্শ, অজ্ঞাজ্ঞা সহৃদয়তার আদর্শ; রাজা দশরথ ব্যসনাসক্তির আদর্শ, কুশ রাজা ক্রটিমত্তার আদর্শ, অতিথি নীতি-পরায়ণতার আদর্শ; সর্বাপেক্ষা জঘন্ত যে অগ্নিবর্ণ, সেও বিলাসিতার আদর্শ। কালিদাস এই আদর্শ-সমূহের ঠিক মধ্যস্থলে বাম্বীকির সেই আদর্শ মনুষ্যকে বসাইয়াছেন। বসাইয়া, রঘুবংশরূপ প্রকাণ্ড চিত্র হইতে প্রকাণ্ড তর চিত্র নিষ্কাশন করিয়াছেন ও তাহাতে জগদ্ব্রজ্ঞাও মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নূতন ও যাহা কিছু প্রকাণ্ড পদার্থ আছে, তৎসমূহ-সংযোগে পূর্বোক্ত আদর্শ চিত্র সমূহের এক প্রকার নূতনত্ব, অদ্বুতত্ব ও অনির্বচনীয়ত্ব সাধন করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠকগণ! তোমরা মনে করিও না, কালিদাসের চিত্রসমূহ আলেখ্য-লিখিত চিত্রের জ্ঞায়। উহার সবল, উহার সজীব। কালিদাসের রঘুবংশের জ্ঞায় জীবনময় গ্রন্থ সংসারে আছে কি না সন্দেহ।”

কালিদাস, দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথ-প্রভৃতির চরিত্রবর্ণন-কালে দেখাই-
 রাছেন যে, জগতে স্থায়ি যশঃ রাখিয়া যাইতে হইলে, ত্যাগ-স্বীকার চাই ;
 'বংশ উন্নত করিতে হইলে, বিদ্যালাভ, জ্ঞানলাভ করা চাই ; পরহৃদয় জয়
 করিতে হইলে, বিনীত হওয়া চাই । গুরুজনের প্রতি—পুজ্যের প্রতি
 'অনুরাগ থাকিলে অশেষ মঙ্গল হয় । পুজ্যের পূজা-বাধে ঘোর অমঙ্গল
 জন্মে । রাজার কর্তব্য প্রজার শিক্ষা-দীক্ষা বিধান, দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচন,
 আর প্রজার কর্তব্য রাজার প্রতি অটল বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি হৃদয়ে
 পোষণ করা । রাজা এবং প্রজা—উভয়েরই উভয়ের জ্ঞাত ব্যাকুলতা ও
 পরস্পরের মঙ্গলেচ্ছা উভয়েরই অভ্যুদয়ের কারণ ।

কবি দেখাইয়াছেন যে,—“রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনঃ”—প্রকৃতিপুঞ্জের
 যিনি হৃদয়-রঞ্জন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজ-পদ-বাচ্য । কুমার
 অধিক সম্পদ নাট । সত্যের অধিক ধর্ম নাই । সত্যের জন্ত মহাত্মা প্রাণ
 এবং প্রাণাধিক পুত্রকেও ত্যাগ করিতে পারেন । অতিথি-পূজা গৃহা
 শ্রমের সর্বপ্রধান ব্রত । দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি অচলা ভক্তি রাজা এবং
 রাজ্য—উভয়েরই মঙ্গলের নিদান । ব্রাহ্মণ স্বাধীন-হৃদয়, পরনিরপেক্ষ,
 কর্তব্যপ্রিয় । প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্বত্রই নিঃসংকোচ, উদার-হৃদয়, ক্ষমাশীল ও
 নির্লোভ । প্রকৃত ব্রাহ্মণের চক্ষে প্রাসাদ-বিলাসী রাজা এবং পর্ণকূটর-
 শায়ী ভিক্ষুক—উভয়েই তুল্য । প্রকৃত ব্রাহ্মণ চাটুকায় বৃত্তি করেন না, বা
 করিতে জানেনও না ।—এইরূপে, যে যে বিষয়ের আলোচনায় সমাজের
 মঙ্গলের সম্ভাবনা, সে সমস্ত, কালিদাস, তদীয় মহাকাব্য রঘুবংশে প্রদর্শন
 করিয়াছেন । আবার এই সকলের বিপরীত, অর্থাৎ যে যে কারণে অতি
 সমৃদ্ধিশালী রাজ্যও উৎসন্ন হয়, সোণার সংসারও অশানে পরিণত হয়,
 দেবমন্ডপেও পিশাচের তাণ্ডব-নৃত্য হয়, তাহাও তিনি অতি স্পষ্টভাবে
 নির্দেশ করিয়াছেন । ভোগের নিবৃত্তিই কল্যাণ-দায়িনী, প্রবৃত্তি-
 সংহারিণী—একথা তিনি অতি প্রাঞ্জল দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন ।

সর্বোপরি দেখাইয়াছেন যে, মানব মর্তের জীব, কত উচ্চ, কত অল্পগম, কত সুন্দর এবং কত প্রশস্ত-হৃদয় হইতে পারেন। সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া মানব কিরূপ দৃঢ়-চিত্তে কর্তব্যের সেবা করিতে পারেন; কর্তব্যের চরণে আত্ম-বলিদান করিতে পারেন। মানবহৃদয়ের বল যে কত অসীম, কত অপরাজ্যেয়, কত হুরধিগম, তাহা কবি অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। যে মনস্বীর হৃদয় বলিষ্ঠ, তিনি সহাস্ত-বদনে রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে পারেন, মাতা-পিতার তৃপ্তি বিধানের জন্ত অবিচলিত-চিত্তে বনগমন করিতে পারেন। হৃদয়ে বল থাকিলে, নিজের কঠোর কর্তব্যের জ্ঞান থাকিলে, মনস্বী ব্যক্তি নিজের হৃৎপিণ্ডে স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া কর্তব্যের চরণে উপহার দিতে পারেন। পরের শাস্তির জন্ত নিজের শাস্তি চিরদিনের মত অতল-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতে পারেন। অথবা একটি একটি করিয়া কত বলিব, পৃথিবীতে যাহা কিছু সঙ্গুণ, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিশ্চল, দেবত্বময়, সে সমস্ত, মহাকবি, তাঁহার প্রিয়কাব্যে অতি উজ্জল-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

রঘুবংশে বর্ণিত নৃপতিগণের মধ্যে দেখিতে পাই দিলীপ হইতে দশরথ পর্য্যন্ত—পর-পর, ক্রমেই যেন রাজগণের গুণাবলীর বৃদ্ধি হইতেছে, অর্থাৎ দিলীপ অপেক্ষা রঘু, রঘু অপেক্ষা অজ, অজ অপেক্ষা দশরথ যেন অধিকতম শৌর্য্যসম্পন্ন। রাজ্যের সুখ-সম্পদ ক্রমেই যেন বর্দ্ধিত হইতেছে, অথবা বাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে, শেষে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের সময়ে, যেন রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধির ষোল কলা সম্পূর্ণ হইয়াছে। যেমন রাম, তেমন সীতা, তেমনই অযোধ্যা-রাজ্য। সমস্তই যেন পরিপূর্ণ। কোন অংশেই কোনরূপ অপূর্ণতা নাই। রাম যেন অযোধ্যার রাজ্যাকাশের পূর্ণ চন্দ্র। দিলীপ হইতে এক এক কলা করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে যেন রামরূপী সর্বোৎকৃষ্ট পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ ও সুশীতল চরিত-চক্রিকায় কেবল অযোধ্যা নহে,

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও স্নিগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিল । রামচন্দ্রের অন্তঃগমনের পর—
অযোধ্যার গুরু-পক্ষের চিরকালের মত অবসান হইল । অযোধ্যায় কুম্ভা
প্রতিপদ উপস্থিত হইয়া, পরবর্তী প্রতিনরপতির সময়েই, এক এক কলা
করিয়া ক্ষয় হইতে হইতে, পরিশেষে, অগ্নিবর্ণের সময়ে যেন অযোধ্যায়
অন্ধতমস-ভীমা অমানিশার আবির্ভাব হইল । অযোধ্যা গাঢ় অন্ধকারে
ডুবিয়া গেল ! যেমন ক্রমিক বৃদ্ধি, তেমনই ক্রমিক ক্ষয় !

দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশতি নরপতি ক্রমে কোশল-
সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রাম—
এই পাঁচ জন রাজার রাজত্বকালেই অযোধ্যায় যত কিছু শ্রীরুদ্ধি
ঘটিয়াছিল । ইহাদেরই রাজত্বকাল নানাবিধ ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ !
সীতা-নির্বাসনের পর, যখন রামচন্দ্র—

কৃত-সীতা-পরিত্যাগঃ স রত্নাকরমেখলাম্ ।

বুভুজে পৃথিবী-পালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্ ।

শূন্য-হৃদয়ে, কেবল কর্তব্যানুরোধে, অতি দুর্বহ জীবনের ভারের
সহিত দুর্বহ পৃথিবীর ভারও ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে
অযোধ্যারাজ্যে যেন অশান্তির কীট,—যে কীট ইন্দুমতীর মৃত্যুকালে
রাজ-সংসারে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, দশরথের অপমৃত্যু, রামের
নির্বাসন প্রভৃতি যে কীটেরই দংশনের ফল, সেই কাল কীট যেন
কালান্তক শরীর-পরিগ্রহ-পূর্বক অযোধ্যায় সর্বনাশ করিতে সন্মত
হইতেছিল ! রামের তিরোধানের পর হইতেই অযোধ্যায় আনন্দের হাট
ভাঙ্গিয়া গেল ! দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধি-শালিনী রাজধানী তিংস্র-স্বাপদ-
সঙ্কুল গহন অরণ্যে পরিণত হইল ! তার পর, অনেক প্রয়াসে, মহাত্মা
কুশ, অযোধ্যায় সেই লুপ্ত-গৌরবের উদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

তাহাও মুমূর্ষুর শোথজ স্থলতার জ্বায় অযোধ্যার একেবারে ধ্বংসেরই পূর্বভাষা স্বরূপ হইল । নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ একবার শেষ জলিয়া উঠিল মাত্র । তার পর কুশের পুত্র অতিথির সময় হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, যে দ্বাবিংশ নরপতি অযোধ্যায় প্রভুত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজত্বকাল, কেবল একটা বিশাল রাজ্য, বিপুল সংসার,—সেই বৈবস্বত মমুর রাজত্ব ভগ্ন হইতে হইতেও যে কতদিন থাকিতে পারে, কতটা সময়ের প্রয়োজন, মাত্র তাহারই নিদর্শন । কোন বিশাল সাম্রাজ্য যখন ক্ষয়-দশায় উপনীত হয়, তখন তাহাতে যেমন—একের পর অত্র, তাঁহার পর অত্র, তাঁহার পর অত্র, আর এক জন সিংহাসনে অধিরোধ করেন মাত্র, কিন্তু রাজ্যের কোনই উল্লেখ-যোগ্য শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় না, অতি দ্রুতভাবে রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের এক একটা নামতঃ অভিষেক হইয়া যায়, তদ্রূপ, অযোধ্যায়, অতিথি হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ নরপতিও অতিদ্রুতভাবে, পর পর, রাজ-সিংহাসন ভোগ করিয়া গেলেন । কেহ যুদ্ধে নিহত হইলেন, কেহ বিতুষ্ট হইয়া শিশু কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন, কেহ বা আত্ম-কৃত অত্যাচারের বিষময় ফলস্বরূপ উৎকট অসাব্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন^১ । একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা যেমন একদিনে ভূমিসাৎ হয় না, অনেক দিন লাগে, তদ্রূপ, প্রকাণ্ড অযোধ্যা রাজ্যটাও ভাঙ্গিয়া পড়িতে অনেক সময় লাগিল । সীতা-নির্বাসনের সময়ে

১- ‘কুশ’ পুত্র ও অগ্নিবর্ণ^২ ; যথাক্রমে—

রঘু. ১৭—৫—স কুলোচিতমিলন্ত সাহায়কমুপেদ্বিবান্ ।

জ্ঞান সময়ে দেত্যং দুর্জয়ং তেন চাবধি ।

—১৮—৩৩—সহীং মহেচ্ছঃ পরিকীৰ্ত্তা নুনো ননীষিণে জৈমিনয়েহর্পিভাস্মা ।

তন্নাৎ স যোগাদধিপত্যা যোগস্ব অজ্ঞানেনেকলত জ্ঞান-ভীকঃ ॥

—১৯—৬ ।

অযোধ্যায় যে ভঙ্গের সূত্র-পাত হইয়াছিল, অধিভি হইতে অগ্নিবর্ণের সময় পর্য্যন্ত সেই ভঙ্গ ব্যাপারই চলিতেছিল। ক্রমে ক্ষীণ, জীর্ণ, শীর্ণ হইতে হইতে বিরাট সৌধ ভূমিসাৎ হইল। অযোধ্যা-রাজ্য রাজ-শূন্য বা ‘অরাজক’ হইল।

কালিদাস, তাঁহার আর একটি উদ্দেশ্য, বাহা কুমারসম্ভব বা মেঘদূতে সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, রঘুবংশে তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কুমারসম্ভবে মাত্র অষ্টাদশটি শ্লোকে পূর্বাঙ্গের তোরনিধি-বাপী প্রকাণ্ড হিমালয়ের যে প্রকাণ্ড বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ আর কোন কবিই করিতে পারেন নাই। মহাকবি নাথ, তদীয় শিশুপালবধ-কাব্যে, একটি সুদীর্ঘ সর্গে, রৈবতক পর্বতের যে বর্ণন করিয়াছেন, কালিদাসের অষ্টাদশ-শ্লোকমাত্র-ব্যাপিনী হিমালয় বর্ণনার নিকট তাহা উল্লেখ্যই নহে। কুমারসম্ভবে কবি তাঁহার প্রিয় হিমালয়ের বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতে অত্যাশ্চর্য যে সমুদ্র নয়নরঞ্জন স্থল আছে, মনোহর দৃশ্য-পটের জায় বাহাদের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া কালিদাস নিজে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের বর্ণন করা হয় নাই। তাই তিনি, কুমারের পর, প্রথমে, মেঘদূতে, রাম-গিরি হইতে অলকাপর্য্যন্ত মেঘের পথ নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে, উত্তর-ভারতের সম্পূর্ণ বর্ণন করিয়াছেন। তার পর আবার রঘুবংশে, অযোধ্যা হইতে দক্ষিণে—অনেক দক্ষিণে, ভারতবর্ষের বহির্ভাগে দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যবর্তিনী লঙ্কানগরী হইতে রাম যখন সীতার সহিত আকাশ পথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন আর একবার ভারতের অপরাংশের, মেঘদূতে বাহা বর্ণিত হয় নাই, সেই অংশের অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ একবার মেঘদূতে, বর্তমান সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অন্তঃপাতী অমরকণ্টক (প্রাচীন রামগিরি) হইতে ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী কৈলাস পর্য্যন্ত, আর একবার, রঘুবংশে দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যবর্তী লঙ্কাদ্বীপ হইতে বর্তমান যুক্তপ্রদেশের

(ইউরাইটেড্ প্রভিন্সের) অন্তঃগামী অযোধ্যাপর্য্যন্ত ভূ-ভাগের বর্ণন করিয়াছেন । ফলতঃ কবি মেঘদূত এবং রঘুবংশে সমগ্র ভারত-বর্ষের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে, অতিস্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, যে, ভারতের উত্তর প্রান্তবর্তী কৈলাস হইতে দক্ষিণ-সাগরের মধ্যবর্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত, যেন কালিদাসের কল্পনারূপ এক গাছি সূত্র গম্বমান করিয়া, সেই সূত্রে ভারতের উত্তর দক্ষিণ—এই উভয় দিকের মধ্যবর্তী প্রদেশ-সমূহের মানচিত্র—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আলেখ্য নিচয়, মালার জ্বায় গ্রথিত করিয়াছেন । মেঘদূত এবং রঘুবংশ—এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে, ভারতের উত্তর-সীমা হইতে দক্ষিণ-সীমা পর্য্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের সুনিশ্চল প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় ।

কবি, রঘুবংশে, যদি লঙ্কা হইতে ঠিক ঋজু-ভাবে, রাম-সীতাকে আকাশ পথে উত্তর-কোশল-রাজ্যে লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না । ভারতের মধ্যবর্তী, নয়নরঞ্জন, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রদেশ-সমূহ তাঁহার প্রিয় পাঠকদিগকে দেখাইতে পারিতেন না । এবং বনবাস-কালে প্রথমতঃ রাম-সীতা মিলিত-ভাবে যে সকল স্থানে কালাতিপাত করিয়াছেন, পরে, সীতাহরণের পর, রাম একা একা উন্মত্ত-হৃদয়ে, যে সকল স্থানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, রামের সীতাকেও সেই সকল স্থান আর দেখান হইত না । তাই কবি, লঙ্কা হইতে রাম-সীতার প্রত্যাবর্তন-কালে, তাঁহাদিগকে সরল-পথে অযোধ্যায় না লইয়া, একটু পশ্চিম-দিগ্ দিয়া সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন । যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, অমনি কখনো তাঁহাদিগকে একটু উত্তরে মহেন্দ্র পর্ব্বতের নিকটে, আবার তথা হইতে একটু পশ্চিমোত্তরে কিঙ্কিয়ায়, কখনও তাহার একটু পশ্চিমদিগ্ দিয়া ক্রমে পম্পায়, তাহার উত্তরদিগ্ দিয়া আবার পঞ্চবটীবনে, তথা হইতে উত্তর-পূর্ব্ববর্তী প্রয়াগে,—এইভাবে, ক্রমে, শেষে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছেন । রাম-সীতার সহিত পাঠক-

দিগকেও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শস্ত্র-শ্রামলা সমুদ্র-মেখলা ভারতভূমির চির-
সুন্দরী নয়নানন্দদায়িনী মূর্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । ভারতবর্ষের মানচিত্রের
সহিত যদি মেঘদূত এবং রঘুবংশের ভৌগোলিক অংশ মিলাইয়া পড়া
যায়, তবে, কালিদাসের অসামান্য ধী-শক্তির এবং অল্পপম বল্পনার সামর্থ্য
কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায় ।

কালিদাস রাম-সীতার আকাশপথে অযোধ্যা প্রত্যাগমনের যে বর্ণন
করিয়াছেন, তাহার আর একটা রহস্য এই যে, রাম-সীতা যখন অযোধ্যা
হইতে বন-বাসে যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা যে যে পথে বনে গিয়াছিলেন, *
যে যে স্থানে ছুইএক দিন বাস করিয়াছিলেন, কবিগুরু বাম্বীকি সে
সমুদয় অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণন করিয়াছেন । সেই জন্তই কালিদাস রাম
সীতার বনগমন-কালের কোন স্থানের বা কোন পথের বিশেষ উল্লেখ
করেন নাট । বাম্বীকির বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণনে নিবৃত্ত হইয়াছেন -
কিন্তু সেই সেই প্রিয়দর্শন স্থান-সমূহ একেবারে উপেক্ষা করিতেও
স্বভাবের কবি কালিদাস প্রস্তুত নহেন । তাই বাম্বীকি যে যে পথে
রাম-সীতাকে অযোধ্যা হইতে লঙ্কায় আনিয়াছিলেন, কালিদাস সেই সেই
পথে, রাম সীতাকে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া গেলেন ।

তাহার মধ্যে আরও একটু বৈচিত্র্য এই যে, বাম্বীকি যে যে পথে
রাম-সীতাকে পদ-ব্রজে বনে লইয়া গিয়াছিলেন, কালিদাস, লঙ্কা হইতে
রাম-সীতার প্রত্যাবর্তন-কালে, সেই সেই স্থানের উর্দ্ধদেশ দিয়া—আকাশ
পথ দিয়া তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া গেলেন । সেই ‘পূর্বানুভূত’ স্থান
সমূহ সুখ-দুঃখের সাক্ষিরূপে নিম্নে বিরাজমান । আর আকাশ-পথে,
ঠিক ঐ ঐ স্থানের উপর দিয়া, রাম-সীতা নিম্নের সেই সেই স্থান দেখিতে
দেখিতে চলিয়াছেন । উর্দ্ধদেশে অবস্থান-প্রযুক্ত তাঁহারা, নিম্নস্থ সমস্ত
পদার্থের সর্সাদ-সম্পূর্ণ আকৃতি সম্যক-প্রকারে দেখিতে পাইতেছেন ।
বশাৎ ভারতবর্ষরূপ সুসজ্জিত মনোহর উদ্যান যেন, গগনবিহারী

রাম-সীতার নয়নের নিম্নে, তাহার হৃদয় খুলিয়া শোভার ভাণ্ডার তুলিয়া ধরিয়াছে। আর রাম-সীতা উর্দ্ধ হইতে আনত-নয়নে, সেই সকল সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইতেছেন। বাহার জন্ত প্রাণ কাঁদে, 'কোন ভাল বস্তু উপভোগের সময়ে, সর্ব্বাঙ্গে তাহারই কথা মনে পড়ে। তাহাকে লইয়া সুন্দর পদার্থ ভোগ করিতে ঠাছা হয়। একাকী ভোগ করিলে, তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না। কবি বথার্থই গাহিয়াছেন—

“তদারম্যাণ্যরম্যাণি তদা শল্যং প্রিয়াসবঃ।

তদৈকাকী সবন্ধুঃ সন্ ইষ্টেন রহিতো যদা ॥

“But one thing want these banks of Rhine,—

Thy gentle hand to clasp in mine² ॥”

রাম সীতাকে হারাইয়া একা একা যে সকল স্থানের সৌন্দর্য্য-দর্শনে কাঁদিয়াছিলেন, আজ সীতাকে লইয়া সেই সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে আশ্র-বিহ্বল হইতেছেন। মহাকবি কালিদাস এ অংশেও বাস্তবিকের সহিত একপথে না বাইয়া, রঘুবংশের উপাদেয়তা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

রঘুবংশের চতুর্থে, তিনি, পূর্বে কামরূপ, পশ্চিমে ও পশ্চিমোত্তর-প্রান্তে সিদ্ধু এবং কছোজ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে মলয়—এই চতুঃসী-মান্তর্ব্বর্ত্তিনী ভূমির বর্ণন করিয়াছেন। এই বিশাল ভূ-ভাগের মধ্যে ষত রাজ্য, ষত নদনদী-পর্ব্বত আছে, সে সমস্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার এমনই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, যখন। যে দেশের কথা বলিয়াছেন, তখন, সেই দেশের যাহা যাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, যাহা সেই দেশ ব্যতীত অন্ত্র ছর্ষট, তাহার বর্ণন করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি বঙ্গদেশের বর্ণন-কালে, বঙ্গের প্রধান শস্ত যে ‘উৎখাত-প্রতিরোপিত’—

অর্থাৎ প্রথমে একবার খাঙ্কের চারা দিয়া, পরে ঐ সকল চারা তুলিয়া যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পুনরায় রোপণ করা হয়, ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ।

এই প্রকারে, রঘুর চতুর্থ সর্গে, প্রথমে বিশাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকবর্তী প্রদেশ-সমূহের বর্ণন-পূর্বক, পরে রঘুর ষষ্ঠে, ভারতের মধ্যবর্তী রাজ্য-নিবহের যেখানে বাহা কিছু স্থল, তাহার বর্ণন করিয়াছেন । রঘুর চতুর্থ সর্গে, কোন কোন রাজ্যের যে সমুদয় উল্লেখযোগ্য বিষয় দ্বিধ্বজ-বর্ণনার অল্পকূল নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ষষ্ঠসর্গে, সেই সেই পরিত্যক্ত বিষয় সমূহের উল্লেখ করিয়া তত্তৎ রাজ্যের বর্ণন সর্বত্র স্থল করিয়া তুলিয়াছেন । তবেই দেখিতেছি, মেঘদূতে এবং রঘুবংশের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ সর্গে কালিদাস, সমগ্র ভারতের সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে বা তাহার যে কোনও স্থানে, বাহা কিছু স্থল, বাহা কিছু মনোহর, সে সকলেরই উল্লেখ-পূর্বক, মহাকবি তদীয় ভারত-ব্যাপিনী কল্পনার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন । তরঙ্গিণী গিরি-নিব্বারিণীর জ্বায়, নৃত্য করিতে করিতে, তাহার উন্মাদিনী কল্পন কখনও ভারতের চতুর্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখনও বা ভারতের মধ্যবর্তী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য—শ্রীহৃদ্ধি-সম্পন্ন জনপদে উপস্থিত হইয়া, তত্তৎক্ষেত্রে প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া, পাঠকের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছে কল্পনার এমন বৈচিত্র্যময়ী তরঙ্গ-লহরী কালিদাসের গ্রন্থ ব্যতীত অন্তত পরিদৃষ্ট হয় না ।

তাঁহার কাব্যের আর একটি অনন্ত-সাধারণ গুণ এই যে, অপরাপর কবি-গণ, নামোল্লেখ পূর্বক হৃদয়ের যে যে ভাবের প্রকাশ করিয়াছেন, কালিদাস তদীয় শক্তি-শালিনী ভাষার দ্বারা, সেই সেই ভাবের একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র । তিনি শোকের স্থলে ‘শোক’ এই শব্দের বিস্তার করেন নাই, কিন্তু এমনই কৌশলে শোকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, অসংখ্য কবির শতবার ‘শোক’ ‘শোক’ শব্দ প্রয়োগ

অপেক্ষা কালিদাসের এই শোকের নাম-বর্জিত বর্ণন-কৌশলে করুণ-
 সের প্রকৃতমূর্তির অধিকতর অভিব্যক্তি হইয়াছে । অস্ত্রান্ত কবিগণ,
 তাহাদের পাত্রদিগকে যে যে স্থলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করাইয়াছেন,
 কালিদাস তথায়, তাহার পাত্রের নয়নাপাঙ্গে মার্জ একবিন্দু অশ্রু উদ্ধৃত
 করিয়া, বর্ণনার চমৎকারিতা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন । অথবা এক
 কথায় বলিলে বলিতে হয়,—অপরাপর কবিগণের রস ‘বাচ্য’—অর্থাৎ
 শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত, আর কালিদাসের কাব্যের রস ‘ব্যঙ্গ্য’—অর্থাৎ
 ভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত । অস্ত্রান্ত কবিদিগের কাব্যের চিত্র শব্দ-সাহায্যে
 পরিব্যক্ত, আর কালিদাসের কাব্যের চিত্র ভাবের সাহায্যে অঙ্কিত ।
 অস্ত্রান্ত কাব্য পাঠকালে শব্দাবলীর আবৃত্তি-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের
 ‘ভাবাভাববোধেরও’ সমাপ্তি হইয়া যায় । কিন্তু কালিদাসের গ্রন্থে শব্দাবলী
 আবৃত্তি করিবার পর, হৃদয়ে একটা ভাব চিরদিনের মত থাকিয়া যায় ।
 গাই বলিতেছিলাম, অস্ত্রান্ত কবির উদ্দেশ্য শব্দের দ্বারা প্রকাশিত—অর্থাৎ
 ‘বাচ্য’ আর কালিদাসের উদ্দেশ্য শব্দের দ্বারা অপ্রকাশিত, অথচ ভাবের
 সাহায্যে প্রকাশিত,—অর্থাৎ ‘ব্যঙ্গ্য’ । এই কারণেই কালিদাসের কাব্য
 সর্বোত্তম ‘ধ্বনিকাব্য’, ‘বাচ্যাতিশায়ী’ ‘উত্তম কাব্য’ ।

১—‘বাচ্যাতিশায়িনি ব্যঙ্গ্যে ধ্বনিস্তৎ কাব্যমুত্তমম্’ ।—দর্পণ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মালবিকাগ্নিমিত্র ।

মহাকবি কালিদাস, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্কশী এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল—এই তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছেন । কালিদাসের সরল রচনা, মধুর ভাবভরঙ্গ এবং অনুপম সৃষ্টি-নৈপুণ্য—এ তিন খানিতেই সম্যকরূপে সুপরিষ্কৃত । এ দেশে এমন এক সময় ছিল, যখন মালবিকাগ্নিমিত্রকে, অনেকে, কালিদাসের প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতেন না । মালবিকাগ্নিমিত্রের সুন্দর রচনা-প্রণালী, বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ এবং প্রসাদ ও মাধুর্য্যগুণের অনুপম অভিব্যক্তি-দর্শনে, এক্ষণে সুধী-সমাজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাস ভিন্ন অন্য কেহই এই আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু ভাব-সম্পদে বৃহৎ বা বৃহত্তর নাটকের প্রণেতা হইতে পারেন না ।

মহাকবি কালিদাসের নাটকাবলীতে এমন একটি অনন্তসাধারণ লক্ষণ বা ধর্ম্ম আছে, যদ্বারা অতি অল্পায়াসেই, অন্তর্দীপ্ত নাটক হইতে তাহার নাটক পৃথক করিয়া লওয়া যায় । অস্ত্রের নাটক হয়ত পাঠ করিতেই সুন্দর, কিন্তু অভিনয়কালে তত মনোজ্ঞ নহে । তাহাতে অভিনয়োপযোগী গুণ-গরিমার অভাব অনুভূত হয় । আর কালিদাসের নাটকাবলী পাঠ করিবার কালে যত সুন্দর, অভিনয়-কালে তদপেক্ষা অনেক অধিক সুন্দর, অনেক চমৎকারিতাময় । কালিদাসের নাটকের অভিনয় দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কত মধুর, কত অনুপম । কেবল পাঠে, তাহার শতাংশের একাংশ আনন্দও অনুভব করা যায় না । সুতরাং কোন্ নাটক কালিদাসের আর কোন্ খানিই বা অপরের—ইহার নির্ধারণ অতি সহজেই হইতে পারে ।

এই নাটকত্রয় আবার একই অদ্বিতীয় মহাকবির লেখনীমুখবিনিস্কৃত হইলেও কিন্তু ঘটনার বৈশিষ্ট্যে তিন খানিই সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ । আকারে অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকারে অত্যন্ত বিসদৃশ । এক পিতার তিনটি সন্তান, হয়ত আকারে অনেকাংশে সদৃশ হইয়াও যেমন প্রকারে, ব্যবহারে, ক্রিয়ায় বিসদৃশ অর্থাৎ তিন প্রকার হয়, এই নাটকত্রয়ও ঠিক ব্রজপ । অথবা কোনও চিত্রকর তাঁহার যৌবনকালে যে চিত্র করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার প্রবীণ বয়সের চিত্রের যেরূপ প্রভেদ, এই নাটক-ত্রয়েও কালিদাস-চিত্রের সেইরূপ প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় ।

প্রথম বয়সে, যখন হৃদয় জগতের বাহ্য-সৌন্দর্য্যেই প্রয়াশঃ বিমুগ্ধ থাকে, যখন সংসারের সকলই সুন্দর মনে হয়, প্রাণে অনন্ত আশার অপরিমিত উন্মাদ থাকে, সেই সময়ে নবীন চিত্রকর যে বস্তু যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, একটু প্রাবীণ্য জন্মিলে, সেই বস্তুই তিনি অল্পভাবে দেখেন । প্রথম বয়সে চিত্রকর যে সকল চিত্র করেন, উহাদের সহিত তাহার পরিণত বয়সের চিত্রের এই জন্তই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয় । চিত্রিত প্রতিমার নাক, মুখ, চক্ষুঃ, কর-চরণাদি সকল সময়েই আকৃতিতে তুল্য হয় বটে, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়ায় তারতম্য ঘটে । প্রথম বয়সের চিত্রিতমূর্ত্তির চক্ষু চঞ্চল, চকিত-হরিণী-নয়নবৎ নিরন্তর চঞ্চল, আর পরিণত-বয়স্ক চিত্রকরের চিত্রিত মূর্ত্তির চক্ষুও চঞ্চল, তবে সেই চাক্ষু্যলোর মধ্যে আবার কদাচিৎ গাভীর্ষ্যও উপলব্ধ হয় । চিত্রকর প্রথম বয়সে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাদের মুখে অতুল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে পারেন, কিন্তু প্রবীণ বয়সের চিত্রিত মূর্ত্তির মুখে অতুল সৌন্দর্য্য এবং হৃদয়নিহিত ভাবের সম্যক অভিব্যক্তি—এই দুইই ফুটিয়া থাকে । ফলতঃ চিত্রকরের চিত্ত-বৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিত্রিত মূর্ত্তিরও ভাবাভিব্যক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে ।

উপরি-লিখিত কারণ-বশতই আমরা দেখিতে পাই যে, অগ্নিমিত্রকে

বিমুখ ও একেবারে আত্ম-বিশ্রুত করিবার জন্য, যে কবি মালবিকাকে নৃত্যমঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়াছেন, সেই কবিই শকুন্তলাকে ভ্রমর-বাধায় চঞ্চল করিয়া, বিটপান্তরিত ছায়াস্তের মনোমোহন করিয়াছেন । মালবিকা সমস্ত রাজপরিবারের সমক্ষে প্রধানা মহিষী ধারিণীর সমক্ষে, ততোধিক রাজার—তাহার ‘চির-প্রার্থিত’ অগ্নিমিত্রের সম্মুখে রঙ্গমঞ্চ-বর্তিনী হইয়া নৃত্য করিতেছেন ; আর শকুন্তলা, শাস্ত তপোবনে সখীগণের সঙ্গে কুসুম চয়ন করিবার কালে, স্বকীয় মুখ-কমল-পতিত ভ্রাস্ত ভ্রমরের সন্মুখে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন । মালবিকা নৃত্যের তালে তালে আবার সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতেছেন, নৃত্যশাস্ত্রানুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিক্ষেপ করিতেছেন, রাজ-সভায় এই ব্যাপার হইতেছে । আর শকুন্তলা অতি নির্ভর্যে, পুরুষাস্তর-বর্জিত তপোবনে, সঙ্গীতাদিক মনোরম স্বরে, সমস্ত কানন যেন স্পন্দন-শূণ্য করিয়া সখীদের সহিত রহস্তালাপ করিতেছেন ; রাজা দৃশ্যস্ত বৃক্ষান্তালাে থাকিয়া, সেই সব শুনিতেছেন, দেখিতেছেন, আর মজিতেছেন । মালবিকা কবির যৌবন-কালের সৃষ্টি—প্রথম বয়সের সৃষ্টি, তাই তাহার সকলই প্রথম বয়সের ভাবে অনুপ্রাণিত। আর শকুন্তলা তাহার পরিণত বয়সের সৃষ্টি,—যে বয়সে সৌন্দর্য্যের সহিত পবিত্রতার সমাবেশ দর্শন করিতে বাসনা জন্মে, সেই প্রবীণ বয়সের সৃষ্টি, তাই—মালবিকা ও শকুন্তলায় এত প্রভেদ । কালিদাসের উর্দ্ধশীও, এই প্রকারে, শকুন্তলার সহিত তুলনা করিলে, শকুন্তলার পূর্ববর্তিনী বলিয় অনুমিত হয় । তাই মনে হয়, কালিদাস প্রথমে বিক্রমোর্কশী বা মালবিকাগ্নিমিত্র, এবং তার পর অভিজ্ঞান-শকুন্তল বিরচিত করিয়াছেন ।

মালবিকাগ্নিমিত্রের ঘটনাবলী সমস্তই এই মর্মে ঘটয়াছিল । বিক্রমোর্কশীর ঘটনার স্থান মর্ত্ত এবং স্বর্গ ; আর শকুন্তলার ঘটনাবলীর স্থান—মর্ত্ত, স্বর্গ ও স্বর্গ-মর্ত্তের অন্তর্বর্তী শূন্য-মার্গ । মালবিকাগ্নিমিত্র পার্থিব ঘটনার পরিপূর্ণ । বিক্রমোর্কশী পার্থিব এবং অপার্থিব ঘটনার

অলঙ্কৃত । আর অভিজ্ঞানশকুন্তল পার্শ্বিৰ অপার্শ্বিৰ এবং এতদুভয়াতিরিক্ত
কবির কল্পিত এক নূতন জগতের ঘটনায় বিমণ্ডিত ।

• কালিদাস স্বকীয় অধিকাংশ গ্রন্থেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাধান্ত প্রচার
করিয়াছেন । রঘুবংশের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । এই
মালবিকাগ্নিমিত্রেও সেই কথা ;—রাজা—প্রজা—যিনি যখন যে কার্য্যই
করুন না কেন, সকল সময়ে সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত সকলে
অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন । তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্ত প্রচার
করিতে যাইয়া, কোনও ধর্মাস্তরের নিন্দা বা বিজ্ঞপ করেন নাই ! এমন
কি, তাঁহার প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্মেরও কোন স্থলে অতি প্রশংসা করিয়া,
গুঢ় উদ্দেশ্যের রহস্ত-ভেদ করেন নাই । কিন্তু তাহা হইলেও, ফল-
প্রবাহের জ্বায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-হিতৈষণারূপ ধরশ্রোত, তদীয় কাব্যাবলীর
মধ্যে সম্ভবত-ভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে ।

দ্রব্যান্ত এবং পুরুষবার চরিত্রে অনেক অলৌকিক ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়,
কিন্তু অগ্নিমিত্রের চরিত্র, মাহুষের চরিত্র যেমন হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ ।
ইহার কোন স্থলে কোন প্রকার অতিমাহুষ ভাবের সমাবেশ নাই । মাল-
বিকাগ্নিমিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য । মালবিকাও ঠিক মর্তের ললনা ।
উর্কশীর বা শকুন্তলার চরিত্রের জ্বায় ইহার চরিত্রে কোন অমাহুষ ব্যাপার
নাই । ভারতের একটি সম্ভ্রান্ত বংশের কুমারী কস্তার চরিত্র যেমনটি
হওয়া সঙ্গত, ঠিক সেইরূপ । সেই জন্তই বলিতেছিলাম যে, এই
নাটকের সমস্তই মর্তের উপাদানে বিরচিত । সংসারে প্রণয়ব্যাপারে
যেমন যেমন ঘটনা থাকে, হর্ষ-বিষাদের যে সকল অভিনয় সাধারণতঃ
হইয়া থাকে, কালিদাস সেই সকলেরই সুন্দর সুন্দর অংশ, সুন্দর সুন্দর
অংশ, বাহা মাহুষের স্থল-নয়নে সহসা উপলব্ধ হয় না, সেই সকল
অংশ, অতি সংযত-হস্তে চিত্রিত করিয়া, সামাজিকগণের সম্মুখে এক
প্রাণঃসমীর-স্নিগ্ধ নূতন জগতের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন । তথায়

প্রবেশ কর, দেখিবে, সে জগতের সবই সুন্দর, সমস্তই মনোজ্ঞ, মধুর
বালাক্ৰণ-কিরণে তব্রত্য প্রতিপদার্থই সমুদ্ভাসিত ।

কালিদাস কোথাও প্রস্তুতি কুসুমের বর্ণন করেন নাই । যে
কুসুম ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফুটিতেছে—তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য ।
তিনি উদ্ভালতরঙ্গ-ভীমা তটিনীর নিকটেও যাইতেন না । যে নদীতে
মৃদু সমীরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উঠিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, মিলিতেছে,
তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য । তিনি কোন বিষয়েই অতিমাত্রার পরূপাভী
ছিলেন না । তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারত-
লেখা পড়ার চর্চা অত্যন্ত প্রবল ছিল । ভারতের সর্বত্রই তখন বিদ্যা-
চর্চার, জ্ঞান-লিপ্সার খরশ্রোত প্রবাহিত । তখন ভারতে সুরসিক
সুপণ্ডিত সামাজিক অনেক । তখন বিদ্যার গৌরবে, শিল্পের গৌরবে,
কলার গৌরবে ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয় । ওরূপ সময়ে, ভারতের ঐ
প্রকার স্পর্শার দিনে, কোন দিকে কোন বিষয়ে, কোন প্রকার বাড়
বাড়ি করিলে, বা অতিমাত্রায় কোন কার্য্য করিতে গেলেই যে
তৎক্ষণাৎ সুপণ্ডিত-সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে, এ তথ্যটা কবিকুল
রবি কালিদাস, অতি নিপুণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । সেই
জন্তই তাঁহার গ্রন্থাবলীর কুত্রাপি তিনি অবশ্য ‘বিদ্যাপ্রকাশ’ করি-
যান নাই । আবশ্যকান্বেষিত একটি কথাও বলেন নাই । সর্বত্রঃ
সংযত-হস্তে ও সংযত-হৃদয়ে লেখনী-চালনা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।
তাঁহার সময়ে ভারতের সর্বাদ্বীন উন্নতি, সর্ববিষয়িনী সমৃদ্ধি, তাই তাঁহার
কল্পনাও সর্বব্যাপিনী, সর্বাসুন্দরী, ওজস্বিনী ।

মালবিকাগ্নিমিত্র একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক । মোর্যবংশে-
শেষ নৃপতি বৃহদ্রথের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি পুষ্পমিত্র (পুষ্যমিত্র ?
রাজ্যলোভে স্বীয় প্রভু বৃহদ্রথকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া, আপন পু-
ত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সেই অদ্বিতীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন । এ

অগ্নিমিত্রের বংশই ‘মিত্রবংশ’ বা ‘সুত্রবংশ’ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই বংশের নৃপতিবৃন্দ বিলক্ষণ পরাক্রমশালী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বিদিশা-নক্ষত্রী ইহাদেরই রাজধানী। বিদিশাপতি এই অগ্নিমিত্রই আমাদের আলোচ্য দৃষ্টকাব্যের নায়ক। অগ্নিমিত্র যে সময়ে বিদিশার রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে বিদর্ভ বা অন্ধুরাজ্যে ভয়ানক অন্ত-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়; অগ্নিমিত্র সুযোগ বুঝিয়া, এই সময়ে বিদর্ভ-রাজ্যে স্বীয় আধিপত্য-বিস্তারে সচেষ্ট হইলেন। বিদর্ভের বিবদমান রাজ-গণের অন্ততম মাধবসেন, পরাক্রান্ত অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভে আপন আধিপত্য স্থাপন মানসে, তাঁহাকে কনিষ্ঠা সহোদরার সমর্পণ দ্বারা মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া, উক্ত সহোদরাকে লইয়া বিদিশাভিমুখে যাত্রা করেন। পশ্চিমবঙ্গে মাধবসেনের পরমবৈরী বিদর্ভের অন্ততম রাজা যজ্ঞসেনের একজন সীমান্ত কন্মচারী হঠাৎ সসৈন্তে আপতিত হইয়া, যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাধবকে কারাবদ্ধ করেন। এই সময়ে মাধবের সহযাত্রী তদীয় প্রধান মন্ত্রী স্মৃতি, তাঁহার ভগিনী কৌশিকী ও রাজকুমারী মালবিকাকে লইয়া, কতিপয় অশুচর সহ পলায়নপূর্বক রমণীদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু গ্রহবৈশিষ্ট্য-নিবন্ধন, পশ্চিমবঙ্গবর্তী এক গহন অরণ্যে একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মন্ত্রী স্মৃতি নিহত হইলেন। আর স্মৃতির ভগিনী কৌশিকী অরণ্যমধ্যেই জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। দস্যুগণ স্মৃতির ধন-রত্নাদির সহিত, মাধবসেনের সেই কুমারী সহোদরাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রণয়ন করিয়াছেন। কালিদাসের সময়ে এই ব্যাপারের আলোচনা দেশের সর্বত্রই হইত! কিছুকাল পূর্বের বৃত্তান্ত হইলেও, যেমন, আমাদের দেশে এখনও পদ্মিনীর উপাখ্যান লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ, কালিদাসের সময়েও ঐ কুমারী-হরণ-কথার যথেষ্ট

প্রচার ছিল। বিদর্ভের রাজকন্যাকে দম্ভাতে লইয়া গিয়াছে, এ একটা আন্দোলনের কথাও বটে। ইহা ব্যতীত এই নাটকের ঐতিহাসিকতার আরও কয়েকটি কারণ আছে।

মহারাজ অশোক স্বকীয় রাজত্ব-কালে, অতি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সমাজের উপর যে একটা অবস্থা আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা তিনি ধ্বংস করিবেন। লোকে ব্রাহ্মণদিগকে যে ঐশী শক্তির আধার বলিয়া মনে করে, লোকের এ ভ্রান্তি তিনি নিরাস করিবেন। প্রকৃতপক্ষে যে সমুদয় ব্যক্তির ঐশী শক্তি আছে, তাঁহারা ই পূজ্য। তাঁহাদেরই সম্মান হওয়া উচিত। এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া, তিনি সর্বপ্রথমেই স্বরাজ্য-মধ্যে যজ্ঞার্থে পশুবধ সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া দিলেন। বিচার-কার্য বা শাসন-বিষয়ে ব্রাহ্মণগণই একমাত্র হর্ষাকর্ষী ছিলেন। অশোক ব্রাহ্মণদিগের এ ক্ষমতাও আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এতদ্ব্যতীত, ‘নীতিশিক্ষক’ নামে কতকগুলি কর্মচারীর নিয়োগ-পূর্বক, তিনি, সমাজের উপর ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ-দানের যে একটা অধিকার ছিল, ক্রমে তাহাও বিলুপ্ত করিলেন। অশোক নিজে বৌদ্ধ নৃপতি হইয়া যদিও সর্বদা প্রকাশ করিতেন যে, সকল ধর্মই তাঁহার অভিমত, কোন ধর্মেরই তিনি বিদ্বেষী নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মণ-ধর্মের যে অক্ষুণ্ণ প্রভাপ, তাহার সমুলে ধ্বংস-বিধান।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। বৌদ্ধনৃপতি অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, এক নূতন ব্রাহ্মণ-শক্তির অভ্যুত্থান হইল। অগ্নিমিত্র রাজসিংহাসনে আরুঢ় হইলেন। অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণগণ এই নূতন রাজত্বকালে, একপ্রকার ‘সর্বো সর্বো’ হইলেন। এইবার ব্রাহ্মণগণ সময় পাইয়া, অমিত-বলে, অতি অল্প-কাল-মধ্যেই, তাঁহাদের বিলুপ্ত ব্রাহ্মণ-শক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন। অগ্নিমিত্রের পিতা পুষ্পমিত্র

পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াই, মহারাজ অশোক যে মগধে বসিয়া যজ্ঞার্থ পশু-বধ প্রভৃতি রহিত করিয়াছিলেন, সেই মগধেই মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্বক, ঐ যজ্ঞীয় তুরঙ্গরক্ষণের নিমিত্ত, অগ্নিমিত্রের পুত্র বহুমিত্রকে নিযুক্ত করিলেন । কুমার বহুমিত্রের মাতা, পুষ্পমিত্রের পুত্র-বধু, বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রের প্রধান মহিষী মহারানী ধারিনী, তুরঙ্গ-রক্ষক, পুত্র বহুমিত্রের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়নাদি করিবার নিমিত্ত, অনেক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন, এবং বার্ষিক আট শত স্রবণমুদ্রা তাঁহাদিগের স্থায়ি-বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিলেন । ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত—যাহা বৌদ্ধ-নৃপতি অশোক একবারে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, হিন্দু নৃপতির সময়ে তাহা আবার ফিরিয়া আসিল । মহারাজ অগ্নিমিত্র ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর দ্বারাই যেন একবারে পরিবৃত্ত হইলেন । তাঁহার বিদুষক ব্রাহ্মণ, কঙ্কুকী ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরবর্তিনী পরম-সম্মাননীয় পরিব্রাজিকাও ব্রাহ্মণতনয়া । এই সমুদয় দেখিলে মনে হয়, যেন বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব-সঙ্কোচকারী নৃপতির সময়ে, লুপ্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের আবার পুনরুত্থান হইল । পুষ্পমিত্রের সময়েই বৈয়াকরণ-কেশরী পতঞ্জলির আবির্ভাব হয় । ঋষি পতঞ্জলিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত-ভাষার সংস্কার-সাধন করেন । বৌদ্ধ-নৃপতিগণের রাজত্ব-কালে, দেশের প্রচলিত ভাষাতেও বৌদ্ধ-প্রভাব প্রচুর-পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । এখন, পালি প্রভৃতি ভাষার দেশের সাহিত্য বিরচিত হইতেছিল । সংস্কৃতের প্রসার স্বার্থেই সঙ্কোচিত হইয়া পড়িয়াছিল । পতঞ্জলির অভ্যুদয়ে সে সব যেন একবারে পরিবর্তিত হইল । সংস্কৃত ভাষা পুনরুজ্জীবিত হইল । কেবল রাজ-পরিষদে নহে, দেশের ভাষাতে পর্য্যাপ্ত ব্রাহ্মণের আধিপত্য অল্পপ্রবিষ্ট হইল ।

এই নাটকের প্রারম্ভেই আমরা আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা দেখিতেছি যে, বিদূষপতি যজ্ঞ-সেনের শ্রালক মৌর্য্যনৃপতিদিগের সচিব

ছিলেন । অগ্নিমিত্র ঐ সচিবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন । মখন অগ্নিমিত্রের কর্ণগোচর হইল যে, বিদর্ভের অন্ততম রাজপুত্র মাধবসেন তাঁহাকে ভগ্নী-সম্প্রদান করিতে আসিবার কালে পথিমধ্যে যজ্ঞসেনের সীমাস্ত কন্মচারী কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তখন অগ্নিমিত্র যজ্ঞসেনের নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন—‘অচিরাৎ মাধবসেনকে সপরিবারে মুক্তিদান কর ।’ নৃপতি যজ্ঞসেনও সদস্তে উত্তর দিলেন,—“মহারাজ ! মোর্ধ্যা-নৃপতিদের সচিব এবং আমার জ্ঞালক আপনার কারাবদ্ধ, আপনি অগ্রে তাঁহাকে মুক্তিদান করুন, তাহা হইলে আমিও আপনার ‘প্রতিশ্রুত-সম্বন্ধ’ মাধবসেনকে মুক্তি দিতে পারি । মাধবের সৌদরা আমার এখানে নাই, সে বালিকার কোন সংবাদই আমি জ্ঞাত নহি ।” যজ্ঞসেনের এই রাজ-নৈতিক উত্তরে, অগ্নিমিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতি বীরসেনকে বিদর্ভ-বিজয়ের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন । বীরসেন বিদর্ভ জয় করিয়া যজ্ঞসেনকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন । মহারাজ অগ্নিমিত্র তখন বিজিত বিদর্ভ-রাজ্যের মধ্যবর্তিনী বরদানদী সীমা-নির্দেশ-পূর্বক, বিদর্ভকে দুইটা স্বতন্ত্ররাজ্যে বিভক্ত করিয়া, একটিকে মাধবসেনকে, অপররাজ্যে যজ্ঞসেনকে স্থাপিত করিয়া, উভয়কেই বিদিশার সামন্ত-নৃপতি করিয়া লইলেন ।

মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে এই সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইহাতে, ভারতের তদানীন্তন রাজ-নৈতিক অবস্থার অনেকাংশে পরিচয় পাওয়া যায় । ইহা ব্যতীত, এই নাটকের অত্র একটি ঘটনাতেও তৎকালীন সামাজিক অবস্থার কতকটা অঙ্কুট চিত্র দেখিতে পাইতেছি ।—অগ্নিমিত্রের সময়ে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তখনও সমাজে বৌদ্ধ-প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই । তখনও বৌদ্ধ-ধর্ম সম্মানের সহিত পরিদৃষ্ট হইত । তাই ব্রাহ্মণ-প্রধান

রাজসংসারে বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকীর অত প্রতাপ। পুষ্পমিত্র
 মগধের বৌদ্ধরাজত্ব ধ্বংস করিয়াছিলেন, হিন্দু রাজত্বের পুনঃস্থাপন
 করিয়াছিলেন। অথচ, তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্রের রাজধানীতে এমন কেহই
 ছিলেন না, যিনি বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য না করিতেন।
 ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ দেশে তখনও এত অধিক ছিল। ইহাও
 'এই নাটকের তথা নাটক-রচয়িতার প্রাচীনত্বের অন্ততম প্রমাণ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

নাটকীয় বৃত্তান্ত ।

রাজা অগ্নিমিত্র বিদিশানগরীর অধিপতি ছিলেন । রাণী ধারিণী তাঁহার প্রধান মহিষী । ধারিণীর এক পুত্র ও একটি কন্যা । পুত্রের নাম বসুমিত্র, আর কন্যার নাম বসুলক্ষ্মী । ধারিণীর অতি সম্ভ্রান্ত কুলে জন্ম । তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মভাব-পরিপূর্ণ ; সহিষ্ণুতাও বৎপরোন্মত্তি । আকারে তিনি যেন শরীর-ধারিণী ক্ষমা । তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও কুশাশ্রবণ তীক্ষ্ণ । ধারিণীর সমস্তই সুন্দর, অসুন্দরের মধ্যে তিনি প্রবীণা । তাঁহার এক শ্রীমতী পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম ছিল ইরাবতী । সে নীচ-কুল-সমুৎপন্ন হইয়াও সৌন্দর্য্যে মহারাজ অগ্নিমিত্রের হৃদয় জয় করিয়াছিল ! অগ্নিমিত্র তাহার পাণিগীড়ন করিয়া, রাজ্যের দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর স্থায় তাহাকে আদর বদ্ধ করিতেন । প্রৌঢ়া মহারানী, নবীনা পরিচারিকার এই অভ্যাস নীরবে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন । আশ্চর্য-হৃদয়ের উপর তাঁহার এতই প্রভুত্ব ছিল যে, তাঁহার ব্যবহারে মনে হইত, পরিচারিকা ইরাবতীর প্রতি রাজার এই অনুগ্রহে ধারিণীর যেন কতই আনন্দ । লোকে শতমুখে তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিত । পাটরাণীর হৃদয় যেমন হওয়া উচিত, রাজ-সংসারের প্রধান-মহিষীর ব্যবহার যেমন হওয়া উচিত, বহির্ব্যাপারে ধারিণীর ব্যবহারও ঠিক সেইরূপ ছিল । মহারানী কেবল নীরবে কালের অপেক্ষা করিতেছিলেন । তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে যে গুরুদক্ষিণা দিয়াছে, যদি কখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে তিনিও তাহার উপযুক্ত পারিতোষিক-দানে পরিচারিকাকে আপ্যায়িত করিবেন,—এই অভিপ্রায়ে, স্থির-চিন্তে, মহিষী সকল অসহ্যই সহ্য করিতেছিলেন । এমন সময়ে, তাঁহার ভ্রাতা, অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন, তাঁহাকে একটি অজ্ঞাত-কুল-শীলা রূপলাবণ্য-

বতী বালিকা উপহার-রূপে অর্পণ করিলেন । রাজ্ঞী ধারিণী তাঁহার ভ্রাতৃ-প্রদত্ত সেই অনর্থ রমণীরই অবলোকন করিয়াই, মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই বালিকাকে নৃত্যগীতাদি-বিষয়ে সম্যক-পারদর্শিনী করিতে পারিলে, কালে, এ, সঙ্গীতাদি-নিপুণা ইরাবতীর গর্ব হয় ত ধ্বংস করিতে পারিবে । আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে । তাই ধারিণী অতি যত্নে বালিকার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন । এই কল্পাই সেই দম্ভাহতা মালবিকা ।

ধারিণীর নৃত্য-গীতাচার্য্য আৰ্য্য গণদাস অতি প্রবীণ ব্যক্তি । নৃত্য-গীতাদি কলায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য । ধারিণী দেখিলেন যে, এ কল্পা যে প্রকার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের আধার, তাহাতে, ইহার উপর, যদি ইহাকে আবার ইরাবতীর জ্ঞায় নৃত্যগীতাদিতেও নিপুণ করা যায়, তবে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইবে । তুচ্ছ ইরাবতী ইহার চরণপ্রান্তেও স্থান পাইবার যোগ্য থাকিবে না । এই বুদ্ধিতে,—এবং একরূপ সুন্দরী বালিকাকে অগ্নিমিত্রের নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী করা আপাততঃ সম্ভব নহে, এই বিবেচনায়, ধীর-বুদ্ধি ধারিণী নাট্টাচার্য্য বৃদ্ধ গণদাসের হস্তে ইহার শিক্ষার ভার দিয়া, বালিকাকে, রাজপ্রাসাদ হইতে একবারে গণদাসের বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন । ভাবিলেন, এই রূপবতী যখন অনন্তশুণে গুণবতী হইবে, তখন ইহাকে অবলা-প্রিয় রাজার গোচর করিব, পূর্বে নহে । কিন্তু ভাগ্যবান অগ্নিমিত্রের সোভাগ্যে ধারিণীর এ কৌশল-জাল অচিরাতঃ ছিন্ন হইল । একদিন রাজা, অস্তঃপুরের চিত্র-শালিকায় ভ্রমণ কালে, একখানি চিত্রে ধারিণী এবং ধারিণীর পরিচারিকাবর্গের প্রতিকৃতি দর্শন করিতে করিতে, অকস্মাতঃ সেই সুন্দর প্রতিকৃতিসমূহের মধ্যবর্ত্তিনী একটি মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ রূপসী পরিচারিকাটি কে ? ইহাকে রাণী কোথায় পাইলেন ? এ কোথায় থাকে ? ধারিণী রাজার কথার কোনই উত্তর না দিয়া, প্রসঙ্গান্তরে প্রব্রট্টা অন্তরিত করিবার অভিলাষ করিতেছেন, এমন সময়ে, তাঁহার

পার্ব্বতিনী সরলহৃদয়া কুমারী বসুগন্ধী বলিয়া দিলেন যে, ঐ পরিচারিকার নাম মালবিকা । রাজা তদবধি মালবিকাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন । এ দিকে পারিণীও পূর্বাশঙ্কা অধিকতর স্তম্ভিত হইয়া সতিত মালবিকাকে নিয়ত রাজ-নয়নের অন্তরালে রাখিতে লাগিলেন । ক্রমে, রাজার আগ্রহে, রাজ-বয়স্ক বিদুষক, নানাবিধ কৌশলে মালবিকার সতিত রাজার মিলন করাইয়া দিলেন । জন-প্রচার-শূন্য উপবনের মধ্যে রাজা ও মালবিকাকে কথাবার্তা কহিতে দেখিয়া কনিষ্ঠা রাণী ইরাবতী ক্রোধে অধীর হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে যাঁইয়া পাটরাণীর কাছে অভিযোগ করিলেন । পারিণীও তৎক্ষণাৎ ইরাবতীর হৃৎথে যেন বিগলিত হইয়াই, মালবিকাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন । বিদুষক আবার নানাকাণ্ড করিয়া মালবিকার উদ্ধার-সাধন-পূর্বক রাজার সহিত তাহাকে সম্মিলিত করিলেন । ক্রমে কথাটা দেশনয় বাপ্ত হইল । পারিণী মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, আর গোপন করা চলে না ।

পারিণী মালবিকাকে বলিয়াছিলেন, “মালবিকে ! যাও, আমার অশোকতরুতে আজও কুমুমোদগম হয় নাই, আমি পারিব না, তুমি যাঁইয়া দোহদানুষ্ঠান কর, যদি ফুল ফুটে, তবে আমিও তোমার অভিলাষ পূরণ করিব ।” পারিণী জানিতেন যে মালবিকার কি অভিলাষ ? ছাঃখিনী মালবিকা মহারাণীর আদেশ-মতে দোহদ করিলেন । অশোকে, দেখিতে দেখিতে, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটিল । মালবিকার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল । সত্য-প্রতিজ্ঞা পারিণী পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, মালবিকার অভিলাষ-পূরণে উদ্যত হইয়া, রাজাকে অনুরোধ করিলেন যে, মালবিকাকে বিবাহ করিতে হইবে । রাজা করেন কি ? পাটরাণী অনুরোধেই যেন অগত্যা স্বীকৃত হইলেন ॥ পারিণী স্বয়ং বিবাহের সমস্ত উদ্ভোগ করিলেন । বিবাহসভায় সকলেই উপস্থিত । এমন সময়ে, হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল, যে, মালবিকা পরলোকগত বিদূর্ভরাজের

কন্তা, বরদা-তীর-বর্তী রাজ্যের অধীশ্বর মাধবসেনের সহোদরা । তখন দারিণীর আনন্দ আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল । রাজারও আনন্দের সীমা রহিল না । রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, যে ভগ্নীকে তাঁহার করে সম্ভ্রদান কুরিবার আশায়, মাধবসেন বিদিশায় আসিতেছিলেন, এবং পথিমধ্যে বিপক্ষ-কর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই সেই মাধব-সহোদরা ।
 * মালবিকা । সঙ্কলিত বরে কন্তা অর্পিত হইল । বিবাহ-দর্শনের জন্ত দারিণী ইরাবতীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইরাবতী আর আসিলেন না । দারিণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল ।

নতিবেশ-দারিণী কোশিকী, পরিব্রাজিকা-রূপে নানাদেশ পৰ্য্যটন করিতে করিতে, বিদিশায় আসিয়া রাজাস্তঃপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি তথায় মালবিকাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার বেশপরিবর্তন-নিবন্ধন, মালবিকা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাট । কোশিকী রাজসংসারে থাকিয়া, কি উপায়ে রাজার সহিত মালবিকার পরিণয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অতি গূঢ়-ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কেননা—তিনি, তাঁহার অগ্রজ স্মৃতি এবং মাধবসেন, এই তিন জনেই মালবিকাকে লইয়া বিদিশায় আসিতেছিলেন ; যদি পথিমধ্যে সেই সকল বিপৎপাত না হইত, তবে, এতদিনে মালবিকার পরিণয় কবে সুসম্পন্ন হইয়া যাইত । তাই, কোশিকী আত্মপরিচয় গোপন করিয়া অভিপ্রেতসিদ্ধির পন্থা দেখিতে লাগিলেন । অতি নিগূঢ়ভাবে, মালবিকাগ্রিমিত্রের মিলনের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

দারিণী এবং কোশিকী—উভয়েরই উদ্দেশ্য এক হইলেও কিন্তু উভয়ের কেহই কাহাকে নিজের অভিপ্রায় জানিতে দিলেন না । পরিণয়সভায় কোশিকী আত্মপরিচয় প্রকাশ করিলেন । মালবিকা কঁাদিতে কঁাদিতে আসিয়া, তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন । রাজা পূর্বাশঙ্কায় অধিকতর ভক্তির সহিত কোশিকীর সেবা করিতে লাগিলেন । মালবিকার

পরিণয় হইল । ধারিণী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মালবিকাকে অন্তঃপুরের
অধীশ্বরী করিয়া দিলেন । ইরাবতীর স্নেহের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল । কবির
'প্রতিশ্রুতিও সম্পূর্ণ হইল ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

মালবিকার আত্মোৎসর্গ ।

এই নষ্টকের বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে, মালবিকা, অগ্নিমিত্র, ধারিণী, ইরাবতী, বিদুষক ও পরিব্রাজিকা—এই কতিপয় পাত্রের চরিত্রই অভিনয়ের 'পদার্থের প্রধান সাধন'। সুতরাং ইহাদেরই আলোচনা আবশ্যক । ইহার মধ্যে আবার মালবিকা-চরিত্রই সর্বপ্রথম আলোচ্য ।

মালবিকা বিদর্ভ-রাজের কন্যা ; অতীব কোমল-প্রকৃতি । বিদর্ভ-পতির মৃত্যুর পর, রাজ্যের মধ্যে যখন অস্ত্রবিপ্লবের দাবানল প্রজ্জলিত, সেই সময়ে, মালবিকার অগ্রজ কুমার মাধবসেন, অগ্নিমিত্রের সহিত লক্ষ্যস্থাপনের জন্ত বিদেশাভিমুখে আসিতেছিলেন । মালবিকা-কৌশিকী-প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন । অগ্নিমিত্র তখন ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি । বৌদ্ধ রাজত্বের তখন পতন হইয়াছে । অগ্নিমিত্র তখন একপ্রকার অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী । বিদর্ভপতির পুত্র কুমার মাধবসেন সঙ্কল্প করিলেন যে, অগ্নিমিত্রের হস্তে ভগ্নী মালবিকার সম্প্রদান করিয়া, ভারতেশ্বরকে বহুতাপাশে আবদ্ধ করিবেন । আর কুলমর্যাদাও বর্জিত করিবেন । একটি প্রধান সহায় হইবে । কিন্তু বিধাতা তাহা হইতে দেন নাই । পথিমধ্যে নানাবিধ বিপৎপাতে, কুমার মাধবের সকল আশা ভরসা নিশ্শূল হইয়াছে । মালবিকা দম্ভা-কর্তৃক হৃত হইয়াছেন । তাঁহার কোনই উদ্দেশ্য নাই । আর মাধবও স্বয়ং বিপ্লব-কারাগারে আবদ্ধ । কে কাহার সন্ধান করে ?

অদৃষ্ট-চক্রের আবর্তনে, নানা হাত ঘুরিয়া, মালবিকা অগ্নিমিত্রের সংসারে আসিয়া পাটরাণীর পরিচারিকা হইলেন । তিনি রাজার কন্যা, বিধাতা তাঁহাকে পরম সম্মানিত কুলে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, অনন্ত-সৌন্দর্যের অধিষ্ঠিত ভাণ্ডার করিয়াছিলেন, আর সর্বাপেক্ষা অতুল

সম্পদ—কোমল অন্তঃকরণ দিয়া, বিধাতা তাঁহাকে মর্ত্তে পাঠাইয়াছিলেন । মালবিকা বিধিপ্রদত্ত সেই অতুলসম্পদ অতি সংগোপনে রক্ষা করিয়া, মহিষীর পরিচারিকাবৃত্তি পালন করিতেছিলেন । তিনি কদাচিৎ নিৰ্জ্জনে বসিয়া সেই বিদর্ভের অতীত গৌরব—পিতার ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিতেন, মনের বেদনা মনোমধ্যেই রাখিতেন, বাহিরের কেহ তাঁহার হৃদয়-নিহিত কোন ভাবই জানিতে পারিত না । তিনি জানিতে দিতেন না । তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই যেন একটা কি গভীর বেদনার ছায়া লক্ষিত হইত । অন্তঃপুর-বাসিনীরা সকলেই সেই সরল-হৃদয়ার স্নান মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া ব্যথিত হইত । তাঁহাকে অকৃত্রিম ভাল বাসিত । তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী । আচার্য্য গণদাসের নিকটে নৃত্যগীতাদি শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রেরণ করার পর, রাণী ধার্ম্মী যখন বকুলাবলিকাকে জানিতে পাঠাইলেন যে, মালবিকা আচার্য্যের উপদেশ-গ্রহণে কতদূর সমর্থী, তখন বকুলাবলিকার প্রেরণ উত্তরে গণদাস বলিয়াছিলেন, “বকুলাবলিকে ! দেবীকে বলিও, মালবিকা সকল বিষয়েই ‘পরমনিপুণা’, তিনি অতিশয় ‘মেধাবিনী’ । তাঁহাকে আমি যে বিষয়েরই উপদেশ-প্রদান করি, অচির-কাল-মধ্যেই তিনি তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন । তিনি প্রতিভাবলে এমন অনেক বিষয় শিখিয়াছেন, যাহা আমিও জানিনা ।” আচার্য্য গণদাসের এই প্রশংসা-শ্রবণে, বকুলাবলিকা মনে মনে বলিয়া উঠিল,—‘এত অল্পকালের মধ্যেই, দেখিতেছি, মালবিকা রূপে ত ঈশবতীকে পূৰ্বেই জয় করিয়াছে, শুণেও তাহাকে অতিক্রম করিল ।’ মালবিকার সম্বন্ধে নাটকে এই প্রথম কথাবার্ত্তা । সামাজিকগণ বুঝিলেন

১—মালবিকাগ্রিমিত্র,—১ম অঙ্ক,—“গণদাসঃ । ‘বিভাবাতা’ দেবী, পরম-নিপুণা

মেধাবিনী চেতি । কিং বহুনা,—

বহু যৎ প্রয়োগ-বিষয়ে ভাবিকমুগ্ধচিত্তে তস্মৈ ।

তত্ত্বম্ বিশেষকরণাৎ প্রত্যাশীশতীক্ যে সা বালা ।”

যে, বিদিশার রাজধানীতে মালবিকার প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর কেহই নাই। ইরাবতী, যিনি রূপে গুণে ধারিণীকেও পশ্চাৎপদ করিয়া রাজার হৃদয় জয় করিয়াছেন, অথবা করিয়াছেন আর বলি কেন, করিয়াছিলেন, বকুলাবলিকু। বলিয়া দিল যে, সে ইরাবতীও আর এখন কলা-নিপুণা মালবিকার কাছে দাঁড়াইতে পারে না^১। বকুলাবলিকার এই কথাটিতে • অনেক তাৎপর্য্য নিগূঢ়। যে চিত্রে বিদিশার রাজ-সংসার বিমুক্ত হইবে, রাজা অগ্নিমিত্র আত্ম-বিস্মৃত হইবেন, কবি এই স্থলে, নাটকের সেই ভবিষ্যৎ চিত্রের রেখাপাত করিলেন। নিপুণ-দৃষ্টি দর্শক, কবির এই কটাক্ষে, এই নাটকের পরিণাম যে কীদৃশ হইবে, তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। এই সকল কোশল কালিদাসের নিজস্ব।

মালবিকা নাট্যচাৰ্য্যগৃহে কলাশিক্ষা করিতেছেন। এদিকে, রাজাও, অস্তঃপুরের একখানি আলেখ্যে তাঁহার প্রতিকৃতি দর্শন করা অবধি, চঞ্চলমনাঃ হইয়াছেন। সেই প্রতিকৃতির অধি-দেবতাকে দেখিবার নিমিত্ত একান্ত বাঞ্ছা হইয়াছেন। বিদূষক আচাৰ্য্যদিগের মধ্যে একটা বিবম কলহ বাধাইয়াছেন। উদ্দেশ্য,—এই কলহের ফলে তাঁহার প্রিয় বয়স্ক অগ্নিমিত্রকে একবার সেই সুন্দরী মূর্তি প্রদর্শন করাষ্টবেন। রাজার নাট্যচাৰ্য্যের নাম হরদত্ত। তাঁহার সহিত ধারিণীর নাট্যচাৰ্য্য গণদাসের পাণ্ডিত্য লইয়া বিবম বাগ্বুদ্ধ হইয়াছে। পরিশেষে, তাঁহাদের মধ্যে কে বড়, কাহার পাণ্ডিত্য অধিক, ইহা নিদ্ধারণের জন্ত, উভয়েই রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রার্থনা, যে, মহারাজ তাহাদের গুণ-দোষের বিচারপূর্ব্বক, গুরু-লাঘব নিদ্ধারণ করিয়া দেন। রাজা অগ্নিমিত্র, দেবী ধারিণীর এবং পণ্ডিত কৌশিকার আহ্বান-পূর্ব্বক, কৌশিকীর উপর কর্তব্য-নির্ণয়ের ভার অর্পণ করিলেন। পরিত্রাজিকা কৌশিকী অমনি আচাৰ্য্যদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘আপনারা উভয়েই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ,

১—মালবিকাগ্নিমিত্র ১ম অঙ্ক—বকুলাবলিকা: ‘অতিক্রমন্তীমিহ ইরাবতীং পশ্যামি।’

সুতরাং, আপনাদের আর কি পরীক্ষা করিব ? আর সে যোগ্যতাও আমাদের নাই । আপনাদের স্ব স্ব ছাত্রের নৃত্যগীতাদির আলোচনা স্বারা আমরা আপনাদের গুরু-লাঘব বিবেচনা করিতে পারিব । তাহাই করুন । পরিব্রাজিকার বাক্যশ্রবণে রাজা মনে মনে পরম আনন্দিত হইলেন । আচার্য্যদ্বয় কৌশিকীর এই উক্তি প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিলেন । পরিব্রাজিকা বলিয়া দিলেন যে, অভিনয়ে অঙ্গসৌষ্ঠবদির সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি আবশ্যক, অথবা অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয় না, সুতরাং আপনাদের শিষ্যগণ যেন অধিক সাজ-সজ্জা করিয়া না আসেন । নেপথ্য-বাহুল্যে ‘অঙ্গহার’ উপলব্ধ হয় না । রাজাও এই কথায় সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন । পরিব্রাজিকার উদ্দেশ্য,—তাহার কাস্তিমতী মালবিকার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য একবার রাজাকে দেখাইয়া, তাহার অভিলষিত মালবিকা-পরিণয়-বিষয়ে অনুকূল করিবেন ! আর রাজার ত সম্মতি দিবারই কথা ।

কিয়ৎক্ষণ পরেই নৃত্য-শালায় মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল । সকলেই সেই দিকে চলিলেন । উৎকর্ষা-পূর্ণ-হৃদয় রাজা একটু দ্রুত-পদে যাঁহতেছিলেন, বিদূষক অমনি তাঁহাকে গোপনে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দ্রুত-গমনে রানীর সন্দেহ জন্মিতে পারে, ধীরে অঙ্গসর হওয়াই ঠিক । রানী ধারিণীর কিন্তু এই ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হয় নাই । তিনি প্রথমে হইতেই অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন । কি একটা যেন ঘোর ষড়যন্ত্রের আভাস তাঁহার নয়ন-পথে ভাসিতেছিল । অভিনয়-দর্শনে রাজার আগ্রহ দেখিয়া, তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে, আর্ধ্যপুত্র ! আজ আচার্য্যদ্বয়ের অভিযোগ নীমাংসায় আপনার যাদৃশ অনুরাগ, বেরূপ কৌশল-নৈপুণ্য দেখিতেছি, আহা ! রাজ-কার্য্যেও যদি আপনার এইরূপ অনুরাগ থাকিত, তবে কতই না সুন্দর হইত ! মৃদঙ্গ-ধ্বনি উদ্ভিত হইলে, যখন রাজা

২—মালবিকায়মিত্র, ১ম অঙ্ক, “দেবী । রাজানং বিলোকা । ‘যদি রাজ-কার্য্যেও
ঈদৃশী উপাধি-নিপুণতা আর্ধ্যপুত্রস্ত, তদা শোভনং ভবেৎ ।”

দেবীকে বলিলেন ‘দেবি! চল, অভিনয় দেখিতে যাই’, তখন দেবী, রাজার এই অভিনয়-দর্শনে, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন, কিন্তু উপায় নাই, রাজার আদেশ, স্বামীর আজ্ঞা, অবনতমস্তকে সাধ্বী ধারিণী পালন করিলেন। পরিত্রাজিকা আচার্য্যদ্বয়ের এই কলহবৃত্তান্ত অবগত হইয়াই, বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। রাজা মালবিকাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক, এ সমস্ত তাহারই অনুযোগী কারণ। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ধূর্ত বিদূষকের চক্রান্তেই আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে এই কলহ বাড়িয়াছে। তাই তিনি, যতদূর সাধ্য রাজার অভিপ্রায়-সাধনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। মালবিকা রাজার সঙ্গী হইবে, ইহা ত তাহারই আন্তরিক অভিলাষ। সম্রাসিনীর বেশে দেশে দেশে পর্যটন করিয়া, পরিশেষে বিদেশীর রাজ-সংসারে আসিয়া এই যে অবস্থান, আশ্রয়গোপন, চক্রান্ত,—এ সমস্তই ত মালবিকার জ্ঞাত। কিন্তু প্রতিভাবতী ধারিণীর সম্মুখে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, তাই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে না, তাই তিনি, উদাসীনভাবে, গ্রাম-বটারের জ্ঞাত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন আচার্য্যদ্বয় ইচ্ছাশ্বরে বিবাদ করিতে করিতে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা, বিদূষককে বলিয়াছিলেন, ‘সখ্যে! তোমার নীতিপাদপের গাণ্ড হয়, এই প্রথম কুসুমোদগম।’ চতুর বিদূষক প্রত্যুত্তরে অমনি বলিলেন, ‘ভয় নাই, এই সব ফুল, ফলও অচিরেই দেখিতে পাইবে।’ রাজা ও বিদূষক, এই দুইটি কথায় সমস্ত বাণপারটা একবারে খুলিয়া দিলেন। রসজ্ঞ সামাজিকগণ এই কলহরহস্ত বুঝিয়া লইলেন। ধারিণী পথন হইতেই বিরক্ত। তাহার বিরক্তির কারণ এই যে, এখনও সময় নাই, যে অস্ত্রে ইরাবতীর সুখতরঙ্গ মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে, সেই

১—মালবিকায়মিত্র, ১ম অঙ্ক। “রাজা। ‘সখ্যে! ত্বন্নীতিপাদপস্ত পুষ্পমুদগমঃ।’
বিদূষক। ‘ফলমপি ত্রক্ষসি।’”

অল্প এখনও সম্যক প্রকারে শাগিত হয় নাই । এখন—এত পূর্বাঙ্কে এই অস্ত্রের প্রয়োগ, হয়ত, বার্থও হইতে পারে, কিন্তু আর কিছুদিন পরে এ অস্ত্র অমোঘ হইবে । আর তার পর, তিনি পাটরাণী, তাঁহার সম্মুখে রাজার এতটা অবিনয়, রাজ-চিত্ত-বিনোদীদিগের এতটা ঝুটতা একান্ত অসহ্য । তিনি স্বয়ং যে কার্য্য কবিত্তে কৃত-নিশ্চয়া, অসহিষ্ণু রাজার তাহাতে বাঞ্ছিত প্রকাশ অনুচিত । এই প্রকার নানাকারণে, এই অভিনয়ে তাঁহার অমত । কিন্তু আর অমতে কি হইবে ? সকলেই নিজের নিজের মনোভাব গোপন করিয়া নৃত্যশালার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ।

গণদাস এবং হৃদয়—উভয়েই স্বাস্থ্য শিষ্যসহ উপস্থিত । চতুরহৃদয় পরিত্রাজিকা ব্যবস্থা করিলেন যে, মালবিকা-গুরু গণদাস হরদত্ত অপেক্ষ বয়োবৃদ্ধ, অতএব তাঁহার পরীক্ষাই অগ্রে কর্তব্য । অমনি গণদাস, তাঁহার শিষ্য মালবিকাকে নৃত্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন । অগ্রে মালবিকা, আর তাঁহার পশ্চাৎ আচার্য্য গণদাস । সম্মুখে রাজাসনে অগ্নিমিত্র উপবিষ্ট, তাঁহার বামপার্শ্বে রাণী ধারিণী, আর দক্ষিণ দিকে পরিত্রাজিকা ও বিদূষক । বালিকা মালবিকা ভীত-চিত্তে দাঁড়াইয় রহিলেন । মহাকবি কালিদাস, কি অপূর্ণ কোশলে, রাজা ও মালবিক উভয়কে উভয়ের সম্মুখীন করিলেন !

মালবিকা বহু পূর্ক হইতেই অগ্নিমিত্রের নাম শুনিয়াছেন, অগ্নিমিত্রের সহিত তাঁহার পরিণয়ের প্রস্তাব হইয়াছিল—একথাও শুনিয়াছিলেন । মনে মনে, অগ্নিমিত্রের কত অনন্ত রূপের কল্পনা করিয়াছিলেন । মালবিকা হিন্দুর ঘরের কন্যা, বিদর্ভের সর্বপ্রধান হিন্দুরাজার কন্যা । তাঁহার অস্ত্রকরণ সে দিন জানিয়াছিল যে, বিদিশাপতি অগ্নিমিত্র তাহার সঙ্কল্পিত আশ্রয়, তদবধি সে হৃদয় অগ্নিমিত্রের ধানেই মগ্ন । ঘটনাচক্রে রাজার কন্যা পথের ভিখারিণী হইয়া, সেই অগ্নিমিত্রেরই সংসা-

আমিরাছেন, অস্তঃপুরের কত আলেখ্যে তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়াছেন, কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, এ পর্য্যন্ত, সেই চিরপ্রার্থিত দেবতার বাস্তবমুখি সন্দর্শন করিতে পান নাই। আজ দেবতার কৃপায়, তাঁহারই সম্মুখে ছুঁখিনী মালবিকা উপস্থিত। মনের মধ্যে যাহার প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া কখনো পানেন দ্বারা, কখনো নয়নজলের দ্বারা পূজা করিতেন, আজ সেই বাঞ্ছিত দেবতা সম্মুখে বিদ্যমান, আর তাঁহারই সম্মুখে মালবিকা নৃত্য ও সঙ্গীত করিতে আহুত। তাই রাজকুমারী লজ্জায় এবং বালা-জন-স্বলত ভয়ে আকুল। তাঁহার উপর আবার, রাজার বিনি প্রণাম মহিষী, মালবিকা যাহার পরিচারিকা, সেই দেবী ধাত্রীগীর সম্মুখে, এবং পরিব্রাজিকার ও বিদূষকের সম্মুখে, আজ নৃত্য করিতে হইবে, গান করিতে হইবে, এতদিন মনে মনে যাহার গান অভ্যাস করিয়াছেন, আজ তাঁহারই সম্মুখে গাইতে হইবে, সুরগাং মালবিকার হৃদয়ের অবস্থা যে কীদূশ, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা বাইতে পারে। আজ নৃত্য-গীত করিতে হইবে বলিয়া মালবিকা যত আকুল,—তাঁহার মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে যে কথা লুক্কায়িত, পাছে সেই কথা আজ প্রকাশ হইয়া পড়ে, আর কেহ তাহা জানিতে পারে, তিনি—সেই আরাধ্য দেবতা পাছে দূর্গাক্ষরেও তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারেন, এই ভাবনায়, মালবিকা ওগোষিক আকুল। তাই তিনি, সভয়ে, সলজ্জভাবে পুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া নৃত্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া আছেন।

এ দিকে রাজা, অস্তঃপুরের আলেখ্যে যাহার প্রতিকৃতি দর্শন মাত্রেই, এবং বসুলক্ষীর মুখে ‘মালবিকা’ এই নামটি শ্রবণ মাত্রেই এক প্রকার উন্মত্ত হইয়াছিলেন, একবার মাত্র যাহার দর্শন-লাভের জন্ত, বিদূষকের দ্বারা এই এত কাণ্ড করাইয়াছেন, সেই লাবণ্য-তরঙ্গিণী প্রথম তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত, রাজা চিত্রে যাহার কাস্তির ছায়া মাত্র দেখিয়াছিলেন, তিনি সশরীরে উপস্থিত, রাজা অতৃপ্ত-নয়নে তাঁহাকে

দেখিতেছেন । অনিমেষনয়নে দেখিবার সাধ্য নাই, মহারাজী ধারিণীর সমক্ষে রাজার অত হুঃসাহস হয় না, তিনি দেখিতেছেন, অথচ না দেখার ভান করিতেছেন । সাধ্বী সহস্রাঙ্গীকে কোন্ পুরুষসিংহ ভয় না করেন ? রাজাও ভয়ে ভয়ে দেখিতেছেন । মালবিকার রঙ্গমঞ্চে প্রমোদ-মাত্রেই, রাজা এক নিমেষে, একবার তাঁহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন । তিনি বুঝিলেন যে, মালবিকার যে প্রতিকৃতি ইহার পূর্বে দেখিয়াছিলেন, তাহা কিছুই নহে, সে চিত্রের যিনি চিত্রকর, তাঁহার চিত্র-বিদ্যায় নৈপুণ্য নাট । রাজা ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলেন যে, মাধবসেন সহোদরকে লইয়া বিবাহ দিতে আসিবার কালে, পশ্চিমদে বিপন্ন হইয়াছিলেন । এই বালিকাই যে সেই মাধব-সহোদরা, তাহা রাজা জানিতেন না । জানিলে চমৎকারিতার হানি হইত । এই প্রথম সন্দর্শন এত সুন্দর হইত না । মালবিক জানিতেন, কিন্তু তিনি গোপন রাখিয়াছিলেন । আর প্রকাশ করিয়াঃ বা লাভ কি ? এ নিকরাক্ষর রাজপুত্রীকে কে তাঁহার বেদনার অংশ গ্রহণ করিবে ? তিনি এখন ভিখারিণী, তাঁহার এই রত্নলাভের বাসনা যত প্রচ্ছন্ন থাকে, ততই মঙ্গল । বাগনের চন্দ্র-স্পর্শের আশার ছায়া, তাঁহার এ দুঃশার কথা যে শুনিবে, সেই ত তাঁহাকে উপহাস করিবে । তাহা তিনি অতি গোপনে, মনের ভাব ননের মধ্যেই রাখিয়াছিলেন ।

নৃত্যমঞ্চে মালবিকার ভীতিবিহ্বল অবস্থা দর্শনে, প্রবীণ আচাৰ্য্য গণদাস বুঝিতে পারিলেন যে, বালিকার চিত্র-চাক্ষুশ্য ঘটিয়াছে, কোনও হৃদয়ে ভগ্ন-সঞ্চার হইয়াছে । তিনি অগনিই অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

“বৎসে ! মুক্ত-সাধবসা সম্ভব্ধা ভবা ।”

‘বৎসে ! ভয় পরিত্যাগ কর, স্থির হও, চিত্র-বিকলতা দূর কর । মালবিকা আচার্য্যের আদেশে চমকিয়া উঠিলেন । ভাবিলেন,—‘এ কি ?

‘আমার এমন হইল কেন ? আচার্য্যের সম্মুখে, পাটরাণীর সম্মুখে, পণ্ডিত কোশিকীর সম্মুখে আমার এ বিচলিত ভাব কি ভাল ?’ তিনি তৎক্ষণাৎ হৃদয় স্থির করিয়া, নৃত্য এবং সঙ্গীত করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন । মুহূর্ত্ত পূর্বে যে মুখচ্ছবি ছিল, সহসা তাহার পরিবর্তন হইল । আর কেহ তাহা বড় না দেখিলেও রাজা কিন্তু দেখিলেন ।

কালিদাস, এই স্থলে, এক নূতন প্রণালীতে পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন । প্রথমে মালবিকা নর্ত্তিকার বেশে রঙ্গমঞ্চে আসিলেন, আসিয়াই ভয়ে, লজ্জায় যেন বিবর্ণ-কান্তি হইয়া গেলেন ; পরক্ষণেই আবার আচার্য্যের কথায় নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া, যেন একটু দৃঢ়তার সহিত, মেঘ দর্শনে উন্নত-গ্রীবা নয়রীর ছায়, দাড়াইয়া রহিলেন । অতি অল্পকালের মধ্যে, তাহার এই সকল ভাবান্তর ঘটিল । রাজা একটি একটি করিয়া মালবিকার সে ভাব-শবলতা দেখিতে লাগিলেন । তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তাহার উপর আবার যেমন তরঙ্গ আসে, তদ্রূপ সেই সময়ে, মালবিকার ক্ষণে ক্ষণে, সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য, তাহার উপর আবার যে সৌন্দর্য্য আসিতেছিল, রাজা নিজ মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন ।

সকলেই নীরব । আচার্য্যের আদেশ-মতে, মালবিকা নৃত্যের সহিত গান আরম্ভ করিলেন—

দুর্লভঃ প্রিয়স্তুম্বিন্ ভব হৃদয় । নিরাশম্ ।

অহো অপাঙ্গকো মে পরিস্ফুরতি কিমপি বামকম্ ।

এষ স চিরদৃষ্টঃ কথমুপনেতবাঃ ।

নাথ ! মাং পরাধীনাং স্থয়ি গণয় সতৃষণাম্ ¹ ॥

১—মালবিকায়িনিভ্য, ২য় অঙ্ক ।—হৃদয় ! তোমার সে প্রিয়বস্তু একান্ত দুর্লভ, তবে কেন আর বুঝা আশা ? হায়, আমার বাম অপাঙ্গ কেন বার বার স্পন্দিত হইতেছে । চির-স্থখিনী আমি, আমার আবার সৌভাগ্য-সম্ভাবনা কোথায় ?

যে স্থানে যে রসের অভিব্যক্তি হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ করিয়া, অথবা তদপেক্ষাও যেন অধিকতর রসাভিব্যক্তি করিয়া, মালবিকা মধুর-কণ্ঠে এই গান গাহিলেন । চিত্রাৰ্পিতের ছায়, অরবিন্দ-নিবিষ্ট ভ্রমর-পঙ্ক্তির ছায়, সকলে নিম্পন্দভাবে, তাঁহার এই গান শুনিঙ্লন, এবং অভিনয় দর্শন করিলেন । গানের এমনই পদ-বিত্তাস যে, ইহার প্রথম চরণে মালবিকার হৃদয়ের বৈরাগ্য, বাস্তিত-লাভে নৈরাশ্র ; দ্বিতীয়ে আবার ঔৎসুক্য, যাহাকে পাইব না, তাহাকেই পাইবার জন্ত আকাঙ্ক্ষা ; তৃতীয়ে সঙ্কল্প, এতদিন যাহার আশাপথ চাডিয়া আছেন, আজ তাঁহাকে পাইয়াছেন, কি করিলে তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবেন, কি করিলে সেই চির-প্রার্থিতের দাসী হইতে পারিবেন, এই বাসনা ; আর চতুর্থে আত্ম-সমর্পণ, তাঁহারই চরণে, সেই আরাধ্য দেবতার চরণে আত্মোৎসর্গ, —মালবিকা পরাদীন, রাজার নন্দিনী ইষ্টাও পরিচারিকা, নিজের উপর তাঁহার কোনই কণ্ঠ নাই, যাহাকে চিরকাল অনিনেয-নয়নে নিরীক্ষণ করিলেও নয়নের তৃপ্তি জন্মে না, সেই অতৃপ্ত-দর্শন আজ সম্মুখে, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া দেখিবার পর্য্যন্ত সানর্গা নাই,—কি করিয়া তোমাকে দেখিব ? আমি পরাদীন, তোমার দাসী-পদ-কাজ্জিকী,—এই প্রকার আত্ম-সমর্পণ । গানের চরণচতুষ্টয়ে, এইভাবে, যথাক্রমে, বৈরাগ্য, ঔৎসুক্য, সঙ্কল্প ও আত্ম-সমর্পণ—এই চারিট ভাব সুপরিষ্কৃত ।

রাজা অনন্ত-মনে মালবিকার নৃত্যগীতাদি অমুভব করিলেন । পূর্বে—মালবিকার রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশের সময়ে, যে প্রতিমার দর্শন করিয়াছিলেন, রাজা, এতক্ষণে, তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাইলেন । বিদূষক টীকা করিয়া আবার, সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্তরূপী সঙ্গীতটি বুঝাইয়া দিলেন ।

১—মালবিকায়িনিভ্য ২য় অঙ্ক । বিদূষক । জনান্তিক্য । ‘চতুর্পদং বস্তু দ্বারীকৃত্য
দ্বায় উপস্থাপিত ইব আত্মা অত্মভবত্যা ।’

রাজা বুঝিলেন, কিন্তু, ধারিণীর ‘সন্নিকর্ষ’-হেতু, বুঝিয়াও যেন বুঝেন নাট, এইরূপ ভান করিলেন।

গান সমাপ্ত হইলেই মালবিকা গমনোদ্যত হইলেন। তাঁহার দেহটা লঘুবোধ হইল। মনের কথাগুলি বাহির করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের একটা গুরুভার যেন কমিয়া গিয়াছে। ক্ষণকালের জন্ত একটা ইর্ষের আভাস তাঁহার মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার,—যাহার কাছে হৃদয়ের কবচ খুলিয়াছেন, তিনি সে দিকে চাহিলেন কি না? কার্যটা সম্ভব হইল কি না? বাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, শত চেষ্টাতেও আর বাহা করিবে না, সে কার্যের পরিণামই বা কিরূপ লাভাইবে? গান ত আরও অনেক ছিল, ‘চতুস্পদ ছলিক’ ত তিনি আরও অনেক জানিতেন, তবে সে গুলি না গাইয়া কেন এ দুঃসাহসের কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন? ইহা দুঃখিনী মালবিকার পক্ষে ভাল হইল না মন্দ হইল?—এইরূপ চিন্তায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে, উৎকর্ষামিশ্রিত একটা ভয়ের উদয় হইল। তিনি একটু অবাক হইলেন। চিত্তে একটা আন্দোলন চলিতে লাগিল। মালবিকা সেই আন্দোলিত হৃদয়ে প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। আর অবস্থানই বা কেন? যাহার জন্ত এই দীর্ঘকাল তপস্বী, সেই বিদর্ভের রাজধানী পরিত্যাগ, গহনবনে দম্ভাহস্তে লাজ্জনা, যাহার জন্ত অহর্নিশ অশ্রু-বিসর্জজন, পরিচারিকা-বৃত্তি-স্বীকার ও এক প্রকার কারাগার-বন্ধন, তাঁহার দর্শনলাভ হইয়াছে, তাঁহাকে মনের বেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাঁহার চরণে তাঁহারই জ্ঞাতসারে আত্মোৎসর্গ হইয়াছে, তবে আর অবশিষ্ট রহিল কি? কিসের জন্ত

১—ঐ। রাজা, জনান্তিক্য।

‘জনমিসমস্তুরন্তং তিদ্ধি নাপেতি গয়ে, বচনমভিনয়ন্তা স্বাক্ষ-নির্দেশ-পূর্বকম্।

প্রণয়-গতিমদৃষ্টা ধারিণী-সন্নিকর্ষাৎ অহমিব হুকুমার-প্রার্থনা-বাজমুক্তঃ।’

আর বিলম্ব ? মালবিকা তাই ধীরে চরণ উত্তোলন করিলেন । রাজা দেখিয়াছেন, সেই প্রথমে, প্রবেশ সময়ে একবার মালবিকার শাস্ত-মূর্তি দেখিয়াছেন, তার পর সঙ্গীতকালে তাঁহার নৈরাশ্রময়ী, উৎকণ্ঠাময়ী, সঙ্কল্পময়ী মুখচ্ছবি দেখিয়াছেন, আর তাঁহার—‘আমি পরাধীন, তোমার গাঙ্গী-পদ-কাজ্জিকী’ বলিয়া মালবিকা যখন সঙ্গীত-শেষের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার আত্মোৎসর্গরূপ মহাব্রতেরও উদ্‌যাপন করেন,—তখনকার সেই কাতরমুখচ্ছবিও রাজা দেখিয়াছেন । এ সমস্তই মালবিকার বিষাদময়ী মুখচ্ছবি । কিন্তু সে মুখের হাস্য দেখেন নাই, সে শারদগগনে চক্ৰমার উদয় দর্শন করেন নাই । বিষাদে যে সে মুখ কত সুন্দর, তাহা রাজা দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু মুহূ-মন্দ হাস্তে যে, সে মুখ কত সুন্দরতর, তাহা অগ্নিমিত্র দেখেন নাই, তাই কবি এবার রাজাকে সে সৌন্দর্য্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । যেমন মালবিকা প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন, অমনি রাজ-বরশ্রু বিদূষক ব্রাহ্মণ, গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, ‘দাঁড়াও মালবিকে । তুমি একটা বিশেষ অলুষ্ঠান বিস্মৃত হইয়াছ, সে সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ।’ মালবিকার আচার্য্য গণদাসও তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ‘বৎসে ! একটু দাঁড়াও, পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, পরীক্ষায় অগ্রে উত্তীর্ণ হও, পরে গমন করিও ।’ মালবিকা নিবৃত্ত হইয়া, প্রস্তুত-প্রতিমার মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইলেন ।

পূর্বে—সেই রঙ্গক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়া, মালবিকা আসিয়া এমনই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, আবার এখনও দাঁড়াইলেন । রাজাকে প্রদর্শন করাই যদি কবির উদ্দেশ্য হয়, তবে ছুইবার একই প্রকারের অলুষ্ঠান কেন ?—মালবিকার স্থির হইয়া দাঁড়ানো ছুইবার এক রকম বটে, কিন্তু মালবিকা এক বুকম নহেন । পূর্বের মালবিকা,—যখন রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু একটি কথাও বলেন নাই, বা হৃদয়ের একটি তপ্ত নিশ্বাসও বাহির হইতে দেন নাই, তখনকার মালবিকা,

আর, এখনকার মালবিকা,—এতদিন নিৰ্জ্জনে বসিয়া যে গান রচনা করিয়াছেন, বাঁহার জন্ত রচনা করিয়াছেন, আজ তাঁহারই সম্মুখে সেই গান নিজে গাহিয়াছেন, মনের মধ্যে বাঁহা গুপ্ত ছিল, জগতের কেহই জানিত না, আজ সেই চিরসঞ্চিত, চিরনিগূঢ় বাসনা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং এখনকার মালবিকা এতদুভয়ে অনেক প্রভেদ ।

বসন্তের প্রারম্ভে সম্ভাবিতমুকুল লতিকা আর পরিণত বসন্তের বিকশিত-কুসুমা লতিকায় যেমন প্রভেদ, পূর্বের মালবিকা আর এখনকার মালবিকায় তেমনই প্রভেদ । সৌন্দর্য্য-দর্শন-পটু কালিদাস, মানব-হৃদয়ের সমস্ত স্তরগুলি যেন দিবা-চক্ষে দেখিতে পাইতেন । মালবিকার মুগ্ধ হৃদয়ের স্তরনিচয়, তাই একটি একটি করিয়া খুলিয়া খুলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিলেন । রাজা দেখিলেন, একবার পূর্বে প্রবেশকালে দেখিয়াছেন, তার পর নৃত্যকালে দেখিয়াছেন, আবার এখন দেখিলেন । আনন্দ-মুখী মালবিকার এইবারকার সৌন্দর্য্যে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন । তিনি দেখিলেন, পূর্বেরকার ছুঁবারের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা এবারকার সৌন্দর্য্য আরও অধিক ।

ধারিণীর ইহা ভাল লাগিল না । পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে । আর বিলম্ব কেন ? মালবিকার এখানে আর থাকিবার প্রয়োজন কি ? তিনি গণদাসকে ইঙ্গিতে বলিলেন—‘মালবিকাকে পাঠাইয়া দাও ।’ গণদাস দেবীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । বিদূষকের প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে, তিনি, মালবিকাকে যাইতে দিলেন না । প্রত্যুত তিনি, অতি বিরক্তির সহিত বিদূষককে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গৌতম ! কি ক্রটি হইয়াছে ! আমার শিষ্যার নৃত্য গীতের কোন্ অংশে তুমি দোষ দেখিলে, প্রকাশ করিয়া বল । বিদূষক ব্রাহ্মণ, অমনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘আচার্য্য ! প্রথম উপদেশ প্রদর্শন-কালে, ব্রাহ্মণের পূজা দিতে হয়, আপনারা সেই প্রধান দৈবকার্য্যই বিস্মৃত হইয়াছেন ।’

বিদূষকের উজ্জ্বলিত সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন । পুরোবর্তিনী মালবিকাও মন্দ মন্দ হাসিতে লাগিলেন । রাজা তাহা দেখিলেন ‘আয়তাক্ষী’ মালবিকার সেই ‘কিঞ্চিদভিব্যক্ত-দর্শন শোভি’, ‘অসমগ্রলক্ষ্য-কেশর’, ‘উচ্ছৃমিত পঙ্কজবৎ’ সুন্দর মুখখানি রাজা দেখিতে লাগিলেন । এ আর এক নূতন রূপ । মালবিকার এ রূপ, রাজা, পূর্বে আর দেখেন নাই । পরিত্রাজিকা বলিলেন, ‘বেশ হইয়াছে, শিষ্যা অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছে ।’ চতুর বিদূষক অমনি বলিয়া উঠিল, ‘তবে কিছু পারিতোষিক দেওয়া বিসেয়, অথবা ইহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন হইবে কেন ?’ এত বলিয়াই, সে রাজার হস্তস্থিত সুবর্ণবলয় নোচন করিতে উদ্যত হইল । পারিণী এতক্ষণও কোনমতে, এই সব কাণ্ড কারখানা সহ্য করিতেছিলেন । কিন্তু এবার তাঁহার অসহ্য হইল । তিনি ঈষৎ ক্রোধের সহিত কহিলেন, ‘গৌতম ! বিরত হও, অথ কোন গুণ না জানিয়া, কেবল একটু অভিনয় দর্শন করিয়াই, কেন তুমি মালবিকাকে রাজ্যভরণ অর্পণ করিতে নাহি তেছ ?’ বিদূষক ঠকিবার পাত্র নহে । সেও অমনি বলিল, ‘দেবি ! পরের জিনিষ বলিয়াই দিতে যাঁহি তেছি, নিজের হইলে কি আর দিগাম্ ?’ মালবিকার মুখে এই কথায়, আবার হাসির রেখা ফুটিল । পারিণী তখন বিদিশার অমোক্ষরী কণ্ঠে কহিলেন, ‘গণদাস ! আপনার শিষ্যের পরীক্ষা এখনও কি শেষ হয় নাই ?’ গণদাস কোন উত্তর না দিয়া, মালবিকাকে লইয়া দীর্ঘে ধীরে অবতরণ করিয়া চলিয়া গেলেন । বিদূষকও রাজার কাছে কাণে বলিল ‘সখে ! আমার যতটুকু সাধা, তাহা করিলাম, এখন তোমার ভাগ্য !’

১—মালবিকায়িমিত্র, ২য় অঙ্ক । রাজা । আশ্চর্য্যতম । ‘আভ্য-সারশচক্ষুয়া স্ববিষয়ঃ ।’

সদমেন অয়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্ত-দর্শন-শোভি মুগ্ধ ।

অসমগ্র-লক্ষ্য-কেশরঃ উচ্ছৃমদিব পঙ্কজঃ দৃষ্টম্ ॥’

২—মালবিকায়িমিত্র, ২য় অঙ্ক । বিদূষক । জনান্তিক্য । রাজানং বিলোক-
‘এতাবান্ এব মে মতি-বিস্তবঃ ভবন্তঃ সেবিতুম্ ।’

হরদত্ত এতক্ষণ, নীরবে, গণদাস-শিষ্যার অভিনয় দেখিতেছিলেন । কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্যে যে আবার কি অভিনয় হইয়া গেল, শাস্ত্র-জ্ঞান-মগ্ন বুদ্ধ আচার্য্য তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । যেমন অভিনয় শেষ হইল, অগ্নিনি, হরদত্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন ‘মহারাজ ! এইক্ষণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার শিষ্য-কৃত অভিনয় দর্শন করুন ।’ রাজা তচ্ছবণে মগ্ন মনে বলিতে লাগিলেন, ‘আর কেন ? যে জগৎ অভিনয় দর্শন, তাহা ত হইয়াছে, তবে আর বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি ?’ কিন্তু-নিরপেক্ষতা ফেঁদার জগৎ প্রকাশে বলিলেন, ‘হরদত্ত ! তোমার প্রয়োগ-দর্শনের নিমিত্ত আমরা সকলেই একান্ত পয়াৎসুক’ । দেখিব বই কি ?’ এমন সময়ে, বৈতালিকগণ, মধ্যাহ্নকালোচিত সঙ্গীতের দ্বারা নরপতিকে শোনাহারের সময় উদ্বোধিত করিয়া দিল । সকলেরই চমক ভাঙ্গিল । বেলা অধিক হইয়াছে, সভা ভঙ্গ হইল । সকলে স্ব স্ব কক্ষাভিমুখে বাত্ৰা করিলেন ।

১—ঐ এ । রাজা । আত্ম-গতম্ । ‘অবসিতে, দর্শনার্থঃ ।’ প্রকাশঃ । দক্ষিণ-মবলম্বা । ‘হরদত্ত । পয়াৎসুকঃ এব বয়ম্ ।’

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

উপবনে মালবিকা ।

মালবিকা, আশা এবং নৈরাশ্র, উভয়ের অধীন হইয়া, আচার্য্যগৃহে সুদীর্ঘ দিনযামিনী কোনমতে অতিবাহিত করিতেছেন । নব বসন্তের আবির্ভাবে উৎসবময়ী বিদিশা-নগরীর সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে । নগরের উপবন সমূহ কুসুমাত্রণে সুসজ্জিত । নাগরিকগণের হৃদয়ের সহিত, উপবন-রাজিও যেন আনন্দে পরিপূর্ণ । নগরের মধ্যে রাজার যেমন উদ্যান, রাণী ধারিণীরও তেমনই এক মনোহর উদ্যান আছে মহারাণী স্বয়ং সেই উদ্যান-বাটিকার তত্ত্বাবধান করেন । বালপাদপে জল-সেচন করেন । উদ্যানের উপর তাঁহার এতই যত্ন । বসন্তের সমাগমে, সকল বাসন্তী তরু-লতিকাষ্ট কুসুমের সাজ-সজ্জা পরিয়াছে । বসন্ত-তরুর এক প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে প্রথমে কুসুমোদগম হয়, পরে তাহার নূতন পল্লব জন্মে । অত্ৰ ঋতুর তরুতে অগ্রে পল্লব, পরে কুসুম জন্মে । বসন্তের এই বিশেষ ধর্ম্মে সকল তরুই কুসুমশুভ্রে সুশোভিত । কিন্তু মহারাণীর বড় আদরের এক অশোকবৃক্ষে ফুল ফুটে নাই । তিনি তজ্জন্তু অত্যন্ত দুঃখিত । প্রসিদ্ধি আছে, সাধবী প্রমদার চরণস্পর্শে অশোকের ফুল ফুটিয়া থাকে । ধারিণীর প্রিয় অশোক-তরু সেই প্রমদার পাদাঘাতরূপ দোহদ করিলে, হয়ত, তাহাতেও ফুল ফুটিতে পারে । কিন্তু ধারিণীর সে সামর্থ্য নাই । চঞ্চল বিদুষক, সে দিন দোলাধিরোহণ কালে, ধারিণীকে ‘দোলা-পরি-ভ্রষ্ট’ করিয়াছিল, তাই তাঁহার চরণ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত । সুতরাং তাঁহার দ্বারা দোহদানুষ্ঠান অসম্ভব । ধারিণী, সত্য সত্যই, মালবিকাকে বড় ভালবাসিতেন । মালবিকার নির্ম্মল-চরিত্রে তিনি একান্ত বিমুগ্ধ ছিলেন । মালবিকার উপর তাঁহার অপর্য্যাপ্ত বিশ্বাস ছিল । তিনি মালবিকাকেই, তাঁহার প্রতিনিধি

করিয়া, দোহদ করিতে পাঠাইয়াছেন। মালবিকা একাকিনী, প্রাসাদের উপকণ্ঠবর্তিনী সেই বসন্তরমণীয়া উদ্যান-বাটিকায় আসিয়াছেন। উদ্যানে আসার পর হইতেই, রাজকুমারীর অস্বঃকরণের যাতনা অতিশয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদিন, আচার্য্য-গৃহে, জন-সমক্ষে, প্রাণ ভরিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসও ছাড়িতে পারেন নাই। সতত সভয়ে অতি কষ্টের সহিত ঝাল কাটাইয়াছেন। আজ নির্জ্জন স্থান পাইয়াছেন। উপবনের সর্বত্র বসন্তের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যামৃত ক্ষরিত হইতেছে। যে দিকে দৃষ্টি-নিষ্ক্ষেপ কর, সে দিক হইতে নয়ন আর ফিরাইতে পারিবে না। এমন সুন্দর উদ্যানের মধ্যে মালবিকা, বন-দেবতার স্থায়, ধীরে ধীরে উপনীত হইয়াছেন। আজ উদ্যানের সমস্তই স্নিগ্ধ, সমস্তই আনন্দময়, কিন্তু সেই উদ্যান-বর্তিনী হুঃখিনী মালবিকার হৃদয় নিরানন্দ! তিনি সে দিন, রাজার দগ্ধুখে, যে আত্ম-নিবেদন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা, তদবধি সর্বদাট, তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। রাজা তাহাতে কি ভাবিলেন, কি করিলেন, কৈ! এত দিনেও ত তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না! গাই একান্ত কাতর-চিত্তে, মালবিকা নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,—

‘কেন এত হুঃসাহস করিলাম? কেন আমি ‘অবিজ্ঞাত-হৃদয়’ নরপতিকে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেখাইলাম? কেন এমন আত্ম-বিমুঢ় হইলাম? বাল্য-জন-সুন্দর লজ্জাবরণ উন্মোচন করিয়া, কেন আমার হৃদয়ের গুপ্তধন বিসর্জন দিলাম? সে দিন যে গান গাইয়াছিলাম, আজ তাহা ভাবিতেও লজ্জা হয়। স্নেহময়ী সখীর নিকটে যে মনের বেদনার কারণ জানাইব, এমন সামর্থ্যও আমার নাই। জানি না, বধাতা কতদিন আমাকে, এই প্রকারে সন্দেহের সূচি-শয্যায় ফেলিয়া রাখিবেন?’

মালবিকা এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এতট বিমনায়মানা হইয়াছিলেন যে, তিনি কি জন্ত উদ্যান-বাটিকায় আসিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি নিজে নিজেই বলিতেছেন,

‘আমি কোথায় বাইতেছি ? কেন বাইতেছি ?’—এমন সময়ে তাঁহার মনে পড়িল । অমনি বলিতে লাগিলেন—“দেবী ধারিণী আমাকে বলিয়াছিলেন, মালবিকে ! আমি ‘তপনীয়’ অশোকের দোহর্দ করিতে পারিব না, তুমি যাও, দোহদ কর গিয়া । যদি ‘পঞ্চ-রাত্রি-মধ্যে,’ অশোক রক্ষে কুম্ভমোক্ষম হয়, তাহা হইলে”—বলিতে বলিতে মালবিকার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল,—‘তাহা হইলে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব’—‘আমার অভিলাষ ?’—মালবিকার অভিলাষ মালবিকাষ্ট জানেন, অতঃ তাহা জ্ঞাত নহে, সে অভিলাষ অপূরণীয় । তাই মালবিকার দীর্ঘ নিশ্বাস, তাই ‘আমার অভিলাষ’ বলিতে বলিতেই মালবিকার কণ্ঠরোগ এই ভাবে, সেই বিজন উপবনে, মালবিকা একা একা নিজের সুখ দুঃখের স্বপ্নের আলোচনা করিতেছেন । মালবিকার এ অবস্থা রাজা না দেখিলে কে দেখিবে ? তাই কালিদাস, সেই নির্জন উপবন-মণ্ডে রাজাকে পূর্বেই প্রবেশ করাইয়াছেন ।

আজ মালবিকা দোহদ করিতে আসিবেন, এ কথা, ধৃত্বি বিদুষক পূর্বে হইতেই জানিত, তাই সে পূর্বে হইতেই রাজাকে লইয়া উদ্যানে এক লতাগৃহে আসিয়া প্রচ্ছন্ন ছিল । মালবিকা বনমধ্যে একাকিনী উপস্থিত, অদূরে রাজা, তিনি যে মালবিকাকে দেখিতেছেন, তাহা কল্পণপদাবলী শুনিতেছেন, মালবিকা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন না। রাজা, সেই একদিন, নৃত্যক্ষেত্রে মালবিকাকে দেখিয়াছিলেন, ধারিণীর সমক্ষে সে দর্শন অদর্শন-তুলা । আজ জন-সংঘা-বিহীন উদ্যানে রাজা নিঃসঙ্কোচে মালবিকাকে দেখিতেছেন । সে এত মালবিকা, আজ, এ আর এক মালবিকা । অদ্যকার মালবিকা সে উল্লাস নাহি, সে উৎসাহ নাহি ; অদ্যকার মালবিকা ‘শর-কাণ্ড-পাণ্ড-গণ্ডস্থলা,’ ‘পরিমিতাভরণা’ ; অদ্যকার মালবিকা বসন্তের ‘পরিণত-পত্র’ ‘কতিপয়-কুম্ভমা’ ‘কুন্দ-লতিকার’ ভায় মলিন-কান্তি । ধীরে ধীরে পাদ-চা

করিতে করিতে আসিয়া, মালবিকা সেই প্রতিবন্ধ-প্রস্থান অশোকের
 ছায়া-শীতল তলদেশে একখানি শিলাফলকে উপবেশন করিলেন । সমস্ত
 এক কুসুম মণ্ডনে বিমণ্ডিত, কেবল এই অশোক কুসুম-শীর্ষ, বিষম,
 তাই বুঝি কবি, বিষম তরুর তলে বিষম-হৃদয়া রাজকুমারিকে লইয়া
 আসিলেন । মালবিকার উৎকর্ষার সীমা নাই, তিনি এক এক বার
 'এখনও মনকে প্রবোধ দিবার প্রয়াস করিতেছেন । কখনো বলিতেছেন—
 'হৃদয় ! বিরত হও, কখনো বলিতেছেন 'দীন তুমি, কেন তোমার এ
 উচ্চাভিলাষ, কেন আমাকে আর যাতনা দাও ?' রাজা 'লতাস্তরিত'
 হইয়া এ সমস্তই শুনিতেছেন । এমন সন্মুখে মালবিকার সখী বকুলা-
 বলিকা অলঙ্কার এবং অলঙ্কৃত লইয়া মালবিকাকে বিভূষিত করিতে
 গিয়া উপস্থিত হইল । মালবিকা আদর করিয়া, তাহাকে নিকটে
 বসাইলেন । সে যখন মালবিকার চরণে অলঙ্কৃত এবং নুপুর পরাইতে
 চাহিল, তখন, দুঃখিনী রাজ-কন্যা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে,
 আজ আমার জীবন-মরণের সন্ধিস্থল । যদি অশোক কুসুমিত হয়,
 তবে এ অলঙ্কার-ধারণ সার্থক হইবে, অভিলাষ পূর্ণ হইবে । অত্যা-
 হাট্ট আমার 'মৃত্যু-মণ্ডন', এই অলঙ্কার পরিয়াই প্রাণত্যাগ করিব ।
 বকুলাবলিকা মালবিকাচরণে অলঙ্কৃত-রাগ করিতেছেন, আর অদূরে
 নগ-পিহিত রাজা তাহা দেখিতেছেন । মালবিকা ও বকুলাবলিকা
 দুই জনে, সেই বিজ্ঞান উদ্যানে কত কথা কহিলেন, হৃদয়ের কত গুপ্ত
 কথা ব্যক্ত করিলেন । মালবিকার অভিলাষ-পূরণে যথাসাধ্য সাহায্যতা
 করিতে বকুলাবলিকা প্রতিশ্রুত হইল । চতুর বিদুষক বহুপূর্ব হইতেই
 মালবিকার এই পরম বিশ্বস্ত সখীটিকে অনুকূল করিয়া লইয়াছিল ।
 মালবিকা যখন বকুলাবলিকার হাত দুইখানি ধরিয়া, সজল-নয়নে
 বলিলেন, 'সখি ! আমার এই ঘোর বিপদে, যতটুকু পারিস, তুই
 আমার সাহায্যতা করিস,' তখন সে বলিল, 'মালবিকে ! তুমি জান

না, বকুলের মালা যত বিমর্দ করিবে, তাহার সৌরভ ততই বাড়িবে। আমি বকুলাবলিকা, আমাকে যত কঠিন কার্যো নিযুক্ত করিবে, আমার ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাইবে।’ বকুলাবলিকা এই একটি কথাতেই মালবিকার প্রাণটি নিজের হাতের মধ্যে করিয়া লইল। তার পর, ‘নিমেষে নিমেষে, যে দিকে ঈচ্ছা, সেট দিকে বকুলাবলিকা সে প্রাণ ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিল। রাজা অন্তরালে থাকিয়া, সে সব দেখিতে লাগিলেন, শুনিতে লাগিলেন। বকুলাবলিকা রাজকুমারীকে লতার বলয়ে, পল্লবের অবতংসে, সাজাইল। নিসর্গসুন্দরী কুমারী বন-কুসুম-পল্লবে সজ্জিত হইয়া বনদেবীর স্থায় দাঁড়াইয়া যখন অশোকের গায়ে পাদপ্রহার করিলেন, তখন তাঁহার নৃপনারাবে সমস্ত উদ্যান-বাটিকা মুখরিত হইয়া উঠিল। পদাঘাত করিয়া, মালবিকা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়, অবসর বুঝিয়া, বিদুষককে লইয়া, রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন।

এদিকে, ইরাবতী তাহার পরিচারিকা নিপুণিকার সহিত রাজাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই বৃক্ষবাটিকায় আসিয়াছেন, অনেকক্ষণ যাবৎ, তিনি, দূর হইতে, মালবিকা ও বকুলাবলিকার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন প্রধান মহিষীর উদ্যানে পরিচারিকা মালবিকা সজ্জিতদেহে কাহার অপেক্ষা করিতেছে?—ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বকুলাবলিকার সহিত, যখন অগ্নিমিত্রের সম্বন্ধে মালবিকার কত কথা হইতেছিল, তখন, নিপুণিকা, একটি একটি করিয়া সে সব কথা, অভিমানিনী ইরাবতীকে বুঝাইয়া দিতেছিল। মালবিকা ও বকুলাবলিকার গুপ্ত মন্ত্রণা-শ্রবণে ইরাবতীর হৃদয় দন্ধ হইতেছিল। ক্রোধে দেহ কম্পিত হইতেছিল। এমন সময়ে আবার স্বয়ং রাজা তথায় প্রবেশ করিলেন। নিপুণিকা দেখাইলেন,—‘ঐ রাজা’। ইরাবতী দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় শতথণ্ডে যেন চূর্ণবিচূর্ণ হইল। ইরাবতী বৃক্ষান্তরিত হইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

সহসা রাজার উপস্থিতিতে মালবিকার বড়ই ভয় হইল। বিশেষতঃ বিদুষক যখন বলিল, ‘তুমি পরিচারিকা হইয়া কেন মহারাজের অশোক বৃক্ষে বাম চরণাঘাত করিলে?’—তখন, সত্য সত্যই মুগ্ধা মালবিকা একান্ত অপতিত এবং ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রাজা অনেক কথা कहিলেন, কিন্তু মালবিকা নির্বাক্। রাণী ইরাবতী ক্রোধোত্তোলিত-কণা বিষধরীর ভ্রায়, ঐরাব উন্নত করিয়া, তাঁহার অবিনীত রাজার ব্যবহার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত অসহ্য হইল। রাজা যখন বলিলেন, ‘অশোক কুসুম-হীন ছিল, তাহার দোহদ করিলে, কুসুমোদগম হইবে। আমারও ত অভিলাষ-কুসুম অপ্ৰস্তুতি, মালবিকে! আমার কি দোহদ হইবে না?’ গর্জিতা ইরাবতী তখন আর আশ্র-গোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সম্মুখে, সহসা, দৃপ্ত সিংহীর ভ্রায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, ‘হইবে বৈ কি? তোমার দোহদ অবশ্য পূর্ণ হইবে। অশোকের দোহদ তাহাতে মাত্র ফুল ফুটিবে, তোমার দোহদে, মহারাজ! তোমাতে ফুল ও ফল দুইই হইবে, ছি ছি !!’—

সকলেই অপ্রস্তুত হইলেন। বকুলাবলিকা কম্পিতাঙ্গী মালবিকার হস্তধারণপূর্বক, ত্বরিত-চরণে চলিয়া গেল। রাজা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া, মুঢ়-নয়নে ইরাবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইরাবতী কম্পিত-কণ্ঠে कहিলেন, “হায়! ‘বান্ধগীতা—রক্তা হরিণীর ভ্রায়, আমি এত দিন তোমার চাটুবাচনে আশ্রবিস্মৃত ছিলাম, তুমি আমায় বঞ্চনা করিয়াছ, আমি বুঝিতে পারি নাই। তুমি বিদিশার অধিপতি, তোমার যে এতাদৃশ বিনোদ বস্ত্র লাভ হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না; জানিলে কি আর আমি হত-ভাগিনী তোমার অশেষে এস্থলে আসিতাম?”

মালবিকা পরিচারিকা, তাই ইরাবতী ‘এতাদৃশ বিনোদ বস্ত্র’ বলিয়া রাজাকে শ্লেষ করিলেন। কিন্তু বিদুষকের ইহা সহ্য হইল না। সে অমনিহঁ বলিয়া বলিল ‘রাজি! পরিচারিকার সহিত সরলভাবে কথাবার্তা

যে কোন দোষ নাই, তুমিই ত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—আজ ইরাবতী রাণী, কিন্তু একদিন তিনিও মালবিকার ছায় পরিচারিকা ছিলেন।

বিদূষকের এই ভীষণ উক্তিতে ইরাবতীর আরও ব্যথা লাগিল। ‘বেশ ত, তবে কথাবার্তাট চলুক’ বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। ‘না, তুমি অবিস্থাগী’ বলিয়া যেমন ইরাবতী ক্ষিপ্ত চরণে ছুটিয়া চলিলেন, অমন তাহার তৈনী মেথলা আলিষ্ট হইয়া চরণে বিজড়িত হইল। পোষকদারিণী ইরাবতী গমনের বিলম্বের এই দশনা হাতে লইয়া, পশ্চাদ্ বাৎসান বিদিশেষ্মদকে হাড়না করিতে গেলেন। রাজা আরও অনুনয় করিলেন। ইরাবতীর তখন মনে একটু চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, ‘কেন আমার আর অপরাধিনী কর ? আমার কাছে তোমার কি অত অনুনয় শোভা পায় ? আমি বি মালবিকা ?’—এই বলিয়াই সখীর হস্ত-ধারণ পূর্বক, তিনি ওরফিন কেশদ্বিগীর ছায়, দম্ভের সতিত চরণে গেলেন। রাজা কুপিতা ইরাবতীর চরণে পতিত হইয়াছিলেন, সে চরণ-পাত বাধ হইল। তিনি ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। বিদূষক বলিল, ‘সখে ! আর কেন ? এখন উঠ।’ রাজার এবার ক্রোধের উদ্বেগ হইল, ব্যক্তির উদয় হইল। রাজা যাহাও পরিচারিকা হইতে রাজ্যপদে আকৃত করিয়াছিলেন, সেই রাজার প্রতি তাহার এই ব্যবহার ! এত অবিনয় ! রাজা ভাবিলেন ‘বাঁচিলাম, আমি ইরাবতীকে ভুলিব।’ মালবিকার মৌভাগ্যগগনে যে একটু কালো মেঘের রেখা ছিল, তাহা দূর হইল।

ইরাবতী ক্রম-চরণা মহারানী পারিণায় সকাশে উদ্যানের সমস্ত ঘটন জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন, পারিণী তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে, মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে ‘সায়ভাগুর্গৃহে’ আবদ্ধ করিয়া রাখ হউক। রাজার আদেশ অচিয়াৎ পালিত হইল। মালবিকা বুঝিলেন যে, তাহার সকল আশা মূলোচ্ছদ হইল। পরিচারিকা বিদূষককে

জানছিলেন । বিদূষক আবার রাজার নিকটে বলিল । রাজা অতীব
 বিসম্বদ হইলেন । কিন্তু কোন প্রতিকার-বিধান করিতে পারিলেন না ।
 দারিণীর আদেশের প্রতিকূলে যাউতে তাঁহার আর সাহস হইল না ।
 একবার উরাবতীর নিকটে বিশেষ শিক্ষা পাঠিয়াছেন, আবার কি করিতে
 'কি হইবে, তিনি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বিদূষকেরই শরণাপন্ন হইলেন ।
 বিদূষক অতিশয় প্রত্ন-পন্নতি, তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করিয়া রাজার
 কাণে কাণে বলিল । রাজা প্রসন্ন-হৃদয়ে অন্তঃপুরে পীড়িতা দারিণীকে
 দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে, বিদূষকের পূর্ব-
 নন্দেখানুসারে, রাজা, প্রত্নহস্তী-দর্শিত 'গৃহপথে' প্রনদ-বনে প্রবেশ-
 পূর্বক, বিদূষকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে বিদূষক
 গাঙ্গরা বলিল, "সখে ! কার্যোদ্ধার হইয়াছে, মালবিকার উদ্ধার করি-
 যাছি, সস্তা চল, 'সমুদ্রগৃহে' মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে রাখিয়া,
 তোমাকে লইতে আসিয়াছি, বিলম্ব করিও না ।"

সমুদ্রগৃহ রাজা ও রাজ্ঞীদের অত্যন্ত প্রাণ প্রাসাদ । নানাবিধ
 আলোখো, নানাবিধ দৃশ্যপটে সমুদ্র-গৃহ-ভিত্তি সজ্জিত । রাজা বা রাণীদের
 কেহ ব্যতীত তথায় অত্রের প্রবেশাধিকার নাই । সেই স্থানে বকুলা-
 বলিকাকে লইয়া মালবিকা অবস্থান করিতেছেন । সখী বকুলাবলিকা
 মালবিকাকে কত সুন্দর সুন্দর ছবি দেখাইতেছেন । কোথাও রাজার
 যুগ্ম-বেশের প্রতিকৃতি, কোথাও রাজবেশের প্রতিকৃতি, কোথাও
 অন্তঃপুর-মহিলাদের সহিত রাজা কথোপকথন করিতেছেন—এই ছবি
 চিত্রিত । দেখিলে মনে হয়, সতাই বুঝি রাজা বসিয়া আছেন ।
 বকুলাবলিকা সে সব এক এক খানি করিয়া মালবিকাকে দেখাইতে
 গািলেন । মালবিকা নিয়ত রাজ-মূর্তি দর্শন করিতে করিতে, একবারে
 যেন তন্ময় হইয়া পড়িলেন । বাহিরে দেখেন রাজা, ভিতরে মনের
 মধ্যে দেখেন রাজা, রাজা ব্যতীত তাঁহা যেন একটা পৃথগস্তিত্বই রহিল

না। কালিদাস এই প্রকার চিত্র-দর্শনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রঘুবংশের কত স্থানে, চিত্রশালিকায় লইয়া গিয়া, স্বর্ষ্যবংশীয় নৃপতিদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। মেঘদূতে যক্ষ ও যক্ষ-বধূর চিত্র-নির্মাণ-প্রিয়তার পর্য্যাপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। আবার এই নাটকেও, চিত্রশালিকায় আনিয়া, তাঁহার মুগ্ধা মালবিকার চিত্র-বিনোদন করিতে-ছেন। তিনি নিজে অসাধারণ চিত্রকর ছিলেন, স্বর্গ-মর্ত্যের চিত্র করিয়া গিয়াছেন। এক একটি কথায়, এক একটি কবিতায়, এক এক খানি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি নিজে চিত্র করিতে ভাল বাসিতেন, চিত্র দেখিতে ভাল বাসিতেন, অন্ধকেও চিত্র দেখাইতে ভাল বাসিতেন : তাই তাঁহার প্রতি গ্রন্থেই আমরা কত প্রকার চিত্র দেখিতে পাই।

ধারিণীর আদেশে মালবিকা অবরুদ্ধ ছিলেন। বিদূষক তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছে। সমুদ্র-গৃহে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছে, মালবিকা অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু কাহার অপেক্ষায় যে বসিয়া আছেন, তাহা তিনি জানেন না। আর বিদূষকও তাহা বলিয়া যায় নাই : মালবিকা সে দিন ইহাবতীর সমক্ষে যে লজ্জা পাইয়াছেন, যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে, তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আর বুঝি রাজ-দর্শন তাঁহার ভাগ্যে নাই। তাই আজ সেই দুর্লভ দেবতার প্রতি কৃতি দর্শন করিয়া উত্তম্ভিত হৃদয়ের কথঞ্চিৎ শাস্তি করিতেছেন। চিত্রাবলী দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ, এক খানি আলখোর উপর তাঁহা দৃষ্টি স্থির হইল। সে চিত্রখানি রাজা অগ্নিবর্ণের। অস্তঃপুরের। প্রতিকৃতি তাহাতে রাজ-পরিবারের অনেকেই আছেন, রাজাও আছেন। কিন্তু রাজা অনিমেঘ-নেত্রে, একখানি, একটি অস্তঃপুর-ললনার দিকে চাহিয়া আছেন। আর সেই ললনা, বদন ঈষৎ পরিবৃত্ত করিয়া আনত-নয়নে বসিয়া আছেন। মালবিকার নয়নে এই দৃশ্যটি পতিত হওয়ামাত্রই, তিনি সমীপ-বর্তিনী সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহা কোন্ ললনার প্রতিকৃতি?

তাহার নাম কি ? বকুলাবলিকা বলিল ‘ইহারই নাম ইরাবতী ।’ সরল-
 প্রাণা মালবিকা অমনি বলিলেন, ‘সখি ! এব্যবহার ত মহারাজের
 দাক্ষিণ্যের পরিচায়ক নহে ; সমস্ত মহিষীদিগকে উপেক্ষা করিয়া,
 একজনের উপর অনুগ্রহাতিশয় প্রদর্শন কি উদার প্রকৃতির লক্ষণ ?’
 ইরাবতী যখন ধারিণীর পরিচাটিকা ছিলেন, ইহা সেই সময়ের ছবি ।
 মালবিকার এই কথায়, বকুলাবলিকা, সত্য সত্যই, তাঁহার হৃদয়ের
 কোমলতা এবং উদারতা অনুভব করিয়া একান্ত প্রীত হইলেন । কিন্তু
 বকুলাবলিকা বুঝিলেন যে, মালবিকা চিত্রগত অগ্নিমিত্রকে প্রকৃত
 অগ্নিমিত্র ভাবিয়াছেন । তাই একটু রহস্ত করিবার জন্ত কহিলেন, ‘সখি !
 ঐ রমণী মহারাজের প্রণয়ভাজন ।’ অমনি মালবিকা ‘কেন তবে আমার
 ব্যথিত প্রাণে আবার নূতন বাথা দিতে যাউতেছি ?’ বলিয়া দ্রুত রোষভরে
 সে চিত্র-দর্শন হইতে বিরত হইলেন, এবং অস্ত্র চলিয়া গেলেন ।
 রোষবির্ভাবে তাঁহার মুখকান্তি রক্তাভ হইল । বকুলাবলিকা মনে মনে
 হাসিতে লাগিলেন । বিদূষক তাঁহাদিগকে এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন,
 তাঁহারা এই ভাবে কাল কাটাউতেছেন ! আর না কাটাইয়াই বা করিবেন
 কি ? যাউবেন কোথায় ? রাজ-সংসারে আর মালবিকার স্থান নাই ।
 ধারিণী এত দিন প্রসন্ন ছিলেন, এক্ষণে, ইরাবতীর অভিযোগে তিনিও
 বিরূপ হইয়াছেন । সূতরাং মালবিকার আর গন্তব্য স্থান কোথায় ?
 এ দিকে ধূর্তচূড়ামণি বিদূষক, অনেকক্ষণ হইল, রাজাকে লইয়া,
 নিগূঢ়ভাবে, সমুদ্র-গৃহের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন । রাজা
 অন্তরালে থাকিয়া মালবিকার কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছেন । মালবিকার
 উক্তি-প্রত্যুক্তি গুলি তন্ময়-চিত্তে শুনিতেছেন । রাজা, ইতিপূর্বে
 দ্রুতকবারে, মালবিকার কয়েক প্রকার মূর্তি দেখিয়াছেন বটে,
 কিন্তু তাঁহার রোষাক্রম মূর্তি দেখেন নাই । কবিশ্রেষ্ঠ এবার তাঁহাকে
 সে কমনীয় মূর্তিও দেখাইলেন ।

মালবিকার কোপরক্ত, মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া রাজা আর আত্মগোপন অথবা আত্ম-বঞ্চনা করিতে পারিলেন না, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । অগ্নিমিত্র-হৃদয়া মালবিক, সহসা হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি 'চিত্রগত ভর্তৃক' মথার ভর্ত্তা ভাবিয়া, তাঁহার উপর বখা কোপ করিতেছিলেন । মালবিকার আর রাজার অবশি রহিল না । তিনি ব্রোড়ানতবদনে কুপ্রাজ্ঞ হইয়া বিদেশেশ্বরের অভ্যর্থনা করিলেন । রাজার অন্তঃকরণ-বাহিনী প্রীতিপায়া যেন শত্রু-মুখে নির্গত হইয়া, মালবিকাকে পরিহৃত করিল । রাজকুমারী যম্মাক্ত-কলেবরে, চিত্রপুতলিকার প্রায়, স্থির-ভাবে নাড়াগয়া রহিলেন ! নিপুণ বদনক বকুল বলিকাকে লগ্না হইয়া প্রাড়াহনে ছাটরা ফেল ।

মালবিকার প্রাণ তুক তুক কাপিতে লাগিল । সেই এক দিন এমন সময়ে, পার্শ্বীর উদ্যান-বাটিকার ইরাবতী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে, এত দিন অবরুদ্ধ থাকিতে উঠেছে । তাই আজ রাজার কোন কথার আর তিনি উত্তর দিতে সাহস করিলেন না । কথা কহিতে আদৌ তাঁহার সাহসই হইল না । তিনি যেন অন্তঃ বাহিরে, সেই দৃপ্ত সিংহী ভরাবতীকে দেখিতে পাঠলেন । রাজার বহু সামর্থ্য, প্রাজ্ঞতা সেই দিন, উদ্যানবাটিকার যখন ইরাবতী আসিয়াছিলেন, তখনই প্রতিলম্ব হইয়াছে । তবে কাহার বলে তিনি কথা কহিবেন ? তাই তিনি নির্বাক্ এবং সাতী-কৃত-বদনে দণ্ডায়মান । আর তাঁহার পুরোভাগে অনুনয়-তৎপর বিদিশাপতি । এমন সময়ে, ওখার মধ্য সত্যই ইরাবতী উপস্থিত হইলেন ।

সে দিন, উদ্যানে, ইরাবতী ক্রোধবশে রাজার অবমাননা করিয়াছেন, কত অগ্নিয় বচন বলিয়া, তাঁহাকে,—বিনি এক দিন কত ভাল বাসিতেন, সেই অগ্নিমিত্রকে ব্যথা দিয়াছেন ; রশনা দ্বারা তাঁহাকে ভাঙনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । ক্রোধোন্মত্তা ইরাবতীর তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান

ছিলনা। পরে ঈরাবতী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সে সব ভাল করেন নাই। রাজার চরণে ঘোর অপরাধ করিয়াছেন। এ অপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক। কিন্তু কাহার কাছে ক্ষমা চাহিবেন? অগ্নিমিত্র তা এখন আর সে অগ্নিমিত্র নাই, সে ঈরাবতী-বল্লভ নাই। তাই ঈরাবতী আজ সমুদ্র-গৃহে আসিয়াছেন। তিনি যে দিন সর্বপ্রথমে রাজার নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিলেন, সেই দিনবার সেই অবস্থার একখানি চিত্র এই সমুদ্র-গৃহে আছে। সেই চিত্রের দিকে দাঁড়াই, ক্রমশঃপূর্বে মালবিকা অভিনয় করিতেছিলেন। এই সমুদ্র-গৃহে ঈরাবতীর জীবনের সেই প্রথম উদার আলোক ফুটিয়াছিল। রাজার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অভিনয়িনী ঈরাবতী আজ জন্মে মৃত ক্ষমা চাহিতে এবং বিদায় লভিতে, এই সমুদ্র-গৃহে উপনীত হইয়াছেন। সে চিত্র খানেক, তাহার দিকে রাজা অনিমেষ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, সেই চিত্রে—সেই চিত্র-রাজমূর্তি, নিকটে, ঈরাবতী আজ ক্ষমা চাহিয়া অপরাধ লাবণ করিবেন। সেই চিত্র-রাজমূর্তি, নিকটে আজ জন্মের মত বিদায় লভবেন। সে আলোখো তাহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রথম রেখার ছায়া অঙ্কিত আছে, সেই আলোখোর সম্মুখে আজ জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের কথাগুলি কহিয়া বাহিবেন। এই ঈরাবতী উপস্থিত। চিত্র-গত ভর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন, শুনিয়া, এখন পরিচারিকা মিলুণিকা কহিল ‘দেবি! চিত্রে কেন? ভর্তার সম্মুখে গেলে ক্ষতি কি ছিল?’ তখন বিষাদিনী ঈরাবতী দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত বলিলেন, “মুঞ্জে! ‘চিত্র-গত’ আর ‘অন্ত-সংক্রান্ত-হৃদয়’—এতজুড়য়ে প্রভেদ কি? আমি তাহার অসম্মান করিয়াছি, এই আমার এই উদ্যম, অতঃ কোন উদ্দেশ্য নাই।”

রাজা ও মালবিকাকে রাখিয়া, হরিণ তাড়নার ছল করিয়া, বিদূষক অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনও সে ফিরে নাই, বহির্দ্বারে বসিয়া বসিয়া ঘুমাই-

তেছে । সে হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখিয়া, ‘সাপ ! সাপ !’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে । তাহার চীৎকারে রাজাও, চকিত-হৃদয়ে, ‘ভয় নাই’ বলিয়া সেই দ্বারের দিকে ছুটিয়াছেন । এমন সময়ে মালবিকা অগ্রবর্তিনী হইয়া রাজাকে বাধা দিলেন । সাপের নাম শুনিয়া মালবিকার প্রাণ ‘কাঁপিয়া উঠিল । তিনি কেমন করিয়া রাজার গমনে সম্মতি দিবেন ? এরূপ সময়ে সাধ্বী ললনার হৃদয়ের অবস্থা যে রূপ হইয়া থাকে, মালবিকারও তাহাই হইল । তিনি লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, সমস্ত একপদে বিস্তৃত হইয়া, পরিণত-বয়স্কার ছায় বলিয়া ফেলিলেন—‘তট্টা ! মা দাব, সহসা নিকম, সপ্তোত্তি ভনাদি ।’ মহাকবি এইবার মালবিকার অপরিমিত-স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়খানি, একবারে যেন খুলিয়া দেখাইলেন যে, সে পতিপ্রাণার অন্তঃকরণ কত সুন্দর, কত মনোময় । পশ্চাদ্ধাবমান মালবিকার প্রস্থিষেধে ততটা কর্ণপাত না করিয়া, বন্ধু-বৎসল রাজা, দ্রুতপদে বিদূষকের নিকটে উপনীত হইলেন । এদিকে ইরাবতীও আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া, রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে ত !’ এই বাপারে, ইরাবতীর এই অকস্মাদাগমনে, সকলেই অবাক হইলেন । মালবিকা ও বকুলাবলিকা একান্ত ভীত হইলেন । রাজা, ইরাবতী, নিপুণিকা, বকুলাবলিকা, বিদূষক প্রভৃতির কত আলাপ হইল, কিন্তু দুঃখিনী রাজনন্দিনী মালবিকা একটি কথাও কহিলেন না । বাতাহত লতিকার ছায়, কেবল একপার্শ্বে, কম্পিত-দেহে দাঁড়াইয়া রহিলেন । এমন সময়ে, হঠাৎ ‘ধারিণীর কন্ডা বম্বলক্ষ্মী বড়ই বিপন্ন’ এই প্রকার একটা রব উঠিল । তাহাতে সকলেই চঞ্চল হইলেন । ইরাবতী ক্রোশ, অভিমান, সমস্ত ভুলিয়া, মাতৃদর্শনের অতিপ্রভাবে, অবশ-চিত্তে, রাজাকে লইয়া কুমারী বম্বলক্ষ্মীর নিকটে ছুটিয়া গেলেন । কেবল বকুলাবলিকা ও মালবিকা—এই দুইজনে, সেই সমুদ্র-গৃহে পড়িয়া রহিলেন । মালবিকা সজল-নয়নে, বকুলাবলিকাকে কহিলেন, ‘সখি ! দেবী ধারিণী

কথ্য ভাবিয়া, আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে । একবার, সেই অশোক
কুঞ্জের ঘটনার পর, যে কি লাঞ্ছনা সহিয়াছি, তাহা ত তুই জানিস্,
এবার যে আবার কি দুর্ঘটনা ঘটবে, তাহা বলিতে পারি না’ ছিন্ন-স্মৃতিকা
মুক্ত-মালিকার আয় বর্ বর্ করিয়া, মালবিকার অশ্রু পতিত হইতে
লাগিল । এমন সময়ে, দূর হইতে কে বলিয়া উঠিল, ‘আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !
এখনও পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হয় নাই, ইহারই মধ্যে অশোকে গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম
প্রক্ষুটিত হইয়াছে, ধন্য মালবিকা ! তোমার দোহদ সার্থক, যাই,
দেবীর নিকটে এ সংবাদ বলি গিয়া ।’ বকুলাবলিকা প্রমদবন-পালিকার
এই হর্ষসংবাদ শুনিয়াই, কাতর-হৃদয়া মালবিকাকে কহিল ‘প্রিয়সখি !
আশ্বস্ত হও, ঐ শুন, তোমার দোহদ সার্থক হইয়াছে । আমি জানি, দেবী
ধারিণী সত্যপ্রতিজ্ঞা, তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা মনে আছে ত ?’—

উদ্যান-পালিকা এই আনন্দের সংবাদ দিবার নিমিত্ত পাটরাণীর
প্রাসাদে ছুটিল । আর মালবিকা এবং তাঁহার সখীও উহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চলিলেন ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

মালবিকার পরিণয় ।

‘ আজ ধারিণীর প্রাণাদে বড় আনন্দ । অশোক কুল কুটিয়াছিল না । দেবী স্বয়ং দোহদ করিতে পারেন নাহি । প্রতিনিধি করিয়া মালবিকাকে পাঠাইয়াছিলেন । তিনি দোহদ করিয়াছেন । কপা ছিৎ, যদি ‘পঞ্চরাত্রাস্তরে’ অশোক কুম্বমিত হয়, তবে, দেবী ধারিণী মালবিকার মনস্কামন পূর্ণ করিবেন । কুল কুটিয়াছে । আজ মালবিকার অভিলାষ পূরণের দিন ।

ধারিণী, এত দিন তটস্থ হৃদয়ে, রাজার কার্যকলাপ দেখিয়া আসিতে-
ছিলেন, বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা কতেন নাহি । উদ্যতীর একান্ত আগ্রহে, যেন একবার মালবিকাকে অবলোক করিয়াছিলেন । প্রাপ্ত রাজার কোন কার্যোই আর বাধা দেন নাহি । প্রত্যুত তিনি আনন্দ সহকারে মনে মনে রাজার কার্যাবলীর অনুমোদনই করিতেছিলেন । যে ভ্রাতা তাঁহার এত প্রয়াস, মালবিকাকে গণদাসের বাজিতে প্রেরণ, দূরে দূরে মালবিকাকে রাখা, যারে ধীরে অভ্যপ্রেত সিদ্ধি চেষ্টা, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে । চুৎকের আকস্মিক লোহ আকৃষ্ট হইয়াছে । ধারিণীর আশ্বাদের সীমা নাহি । তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, মালবিকা যখন সকল বিষয়ে সমান পারদর্শিনী হইবেন, তখন তাঁহাকে রাজার নয়ন-গোচর করিবেন । ক্রমে ক্রমে, রাজাকে একবারে মালবিকাময় করিয়া, পরে, যথাসময়ে মালবিকাকে অর্পণ করিবেন ! কিন্তু তাহা হয় নাই । ধারিণীর জ্ঞান পরিত্রাজিকাও ঐ অভিপ্রায় ছিল, বিদূষকেরও ছিল । রাজার সহিত বাহ্যতে সহ্য মালবিকার সম্মিলন ঘটে, এ বিষয়ে সকলেই সত্বপর ছিলেন । তাই সমবেত চেষ্টার ফলে, তাঁহাদের মিলন হইয়াছে ।

ধারিণীর বাজা পূর্ণ হইয়াছে । স্ততরাং আর বিলম্ব কেন ? কাহার অপেক্ষায় বিলম্ব ? তাই আজ ইরাবতীর পারিতোষিকের সমস্ত আয়োজন মহারাণী তিক করিয়াছেন । আজ রাজাকে লইয়া ধারিণী অশোককুঞ্জে চলিলেন । অশোকের ফুল পাটরাণী একাকী দেখিবেন না, রাজার সহিত মিলিত হইয়া দেখিবেন । আর যে এত অকুসুমিত অশোকতরু কুসুমগুচ্ছে পরিপূর্ণ করিয়াছে, আজ আকাশ, ভূমি, শাহকেও একবার রাজাকে দেখাইবেন । রাজা এ সব জানেন না । তিনি দেবীর নির্দেশ মতে অশোক কুঞ্জে উপস্থিত । এদিকে, ধারিণীর কথানুসারে, পরিভ্রাজিকা নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া, মালবিকাকেও তথায় লইয়া গিয়াছেন । মালবিকা জানেন না, কেন আবার আজ শাহার এই নুতন সাজসজ্জা । অশোক কুঞ্জে যখন, সমবেশ হইয়াছেন, এমন সময়ে মহারাণী সহস্রাবদনে মহারাণীকে কহিলেন, ‘আদ্যপুত্র । আজ এই অশোককুঞ্জে তোমার ‘বিবাহবাসন’ করিব । রাজা বৃক্কে পারিলেন না । ধারিণীর মুখের দিকে অপ্রবুদ্ধ প্রাণে গতিয়া বহিলেন । এমন সময়ে দ্রষ্টজন সঙ্কীর্ণনিপুণ বালিকা তথায় উপস্থিত হইয়া, পরিত্যক্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল । দেবী ধারিণীর আদেশে শাহার সমীপে আনীত হইল । আসিয়াই শাহার, পার্শ্ববর্তিনী মালবিকার মুখের দিকে গতিয়া চাহিয়া কঁদিয়া ফেলিল । মালবিকাও শাহাদিগকে দেখিয়া কঁদিয়া ফেলিলেন । পণ্ডিত কৌশিকী ব্যতীত, আর কেহই শাহার সহস্রভেদ করিতে পারিলেন না । ক্রমে প্রকাশ পাইল যে, এই বালিকাঈয় মালবিকার সহচরী ছিল । মাধবসেন যখন ইহাদিগকে লইয়া বিদিশায় আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে-বৃত্ত সেই বিপ্লবে শাহাও হারাইয়া যায় । রাজা কোতুলবশতঃ বালিকাঈয়কে সমস্ত রত্নাঙ্ক প্রকাশ করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । শাহাও যথাক্রমে বিবৃত করিল । তখন ধারিণী এবং রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, যে

বিদর্ভ-রাজপুত্রী পথিমধ্যে বিপন্ন হইয়াছিলেন, এই মালবিকাই তিনি । রাজার আর আনন্দের অবধি রহিল না । ধারিণী কিন্তু লজ্জিতা হইলেন । রাজার কথাকে পরিচরিকা করিয়াছিলেন, অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, ভাবিয়া মহারানী লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন ।

এদিকে মালবিকার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল । যে বালিকা গহন বনে দম্ভ্য কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, যাহাকে রাজার করে অর্পণ করিবার জন্ত মাধবসেন লষ্টয়া আসিতেছিলেন, এই সেই মালবিকা, ইহা শুনিয়া রাজা কি বলেন, মালবিকা এখন গ্রাহ্য না ত্যজ্য, কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, শুনিবার জন্ত মালবিকা উদ্বিগ্নচিত্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন । রাজার এই একটি কথার উপর এখন মালবিকার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে । হুঃখিনী রাজকুমারী থাকিয়া থাকিয়া চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন । রাজা কিন্তু অতিশয় প্রীত হইয়া সেই নবাগত বালিকাদ্বয়কে পারিতোষিক দিলেন । এমন সময়ে ধারিণী অবসর বুঝিয়া পরিত্রাজিকাকে কহিলেন, ‘ভগবতি ! আপনার অগ্রজ মন্ত্রিবর আৰ্য্য স্মৃতির একান্ত বাসনা ছিল যে, মালবিকাকে আমার আৰ্য্যপুত্রের হস্তে অর্পণ করেন । তিনি এখন পরলোকে । আমি আজ আপনার জ্যেষ্ঠের সেই অভিলাষ পূরণ করিতে চাই । মালবিকাকে আৰ্য্যপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে বাসনা করি, আপনি অনুমতি করুন ।’ ধীরবুদ্ধি পরিত্রাজিকা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ‘দেবি ! মালবিকার তুমিই কর্ত্রী, যাহা ইচ্ছা করিতে পার !’—

ধারিণী ইরাবতীকে নিমন্ত্ৰণ করিয়াছিলেন । এখন বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি প্রতিক্ষিত ছিলাম, অশোকে ফুল ফুটিলে মালবিকার বাহ্য পূর্ণ করিব ; ফুল ফুটিয়াছে, এখন ভগ্নি ! তুমি আসিয়া আমার প্রতিক্ষণ্তি পালনের সাহায্য কর । ইরাবতী আর আসিলেন না, তিনিও পরিচারিকার মুখে বলিয়া পাঠাইলেন ‘দিদি ! তুমিই কর্ত্রী, যাহা

অভিলাষ করিয়াছ, তাহাই কর, প্রতিক্রান্ত বিষয় অবশ্য পালন করিও ।’—
ইরাবতীর সব ফুরাইল !

ধারিণী রাজাকে বলিলেন যে, এখনই মালবিকাকে বিবাহ করিতে
হইবে । রাজা করেন কি ? মহারাজার কথা না রক্ষা করিলে তাঁহার
অবমাননা করা হয়, তাই যেন অগত্যা, নিতান্ত অনিচ্ছাসহেও মাল-
বিকাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন । তখন রাজা সালঙ্কার
মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া, মম্বুর-পদ-বিক্ষেপে, রাজার নিকটে
লইয়া গিয়া গভীর কণ্ঠে কহিলেন ‘আর্য্যপুত্র ! বিদিশেশ্বর ! গ্রহণ কর !’
—‘দেবি ! তোমার শাসন সর্ব্বথা পালনীয়’ বলিয়া রাজা মালবিকার
পাণিগ্রহণ করিলেন । পরিচারিকাগণ অমনিই প্রধান মহিষী ধারিণীর
সন্নিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ত্বরিতচরণে মালবিকার চতুর্পাশ্বে আসিয়া
দাঁড়াইল ! ধারিণী উদাসীন-নয়নে, চিরপরিচিত সেই প্রিয় পরিচারিকা-
গণের এই ব্যবহার দেখিতে লাগিলেন । পরিত্রাজিকাও অমনি
মালবিকার নিকটে যাওয়া, ‘গাণি ! তোমার জয় হউক’ বলিয়া অভিবাদন
করিলেন । ধারিণী স্থির-নয়নে, পরিত্রাজিকার এই আকস্মিক সম্মান-
প্রদর্শনের দিকে চাহিয়া রহিলেন । এমন সময় ইরাবতীর পরিচারিকা
আসিয়া বলিল, ‘রাজন্ ! ইরাবতী বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনার
নিকট তিনি সে দিন ঘোর অপরাধ করিয়াছেন । আজ আপনি পূর্ণ-
কাম হইয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন ।’ রাজা কোন কথা কহিলেন
না । ধারিণী বলিলেন—‘আচ্ছা’ ।

ধারিণী এতদিন একটা গুপ্তভর আবেগভরে ক্লান্ত ছিলেন । সেই
আবেগের কারণ, রাজার সহিত মালবিকার পরিণয় আজ । তাহা সম্পন্ন
হইল । ধারিণীর হৃদয়ও আবেগ-শূন্য হইল । নিস্তরঙ্গ, শ্রোতোহীন
বিশীর্ণবক্ষঃ তটিনীর জায় তাঁহার হৃদয় যেন একবারে স্থির ও ক্রমে নিস্তেজ
হইয়া পড়িল । উৎসাহের অবসানে প্রাণে একটা অবসাদ আসিল ।

আর মালবিকা,—মালবিকা রাজার কন্যা হইয়া পথে পথে, বনে বনে, নগরে নগরে, ভিখারিণীর ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে রাজবাড়ীতে আসিয়াছিলেন । ভ্রাতা মালবসেন যদি কাতারুদ্ধ না হইতেন, তাহ হইলে এতদিন কবে রাজার কন্যে মালবিকা অর্পিত হইতেন । তাহা হয় নাই । সেই সম্বন্ধিত রাজার প্রাসাদেই মালবিকা আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাজ-কন্যা-ভাবে আসেন নাই, দাসী-ভাবে আসিয়াছেন । তাঁহার অন্তঃকরণে ত আঃ দাসীর উপযুক্ত নয় । সে হৃদয় রাজকন্যার হৃদয় । বিদর্ভের অর্পিত আশ্রয় হৃদয় যেমন হওয়া উচিত, তদ্রূপ । আর বিদর্ভের পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু মালবিকার বাল্যকালে, এই বিদিশার ছায় বিদর্ভের রাজ-সংসারেও কত আশ্রয় ছিল, কত উৎসব ছিল । বিদিশার আজ কুনারী বহুবল্লীর সেনন আদর যত্ন, যেমন পরিচারিকা, বিদর্ভের মালবিকারও এক দিন এইরূপ ছিল । সে সমস্ত আজ স্বপ্নের বিষয় হইয়াছে । মালবিকা রাজবাড়ীতে পরিচারিকা সাজিয়া আছেন । প্রাণ সংক্ষণ মানুষের দেহ ছাড়িয়া, না যায়, সংক্ষণ মানুষ না থাকিয়া পানো না, এক ভাবে না এক ভাবে মানুষকে থাকিতে হয়, তাহা হৃদয়ে জ্বলি, বহুধা, অবগাদ, ভ্রুংখ নাহাই থাকুক না কেন, সে সমস্ত বক্ষে চাপিয়া, তাহাকে অসিত কঁাদিতে হয় । রাজকন্যা মালবিকাও সেই ভাবে ছিলেন । কখনো কোন কূট চিন্তা কি নীচ ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভিত হয় নাই । রাজা অগ্নিমিত্রের উপর যখন তাঁহার দীন-হৃদয়ে অনুগতির প্রথম উন্ময় হইয়াছিল, তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত অগ্নিমিত্রের সন্তিত পরিণয় পর্য্যন্ত, কোন সময়ে, কোন অবস্থায়, তিনি কোন প্রকার অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন নাই । তাঁহার উপর যত বিপদই পতিত হউক, তিনি আপন হৃদয়-অরণ-পূর্ব্বক, সে সমস্তই নীরবে বক্ষ পাতিয়া লইতেন । কিছুতেই বিচলিত হইতেন না । যখন হৃদয়ের বেদনা এবাং অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন তিনি নির্জনে

সিরা একাকিনী কাঁদিতেন ও বিলাপ করিতেন । রাজার কথা তিনি, রাজার সঙ্গেই ত পরিণয় হইবার কথা, কিন্তু ভাগ্যবশে, রাজরাণী না হইয়া তিনি রাজরাণীর পরিচারিকা হইয়াছিলেন । তাহার অতি সুন্দর বস্ত্রও একান্ত ছদ্ম হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল । নাহা কিছু জীবনের অলুক ছিল, সে সমস্তই প্রতীক হইয়াছিল । বিধাতার সৃষ্টিতে এমন বস্তু নাই । 'হতাশা কবির' এক নূন সৃষ্টি । বিধাতার সৃষ্টিতে স্বর্গের পারিজাত স্বর্গেই থাকে, মর্ত্যে আসে না । মর্ত্যে কুসুমও স্বর্গে যায় না । ভিন্ন ভিন্নের সমস্তই বিভিন্ন । আর কবিঃ এক নূতন সৃষ্টিতে স্বর্গের পারিজাতকে তিনি, মর্ত্যে জুগুপ্সনর, অবদানর, পঙ্কজ সংসারঃ লঙ্ক অসির, জীবির তাহাকে প্রাণে দোহস্তানে বিচরণে লইয়া শিখাছেন । কবির এ চিত্র বিধাতার চিত্র অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, অনেক সুন্দর, অনেক মনোহর ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

অগ্নিমিত্র ।

অগ্নিমিত্র যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতের এক সুদিন । তখন বৌদ্ধ রাজত্বের পতন হইয়াছে । পিতা পুষ্পমিত্র শেষ বৌদ্ধ-নৃপতি বৃহদ্রথকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুত্র অগ্নিমিত্রকে বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট করিয়াছেন । ভারতে বহিরুপদ্রবের শাস্তি হইয়াছে । কোথাও অন্তর্বিপ্লব নাই । পিতা পুষ্পমিত্র, মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রে, বিরাট সেনার অধিনায়করূপে রাজত্ব করিতেছেন, ওদিকে অগ্নিমিত্রকে মধ্যভারতে বিদিশার সিংহাসনে ভারতেশ্বরের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন । সম্রাট অগ্নিমিত্র, পিতৃ-নির্বাচিত বিশ্বস্ত মন্ত্রী-পরিষদের পরামর্শানুসারে দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেছেন । অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্রও একজন অপ্রতির্য্য় বীর । যে স্থানে প্রয়োজন, কুমার বসুমিত্র অশ্বসর হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা শত্রু দমন করিতেছেন । এ বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে । পিতা পুষ্পমিত্র জগদ্বিখ্যাত বীর, মৌর্য্যবংশের প্রকৃত উচ্ছেদ-কর্ত্তা ; স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ; আর পুত্র বসুমিত্র দৃষ্ট সিংহশাবকবৎ অপরাজেয় সৌর্য্য-সাম্পন্ন ! তিন পুরুষ এতাদৃশ ক্ষমতালী হইয়া, যুগপৎ বিদ্যমান থাকার কথা, ভারতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না । অগ্নিমিত্রের তীক্ষ্ণ প্রতিভা তিনি সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই রাজ-কার্য্য করিতেন । আমোদ প্রমোদের মধ্যে, সঙ্গীত-চর্চ্চার মধ্যে, অন্তঃপুরে অবস্থানের সময়ে পর্য্যন্ত, রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্য উপস্থিত হওয়া মাত্রেই তাহার স্রব্যবস্থা করিতেন । রাজকার্য্যের কোন অংশ ভবিষ্যতের জন্ত স্থগিত রাখিতেন না । তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি এবং মনের দৃঢ়তা এত অদ্ভুত ছিল যে, কোন সময়ে কোন কার্য্য করিয়া, কোন কারণেই তাহার আর পরিবর্তন করেন নাই ।

গথচ প্রত্যেক কার্যই অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার বিচার-শক্তি অতি প্রখর ছিল। কোন একটা দুর্ভাগ্য বিষয় আপতিত হইলেই তিনি তাহার তৎক্ষণাৎ চরম মোমাংসা করিতে পারিতেন। ক্ষিপ্ৰতা তাঁহার চরিত্রের একটা প্রধান ধর্ম ছিল। রাজকার্যে তিনি যেমন ক্ষিপ্ৰ ছিলেন, প্রণয়-ব্যাপারেও তাঁহার তাদৃশী ক্ষিপ্ৰতা পরিদৃষ্ট হইত। যেমন একটা কোন কার্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অমনি তাহা একবারে শেষ করিয়াছেন। যদি কোন কারণে, তাহা শেষ করিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিত, তবে তাঁহার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত এক প্রকার বন্ধ হইত। তাঁহার হৃদয় যেন স্নেহের প্রস্রবণ। সকল রাণীর উপরই তাঁহার প্রচুর স্নেহ। প্রত্যেকেই মনে করিতেন, “মহারাজ তাঁহাকেই অধিক ভালবাসেন।” পরিচারিকাটি পর্য্যন্ত তাঁহার স্নেহ-ভাগিনী ছিল। তাঁহার এতাদৃশ স্নেহময় অন্তঃকরণেও কিন্তু কর্তব্য-প্রিয়তা অতিশয় বলবতী ছিল। তিনি একবার যাহা কর্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অচিরাৎ সম্পন্ন করিতেন। কোন প্রকারেই, কেহ তাঁহাকে সে কর্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি যখন বুঝিলেন যে, দাস্তিক ‘বৈদর্ভ যজ্ঞসেন’ সহজে বশীভূত হইবে না, তখন অমনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্ত অনুমতি করিলেন। রাজ-সম্মান ও রাজাদেশ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে পক্ষে তাঁহার প্রাণান্ত পণ ছিল। তিনি কর্তব্যের চরণে অতি প্রিয়বস্ত্রও উৎসর্গ করিতে পারিতেন। রাজ্ঞী ইরাবতী যে তাঁহাকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি জানিতেন যে, ইরাবতীর অন্তঃকরণ অগ্নিমিত্রময়, ইরাবতীর জীবন অগ্নিমিত্রময়। তিনি আরও জানিতেন যে, জগতে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা অগ্নিমিত্রের প্রীত্যর্থে ইরাবতী পরিত্যাগ করিতে না পারেন। বিধাতা যে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমময় করিয়া ইরাবতীর হৃদয় নির্ম্মিত করিয়াছেন, অনন্ত সমুদ্রের জ্ঞান সে গভীর ইরাবতী-হৃদয়ের প্রেমেরও যে অন্ত ছিল না, ইহাও তিনি

সুপরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত জানিয়াও যখন তিনি দেখিলেন, যে, শত অনুন্নয় করিয়াও তিনি ইরাবতীর দুঃখভিমান ভঞ্জন করিতে পারিলেন না, পরন্তু পত্নী ইরাবতী, দাসীপদ ইহাতে রাজ্ঞীপদে উন্নীত ইরাবতী, স্বামী বিদিশাপতির সম্মুখে অতি কদর্যা ব্যবহার করিলেন, অবিনয়ের পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিলেন, পতির সমক্ষে ভার্য্যার যে মর্য্যাদা, আত্ম লজ্জন করিলেন, প্রকৃত পক্ষে রাজাকে অবমানিত করিলেন, তখন তাঁহার ঐর্ষ্যচ্যুতি ঘটিল । রাজার রাজ-মর্য্যাদায় বেন আঘাত লাগিল । তিনি অহিনিষ্ঠ্রোকেয় ছায়, ইরাবতীকে চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন । অথবা ‘মনস্থ’ বলি কেন, যেমন মনন, অমনি তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন । দু’দিন পূর্বে যে অগ্নিমিত্র ইরাবতীগত-প্রাণ ছিলেন, যে মুহূর্ত্তে সেই অগ্নিমিত্র দেখিলেন যে, না, এতদিন যে প্রণয় বিগুহ্ব প্রণয় ছিল, এক্ষণে সে প্রণয়ের সহিত অবজ্ঞা মিলিত হইয়াছে, অমনি সেই প্রণয়বতী ইরাবতীকে পরিহার করিলেন । মহচ্চরিত্রের এ একটা প্রধান দিক্ । তাহাতে আত্ম-সম্মানের হানি ঘটবার সম্ভাবনা, তাদৃশ বস্তু একান্ত প্রণয়াম্পদ হইলেও, মহাপুরুষ অম্মান-বদনে, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন । চরিত্রের এই মহা শক্তি-বলেই এক দিন রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন ।

মহারাজ অগ্নিমিত্র প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । অত পূর্বেও যে ভারতেশ্বরের মন্ত্রি-পরিষদ্ কিরূপ দক্ষতার সহিত, রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, এবং সেই পরিষদের অধিনায়করূপে মহারাজ অগ্নিমিত্র যে কি প্রণালীতে অতি কঠিন কঠিন রাজ নৈতিক সমস্ত-সমূহেরও সমাধান করিতেন, তাহা তদীয় চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ধারিণী ।

• ধারিণী বিদিশেশ্বর অগ্নিমিত্রের প্রধান মহিষী । প্রধান মহিষীর হৃদয় ষাটশ উদার, স্নেহময়, দাক্ষিণাময়, হওয়া উচিত, ধারিণীর হৃদয়ও ঠিক তদ্রূপ ছিল । রাজ্যের মধ্যে তাঁহার যে কত সম্মান, ভারত সিংহাসনের তিনি যে কোন স্থানের অধিকারিণী, সে সমস্তই তিনি জানিতেন ; কিন্তু তবুও সর্বদাই তাঁহার হৃদয় বিনয়ভূষণে বিভূষিত ছিল । রাজা অগ্নিমিত্র শত দোষ করিলেও তাঁহার স্বামী, ইহকাল ও পরকালের দেবতা, স্মৃতরাং ক্ষমাই, এ কথা তিনি নিয়তই মনে রাখিতেন । তিনি জানিতেন যে, যাহাকে ভাল বসিয়াছি, তাঁহার অত্যাচার, অবিনয়, আমি ব্যতীত কে সহ করিবে ? তাই তিনি, রাজার সকল বাবহারই অবনতমস্তকে মানিয়া লইতেন । ইরাবতী আর ধারিণীতে এই অংশেই প্রভেদ । ইরাবতী মাত্র ভোগের সামগ্রী, তাই কবি, ভোগের বাঘাত ঘটাইয়া সে ভোগ্য বস্তুও বাহত করিলেন । আর ধারিণী ভোগের নহে, ভোগ অপেক্ষা অনেক উচ্চ, অনেক অল্পম, গভীর প্রণয়ের মুক্তি, তাই ধারিণী, তাঁহার প্রণয়ান্ধদের প্রধান অতীষ্ট পূরণ করিয়া, আপন প্রণয়-ব্রতের উদ্‌ঘাপন করিলেন ।

প্রৌঢ়া মহারানী ধারিণী জানিতেন যে, মালবিকার সহিত রাজার পরিণয় হইলে, প্রকৃতপক্ষে, তরুণী মালবিকাই বিদিশার অধীশ্বরী হইবেন, অগ্নিমিত্রের হৃদয়ের অধিদেবতা হইবেন । তবুও তিনি যেমন বুঝিলেন যে, মালবিকা ব্যতীত তাঁহার উপাশ্রয় দেবতার হৃদয়-রঞ্জন অসম্ভব. অমনিই, আশ্রু-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, মহারানী হাসিতে হাসিতে মালবিকাকে ধরিয়া রাজার হাতে তুলিয়া দিলেন । ধারিণী বাধা দিলে, অগ্নিমিত্রের মালবিকালভ হয়ত অত সহজে হইত না, অথবা হইতই না । ধারিণী

নিজে পাটরাণী, আর তাঁহার স্বপুত্র যিনি অগ্নিমিত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি এখনও জীবিত, পুত্র দিগ্বিজয়ী বীর, আভিজাত্য-বতী জননীর উপযুক্ত সন্তান, সুতরাং ধারিণীকে যে, রাজা অগ্নিমিত্র, এক কথায় ইরাবতীর হ্রাস ত্যাগ করিতে পারিতেন না, এমনস্ত ধারিণী বেশ বুঝিতেন । কিন্তু তথাপি, তিনি স্বামীর সুখের অন্তরায় হয়েন নাই । বরং যখন যতটুকু পারিয়াছেন, পতির অভিপ্রেত-সিদ্ধির সহায়তাই করিয়াছেন ।

ধারিণী ইরাবতীকে এক সময়ে বড় ভালবাসিতেন । ইরাবতী রাজার অনুকম্পায় যখন অন্তরা মহিষী হইলেন, ধারিণী তখনও কিছু বলেন নাই । রাজ-বাসনায় কোন প্রকার বাধা দেন নাই । প্রত্যুত সোদরার হ্রাস ইরাবতীকে আদর যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন । ধারিণী নিজে পাটরাণীর রত্নময় কিরীট মস্তকে পরিচেন বটে, কিন্তু অগ্নিমিত্রের প্রণয়-রত্নে ক্রমশই বঞ্চিত হইতেছিলেন । ইহাতেও তিনি কথা কহেন নাই । কিন্তু যখন দেখিলেন যে, রাজার ইরাবত উন্মাদ দিন দিন অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আর ভূতপূর্ব-পরিচরিকা ইরাবতীও ক্রমে নিজে পূর্বাবস্থা বিস্মৃত হইতেছে, ইহাতে রাজ্যের ঘোর অনঙ্গলের সম্ভাবনা, তাঁহার পুত্র শুরোত্তম বসুমিত্র আর ছ'দিন পরে যে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন, সে সিংহাসনেরও ক্ষতির সম্ভাবনা, তখন তিনি প্রতিকার-কল্পে একান্ত যত্নবতী হইলেন । তিনি, তাঁহার জীবিতেশ্বর অগ্নিমিত্রের হৃদয়ে কোন্ অংশ সবল, কোন্ অংশ দুর্বল, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন : অভিমানিনী ইরাবতীর হৃদয়ই বা কতদূর বলিষ্ঠ, তাহাও সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন । তাই যখন দেখিলেন যে, আর সময় নাই, এক্ষণে প্রত্যাবর্তিত করিতে না পারিলে, আর তাঁহার হৃদয়েশ্বরের পতিত হৃদয়ের উদ্ধার করিতে পারিবেন না, তখন ধীরে ধীরে, মালাবিকারূপী ভীষ্ম ঔষধের—যে ঔষধ সেবন করিবার নিমিত্ত, তাঁহার স্বামী কতই অভিজ্ঞাধী, সেই

অমোঘ ঔষধের প্রয়োগ করিলেন । ইরাবতী তাঁহার সত্যই অতিশয় প্রিয় ছিলেন, কিন্তু রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তর, সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ছিলেন, তাঁই প্রিয়তমের হিতার্থে, আত্ম-স্বথের তথা প্রিয় ইরাবতীর বিসর্জন দিলেন ।

কবি, তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে নানারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত রূপই ভারতেশ্বরীর অনুরূপ । তিনি যখন শুনিলেন যে, পুত্র বহুমিত্র তুরঙ্গ-রক্ষায় নিরত, যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে বাস্ত, তখন, ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ‘আপনারা শাস্তি স্বস্তায়ন করুন, আপনাদের নাসিক আটশত সুবর্ণমুদ্রা বৃত্তি নিদ্ধারিত হইল ।’ কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, নিজেই যেন তিনি রাজ্যের সর্বময়ী । আত্ম-গৌরব, আত্ম-পদ-মর্যাদা তিনি বিশেষভাবে রক্ষা করিতে জানিতেন : যখন ইরাবতী আসিয়া তাঁহার নিকটে মালবিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন, তখন ধারিণী, অবিচারিতহৃদয়ে, মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন । যেন তিনিই রাজ্যের তথা রাজ্য অগ্নিমিত্রের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্রী ।

মালবিকার নৃত্য-কালে, যখন পরিব্রাজিকা ধারিণীকে রাজার প্রতিকূলে উত্তেজিত করিবার আশায় বলিয়াছিলেন যে, উনি যেমন রাজা, দেবি ! তুমিও ত তেমনিই মহারানী, তুমি কম কিসে ? তখন ধারিণী, কোনই উত্তর দেন নাই, বরং মনে মনে বলিয়াছিলেন ‘মুঢ়ে পরিব্রাজিকে ! আমি জাগরিত, আর তুমি ভাবিতেছ যে আমি স্তম্ভ ? অর্থাৎ তুমি আমাকে আমার পতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চাও ? তোমাদের অভিপ্রেত মালবিকা-নর্দন আমার দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতে চাও ? আর তোমার নিজের নিরপেক্ষতার ভান দেখাইতে চাও ?

বিদুষকের কৌশলে, গণদাস ও হরদত্তের বিবাদ বাধিলে, যখন পরিব্রাজিকা শিষ্যবিদ্যা দ্বারা আচার্য্যের গুণবত্তা পরীক্ষা করিতে মনন করিলেন, এবং তদনুসারেই গণদাস-শিষ্যা মালবিকার নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান

হইল, তখন মহারাণী বুঝিয়াছিলেন যে, কি একটা যেন গভীর ষড়যন্ত্র হইয়াছে ; রাজা, বিদুষক, পরিব্রাজিকা, এমন কি, পরিচারিকাগণ পর্য্যন্ত সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । ধার্মিনী ইচ্ছা করিলেই মালবিকার নৃত্যে বাধা দিতে পারিতেন, সকলেরই গূড় অভিপ্রায় অন্ধুরে বিনষ্ট করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাট । তিনি যে চক্রান্তটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কবি, মধো মধো, ধার্মিনীরই কথা দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন । রাজার সঞ্চিত মালবিকার মিলন ইউক, উহা ধার্মিনীর আন্তরিক বাসনা ছিল । ইরাবতী নৃত্য-গীতাদি-কলায় সমাক্ষ পারদর্শিনী ছিলেন, মালবিকা বর্দি, ঐ সকল বিদ্যায় তাদৃশী ব ততোধিক পারদর্শিনী না হইলেন, তবে অগ্নিমিত্রের ইরাবতী-বিনুন্ধৃদয় আকৃষ্ট করা যে বড়ই কঠিন, এ তত্ত্ব ধার্মিনী সবিশেষ বিদিত ছিলেন । তাই তিনি, অসহিষ্ণু অগ্নিমিত্রের মালবিকা-দর্শন-বাগ্যতায় অন্ত বিরতি প্রকাশ করিতেছিলেন ।

ধার্মিনী রাজ-সংসারের প্রবীণ গৃহিণী, তাঁহার চরিত্রের কোন স্থলেও কোন প্রকার তারণ্য প্রকাশ পায় নাট । তিনি প্রথমে যে প্রকাশ দীর, শেষে—অর্থাৎ যখন রাজার করে বধূ-বেশা মালবিকাকে সমর্পণ করেন, তখনও সেট প্রকার দীর । তিনি, যখন 'বুঝিলেন যে, তাঁহার জীবিতেশ্বর অগ্নিমিত্র তাঁহাকে লুকাইয়া, মালবিকার সঙ্ঘ-সম্মিলিত হইতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, মালবিকাও সরল-হৃদয়ে ছায়া ছায়, রাজার অনুবর্তিনী হইয়াছেন, এখন তাঁহার অতুল আনন্দ হইল : তখন মালবিকাও নানা বিদ্যায় নিপুণা হইয়াছেন, এ দিকে নবীন বয়স্ক্রমের গুরুভারে মালবিকার দেহ-মন সকলই আনত হইয়াছে, রাজা এবং মালবিকা উভয়েই উভয়ের সন্দর্শনার্থে একান্ত আকুণ্ঠ । তখন ধার্মিনী মালবিকাকে অশোকের দোহদ করিতে পাঠাইলেন পাটরাণী স্বয়ং যে কার্য্য করিবেন, তাহাতে মালবিকাকে প্রতিনিধি

নিযুক্ত করিলেন। প্রধান মহিষীর প্রতিনিধি হইয়া মালবিকা প্রধান মহিষীরই উদ্যান-বাটিকায় গেলেন। মহারাণী জানিতেন যে, মালবিকাকে তিনি একটা অবসর বা সুযোগ করিয়া দিলেন। তিনি আরও জানিতেন যে, তাঁহার উদ্যানে মালবিকার গমনে কতদূর কি ঘটিতে পারে, ইহার পরিণাম কি, কিন্তু জানিয়াও তিনি মালবিকাকে বলিয়া দিলেন, 'নদি তোমার দোহদে অশোকে দুল ফুটে, তবে আমিও তোমার অভিলাষ পূরণ করিব।' মালবিকার যে কি অভিলাষ, তাহা প্রবীণা মহারাণী বুঝিয়াছিলেন, এবং সে অভিলাষ পূরণে তিনি পূৰ্ব্ব হইতেই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মালবিকাকে কদাচ সে সঙ্কল্পের বিন্দু-বিসর্গও জানিতে দেন নাই। তাঁহার ভয়ে দুঃখিনী মালবিকা সততই কাতর, মালবিকা প্রাণ ভরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসটিও ছাড়িতে পারেন না। ধারিণী এ সমস্তই বুঝিতেন। এখন সময় হইয়াছে, তাই, মালবিকাকে আভাসে জানাইলেন যে, তোমার আকাঙ্ক্ষা আমিই পূর্ণ করিব। আর দুই দিন পরে, ধারিণী স্বয়ং যাহাকে বিদিশার রাণী করিবেন, আজ তাহাকে প্রথম নিজের প্রতিনিধি করিলেন। মালবিকা সত্য সত্যই যেন, এত দিন পরে, কতকটা অগ্রসর হইলেন।

ধারিণী নিজের অতিশয় সম্প্রদায়ণা ছিলেন। তিনি বয়সে প্রবীণা, তাঁহার পুত্র উপযুক্ত, সুতঃ সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ধারিণীর হৃদয়, রাজ্যের ওভালুখ্যানেই নিয়ত তৎপর ছিল। শান্ত-হৃদয়া মহারাণী নিয়ত অবলা-প্রিয় অগ্নিমিত্রের ছায়ার ছায় অহুর্ভর্তন করিতেন, কিন্তু সে সমস্তই অগ্নিমিত্রের প্রীতির জন্ত, অগ্নিমিত্রের সুখের জন্ত; নতুবা তাঁহার ধার-প্রবীণ হৃদয়ে, আপনার জন্ত কোন প্রকার চাঞ্চল্য ছিল না, ভোগের তাড়নার তাঁহার প্রাণ আকুল ছিল না।

তিনি হৃষিক-হৃদয়ে, রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পরই, যখন, পরিচারিকাবৃন্দ, এমন কি তাঁহার নিয়ত-সঙ্গিনী

পরিব্রাজিকাও আসিয়া মালবিকাকে 'রাণী' বলিয়া অভিবাদন করিল, মালবিকার মুখাপেক্ষিণী হইয়া, যখন সকলে মালবিকাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আর পাটরাণী ধারিণী একাকিনী সভার এক কোণে পড়িয়া রহিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে ক্ষণকালের জন্ত একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি শূন্য-নয়নে পরিজনের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন ; এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, কি একটা যেন গুরুতর ব্যাপার ঘটিল, যাহার ফলে, কাল যাহার! তাঁহার আপনার জন ছিল, আজ তাহারাও তাঁহার 'পর' হইয়া গেল।

অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার পরিণয়ের পর, অগ্নিমিত্র-গত-হৃদয়া ধারিণীর মনের যদি এই ভাবান্তর না ঘটিত, তাহা হইলে, স্ত্রী-চরিত্রের ব্যাহানি হইত, রমণী সৃষ্টি অস্বাভাবিক হইত। তাই কবিকুলোস্তুম সকল দিক রক্ষা করিলেন। ধারিণীর 'পরিজনমবেক্ষণে'—এইটুকু পরিচয় দিয়া, সমগ্র ধারিণী-চরিত্রটি উজ্জ্বলতর করিয়া দিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

ইরাবতী ।

এই নাটকের মধ্যে, একদিকে মালবিকা-চরিত্র যেমন সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সম্পূর্ণ, অত্ৰদিকে ইরাবতী চরিত্রও তদ্রূপ সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সম্পূর্ণ । অথবা পূৰ্ব্বাপর পর্যালোচনা করিলে, মনে হয়, এই নাটকের জ্ঞা-চরিত্র-সমূহের মধ্যে ইরাবতীচরিত্রই বুঝি উৎকৃষ্ট । ইরাবতী এক সনয়ে ধারিণীর সচ্চরী ছিলেন । চিত্রবিদ্যা, গীতবিদ্যা ও নৃত্যাদিবিষয়ে তাঁহার অশেষ দক্ষতা ছিল । বিধাতা তাঁহাকে অতুল সৌন্দর্যের আধার করিয়াছিলেন । বয়ঃক্রমও তত অধিক নহে । তাঁহার হৃদয় অতিশয় সরল, স্বচ্ছ দৰ্পণবৎ নিৰ্ম্মল ! তিনি কোন প্রকার চক্রান্তে বা রাজ-সংসারের কোনরূপ কূটপরামর্শে কদাচ থাকিতেন না, ও সব তিনি জানিতেনই না । রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আর তিনিও রাজাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রাজ-কৃত অনুকম্পার প্রতিদান করিয়াছিলেন । তিনি উচ্চবংশোদ্ভব! না হইলেও, তাঁহার হৃদয় কিন্তু সমুচ্চ-গুণ-সম্ভারে অলঙ্কৃত ছিল । সেট গুণের দ্বারাষ্ট তিনি বিদিশেশ্বরের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন । অগ্নিমিত্রের অনুগ্রহে রাজ-সংসারে তাঁহার অপার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল । কিন্তু কখনও তিনি কাহারও কোনরূপ হুঃখ কষ্টের হেতু হয়েন নাট । তাঁহার ব্যবহারে কেহ সন্দেহ বই ব্যথিত হইত না । এতই সুন্দর তাঁহার চরিত্র । রাজা অগ্নিমিত্র বাতীত তাঁহার জগতে অত্ৰ কিছুই চিন্তনীয় ছিল না । তিনি অত্ৰ কোন কার্য্যেই থাকিতেন না : রাজবাড়ীতে আমোদ প্রমোদ, নিত্য উৎসব, এ সমুদয়ে তাঁহার কোনই রতি ছিল না । উদ্যানের একপার্শ্বে, সূর্য্যামুখী যেমন, সূর্য্যের উদ্দেশে ফুটিয়া থাকে, তদ্রূপ ইরাবতীও জনতাময় রাজ-প্রাসাদের এক প্রান্তে রাজা অগ্নিমিত্রের ধ্যানেই নিমগ্ন থাকিতেন ।

তাহার সে সরল হৃদয়ের প্রণয়-সম্পদ যেন এ মর্ত্যের উপযোগিনী নহে । অনেকাংশে তাহা দিবা-ভাবাপন্ন । ধারিণী মনে মনে ইরাবতীর উপর একটু অসুখাবতী ছিলেন সত্য, কিন্তু ইরাবতী কদাচ ধারিণীর উপর বিরক্ত ছিলেন না । তিনি ধারিণীকে সর্বদাই জ্যেষ্ঠ-সহোদরার আয়াজ্ঞান করিতেন । সংসারের প্রধান কর্তাকে যেমন সম্মান করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ সম্মান করিতেন । ইরাবতী রাণী হইয়াও ধারিণীকে অভিভাবিকার মত দেখিতে বিশ্বস্ত হয়েন নাই । অগ্নিমিত্র-বিষয়িণী মনুষ্যতা তাহার অত্যধিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও কিন্তু ধারিণীর উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল । ধারিণী-কড়ক যে তাহার কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন না । তাই অশোককুঞ্জে রাজার সহিত মালবিকার সাক্ষাৎকারের কথা, তিনি আসিয়া ধারিণীকেই বলিয়া দিলেন । সকলপ্রাণ জানিতেন যে, ইহাতেই উপযুক্ত প্রতিবিধান হইবে । তাহার হৃদয়ের এই সারল্যেই রাজা আশ্চর্যবিশ্বস্ত হইয়াছিলেন । ইরাবতীর কেবল এত সকল সঙ্গুণেই যে রাজা তাহাকে ভাল বাসিতেন তাহা নহে, সেই ভালবাসার সঙ্গে, তাহার উপর রাজার একটা সম্মান বুদ্ধিও ছিল । রাজা তাহাকে সর্বদা স-সম্মানে দেখিতেন । রাজা জানিতেন যে, ইরাবতী সমস্ত সহ্য করিতে পারেন, কেবল একটা-বিসয় ইরাবতীর অসহ্য । প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দী তিনি সহ্য করিতে পারেন না । ওরূপ কল্পনাতেও তিনি উন্মাদিনী হইয়া উঠেন, তখন তাহার আর জ্ঞান থাকে না । তিনি প্রাণ দিয়া রাজাকে ভাল বাসিতেন ; রাজা ব্যতিরিক্ত সংসারে তাহার অত্ম আকর্ষণ ছিল না, তিনি ভ্রমক্রমেও কখনো ভাবেন নাই যে, তাহার হৃদয়-দেবতা অত্ম-সংক্রান্ত-হৃদয় হইতে পারেন, ইরাবতী-বল্লভ তদীয় অর্পিত হৃদয়ে অত্মজ পুনর্দান করিতে পারেন । নারী-হৃদয়ের এই কমনীয়তার রাজা অধিকতর বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন ।

যখন ইরাবতী ধারিণীর সহচরী, তখন বিদূষকের কৌশলেই তিনি প্রথমে রাজ-নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, বিদূষকই তাঁহার বাঞ্ছিত পূরণ করিয়াছিলেন ; এইজন্ত, তিনি, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, সতত লোলুপ বিদূষক ব্রাহ্মণকে কত প্রকার মিষ্টান্ন প্রদান করিতেন, হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন । ইতভাগিনী মরল-প্রাণা ইরাবতী* বুঝিতেন না যে, যে গড়িতে পারে, সে ভাঙ্গিতেও পারে । তিনি বুঝিতেন না যে, সে বিদূষক তাঁহাকে পরিচারিক। হইতে রাগী করিতে পারিয়াছে, * তাঁহার ক্ষমতা কত, প্রয়োজন বোধ করিলে, সেই বিদূষকই যে আবার তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, ইহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না । তিনি সকলকেই বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন । সংসারে তাঁহার সুখের পথে কণ্টক জন্মিতে পারে, এ কল্পনাও তিনি করিতে পারিতেন না । ধারিণীর সহচরী যখন বলিয়াছিল যে, নালবিকা দেখিতেছি, ইতি-নমোষ্ট সকল বিষয়ে ইরাবতীকে অতিক্রম করিল, তখন ইহঁতেই নানাজিকগণ বুঝিয়াছেন যে, ইরাবতীর সুখ-স্বপ্ন-ভঙ্গের আর বিলম্ব নাই । কিন্তু মুগ্ধা ইরাবতী ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতে পারেন নাই । তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠমোদরাবৎ পরম সম্মাননীয় পরিণীত তাঁহার সর্বনাশ সাপনে উদাত্ত হইয়াছেন । তিনি যেমন ছিলেন, সেই ভাবেই পরম সুখে আছেন । আপনার ভাবে আপনি ডুবিয়া গাছেন । তাঁহার অসংপাত-সাপনের জন্ত, রাজ-বাড়ীতে যে এত বড় একটা চক্রান্ত চলিয়াছে, ইহার গন্ধও তিনি বিদিত নহেন । রাক্ষসজ্ঞানীতেই যে রাহুর উপদ্রব হয়, ইহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য ছিল ।

ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে, রাজধানী উৎসব-সাগরে নিমগ্ন । ইরাবতী পরম আগ্রহে রাজাকে আহ্বান করিয়াছেন, বাসনা, রাজার সহিত একত্রে দোলাধিরোহণ করিবেন । কিন্তু রাজা এখন আর সে রাজা নাই । রাজা দেখিলেন যে, ইরাবতীর প্রকৃতি যে প্রকার কোমল,

তাহাতে কোনমতে কথাবার্তায়, বা অল্প কোন রূপে, তিনি যদি জানিতে পারেন যে, মালবিকা রাজার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তবে আর ইরাবতীর অভিমানের অবধি থাকিবে না । পরন্তু হৃদয়ের অতি-বেদনায় তিনি মৃতপ্রায় হইবেন । তাই রাজা ইরাবতীর নিমন্ত্রণ রক্ষায় অমত করিলেন । ইরাবতীর আহ্বানে উদাসীন্ন অবলম্বন রাজার এই প্রথম । ইতিপূর্বে আর কখনও এরূপ ঘটে নাট । ইরাবতী পূর্ব পূর্ব বারের ছায়, এবারেও রাজাকে আহ্বান করিয়াই পরিচারিকার সহিত উদ্যানের দোলাগৃহে উপনীত হইলেন । তিনি জানেন, তাঁহার আহ্বানে রাজা না আসিয়া থাকিতে পারেন না, কোন দিন পারেন নাট । তাই ইরাবতীর ধারণা যে, রাজা নিশ্চয়ই তাঁহার আগমনের পূর্বে আসিয়া, দোলাগৃহে, পূর্বের ছায়, তাঁহার অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন । কিন্তু ফল বিপরীত হইল । পরিচারিকা নিপুণিকাকে লইয়া দোলাগৃহে প্রবেশ-পূর্বক, ইরাবতী দেখিলেন যে, সে গৃহ শূন্য, তথায় রাজা নাট । তাঁহার বক্ষের পঙ্কজ যেন শতশা ভগ্ন হইল । তাঁহার জীবনে এই প্রথম নৈরাশ্র ! এই প্রথম আহ্বানভঙ্গ ! তিনি প্রথমতঃ কত প্রকারে মনকে প্রবোধ দিলেন, ভাবিলেন, ‘হয়ত’ অর্থাপূত্র আমাকে অপ্ৰতিভ করিবার উদ্দেশে কোথাও অন্তরিত হইয়া আছেন’, তাই রাণী রাজার অন্বেষণে তৎপর হইলেন, কিন্তু তাঁহার মদবিহ্বল চরণ বার বার স্থলিত হওয়ায় অধিক দূরে যাউতে পারিলেন না ।

বিদূষক পূর্ব হইতেই রাজাকে উদ্যানে আনয়ন করিয়াছিলেন ; কেননা, তিনি জানিতেন যে, আজ মালবিকা অশোকের দোহদ করিতে আসিবেন । রাজা আসিয়াছেন, মালবিকার দোহদাছুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । রাজা মালবিকার সম্মুখে অল্পনয়-পর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে রাজাষেধিণী ইরাবতী, মছরপদে আসিতে আসিতে, দূর হইতেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন ।

তাঁহার প্রিয়তম, আজ অশ্রু রমণীর সহিত, বিশেষতঃ একটি পরিচারিকার সহিত, নির্জনে, রাণীদের উদ্যান-বাটিকায় কেন উপস্থিত?— ভাবিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তিনি রাজাকে তিরস্কার করিলেন! কোথায় রাজা তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া, দোলাগৃহে পূর্বের ভ্রায় অপেক্ষা করিবেন, আর কিনা তিনি অশ্রু ললনার সহিত অশোককুঞ্জে রহস্তালাপ করিতেছেন, এ ব্যাপারে, ইরাবতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। “তুমি রাজা, পরিচারিকার সহিত কথা কহিবারই বা তোমার প্রবৃত্তি হইবে কেন?” বলিয়া যেমন তিনি রাজাকে ধিক্কার দিলেন, অমনি ধূর্ত বিদুষকও বলিল, “রাণি! তুমিও একদিন পরিচারিকা ছিলে!” একে রাজার ব্যবহারে ইরাবতীর বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার উপর আবার ক্রুর বিদুষকের এই মর্শ্বেদিনিী শ্লেষোক্তি,—ইরাবতীর একপ্রকার সংজ্ঞালোপ হইল। তিনি বেদনার গুরুভারে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “তবে আর কেন? যত পার, তোমরা কল্যাণ কর, আমার হৃদয়কে কেন আর বাতনা দিই!”—বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার সুখ-শশী এ জন্মের মত রাহু-গ্রস্ত হইয়াছে; আর মুক্ত হইবে না। তাঁহার মর্শ্বস্থল হইতেই যেন ধ্বনি উঠিল, “হায়, পুরুষ প্রতারক, অবিবাসী”। রাজার শত অহুনয় অপেক্ষা-পূর্বক ভগ্নহৃদয়া ইরাবতী সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন চিরকালের মত ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি এতদিন পরে বুঝিলেন যে, তাঁহার মত নিঃস্ব জগতে আর দ্বিতীয় নাই; আজ তিনি এক গাছি তৃণ অপেক্ষাও দুর্বল। তিনি চতুর্দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, তাহার কেহই নাই, তিনি নিঃসঙ্গল, হতশরীর।

ইরাবতীর প্রাণে বড়ই বেদনা লাগিল। কিন্তু সে বেদনা, তিনি

নীরবে ভোগ করিতে লাগিলেন । অল্প কাহাকেও জানিতে দিলেন না ।
 তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবেন না ।
 আর কেনই বা দেখাইবেন ? তিনি পরিচারিকা ছিলেন, 'আপনার
 অবস্থায় আপনি সন্তুষ্ট ছিলেন । পৃথিবী-পতি তাঁহার হৃদয়ে উচ্চ আশা
 জাগাইয়া, তাঁহাকে উচ্চস্থানে আরুঢ় করিয়া, অতর্কিতে ফেলিয়া
 দিয়াছেন ; পূর্বে যে স্থানে ছিলেন, তথায় নহে, তদপেক্ষা অনেক নিম্নে
 ফেলিয়া দিয়াছেন । তাই নিঃসঙ্কলা নিরাশ্রয়া ইরাবতী আর জগদ্বাসীর
 সমক্ষে মুখ দেখাইতে বাসনা রাখিলেন না । তিনি স্থির করিলেন যে,
 অতীত সুখের স্মৃতি বক্ষে লইয়া, গহন কাননজাত কুসুমের স্থায় অবিজ্ঞাত
 ভাবে বিস্কন্ধ হইবেন । যখন এই সঙ্কল্প করিলেন, তাঁহার পর হইতেই
 তাঁহার হৃদয়ে একটু বল আসিল । বহুক্ষণ তৃষ্ণা, ততক্ষণই যাতনা,
 তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে, যাতনা কিসের ? তাই দেখিতে পাই, যখন,
 সমুদ্রগৃহে, চিত্রলিখিত অগ্নি-মিত্রের নিকটে ক্ষণ প্রার্থনা করিতে যাওয়া,
 তথায়ও ইরাবতী রাজা, মালবিকা এবং সেই ঘটকচূড়ামণি বিদূষককে
 আবার সমবেতভাবে দেখিতে পাঠিলেন, তখন কিন্তু তিনি কোন প্রকা-
 রক্রোধের ভাব দেখান নাই, বেশী কথা কহেন নাই । যেখানে জীবনের
 প্রধান সুখের ছবি চিত্রিত রহিয়াছে, সেই সমুদ্র-গৃহে, সেই চিত্রের নিকটে
 ইরাবতী জীবনের সুখের চিরবিসর্জজন-কাহিনী কহিতে আসিয়াছেন,
 বর্জনান এবং ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, অতীত প্রণয়ের স্মৃতিতে দীক্ষি-
 ত হইতে আসিয়াছেন । সেখানে আসিয়াও যখন দেখিলেন সেই ত্রিমূর্তি
 রাজা, মালবিকা ও বিদূষক, তখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা যে কীদৃশ
 তাহা সহৃদয়সম্বোধ্য । বর্ণনীয় নহে । কালিদাস অতি ভয়ানক ক্ষেত্রে
 ইরাবতীকে উপস্থিত করিয়াছেন, ওরূপ স্থলে অধিকক্ষণ থাকিলে
 অতি কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায় । মানুষ মরিয়া যায় । ইরাবতীর
 কথাই নাই ; তিনি অতি ।

বিগ্রহবতী অতি

দেবতা। তাই কবি তাঁহাকে অধিকক্ষণ, ঐ মন্দিরদ্বারক ব্যাপারে লিপ্ত রাখেন নাই। রাজা মালবিকা প্রভৃতির সমক্ষে, সমুদ্রগৃহে, তিনি অধিকক্ষণ থাকেন নাই। সমুদ্রগৃহে আসিয়াও, যখন তিনি ঐ ত্রিমূর্তিকে একত্র দেখিলেন, তাহার পূর্ব হইতেই সেই অশোককুঞ্জের ঘটনার পর হইতেই তিনি তাঁহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এবারকার মত তাঁহার সাধের বিপণি ভাঙ্গিয়াছে, এবার আর হইবে না। ওরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকা যায় না।

• প্রাণ-দণ্ডের আদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট জীবন-কাল নিরবচ্ছিন্ন কষ্টেরই কারণ। ইরাবতীর অবস্থাও সমুদ্রগৃহে আগমনের সময়ে ঠিক তদ্রূপ। তাই মহাকবি, ইহাৎ বসুলক্ষ্মীর বানরাক্রমণের ব্যাপার অবতারণা করিয়া, ঐ কষ্টময়, বেদনাময় দৃশ্য অন্তরিত করিলেন। সরলা ইরাবতী, যেমন শুনিলেন যে, বসুলক্ষ্মীর বিপদ, অমনি সমস্ত ভুলিয়া, রাজাকে লইয়া ক্ষিপ্ৰপদে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। যে ধারিণী তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন, বসুলক্ষ্মী তাঁহারই কন্ঠা; কিন্তু ইরাবতী সে সমস্ত মনেও করিলেন না। তাঁহার এই সর্বনাশের জ্ঞাত্য তিনি আপন অদৃষ্টকেই দোষী করিয়াছিলেন, পরের উপর দোষ দিতেন না। এতই উদার তাঁহার অন্তঃকরণ।

যখন মালবিকার বিবাহ, তখন ধারিণী ইরাবতীর মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কাতরপ্রাণা ইরাবতী শাস্তভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, “আপনি অঁঠা, যাহা ইচ্ছা, অন্নান-হৃদয়ে করুন, আমি কে? আমার মতামত থাকে যায় কি?”

যখন রাজা নব-পরিণয়সংস্বে উন্নত, সেই সময়ে, দুঃখিনী ইরাবতী তাঁহার শেষ কথা রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে আমি অপরাধিনী, আপনার যথোচিত সম্মানরক্ষা করি নাই; আপনি এখন অভিপ্রেত লাভে

পরম আনন্দিত, তাই আমার শেষ প্রার্থনা, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অভিমানী বিদিশেশ্বর, ইরাবতীর এই শেষ প্রার্থনারও কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু সফলাভিলাষী গর্বিত মহারানী বলিলেন, “আমার স্বামী অবশুই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।” আজ ধারিণী গর্বভরে বলিলেন, “আমার স্বামী।” উহার পর ইরাবতীর আর কোন সম্মান পাওয়া গেল না। উপেক্ষিত বন-কুম্বের আয় তিনি কোথায় পড়িয়া রহিলেন, কে জানে ?

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

বিদূষক ।

এই নাটকের বিদূষক অতি বিচিত্র প্রকৃতির লোক । সংস্কৃত অথবা কোন নাটকে, এতাদৃশ চতুর, প্রত্যাশপন্নমতি, কার্যদক্ষ রাজ-বয়স্ক দেখিতে পাউ না । রাজধানীতে এমন কেহ ছিল না, যে, বিদূষককে ভয় না করিত । বিদূষকের কৌশলে কে কখন কি বিপদে পড়িবে, এই ভয়ে সকলেই শশবাস্ত । এক দিকে বিদূষকঃ সেমন প্রবল প্রতাপ, অত্মদিকে আবার তাহার কৌতুক-প্রিয়তাও তদ্রূপ । সে কৌতুক-প্রিয়তা আবার এমন তীব্র, এমন শ্লেষ-বহুল যে, যাহার উপর সে গ্রীষ্ম কৌতুকবাণ নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার প্রাণপক্ষী 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িত । রাজা, রাণী, গুরু, পুরোহিত, মন্ত্রী, সেনাপতি, পরিচারিকা—কেহই সে নিশিত শায়কের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না । বাহার যে অংশে যখন যে কোন দুর্দশগার চিহ্ন প্রকাশ পাইত, বিদূষক অননি তাহা বরিয় ফেলিতেন । কাহারই অববাহিত ছিল না । কিন্তু সমস্ত কার্যের মধ্যেই বিদূষকের প্রধান লক্ষ্য ছিল, রাজার চিত্তবিনোদন-সাধন । সে ব্রাহ্মণ, রাজা ব্যতীত অত্মকে জানিতেন না । রাজার প্রীত্যর্থ তাহার অকরুণীয় কিছুই ছিল না । প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, অগ্নিমিত্র প্রোত্ভূত হইয়াছিলেন । এখন ভারতের রাজ-প্রাসাদ নিয়ত চক্রান্তময় ছিল । কি রাজকার্য্য কি প্রণয়কার্য্য, সর্বত্রই ষড়যন্ত্রের একান্ত প্রাবল্য ছিল । এতাদৃশ মহাআরাই সেই সকল বিষয়ে এক প্রকার ধুরন্ধর ছিলেন ।

আমরা প্রথম অঙ্কে দেখিতেছি যে, মহাাণী ধারিণীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্বক, বিদূষক, মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের নয়ন-পথবর্ত্তিনী করিবার উদ্দেশ্যে, এক বিচিত্র কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছেন । ধারিণী মালবিকাকে আচার্য্য গণদাসের গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন, আর

বিদূষক, গণদাস এবং হরদত্ত—দুই আচার্য্যের মধ্যে কৌশলে এমন বিবাদ বাধাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা প্রতিকার-বাসনায় রাজার নিকটে বিচারার্থী হইলেন। এই বিবাদের ফলেই, বিদূষক, মালবিকাকে রাজার গোচর করিলেন।

নৃত্যাবসানে যখন মালবিকা গমনোন্মুখী হইয়াছেন, তখন বিদূষক, কেমন এক কৌশলে মালবিকাকে চিত্রাৰ্পিতের ভ্রায় দণ্ডায়মানা করিয়া, রাজাকে আশ্রয় আশা মিটাইয়া পুষ্পাভূষণরূপে দেখিবার অবসর করিয়া দিলেন। মালবিকা নৃত্য ও আকৃতি দর্শন করিয়া রাজা যে অতিশয় প্রীত হইয়াছেন, ইহা মালবিকাকে উত্তমরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত, এবং মালবিকা হাসিলে কেমন দেখায়, তাহা রাজাকে দেখাইবার নিমিত্ত, বিদূষক রাজার হস্তস্থিত স্তব্ধবলয় নৃত্যের পারিতোষিক বা উপহার দিব্য জন্ত, যখন তাহা খুলিতে যান, তখন অস্বাভাবী ধারিণী বাধা দিলেন। বিদূষকও এমন একটি কথা বলিলেন, যাহাতে তত্রত্য সকলেই হাসিয়া পড়িলেন। কুম্ভ-কোরক-দশনা মালবিকাও হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না। বিদূষকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

নৃত্য-শেষে, যখন মালবিকা চলিয়া গেলেন, আর রাজা বিষম-হৃদয়ে হরদত্ত-শিব্যের অভিনয় দর্শনের জন্ত, বিরক্তির সহিত বসিয়া রহিলেন, তখন চতুর বিদূষক, বৈতালিকদিগের মধ্যাহ্নকালসূচক স্তুতিপাঠ প্রবণ মাজেই, কত প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে, সময়ে স্নানাহারের উপকারী বুঝাইয়া দিলেন। যেন আর ক্ষণকালও বিলম্ব করা বিধেয় নহে করিলেই স্বাস্থ্যভঙ্গ নিশ্চিত। বিদূষকের উদ্দেশ্য ছিল—রাজাকে মালবিকা-প্রদর্শন, তাহা ত হইয়া গিয়াছে, তবে আর কেন? হরদত্তের পরীক্ষা প্রয়োজন কি?

ধারিণী নিকটে ছিলেন বলিয়া, নৃত্যের দিন, রাজা মালবিকাকে ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আর একবার দেখিবার অভিলাষ। কিন্তু

ধার্মিণীর শুয়ে সে অভিলাষ প্রকাশ করিবার সামর্থ্যও নাই। বিদুষক অমনি সন্মুখ হইলেন। রাজাকে আশা দিলেন। মালবিকার পরিচারিকা বকুলাবলিকাকে হস্তগত করিয়া সাক্ষাৎকারের সকল ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সে সাক্ষাৎকারের এক প্রধান অন্তরায় আছেন ধারিণী। যদি তিনি কোনরূপ বিড়ম্বনা ঘটাইয়া বসেন, তাই চতুর বিদুষক পূর্বাঙ্কেই সে পথ বন্ধ করিলেন। ধারিণী একদিন দোলারোহণ করিয়াছেন, এমন সময়ে চঞ্চল বিদুষক যেন আরও একটু চঞ্চলতর হইয়া, ধারিণীকে দোলা হইতে কেলিয়া দিলেন। হৃৎকম্পিত মহারাণী দোলাস্থলিত হইয়া চরণে আঘাত-প্রাপ্ত হইলেন ও কতিপয় দিবস শয্যাশায়িনী হইয়া রহিলেন। এই অবসরে, বিদুষক, উদ্যানে দোহদকারিণী মালবিকার সহিত রাজার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন।

ইরাবতী-কৃত-অভিযোগে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই, মহারাণী ধারিণী যখন মালবিকাকে ‘সার-ভাণ্ডাগৃহে’ আবদ্ধ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, আমার এই অঙ্গুরীয়ক-প্রদর্শন ব্যতীত যেন ইহাকে কেহ মুক্ত না করে, তখন এই বিদুষকেই কেতকী-কণ্টক-দ্বারা অঙ্গুলী ক্ষত করিয়া, সর্পাঘাত বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়াছিলেন। পরিত্রাজিকার সহিত পূর্বেই পরামর্শ ছিল। পরিত্রাজিকা বলিলেন, ‘এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ‘নাগমণি।’ নাগমণি স্পর্শে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়। কোথায় নাগমণি মিলিবে?’ দয়াবতী ধারিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ‘কেন, আমার এই অঙ্গুরীয়কেই ত নাগমণি আছে, ইহা লইয়া যাও, গোতমের অগ্রে প্রাণ রক্ষা কর, তারপর অন্য কার্য’। ধারিণী অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া দিলেন, আর ধূর্তপ্রবর গোতম অমনি, সেই অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শন করিয়া অবরুদ্ধ মালবিকার উদ্ধার সাধন করিলেন। এইরূপে, যখন যে স্থানে রাজার অভিপ্রায় সাধনের পথে কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, তখনই বিদুষক স্বীয় অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অপরিচ্ছেদ্য নৈপুণ্য বলে,

তাঁহার তিরোধান করিয়াছেন । বিদুষকের সম্মুখে যে রূপ প্রতিবন্ধকই আপতিত হউক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপসারণ করিয়াছেন । ভবিষ্যতে কি হইবে, এ চিন্তা তাঁহার ছিল না । তিনি করিতেও জানিতেন না । অথবা যাঁহারা পরনাগোপজীবী, তাঁহাদের চিত্তে বুঝি বা ভবিষ্যৎ চিন্তার উদ্রেকই হয় না । বর্তমান লইয়াই তাঁহারা বাস্তব । বিদুষকও বর্তমান লইয়া বাস্তব ছিলেন । কালিদাস এমন কোশলেই বিদুষক-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যে, এষ্ট নাটকের প্রতিকার্ষো, প্রতি বৃদ্ধান্তে, সে চরিত্রের ক্ষুরণ হইয়াছে । সে চরিত্রের আলোকে নাটকের সৰ্ব্বাংশই আলোকিত । যে স্থানে অদ্ভুত বাপার, যে স্থানে রহস্য-কৌতুক, যে স্থানে সঙ্কট, সেই স্থানেই সে চরিত্র প্রধান আকর্ষণ স্বরূপ । মনে হয়, বিদুষককে বাদ দিলে, মালবিকাগ্নিনিদ্র নাটকের নাটকত্বই বাহ্য হইত । নাটকীয় বস্তুর এমন উপযোগী বিদুষক-কালিদাসের অস্ত্র কোন দৃশ্যকাব্যে উপলব্ধ হয় না ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পরিব্রাজিকা ।

এই নাটকের অন্ততন পাত্র পরিব্রাজিকা বা ‘পণ্ডিত কৌশিকীর’ চরিত্রও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ত কোথাও, নাটকের অপ্ৰধান পাত্রের এমন সম্পূর্ণ চরিত্র পরিলক্ষিত হয় না। পরিব্রাজিকার তুলনা পরিব্রাজিকা স্বয়ং। তাহার চরিত্রের অমুকরণে, মহাকবি ভণ্ডুতি কামন্দকী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু যতি-বেশ-ধারিণী পরিব্রাজিকার সমক্ষে সে কামন্দকী-সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য নহে।

পরিব্রাজিকা ভারতের তদানীন্তন সম্রাট এল্লম্বংশের কন্যা। ধনবান্ ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের কন্যার শিক্ষা দীক্ষা সে কালে যে কিরূপ হইত, তাহার কতকটা আভাস, আমরা এই পরিব্রাজিকা চরিত্রে দেখিতে পাই। সকল বিষয়েই তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যে স্বয়ং নৃত্যগীতাদি করিতে পারিতেন, এরূপ কোন নিদর্শন আমরা নাটকে পাই না বটে, কিন্তু নৃত্যগীতাদি বিষয়ক শাস্ত্রে যে তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, ইহার প্রমাণ এই নাটকের প্রথম অঙ্কেই পাওয়া যায়।

কি উপায়ে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষ-ভাবে জানিতেন। তিনি বিদভ হইলে, তদীয় অগ্রজ মন্ত্রী সুমতির সহিত, মালবিকাকে লইয়া বিদেশায় আসিতেছিলেন, পশ্চিমধ্যে বিপৎপাত হওয়ায়, কে কোথায় চলিয়া গেল! তাহার অগ্রজ মন্ত্রিবর সুমতির বিনাশ হইল, এসমস্তই তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার মনে কেমন একটা নিবেদ উপস্থিত হইল, তিনি আর বিদর্ভে ফিরিলেন না। পরিব্রজ্যা-গ্রহণ-পূর্বক, বিদেশায় উপনীত হইলেন। ইহা যে সময়ের ঘটনা, তখন ভারতের অবস্থা আর এক প্রকার ছিল। তখন দেবতা-ব্রাহ্মণে মানুষের অগাধ ভক্তি ছিল। পরিব্রাজিকার ছায়া শুদ্ধশীলা দেবীকে পাইয়া,

বিদিশেশ্বর আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিয়া, ইষ্টদেবীর মত সম্মান করিয়া, তাঁহাকে রাজ-সংসারে বাস করিবার জন্ত প্রার্থনা জানাইলেন । পরিব্রাজিকার ভোগোপভোগ হৃদয়ে রাজপ্রাসাদ ও পর্ণকূটর, উভয়ই তুল্য । তিনি রাজার প্রার্থনা পূরণ করিলেন । তাঁহার উপর মহারাণী ধার্মিকীর অগার বিশ্বাস । পরিব্রাজিকার অনুমতি ব্যতীত, পরিব্রাজিকার পরামর্শ ব্যতীত, মহারাণী কোন কার্য্যই করিতেন না । এইভাবে, রাজা ও রাজ্ঞীর পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া, পরিব্রাজিকা মহা সম্মানের সহিত, রাজ-প্রাসাদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । কিন্তু দিগ-দর্শন যন্ত্রের শলাকা যেমন নিয়ত উত্তরমুখী, কোন অবস্থাতেই তাহার ব্যত্যয় হয় না, তজ্জপ, তাঁহারও চিত্ত, প্রতিনিয়ত পরিচারিকা মালবিকার উপর স্থির ছিল । কোনক্রমেই সে হৃদয় মালবিকা-পরানুখ হইত না । রাজ-নন্দিনী মালবিকা অদৃষ্টবশে পরিচারিকাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার সৌভাগ্য-দেবতা যেন ছদ্মবেশে রাজসংসারে আসিয়া, তাঁহারই শুভানুধ্যানে রত রহিয়াছেন । রাজ-সংসারের কেহই জানিত না যে, তাঁহার সহিত মালবিকার কি সম্বন্ধ ।

পরিব্রাজিকা নিয়ত নির্লিপ্ত-ভাবে থাকিতেন সত্য, কিন্তু রাজ-সংসারের কোথায় কখন কি ব্যাপার ঘটে, তৎপ্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন । কোন কার্য্যই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না । প্রতিভাবলে, তিনি, রাজ-প্রাসাদের সর্ববিষয়ের এক প্রকার কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন । নতুবা, ভারতেশ্বরের নাট্যচার্য্যগণের বিবাদ-মীমাংসায় তিনি রমণী হইয়াও মধ্যস্থ হইবেন কেন ? তাঁহার বিদ্যাবতায়, তাঁহার নিরপেক্ষতায় এবং ততোধিক তাঁহার অলুপ্ততায় রাজ-সভার তথা অন্তঃপুরের সকলেই বশীভূত ছিলেন ! যখনই মালবিকা বিপন্ন হইয়াছেন, তখনই তিনি সে বিপদের প্রতি-বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না । মালবিকার অবরোধের কথা তিনিই প্রথমে বিদূষককে

জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, নাগমণির দ্বারা যে সৰ্পবিষের ধ্বংস, এ রহস্য তিনিই প্রকাশ করিয়া ধারিণীর অনুরীয়ক-লাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন । আবার তিনিই ধারিণী-কর্তৃক অনুকম্পিত হইয়া, পরিণয়কালে মনের মত করিয়া মালবিকাকে সাজাইয়াছিলেন । রাজ-প্রাসাদের নানাবিধ কূটক্রান্তের মধ্যে থাকিয়াও, পরিব্রাজিকা স্বীয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিয়াছিলেন । তাঁহার স্বর্গগত অগ্রজ সুমতির পরামর্শানুসারে মাধবসেন মালবিকাকে অগ্নিমিত্রো সহিত বিবাহ দিতে আসিতেছিলেন, দৈব-চর্কিপাকে তাহা ঘটয়া উঠে নাই । অগ্রজের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই । সোদর্য পরিব্রাজিকা এই দীর্ঘকাল আত্ম-গোপন করিয়া, কত কষ্টে থাকিয়া, অগ্রজের সে অভিলাষ পূর্ণ করিলেন । মাধবসেনের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন । ভারতেশ্বরের সহিত সৌহার্দ স্থাপিত করিয়া দিলেন । অন্তর্বিপ্লবানল-দগ্ধ বিদর্ভে মাধবের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন ।

মালবিকাকে রাজ্যের করে সমর্পণ করার পর, যখন ধারিণী বুঝিলেন, এতদিনে তাঁহার আত্ম-বলিদান হইল, ইরাবতীও যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সম্পূর্ণ হইল, রাজ-সংসারে ধারিণীর থাকা এখন প্রতিপদে বিড়ম্বনাময়,—তখন, ধারিণীর মুখচ্ছবি-দর্শনেই পরিব্রাজিকা তদীয় হৃদয়-ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে প্রবোধচ্ছলে বলিলেন—“সাম্বী পতিবৎসলা কামিনীরা পরম শত্রুর দ্বারাও পতির সেবা করিয়া থাকেন, রাজ্ঞি ! ‘সাগর-গামিনী স্রোতোবহা’ যেমন নিজের সাগরের সহিত সঙ্গত হয়, তেমন আর দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীকেও লইয়া সমুদ্রে মিলাইয়া দেয় । সুতরাং তুমি বিমনা হইও না ।” পরিব্রাজিকা যেন কিছুই জানেন না । সকলই যেন ধারিণী করিয়াছেন ।

প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, ধারিণী-চরিত্র অপেক্ষা পরিব্রাজিকা-চরিত্র অধিকতর চমৎকারিতাময়, নিপুণ ও প্রতিভাপূর্ণ বলিয়া মনে হয় ।

ধারিণী মালবিকাকে ভাল বাসিতেন, কতাদিক স্নেহ করিতেন । ইরাবতীর গর্ষ খর্ব করিতে যাইয়া, তিনি নিজেও অনেকটা খর্ব হইলেন । আশু পরিব্রাজিকাও মালবিকাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, সে ভাল বাসার পরিচয়স্বরূপ তিনি মালবিকাকে পূর্ব সঙ্কল্পিত পাত্রে সম্প্রদান করিয়া, 'স্বয়ং অক্ষত-চরিত্রে বাহির হইলেন । ধারিণীর স্নেহে একটু স্বার্থ ছিল । পরিব্রাজিকার স্নেহ নিঃস্বার্থ । স্বার্থপূর্ণ স্নেহের পরিণাম 'যে মঙ্গলজনক' নহে, মালবিকার পরিণামে ধারিণী গ্রাম বেশ বৃক্ষে পাবিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় নাহি । অক্ষত এখন হস্তচূত । ধারিণীর স্বার্থ-গন্ধ স্নেহের পরিণাম দুঃখময় ; আশু পরিব্রাজিকা নিঃস্বার্থ স্নেহের পরিণাম সুখময় মঙ্গলময়, তিনি যে রাজ্যের 'অধিবাসিনী', সেট বিদর্ভের অশেষ কলাণময় । যে স্থানে নিঃস্বার্থ স্নেহের নির্বর প্রবাহিত, সে স্থানের অভূতাব্য নিশ্চিত । বিদর্ভে মন্ত্রিসোদরা কোশিকীর হৃদয়ে সেট নিকর প্রবাহিত ছিল, তাই অগ্নিমিত্রের কন্যা বিদর্ভ-রাজ-কুমারী অর্পিত হইলেন, বিদর্ভের অশেষ কলাণ হইল । বিদর্ভে বহুকাল-লুপ্ত শান্তি ফিরিয়া আসিল । নাথবসেন ও মঞ্জুসেন উভয়ে, নির্বিবাদে, অগ্নিমিত্রের ব্যবস্থা শুণে, দ্বিধা-বিভক্ত বিদর্ভ-রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । পণ্ডিত কোশিকীর অভিলাষ পূর্ণ হইল । মালবিকার দুঃখময় জীবন-নাটিকার পটপরিবর্তন হইল । তিনি বিদেশধরা-রূপে, উভয় রাজ্যের মঙ্গলকামনায় রত রহিলেন

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

উপসংহার ।

এতক্ষণে মালবিকাগ্নিমিত্রের পাত্রাবলীর চিত্র-সমালোচনা শেষ হইল । উল্লিখিত কতিপয় চরিত্র বাবতীত, নিপুণিকা বকুলাবলিকা প্রভৃতি আরও কয়েকটি অপ্রধান পাত্রের চরিত্রও বিশেষ দ্রষ্টব্য । মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহার পাত্রাবলীর প্রত্যেকটিই স্ব স্ব চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দ্বন্দ্ব অধিষ্ঠিত । কোন পাত্রের চরিত্রেই কোন প্রকার অভাব বা অপূর্ণতা উপলব্ধ হয় না । প্রতি চরিত্রেই স্ব-প্রকাশ ।

এই নাটক কাশিদাসের প্রধান বস্তুে বিরচিত বলিয়া মনে হয় । মহাকবি গ্রন্থে প্রস্তাবনার এ বস্তু সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা দিয়াছেন । এষ্ট নাটকের সর্বত্রই কাশিদাসের অল্পপদ কবিত্ব সহস্র, উপায়াহত নির্বিরণীর জায় নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে । কোথাও সে কবিত্বের কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটে নাই । তবে কাশিদাসের অত্যন্ত দৃষ্টকবোর জায়, ইহাতে, তিনি, তাহার চিত্রপ্রায় স্বভাবের তেনন উদ্ভাদিনী বর্ণনা করিতে পারেন নাই, বা ইহার অবসরও পান নাই । সেই বস্তুরাহ, চরিত-নয়ন গুণ-মিথুন, বনময়ুগ,—সেই শলীধন, তুষারস্নাত পর্বত, কণবাহিনী হটিনী, আর সেই হটিনীর বক্ষে মরাল ক্রীড়া, চক্রবাক-চক্রবাকীর সায়ংকালীন শেষ সম্ভাষণ, এবং হটিনীর সৈকতে হংসমিথুনের নর্তন, অমর-বালিকার কন্দুক ক্রীড়া,—এ সমুদয় তিনি দেখাইতে পারেন নাই । কিন্তু তিনি প্রাচীন ভারতের একটি সর্বপ্রধান প্রাচীন রাজ-বংশের সে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার সকল প্রয়াস সার্থক হইয়াছে ।

তাঁহার বর্ণিত বিদিশা, ভারতে, বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে, যে, একটি স্মৃতি সমৃদ্ধিশালিনী মহানগরী ছিল, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ।

তিনি স্বকীয় মেঘদূত কাব্যে একবার বিদিশার অভ্যাসের কীর্তন করিয়াছেন, বিদিশা যে চিরদিন আমোদ-পূর্ণ, উল্লাস-পূর্ণ ও উৎসব-পূর্ণ নগরী, একথা মেঘদূতের বর্ণনা হইতে স্পষ্টতঃ অনুমান করা যায় ।

এই নাটক আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহাতে মহাকবির বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপুণ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে, ইহাকে অন্ত্যান্ত অনেক নাটক অপেক্ষা বৃহত্তমও বলা যাইতে পারে । 'নাটকখানি' একবার পড়িলেই, বুঝা যায় যে, কালিদাস, ইহাকে রসজ্ঞ, শিক্ষিত ও বিশিষ্ট সামাজিকদিগের উপযোগী এবং রুচিকর করিয়া প্রণয়ন করিয়া-ছেন । ইহার কোন স্থলে কোন প্রকার কল্পনা-মান্য পরিলক্ষিত হয় না । কোথাও পুনরুক্তি দোষ নাই, বা কোন স্থানে, নিরর্থক কোন বিষয়ের অবতারণা পূর্বক, সামাজিকগণের বিরক্তির উদ্বেক করা হয় নাই । ইহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বৃত্তান্তই সূচক ও চমৎকারিতা-পূর্ণ । নাটকখানি সৰ্ব্বাংশে নিরবদ্য । অপরাপর সংস্কৃত নাটকের ছায় ইহার ঘটনাবলী দীর্ঘকালব্যাপী নহে । আবার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ক্ষিপ্ৰতা দ্বারাও ইহার কোন ঘটনাকে বিকলাঙ্গ করা হয় নাই । যেমন একটা অঙ্কুর, বিধাতার অব্যর্থ নিয়মে, আপনিই দিনে দিনে বাড়িতে বাড়িতে, ক্রমে ছায়া-প্রাণন মহীকরে পরিণত হয়, তদ্রূপ, এই নাটকের ঘটনাও যেন, প্রকৃতিবশে আপনা আপনি ঘটিতে ঘটিতে, শেষে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে । অতিপ্রকৃতিক কোন ব্যাপারই ইহাতে নাই । মহাকবি, তদীয় বলিষ্ঠ কল্পনা-প্রভাবে, সামাজিকগণের হৃদয়ে, এই নাটক-বর্ণিত বৃত্তান্তের একটা স্থায়ী সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছেন । যিনি ইহা একবার পাঠ করিবেন, বা ইহার অভিনয় একবার দর্শন করিবেন, তাঁহাকেই চিরদিনের মত, ইহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ থাকিতে হইবে । কখনও এই নাটকের বিষয় বিস্মৃত হইতে পারিবেন না । ইহা সৰ্ব্বতোভাবে সেই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবিরই উপযুক্ত ।

তিনি যে সকল রসজ্ঞ, ‘অভিরূপ’ সামাজিকের উদ্দেশে এই নাটক নিশ্চয়
করিয়াছিলেন, ইহা সেই সকল শিক্ষিত কলাবিশ্ব মনস্বীগণেরও সর্বাংশে
হৃদা এবং আনন্দ-প্রদ হইয়াছে ! এই নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্রকে তিনি
স্বাদর্শ পুরুষরূপে দৃষ্টি করেন নাই । তাঁহার উদ্দেশ্যও তাহা ছিল না ;
যে অভিপ্রায়ে তাঁহার এই নাটক প্রণয়ন, মহাকবির সে অভিপ্রায়
সিদ্ধি হইয়াছে ।

তাঁহার রচনার এমনই মোহিনী শক্তি যে, এই নাটক পড়িতে পড়িতে,
প্রত্যক্ষ ইহার অভিনয় দর্শন করিতে করিতে মনে হয়, যেন সেই
বিদিশার উদ্যান-বাটিকায় উপস্থিত হইয়াছি, কখনো বা রাজসভাস্থলে
বিবদমান সেই নাট্যাচার্য্যদ্বয়ের কলহমীমাংসা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আর
রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ধূর্ত বিদুষকের গূঢ়াভিপ্রায়-দ্যোতিকা মুখচ্ছবি
দর্শন করিয়া, মনে মনে হাসিতেছি । তাঁহার রচনার এমনই তন্ময়তা-
বিদ্যায়িনী শক্তি ! তাঁহার রচনা-পাঠান্তে যথার্থই মনে হয় :—

কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ

মাহিষং দধি স-শর্করং পয়ঃ ।

এনমাংসমভিরূপসঙ্গমঃ

সম্ভবন্তু মম জন্ম-জন্মনি ॥

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়

বিক্রমোর্কশী ।

বিক্রমোর্কশী মহাকবি কালিদাস প্রণীত নাটকত্রয়ের অন্যতম । এষ্ট ত্রোটিক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত । ইহাতে পুরুষাঃ ও উর্কশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । বিক্রমোর্কশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার আয় সর্বদা সুন্দর নহে । কিন্তু চতুর্থ অঙ্ক, উর্কশীর বিরুদ্ধে একান্ত অধীর ও বিচেষ্ট, পুরুষা, তাহার অস্বপ্নে নিনিত্র বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এ বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর, যে কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, একথা বলিতে নিতান্ত অসম্ভব হইবে না ।

কালিদাসের নাটক-ত্রয়ের পোর্কোপর্ষা-বিচার করিলে, বিক্রমোর্কশীকেই তদীয় প্রথম নাটক বলিয়া মনে হয় । কেননা, তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রস্তাবনার—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্ ।
সন্তুঃ পরীক্ষ্যান্তরদৃ ভজন্তে ।
মৃঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-নেয় বুদ্ধিঃ ॥

১—বিদ্যাসাগর ।

২—যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই নির্দেশ, এবং যাহা নূতন, তাহাই দোষগুণ—এ প্রকার নির্দেশ একান্ত অসঙ্গত । পণ্ডিতেরা যখন পরীক্ষা-পুঙ্খক উহাদের যেটি নির্দেশ তাহাই গ্রহণ করেন । যাহারা মৃঢ়, সবসমুদ্বিচারে অসমর্থ, তাহারা পরের বুদ্ধিতে পরের নির্দেশে পরিচালিত হয় ।

এই যে শ্লোক চরনা করিয়াছেন, তৎপাঠে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের পূর্বে তিনি অল্প কোনও নাটক নিশ্চিতই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নতুবা মালবিকাগ্নিমিত্রে ঐ প্রকার শ্লোক রচনার অবসরই হইত না। তাঁহার প্রথম রচিত নাটক, হয়ত, রসজ্ঞ-সমাজে দাদুশ অভ্যর্থিত হয় নাট, তাই পরবর্তী নাটকে তাঁহাকে ঐ শ্লোকদ্বারা সামাজিকদিগের হৃদয়াকর্ষণ করিতে হইয়াছে। মহাকবি ভবভূতিও, প্রথমে 'বীরচরিত' প্রণয়ন করেন। বীরচরিতের প্রতি ৩৭কালীন সামাজিকবন্দ তাদৃশ অধমানাত্মক প্রদান করিয়াছিলেন না, তাই কবি ব্যথিত-হৃদয়ে, তাঁহার মালবী-মাধবে —

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং

ভানন্তি তে কিমপি, তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ ।

উৎপৎস্বতেহন্তি মম কোহপি সমানধর্ম্য

কালোহয়ং নিরবধিবিপুলো চ পৃথো ॥

— বলিয়া সামাজিকদিগের নিবটে, মনের গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালিদাসের পূর্বে ভাস-সৌমিল্লকবিপুত্রাদির বিশিষ্ট বিশিষ্ট কাব্য বিরচিত হইয়াছিল। পরে, যখন কালিদাস, বিক্রমোর্কশী বিরচন করিলেন, তখন, বিদ্বদ্ভৃন্দ ঐ সকল বিশিষ্ট কাব্যাবলীর প্রতি উদাসীন হইয়া, তদীয় কাব্যে আদ্যাত্মিক প্রদর্শন করেন নাই। তাই তিনি তাঁহার দ্বিতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে, ঐ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। নতুবা ঐ কবিতা তাঁহার গর্বের উক্তি নহে। মালবিকাগ্নি-

:—যাঁহারা আমার এই গ্রন্থে অজ্ঞঃ প্রকাশ করেন, তাঁহারা ই জানেন যে তাঁহাদের গণ্যতার কারণ কি? তাঁহাদের জ্ঞান আমার এ গণ্য প্রণত হয় নাই। পৃথিবীর কোন স্থানে হয়ত আমার সমানধর্ম্য কেহ থাকিতোপারেন, অথবা এখন নাই, কিন্তু কালে উৎপন্ন হইবেন, কেন না কাল অনন্ত, আর পৃথিবীও বিপুল।

মিট্রই যদি তাঁহার প্রথম নাটক হইবে, তবে, তাঁহার প্রস্তাবনায় তিনি ইহাও ঐ প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিবেন কেন ? তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র স্মৃতিসমাজে আদৃত হইবে, না উপেক্ষিত হইবে, ইহা নাটকের প্রস্তাবনা লিখিবার সময়েই বা তিনি বুঝিবেন কি প্রকারে ? কেবল সংশয় করিয়াই যে তিনি ঐ রূপ উক্তি করিয়াছেন, ইহা বলিলে তাঁহার জ্ঞান অলৌকিক ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাকবিবির বিবেচনা-শক্তির অমর্যাদা করা হয় । সুতরাং মনে হয়, তিনি প্রথমে বিক্রমোর্কশী প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা স্মৃতি-সমাজে তাদৃশ আদরের সহিত প্রথম প্রথম পরিগৃহীত হয় নাই, তাই তিনি পরে দ্বিতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ঐরূপ খেদোক্তি করিয়া, গতানুগতিক, প্রাচীনানুরক্ত সমাজিকগণের সম্মুখে স্বীয় কাব্যোৎসাহ-দোষ-পরোক্ষার প্রার্থনা করিয়াছেন ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে মালবিকাগ্নিমিত্রই কালিদাসের প্রথম নাটক । এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিম্নলিখিত । বিক্রমোর্কশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র, এই উভয় নাটকের রচনানৈপুণ্য ও কল্পনাপ্রাবীণ্য বিচার করিলেই, স্মৃতিসমাজ এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারিবেন ।

শকুন্তলা ব্যতীত, সংস্কৃত সাহিত্যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের সমকক্ষ অন্য নাটক নাই । উহার সর্বোৎকৃষ্ট স্বাভাবিক ঘটনায় পরিপূর্ণ । অস্বাভাবিক একটি কথাও, অথবা একটি বর্ণও মালবিকাগ্নিমিত্রে পরিদৃষ্ট হয় না । যিনি একবার মালবিকাগ্নিমিত্রের জ্ঞান স্বাভাবিক-ঘটনালঙ্কার নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি যে, পরে আবার বিক্রমোর্কশীর জ্ঞান অতিপ্রকৃতিক-ঘটনা-বহুল নাটক রচনা করিবেন, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুতি হয় না । যদি বুঝিতাম যে, বিক্রমোর্কশীতে মালবিকাগ্নিমিত্র অপেক্ষা অধিকতর সৃষ্টিকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, যদি বুঝিতাম যে, নাটকটির অনুসারে অভিজ্ঞান-শকুন্তল যেমন উৎকৃষ্টতম, সেইরূপ বিক্রমোর্কশীও অন্ততঃ মালবিকাগ্নিমিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তাহা

হইলেও না হয়, মালবিকাগ্নিমিত্রকে বিক্রমোর্কশীর পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু বিক্রমোর্কশী কোন কোন কবির কাব্য হইতে উৎকৃষ্টতর হইলেও, উহাতে এমন কোনই বিশেষ গুণ নাই, বাহাতে, উহা মালবিকাগ্নিমিত্রকে অতিক্রম করিতে পারে।

কুমারসম্ভবের সমালোচনা কালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রথম কবিত্ব অতিপ্রকৃতিক ঘটনার আশ্রয়ে কাব্য নিৰ্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। স্বকীয় নিৰ্ম্মাণ-কৌশলের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, কোন মনস্বীই নিত্য পরিদৃশ্যমান জগতের কোন বস্তু বর্ণন করিতে অগ্রসর হয়েন না। দৃষ্ট অপেক্ষা অদৃষ্ট পদার্থের বর্ণন অন্মায়াস-সাধ্য। পরিণত কল্পনা ব্যতিরেকে, নিত্যানুভূত বস্তুর বর্ণন করিলে, তাহা কদাচ চমৎকারী হয় না। বিক্রমোর্কশীতে অদৃষ্ট বস্তুর বর্ণন, আর মালবিকাগ্নিমিত্র দৃষ্ট পদার্থের—জগতের নিত্যানুভূত পদার্থের বর্ণনার লীলাতরঙ্গ সমুল্লসিত। এই সকল বিবেচনা করিলে, বিক্রমোর্কশীই কালিদাসের প্রথম নাটক বলিয়া মনে হয়।

যে বৃত্তান্ত উপজীব্য করিয়া, কালিদাস বিক্রমোর্কশী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ বেদে পর্য্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু, পদ্ম, মৎস্য প্রভৃতি অনেক পুরাণাদিতেও উহার নির্দেশ আছে। তবে প্রতি পুরাণেই অংশ-বিশেষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এই নাটক সম্পূর্ণরূপে বৈদিক এবং পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে বিরচিত। তবে মহাকবি-কালিদাসের অপ্রতিম কল্পনালোকে সেই সকল প্রাচীন ঘটনা এক অতি চমৎকারিণী ও নয়ন-রঞ্জিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি যত দূর পারিয়াছেন, বর্ণনীয় বস্তুকে স্বভাবের অমুকুল করিয়া আনিয়াছেন। বাহা অতিরঞ্জিত স্মরণ্য অস্বাভাবিক, তাহা যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই এই নাটকের উপজীব্য বৈদিক এবং পৌরাণিক বৃত্তান্তের সহিত, কোন কোন স্থলে ইহার প্রভেদ ঘটিয়াছে।

কল্পনার চমৎকারিতায় এবং রচনার মনোহারিতায় এই নাটক শকুন্তলা, উত্তরচরিত এবং মালবিকাগ্নিমিত্রের পরেই উল্লেখযোগ্য। পুরুষের অন্তঃ-
করণ যে কত কোমল হইতে পারে, তাহা মহাকবি, পুরুষবার চরিত্রে
উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রণয়ের এক মূর্তি বিরাহে যে সহস্র
মূর্তি ধারণ করে, মিলনের সময়ে, পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে যাহাকে
পৃথক্ করিয়া হৃদয়ে রক্ষিত করা যায়, নয়নের একমাত্র দ্রষ্টব্য করা যায়,
বিরহকালে, সেই এক অদ্বিতীয় দ্রষ্টব্যই যে আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাপ্ত
হইয়া উঠে, পৃথিবীর তাবৎ পদার্থে যে প্রাণের মূর্তি উপলব্ধ হয়, বিরহীর
হৃদয়ে, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই যে, সেই বিরহিত ব্যক্তির প্রতি
মূর্তি জাগাইয়া দেয়, ইহা কবি, এই নাটকে অতি সুন্দর ভাবে
দেখাইয়াছেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই নাটকের উপজীব্য বৃত্তান্তটি এক
প্রকার দিবা ; কেননা উর্ধ্বশী স্বর্গের বাসিনী, পুরুষের মর্তবাসী হইয়াও
দেব প্রভাব-সম্পন্ন। বটনার স্থানও, অবিকাংশ স্থলে, স্বর্গে চৈত্ররথ
উদ্যানে, কখনো বা গন্ধনাদন পক্ষিতে। কিন্তু এথাপি কালিদাস এমন
কৌশলে, সেই উর্ধ্বশী এবং পুরুষবার প্রণয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, যে,
তাহা পাঠি কিংবা শ্রবণ করিলেই মনে হয়, যেন সত্য সত্যই মর্তের কোন
প্রণয়চরিত্র, বাহ্যতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই, এমন চিত্র দেখিতেছি।

এই নাটকের কি শ্লোকে, কি গদ্যে, সর্বত্রই প্রাকৃতের প্রাচুর্য
প্রদীক্ষিত হয়। বিশেষতঃ চতুর্থ অঙ্কের অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায়
বিরচিত, এবং ঐ অঙ্কে শ্লোকাবলীও নানাবিধ ছন্দোবন্ধে প্রথিত।
সংস্কৃত অথবা কোন নাটকে এত অধিক ছন্দো সন্নিবেশ দৃষ্ট হয় না।
কালিদাসের সময়েও প্রাকৃতের প্রচলন যে কত অধিক ছিল, ইহা
তাহারই নির্দর্শন।

পঞ্চ-চত্বারিংশ অধ্যায় ।

বৃত্তান্ত ।

জাহ্নবীর পবিত্র তটে বিাজমান, পবিত্রতম প্রয়াগতীর্থের অন্তঃপাতী, 'প্রতিষ্ঠান' নামক নগরে, চন্দ্রবংশাবতংস বিখ্যাতকীর্তি পুরুষবা নামে এক পরম-পরাক্রমশালী নরপতি বাস করিতেন। একদা রথারোহণে আকাশ-মার্গে বিচরণ করে, তিনি দেখিলেন যে, একটি পরম সুন্দরী যৌবনবতী ললনা এক বিশালবৃক্ষ দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া বাহ্যতেছে, আনন্দে সখাযুগ দূরে আর্ন্তস্বরে রোদন করিতেছে। রাজা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, ঐ অপরিস্রবমাণা লাবণ্যবতী কামিনীর নাম উর্বশী, তাহার অমুরের নাম কেশী। উর্বশী, অলকাপতি কুবেরের ভবন হইতে প্রচ্যবর্তন-কালে, পশ্চিমমুখে এই ছরস্ত্র অমুর-কর্তৃক বিপন্ন হইয়াছে। শূন্যহস্ত পুরুষবা, তৎক্ষণাৎ, বাহুবলে কেশীকে নিহত করিয়া, সেই কেশী-করণ-পরিদেবিনী অমর-ললনার উদ্ধার-সাধন পূর্বক তাহার প্রাণমানস সখাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। উর্বশী, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হইয়া, একবার সেই কন্দর্পকল্প মহারাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহার অন্তঃকরণে অনুরাগ জন্মিল। তিনি এদবধি, একান্ত অমুর-ভোগে, সেই পরনোপকারী পুরুষবার শান্তোজ্জল মূর্তির ধ্যান করিতে থাকিলেন। উর্বশী যখন বীরবর পুরুষবার চিন্তায় এইরূপ বিমুত-হৃদয়া, তখন সুপতি ইন্দ্রের সভায়, নাট্যশাস্ত্রের আদি কর্ত্তা ভরতমুনির প্রণীত 'স্বয়ংবর' নামক নাটক অভিনীত হইতেছিল। সেই অভিনয়ে উর্বশী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরাবতীর প্রসঙ্গে, যখন স্বর্গে গিয়া লোকপালগণ, এমন কি, বিষ্ণু পর্য্যন্ত সমাসীন হইয়াছেন, তখন বাক্য-ভূমিকা-ধারিণী মেনকা, স্বয়ং-বরাধিনী, পরিগৃহীত-লক্ষ্মী-বেশ, তদৃশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লক্ষ্মি! কোন্

কল্পনার চমৎকারিতায় এবং রচনার মনোগ্রন্থিতায় এই নাটক শকুন্তলা, উত্তরচরিত এবং মালবিকাগ্নিমিত্রের পরেই উল্লেখযোগ্য। পুরুষের অন্তঃ-
করণ যে কত কোমল হইতে পারে, তাহা মহাকবি, পুরুষবার চরিত্রে উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রণয়ের এক মূর্তি বিরাহে যে সহস্র
মূর্তি ধারণ করে, মিলনের সময়ে, পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে যাহাকে
পৃথক্ করিয়া হৃদয়ে রক্ষিত করা যায়, নয়নের একমাত্র দ্রষ্টব্য করা যায়,"
বিরহকালে, সেই এক অদ্বিতীয় দ্রষ্টব্যই যে আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত
হইয়া উঠে, পৃথিবীর তাবৎ পদার্থে যে তাহাষ্ট মূর্তি উপলব্ধ হয়, বিরহীর"
তন্ময়-হৃদয়ে, চেতনা-চেতন সমস্ত পদার্থই যে, সেই বিরহিত ব্যক্তির প্রতি
মূর্তি জাগাইয়া দেয়, ইহা কবি, এত নাটকে অতি সুন্দর ভাবে
দেখাইয়াছেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এত নাটকের উপজীব্য ব্রতান্তটি এক
প্রকার দিবা : কেননা উর্কশী স্বর্গের বাসিনী, পুরুষা মর্ত্যবাসী হইয়াও
দেব প্রভাব-সম্পন্ন। ঘটনার স্থানও, অধিকাংশ স্থলে, স্বর্গে চৈত্ররথ
উদ্যানে, কখনো বা গন্ধমাদন পর্বতে। কিন্তু তথাপি কালিদাস এমন
কৌশলে, সেই উর্কশী এবং পুরুষবার প্রণয়ব্রতান্ত বর্ণন করিয়াছেন, যে,
তাহা পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলেই মনে হয়, যেন সত্য সত্যই মর্ত্তের কোন
প্রণয়চরিত্র, বাহ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই, এমন চিত্র দেখিতেছি।

এই নাটকের কি শ্লোকে, কি গদ্যে, সর্বত্রই প্রাকৃতের প্রাচুর্য্য
প্রতিফলিত হয়। বিশেষতঃ চতুর্থ অঙ্কের অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায়
বিরচিত, এবং ঐ অঙ্কের শ্লোকাবলীও নানাবিধ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত।
সংস্কৃত অথবা কোন নাটকে এত অধিক ছন্দো সন্নিবেশ দৃষ্ট হয় না।
কালিদাসের সময়ও প্রাকৃতের প্রচলন যে কত অধিক ছিল, ইহা
তাহারই নির্দর্শন।

পঞ্চ-চত্বারিংশ অধ্যায় ।

রূভাস্ত ।

জাহ্নবীর পবিত্র তটে বিরাজমান, পবিত্রতম প্রয়াগতীর্থের অন্তঃপাতী, 'প্রতিষ্ঠান' নামক নগরে, চন্দ্রবংশাবতংস বিখ্যাতকীর্তি পুরুষবা নামে 'এক পরম-পরাক্রমশালী' নরপতি বাস করিতেন। একদা রথারোহণে আকাশ-মার্গে বিচরণকালে, তিনি দেখিলেন যে, একটি পরম সুন্দরী যৌবনবতী বলনাকার এক বিশালবপুঃ দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া বাইতেছে, আর তাহা সখীগণ দূরে আর্দ্রস্বরে রোদন করিতেছে। রাজা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, ঐ যুগলদ্বয়মালা লাবণ্যবতী কামিনীর নাম উর্বশী, আর ঐ অসুরের নাম কেশী। উর্বশী, অলকা-পতি কুবেরের ভবন হইতে প্রচ্যবত্তন-কালে, পশ্চিমপাশে এই ছরস্ত্র অসুর-কর্তৃক বিশল্প হইয়াছে। শূন্যভন পুরাব, তৎক্ষণাৎ, বাহুবলে কেশীকে নিহত করিয়া, সে চক্ৰা ককণ-পরিদেবিনী অমর-ললনার উদ্ধার-সাধন পুঙ্খক তাহা রক্ষমানা সখাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। উর্বশী, কুন্তল-চ-পূর্ণাঙ্গা, একবার সেই কন্দর্পকল্প মহারাজের প্রতি দৃষ্টপাত করিয়া ললন। তাহার অন্তঃকরণে অনুরাগ জন্মিল। তিনি এদবধি, একান্ত অগ্নি-রক্ত, সেই পরমোপকারী পুরুষবার শান্তোজ্জল মূর্তির দান করিতে আসিলেন। উর্বশী যখন বীরবর পুরুষবার চিন্তায় এইরূপ বিমুত হইল, তাহা সুপতি ইন্দ্রের সভায়, নাট্যশাস্ত্রের আদি কর্ত্তা ভরতমুনির প্রণীত 'শাস্ত্রসংবরণ' নামক নাটক অভিনীত হইতেছিল। সেই অভিনয়ে উর্বশী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরাবতীর স্তম্ভক্ষে, যখন সবে এই লোকপালগণ, এমন কি, বিষ্ণু পর্য্যন্ত সমাসীন হইয়াছেন, তাহা উর্বশী-ভূমিকা-ধারিণী মেনকা, স্বয়ং-বরাধিনী, পরিগৃহীত-লক্ষ্মী-বেশ, উদগ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লক্ষ্মি! কোন্

অমরের উপর তোমার হৃদয় অভিনিবিষ্ট হইয়াছে ? অন্তমনস্ক! উর্কশী মেনকা কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, 'পুরুষোত্তমের উপর' এষ্ট কথা বলিতে যাইয়া, 'পুরুষবার উপর', এই কথা হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন । ভরতমুনি স্বয়ং অভিনয়স্থলে উপস্থিত থাকিয়া, অভিনয় পদার্থের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছিলেন । তিনি উর্কশীর মুখে এষ্ট প্রকার প্রস্তুত-বিরোধিনী কথা শ্রবণ করিয়া, ক্রোধ-পর-বশ-চিত্তে, 'তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন, 'তুমি অচিরাৎ মানুষী হও, অপ্সর' কুলের তুমি কলঙ্কিনী ।'

বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষবার, অনেক সময়ে, অসুরযুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করিতেন ; তাহার শৌর্য্যবীর্য্যে সুরনাথ অত্যন্ত বিমুগ্ধ ছিলেন । ভরতের অভিষাপ শ্রবণে, ইন্দ্র বলিলেন যে, উর্কশী মানুষী হউক, কিন্তু বাহার জন্ত উর্কশীর এই নিগ্রহ, তিনি আমার পরম সুহৃদ, উর্কশী মানুষী-দেহ ধারণ করিয়া, তাহাকেই ভজনা করুক । অভিষপ্ত! উর্কশী, ইন্দ্রকর্তৃক এইভাবে কথঞ্চিৎ অনুগ্রহীতা হইয়া, মর্ত্তে পুরুষবার নিকটে আসিয়া মানুষীভাবে কালবাপন করিতে লাগিলেন । এষ্ট পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, কালিদাস এষ্ট অপূর্ব নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন । তবে সৌন্দর্য্যের অমুরোধে, কালিদাস যেমন ঐ প্রাচীন বৃত্তান্তের অনেক অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ চমৎকারিতার পরিপন্থী বিষয়ের গাগ করিয়াছেন, তেমনি, মূলবৃত্তান্তের অঙ্গহানি না করিয়া, সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন-মানসে, অনেক নূতন ঘটনারও সমাবেশ করিয়াছেন, এবং তদ্বারা মূলবৃত্তান্তকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ।

ষট্-চত্বারিংশ অধ্যায় ।

উর্বশীর মুক্তি ও পুনর্বন্ধন ।

উর্বশী, মালবিকা বা শকুন্তলার ছায়, সংসারবৃত্তান্তানভিজ্ঞা মুক্ত-
হৃদয়া বালিকা নহেন । তিনি স্বর্গাধিপতি ইন্দের সভার অলঙ্কাররূপিণী,
অপ্সরাগণের সর্বশ্রেষ্ঠা । সুতরাং তাঁহার পরিপক্ব-হৃদয়ের পুরুষবা বিষয়ক
অমুরাগের বর্ণন বড়ই দুষ্কর । উর্বশী, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি
অমরগণের নিত্য-নয়ন-পথ-বর্তিনী । স্বর্গের নন্দন কানন, পারিজাত-
তরুর শীতল ছায়া, মন্দাকিনীর সুরম্য পুলিন, তাঁহার বিনোদস্থান ।
দেবতার অনুগ্রহে, তাঁহার যৌবন চিরস্থির । তাঁহাদের ভোগের অভাব
নাই । কেবল আকাজ্জক অভাব । মনে, যখন, যে আকাজ্জকের উদয়
হয়, তাঁহারা তখনই তাহা পূর্ণ করেন । কত মহা মহা তপস্বী, যে
বিনোদময় স্থানে বাইবার জন্ত, দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর তপস্তা করিয়া,
শরীরপাত করেন, উর্বশী সেই আনন্দময় উৎসবময় স্থানের অধিবাসিনী ।
সুতরাং তাঁহার হৃদয় যে কীদৃশ প্রণয়-প্রবণ, কীদৃশ উল্লাসময়, তাহার
বর্ণন নিম্নয়োজন । স্বর্গাধিপতির সভা-বিলাসিনী তাদৃশী কামিনীকে,
সজ্জান, অবস্থায়, মর্তের রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তাঁহার সেই
স্বর্গ-রাজ্যের যথেষ্ট-ভোগ-ভৃগু হৃদয়ের সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনে মহাকবি যে
কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা ভাবিবার বিষয় । তাই কালিদাস,
উর্বশীকে, প্রথমে সজ্জান অবস্থায় রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন ।
হরস্ত অম্বর, তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ;—সেই মহেন্দ্রসভা, নন্দন
কানন, চিত্ররথ উদ্যান ;—সেই কল্পপাদপ, চিরবসন্ত সমাগম,
মন্দাকিনী-সৈকত ;—সেই অপ্রার্থিতোশনত ভোগ্য-সম্ভার, আনন্দ,
উৎসব, উল্লাস ;—আর সেই চিত্রলেখা, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা
প্রভৃতি প্রিয় সখীগণ,—এ সমস্ত চিরদিনের মত শেষ হইল ! উর্বশীর

অনন্ত জীবনে এ সকলের সন্দর্শন আর ঘটিবে না ! তাই উর্বশী ভয়ে, বিষাদে, মর্ষবেদনে মূর্ছিত। দূরে সখীগণ রোহদ্যমান। এমন সময়ে রাজা পুরুরবা সেই দুর্জয় অশ্বরের বিনাশ করিয়া উর্বশীকে উদ্ধার করিলেন। মূর্ছিত উর্বশী তাঁহার বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না। রাজা উর্বশীকে লইয়া, করুণ বিলাপিনী সখীদিগের নিকটে আসিলেন। চিত্রলেখা কত প্রকারে, তাঁহার সন্তর্পণ করিলেন। উর্বশী তখনও হতচেতনা ! অনেক পরে, তাঁহার জ্ঞান হইল। তখন তাঁহার অন্তঃকরণ প্রলয়ান্ত সমুদ্রবক্ষেয় ত্রায় শান্ত, একবারে নিস্তরঙ্গ। সে স্বর্গের ভাবনা এখন আর তাঁহার নাই। তাঁহার হৃদয় এখন সর্বপ্রকার ভাবনা-শূন্য, মেঘমুক্ত গগনের ত্রায় নির্মল। যখন হৃদয়ের এবস্থ 'অবস্থ', সে হৃদয় নাতিপ্রকুর, নাতিবিষয়, নিদ্রাম্প প্রদীপকলিকার ত্রায় স্থির, তখন তাঁহার প্রিয়সখী চিত্রলেখা বলিলেন, 'সখি ! আশ্রয় হও, ভয় নাই, বিপন্নের সত্য নরনারাজ কর্তৃক, সেই সুরবিদ্যে দানবগণ নিহত হইয়াছে। দানবভয়ে উর্বশী তখনও নয়ন উন্মত্ত করেন নাই। চিত্রলেখার কথায় জীবদাশ্রয় হইয়া, তিনি নেত্রোন্মীলন-পূর্বক, অবসন্নকণ্ঠে কহিলেন 'কে ? এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া, দানবহস্ত হইতে আনাকে কি মহেন্দ্র উদ্ধার করিলেন ?' উর্বশী জানিতেন, তাঁহার অসময়ের বন্ধু, তাঁহার নিপদের সহায়—মহেন্দ্র। তাই চৈতন্য-লাভের পরই সর্বপ্রথমে, তাঁহার মহেন্দ্রের কথা মনে পড়িল। চিত্রলেখা বলিলেন, 'না, মহেন্দ্র নয়, মহেন্দ্র-তুল্য প্রভাবশালী রাজর্ষি পুরুরবার অগ্রগৃহে, তোমার উদ্ধার হইয়াছে'।' সখী চিত্রলেখার কথায়, উর্বশী একবার শান্ত-নয়নে সেই মহেন্দ্রতুল্য-রাজার দিকে চাহিলেন। রাজা পুরুরবা সাক্ষাৎ মহেন্দ্র নহেন বটে, কিন্তু চিত্রলেখা বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি মহেন্দ্র-তুল্য-প্রভাবশালী। উর্বশী

১—বিক্রমোর্বশী, ১ম অঙ্ক। চিত্রলেখা। "ন মহেন্দ্রো, মহেন্দ্র-সদৃশাভ্যুত্থানে অনেক রাজর্ষি।"

স্বর্গের পরিণত-হৃদয়। অপর। হইলেও কিন্তু, এখন তাঁহার হৃদয় পূর্ক-সংস্কার-বর্জিত। তিনি ৩৭ পূর্ববর্তী ভাবৎ বৃত্তান্তই বিস্মৃত হইয়াছেন। চিত্রলেখার আশ্বাস-বাণীতে, একবার মহেন্দ্রের কথা,—যিনি চিরদিন উর্কশীর স্তূথ-ছঃথের সাথী, সেই অমরেশ্বরের কথা মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাও ভুলিলেন, চিত্রলেখা কথিত ‘মহেন্দ্রতুলা-প্রভাবশালী রাজর্ষি’—এই বাক্যে, তাঁহার মহেন্দ্রভাবনা, সেই মহেন্দ্র-কল্প রাজর্ষির উপর হস্ত হইল। তিনি ভাবনাস্তর-শূন্য-চিত্তে রাজার দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার সেই শাস্ত-নিশ্চল হৃদয়, রাজ-দর্শন-লব্ধ প্রীতিতে একবারে ভরিয়া গেল। মুচ্ছাপগমে যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, তিনি, এক অদৃষ্টপূর্ব নবীন উৎসবময় জগৎ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সর্বচিন্তা-বিমুক্ত হৃদয়, রাজর্ষি-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। তিনি তখন মনে মনে ভাবিলেন, ‘দানব আমার পরম উপকার করিয়াছে’।

স্বর্গের সর্বোত্তমা অপরাকে মর্তবাসীর উপর অনুরক্ত করিতে হইবে, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতির আকিঞ্চনেও বাহার হৃদয় স্থির-ধীর, তাঁহার সেই হৃদয়ে তরঙ্গ ভুলিতে হইবে, তাই মহাকবি, উর্কশীকে মুচ্ছিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই দিব্য কাস্তি, দিব্য যৌবন—সমস্তই ছিল, সে দিব্য হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্যও অক্ষুণ্ণ ছিল, ছিল না কেবল সেই দিব্য লোকের স্মৃতি। তাহা থাকিলে, উর্কশী কদাচ একপদে পুঞ্জরবাময় হইতে পারিতেন না। উর্কশীর মুচ্ছা সৃষ্টি করিয়া, মহাকবি যেন বিধাতৃসৃষ্টিকেও পরাস্ত করিলেন।

রাজর্ষি পুঞ্জরবা, সেই মুচ্ছিত প্রতিমাকে, একবার পূর্বেই দর্শন করিয়াছেন, এখন আবার সেই স্বর্ণপ্রতিমার প্রাণসংযোগ হইতেছে, তাহাও দেখিতে লাগিলেন। তীর পর—ক্রমে, সৌন্দর্য্য-দর্শন-পটু, প্রতিষ্ঠানপতি পুঞ্জরবাকে, মহাকবি কালিদাস, একটি একটি করিয়া,

১—বিজ্ঞেমোর্কশী, ১অঙ্ক। উর্কশী। “রাজানং বিলোক্য। আশ্চর্যতঃ। উপকৃতং বলু দানবৈঃ।”

উর্কশীর শাস্ত্রহৃদয়ের স্তরগুলি দেখাইলেন । সে এক নিরুপম দৃশ্য !
উর্কশীর প্রতিকথায়, প্রতি অঙ্গবিক্ষেপে, রাজার মনে এক একটা নূতন
ভাব জাগরুক হইতে লাগিল । ক্রমে তাঁহার, উভয়ে, উভয়ের সৌন্দর্য্যে,
উভয়ের ভাবনায় ডুবিয়া গেলেন । এমন সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ আসিয়া
উপস্থিত হইলেন । রাজার সম্মতিক্রমে, তিনি, উর্কশী প্রভৃতিকে লইয়া
স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । যাইবার সময়, উর্কশীর কণ্ঠ-মালা লতা-বিটপে
সংস্কৃত হইল, তিনি সেই মালা মোচন করিবার জন্ত মুখ ফিরাইয়া সাধ
মিটাইয়া, আর একবার সেই ‘উর্কশী-তল-শীতল-ছাতি’ পুস্ত্রবাকে দেখিয়া
লইলেন । হার মোচন আর হইল না ! তিনি তখন অশ্রুমনস্কভাবে,
চিত্রলেখাকে বলিলেন, ‘সখি ! তুমি ইহাকে মোচন কর ।’ চিত্রলেখা
উর্কশীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘উর্কশি ! বড়ই দৃঢ়ভাবে
সংলগ্ন হইয়াছে, ইহা মোচন করা আমার কন্ধ্য নয়, আমার মনে হয়,
কখনও ইহার মোচন হইবে না’ ।^১ কিঞ্চিদুঃস্বপ্নো রাজর্ষি পুস্ত্রবাও
এই অবসরে, সেই ‘অরাল-নেত্রা’ ‘পরিব্রতাক্ষমুখীকে’ আর একবার
দেখিলেন । রাজা ও উর্কশীর প্রথম সন্দর্শন এইভাবে সমাপ্ত হইল ।

মহাকবি, স্বর্গের ললনাকে মর্ত্তের অধিবাসীর প্রতি অনুরক্ত করাইয়া
দেখাইলেন যে, মর্ত্তেও স্বর্গের কমনীয় বস্তু আছে, থাকিতে পারে ।
রাজর্ষি পুস্ত্রবার সৌন্দর্য্য অপাঙ্গ-বিক্ষেপ, হৃদয়ে অগাধ-স্নেহ, তাই
তাহা স্বর্গ-বিলাসিনীরও প্রার্থনীয় হইল । যদি উভয়ের হৃদয় অনাবিল
এবং নিষ্পাপ হয়, বিধাতার কৃপায় যদি উভর হৃদয়েই উভয়ের জন্ত
উৎকর্ষা জন্মে, তবে, তাহা স্বর্গ, অথবা স্বর্গাদপি রমণীয়তর । তাই
দানবহন্ত-মুক্তা উর্কশী রাজার গুণ-রাশিদ্বারা পুনরায় আবদ্ধ হইলেন ।

১—বিক্রমোর্কশী, ১ম অঙ্ক, উর্কশী । অহো ! লতা-বিটপে মঠেকাবলী লগ্না । চিত্রলেখা ।
মোচয় ভাবনোন্ম ।—চিত্রলেখা । সম্মিতম্ । দৃঢ়ং ধলু লগ্না । হ্রস্বোচ্চনীয়েব প্রতিভাতি ।’

সপ্ত-চত্বারিংশ অধ্যায় ।

অভিশপ্তা

মুচ্ছাভঙ্গের পর, যখন উর্কশী বুঝিলেন যে, ইনিই আমার ত্রাণ-কর্তা এবং প্রাণ-দাতা, তখন তাঁহার কোমল নারীহৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইল, এক অনুপমভাবে মগ্ন হইল । এমন সময়ে, ধীরে ধীরে, সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, কবি, অনুরাগের অরুণ-রেখা, অতি সন্তুর্পণে অঙ্কিত করিলেন । প্রথমতঃ, মুচ্ছারূপী মহাপ্রলয়ে, যেন, উর্কশীকে বিলুপ্ত করিয়া পরে—মুচ্ছাপিগমে, নবচৈতন্যের দ্বারা নূতন উর্কশীর গঠনপূর্ব্বক, সৌন্দর্য্যশ্রষ্টা মহাকবি, সেই নবীন ললনার নবীন, অনন্ত-পরায়ণ, অনন্ত-করণে নূতন প্রণয়ালোক জালিয়া দিলেন । তামসী নিশার অবসানে প্রাণী যেমন উষার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃত হয়, প্রভাতের বিষক্ত সমীরণে গাভ্রনিকরীণ লাভ করে, তদ্রূপ, উর্কশীও তাঁহার তমোময়ী মুচ্ছার অবসানে, নবীন প্রভাতে যেন নবজীবন লাভ করিয়া, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন স্বর্গের দর্শন পাইলেন । মহাকবির এই নূতন স্বর্গের নিকটে, মহেন্দ্রের সেই পুরাতনী অমরাবতীও তুচ্ছ ! উর্কশী অবশ-হৃদয়ে, যেন কাহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে, সেই নূতন স্বর্গে প্রবেশ করিলেন ।

চিত্ররথ যখন তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন, তখন, তাঁহার বাহ্য দেহ—স্থূল দেহ গেল বটে, কিন্তু তাঁহার আন্তর দেহ—সূক্ষ্ম দেহ ঐ লতাবিটপে সংলগ্ন হইয়া, চিরদিনের মত, মর্ত্তে মহীপতি পুরুষবার পার্শ্বে পড়িয়া রহিল ।

উর্কশী স্বর্গে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ ত মর্ত্তে রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি অধিক দিন স্বর্গবাস করিতে পারিলেন না ! সম্বরই তাঁহাকে মর্ত্তলোকে আসিতে হইল । মনই স্বর্গ, মনই নরক । যদি মনের মত বস্তু লাভ হয়, তবে, আর স্বর্গের প্রয়োজন কি ?

বিশেষতঃ, কবির স্বর্গ কবির সৃষ্ট পাত্রের হৃদয় । কবি স্থল স্বর্গ অপেক্ষা
স্থল স্বর্গরূপী গাহুয়ের হৃদয়কে অধিক ভাল বাসেন । তাই, তিনি,
স্থল-স্বর্গ-বাসিনী উর্কশীকে পুরুষবার স্থল-স্বর্গ-রূপী হৃদয়ের অবেষণের
নিমিত্ত, আবার মর্তের দিকে লইয়া আসিলেন । উর্কশী যখন মর্তে
আসেন, তখন পশ্চিমদ্যে, আকাশে চিত্রলেখার সহিত দেখা হইল ।
উর্কশী ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলেন, ‘সখি ! চলিয়াছি ত, আবার কোনও
অস্তুরে বাধা না জন্মায় !’ একবার, সেই যখন অলকা হইতে প্রতিনিবৃত্ত
হয়েন, তখন, ছরস্তু দানব কেশা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, রাজা
পুরুষবা সে বাতায় রক্ষা করিয়াছিলেন । এখন সেই পুরুষবার উদ্দেশ্যেই
যাইতেছেন, আবার যদি পশ্চিমদ্যে কোন বিপদ ঘটে, তবে কে রক্ষা
করিবে ? তাহা হইলে ত, যাহার জন্ম স্বর্গ-রাজ্য-পরিভ্রাণ, তাহার সন্দর্শন
আর ঘটিবে না । তাই উর্কশী, ব্যাকুলপ্রাণে, চিত্রলেখার শরণ লইলেন ।
মুগ্ধ-হৃদয়ার মনে ছিল না যে, নিকরিশী যখন সিন্ধুর উদ্দেশ্যে বাহির হয়,
তখন, পাহাড়, পর্বত—কিছুতেই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না ।

উর্কশীর মুচ্ছার সময় রাজা তাঁহাকে দেখিয়াছেন ; তার পর, লতা-
বিটপলগ্না একাবলীর বিমোচন-কালে, আবার রাজা তাঁহাকে দেখিয়াছেন ;
মধ্যে, উর্কশীর সহিত, কখনো বা চিত্রলেখার সহিত, রাজার কথাবার্তাও
হইয়াছে । কিন্তু উর্কশীর ভাগ্যে ত তাহা ঘটে নাই । প্রথমতঃ ভ্রাস,
তারপর মুচ্ছা, পরে যদি বা মুচ্ছাপগন হইয়াছিল, কিন্তু আতঙ্কে প্রাণ
তখনও আকুল ছিল, তার পর যখন সময় আসিল, তখনই হঠাৎ বিদ্যরূপী
চিত্রলেখা আসিয়া, তাহা নষ্ট করিলেন । রাজার নিকট হইতে উর্কশীকে
লইয়া তিরোহিত হইলেন ! প্রকৃতপক্ষে, উর্কশী, বিশেষভাবে রাজাকে
দেখিতে বা রাজ-হৃদয়ের প্রণয়-গতির বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে অবসর
পান নাই । তাই কবি, এবার উর্কশীকে অন্তরালবর্তিনী করিয়া, উর্কশী-
হৃত-চিত্ত রাজার তদানীন্তন অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন ।

সুন্দর বসন্ত কাল । সমস্ত বনভূমি উল্লাসময়ী । বিরহখিন রাজা পুরুষবা, রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ক্রিয়াকালের জন্ত, একবার সেই সঙ্কল দৃষ্টা উর্কশীর চিন্তা করিতে প্রমদ-বনে আসিয়াছেন । সেই উপবনে একটি মাধবী-লতা-মণ্ডপ আছে, নীলকান্তমণিরাশির দ্বারা তাহার মধাস্থল বিমণ্ডিত । উন্মত্ত ভ্রমরের চরণ তাড়নে লতাকুঞ্জ হইতে রাশি রাশি কুসুমের নষ্ট হইতেছে, আর উর্কশী-বল্লভ রাজা পুরুষবা, সেই স্থানে তাপিত হৃদয়ের শান্তি-কামনার উপবেশন করিয়া আছেন । সঙ্গে নিত্য সহচর বিদূষক । যে স্থানে প্রবেশগাত্রে, হৃদয়ে কত পুণাতন কথা জাগিয়া উঠে, জীবনের সকল স্বপ্নের কাহিনীই একটি একটি করিয়া মনে পড়ে, বিরহী পুরুষবা তাদৃশ উদ্দীপক স্থানে উপনীত । ঔষধ-ভ্রমে তিনি কুপথা-সেবনে উদাত । তাঁহার রাজ-কার্য্য-বাকুল অন্তঃকরণে, যে অনল ক্ষুলিঙ্গাকারে ছিল, এক্ষণে, তাঁহার ভাবনাস্থা বিমুক্ত হৃদয়ে সেই অনল প্রচণ্ড দাবানলের আকার ধারণ করিল । ইহ জন্মে আর উর্কশীর সহিত দেখা হইবে না—ভাবিয়া, রাজা কত বিলাপ করিতেছেন । তাঁহার চিত্ত একান্ত অদীর হইয়াছে । পার্শ্বে উর্কশী দণ্ডায়মানা । ত্রিধ্বরিণী বিদ্যার প্রভাবে, তিনি লোক-নয়নের অদৃশ্য । তিনি রাজার সমস্ত বাপার দেখিতেছেন, সমস্ত কথা শুনিতেছেন । পূর্বে—সেই প্রথমবার, উর্কশীর যে আশা অপূর্ণ ছিল, এবার তাহা পূর্ণ করিয়া লইতেছেন । রাজার কাতরতাদর্শনে, কোমল-প্রাণা উর্কশীর আর বৈর্য্য রহিল না । তিনি অগ্রে মেনকাকে রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন । ক্রিয়াকাল পরেই, মেনকা উর্কশীর নিকটে যাওয়া যখন বলিল যে, রাজার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, তিনি উন্মত্তপ্রায়, তখন উর্কশীর আর জ্ঞান রহিল না । তিনি অনেক প্রয়াসে, চিত্ত স্থির করিয়া, দিব্য-কান্তি-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক, ব্যগ্রভাবে পুরুষবার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । আকাজ্কিত-লাভে তাঁহারা উভয়েই প্রথম প্রীত হইলেন । কবি এই ভাবে, দ্বিতীয়বার রাজার সহিত উর্কশীর মিলন

করাইলেন । পুরাণ-কর্তৃগণ, এই সকল স্থলে, যে সমুদয় সুদীর্ঘ ঘটনার বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছেন, কালিদাস অতি কৌশলে, তাহা সংশোধিত করিয়া লইলেন ।

উর্কশী রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র, ইতিমধ্যেই স্বর্গ হইতে দেবদূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, মহর্ষি ভরত লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নামক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, দেবরাজ-সভায় তাহার অভিনয় হইবে, উর্কশীকে সেই অভিনয়ে অভিনেত্রী সাজিতে হইবে, সুতরাং এখনই স্বর্গে প্রস্থান আবশ্যক ! উর্কশীর তথা উর্কশীবল্লভ পুত্রবার হৃদয়, এ সংবাদে ভাঙ্গিয়া গেল । উর্কশী, তাঁহার সেই ভগ্ন হৃদয় খানি, যেন রাজার চরণ-প্রান্তে স্ত্রাসবৎ গচ্ছিত রাখিয়া, দেবেজের অপরিহার্য আদেশে, শূন্য-মনে স্বর্গযাত্রা করিলেন । তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব-সম্বৃত হৃদয়ানল এবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । আকাজ্ঞা প্রতিহত হইলে, উহা পূর্বাশঙ্কা সহস্রগুণে বন্ধি-প্রাপ্ত হয় । রাজার উর্কশী-দর্শন-বাসনাও অত্যন্ত বলবতী হইল । মহাকবি, এইভাবে রাজা এবং উর্কশীর প্রণয়ের ক্রমস্ফূর্তি প্রদর্শন-পূর্বক, শেষে এক অনির্কচনীয় চিত্রের অঙ্কন করিয়া, সামাজিকদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ এবং রস-সাগর-নিমগ্ন করিয়াছেন ।

কবি, তৃতীয় অঙ্কে, রাজা, বিদূষক ও প্রধান মহিষী দেবী ঔশীনরীকে এক মণিময় প্রাসাদে সমবেত করিয়াছেন । দেবী ঔশীনরী কাশী-রাজের ছুহিতা, উদার-হৃদয়া ; তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন । মহারানী একটি বড় ব্রত লইয়াছিলেন, আজ তাহার উদ্‌যাপনের দিন । ব্রতের নাম ‘প্রিয়-প্রসাদন ।’ এ দিকে, উর্কশী, ভরতমুনিকর্তৃক অভিষপ্ত হইয়া, স্বর্গরাজ্য হইতে মর্ত্তে আসিয়াছেন । সঙ্গে চিত্রলেখা । তাঁহারাও উভয়ে ঐ ‘মণিপ্রাসাদে’ উপস্থিত । তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অস্ত্রোদ্বস্ত । রাজার নিকটে দেবীর উপস্থিতি-দর্শনে উর্কশীর হৃদয় অবসর

হইল । • তাঁহার স্বর্গ-রাজ্য-স্থলন হইয়াছে, এখন বুঝি, মর্ত্তে যে স্থানটুকু ছিল, তাহাও যায়,—ভাবিয়া, তিনি, দুঃখে, বেদনায়, অবসাদে, একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন ।

• তখন মহিষী প্রবেশ করিলেন, এবং রাজা ক্ষিপ্ৰভাবে তাঁহার হস্ত ধারণ পূৰ্ব্বক তাঁহাকে আসনে বসাইলেন, তখন উৰ্ব্বশী এক দৃষ্টে, সেই সৌভাগ্যবন্তী মহিষীর দিকে চাহিয়া রহিলেন । তিনি দেখিলেন, স্বর্গের শচী যমপেক্ষাও যেন এই মর্ত্তের রাণী অধিকতর ওজস্বিনী^১ । রাজা ও রাজ্ঞীর কত কথাবার্ত্তা হইল । উৰ্ব্বশী উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে সে সমস্ত শুনিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ তাঁহার হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এইক্ষণ, দেবীর কথোপকথন শ্রবণে তাহা বিদূরিত হইল । দেবী যখন কথাপ্রসঙ্গে বিদুষককে বলিলেন যে, মৃত ! তুমি জাননা যে, আমি আমার স্বামীর স্মৃথের জন্ত, আমার নিজের সমস্ত স্মৃথ, অম্লান-বদনে বিসৰ্জন দিতে পারি ; স্বামীর স্মৃথসম্পাদন ব্যতীত আমার অত্ন কোনও প্রিয় কার্য্য নাই ; তখন অন্তরাল-বৰ্দ্ধিনী উৰ্ব্বশী চিত্রলেখাকে বলিয়াছিলেন, ‘সখি ! যাহার এমন প্রার্থ্যা, আর যিনি এতাদৃশী দেবী রমণীর স্বামী, আমি তাঁহাকে, কেন শ্রামনা করিলাম ? হায় ! আমার হৃদয় এখন আর আমার নাই, আর প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস বৃথা^২ !’

দেবী পরিচারিকা সমভিবাাহারে, নিজ্জাক্ত হইলে, রাজা উৰ্ব্বশীময় চক্ষে আবার কত আশার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । একবার এইরূপ প্রমোদ-বনে উৰ্ব্বশী আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন, আর কি তেমন হইবে ?

১—বিক্রমোৰ্ব্বশী ওয় অহ । উৰ্ব্বশী । ‘হলা, ইয়ং স্থানে দেবীশব্দেন উপচর্য্যতে ।

ন কিমপি পরিহর্য্যতে শচ্যা ওজস্বিতয়া ।’

২—ঐ । দেবী । অহং খলু আশ্রমঃ স্থাবসানেন আৰ্ধ্যপূজং নিবৃত্তশরীরং কৰ্ত্ত্বমিচ্ছামি ।

• এতাবতা চিন্তয় তাবৎ, শ্রিয়ো নবেতি ?

•—উৰ্ব্বশী । ‘হলা ! শ্রিয়কলত্রো রাজকি । ন পুনর্হৃদয়ং নিবর্ত্তয়িতুং শক্যমি ।’

এইরূপে—রাজা সেই অতীত স্মৃতির মুহূর্ত্ত ভাবিতেছেন, এমন সময়ে, ছায়াময়ী উর্বশী স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক, রাজার পশ্চাভাগ দিয়া আসিয়া, করপন্নব, তাঁহার নয়ন আবরণ করিয়া ধরিলেন । বহুকাল পরে উভয়ের আবার মিলন হইল ।

অষ্ট-চত্বারিংশ অধ্যায় ।

লতাময়ী উর্বশী ।

• অনেক দিন হইল, উর্বশী অম্বরাদিগের দল ছাড়িয়া মর্ত্তে আসিয়া-
ছেন । রাজা পুত্ররবা তাঁহার সমাগমে যেন কৃতকৃতা হইয়াছেন । তাঁহার
জীবনের সমস্ত কাৰ্য্যই যেন পর্য্যবসিত হইয়াছে । তিনি অনাতাগণের
উপর বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুভার হস্ত করিয়া, উর্বশীর আকাঙ্ক্ষানুসারে,
তাঁহার সহিত, কৈলাসপর্ব্বতের শিখরোদ্দেশবর্তী গন্ধমাদন বনে চলিয়া
গিয়াছেন । উর্বশী উক্তন প্রদেশের অধিবাসিনী, অগ্নোদ্দেশবর্তিনী
পৃথিবীর জন-কোণাহীনময় স্থান তাঁহার রুচিকর নহে । তাই তিনি,
তাঁহার চিরপরিচিত প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছেন । চন্দ্রবংশে, অবতংস,
মহাপতি পুত্ররবা, উর্বশীর জন্ত, আপন কর্ত্তব্য রাজা-পালন বিস্মৃত
হইয়াছেন । রাজার পবিত্র ধর্ম্মে অবহেলা করিয়া, তিনি রাজধানী হইতে
অন্তর্হিত হইয়াছেন ।

মহাকবি, অতিকৌশলে প্রতিপাদন করিলেন যে, তাঁহার হৃদয় এক-
বার আলিত হইয়াছে, তাঁহার পতন যে কতদূরে শেষ হইবে, তাঁহার
স্থিতি নাই । উর্বশী রাজার জন্ত, চিরানন্দময় স্বর্গরাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট
হইয়াছেন । রাজাও উর্বশীর জন্ত স্ব-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় কোন্
পার্বত্য অরণ্যে আশ্রয় লইলেন । উভয়েরই ত্যাগ-স্বীকার অদ্বিত । উর্বশী
বাদনার প্রতিমূর্ত্তি । বাসনার ধর্ম্ম এই যে, সে সৌধগাত্রে বটবৃক্ষবৎ
গন্ধুরূপে প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়া, পল্লবিত হইতে হইতে, ক্রমে গাহার
আশ্রয়কেই একবারে আশ্র-সন্তায় আবৃত করিয়া ফেলে, সে আশ্রয়ের
দ্বার পৃথগস্তিত্ব রাখে না । রাজা পুত্ররবারও এখন সেই অবস্থা । তিনি
এখন সম্পূর্ণরূপে উর্বশীময় । তাঁহার পৃথক সত্তা নাই । সুতরাং সে
অবস্থায়, তাঁহার পক্ষে, রাজধানীতে অবস্থান বিড়ম্বনা মাত্র । তাঁহার এখন

রাজধানী আর অরণ্য, উভয়ই তুল্য । উর্কশী-বিহীন নগর তাঁহার পক্ষে মহারণ্যকল্প, আবার উর্কশীযুক্ত অরণ্যানী তাঁহার নয়নে জনশ্রোতোময়ী মহানগরীর তুল্য ।

কৈলাস-শিখর-বর্তিনী গন্ধমাদন-বনভূমির প্রান্তবাহিনী মন্দাকিনী-তীরে, একদিন রাজা ও উর্কশী ভ্রমণ করিতেছিলেন, আর দূরে মন্দাকিনী-সৈকতে উদকবতী-নারী এক বিদ্যাধর-দারিকা সিকতার ক্রীড়া-পর্যন্ত নিম্মাণ করিয়া খেলিতেছিল । রাজর্ষি পূরুরবা, একবার মুহূর্তে জ্ঞাত, সেই কস্তুর অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ছিলেন । ইহাতেই উর্কশীর অভিমান জন্মে । তিনি তৎক্ষণাৎ নিকট বর্তী ‘কুমারবন’ নামক প্রসিদ্ধ অরণ্যে অভিমান-ভরে প্রবেশ করেন । ভরতের অভিশাপে উর্কশী মাহুযী হইয়াছিলেন । তাঁহার হৃদয় হইতে গন্ধর্ব্বজন-সুলভ স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল । কুমারবনে কস্তুর প্রবেশ নিষিদ্ধ—একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন । উর্কশী যেমন সেই প্রতিষিদ্ধ-প্রবেশ কুমার বনে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি অভিমানিনী উর্কশীর সেই অমরপ্রার্থিত রূপরাশি নিমেষমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল । তিনি সেই কাননের উপান্তবর্তিনী এক লতার রূপে পরিণত হইলেন ।

তিনি প্রথম ছিলেন স্বর্গের প্রধান অপ্সরা, হইলেন মাহুযী, কিন্তু তাহাও তাঁহার রহিল না । শেষে একবারে, অচেতন লতার আকার ধারণ করিলেন । একবার যাহার পরিভ্রংশ ঘটে, তাহার চরম পরিণতি যে কোথায়—কত দূরে, বোধ হয়, তাহা বিধাতার অনির্দেশ্য ।

কালিদাস—এই স্থলে, দুইটি চরিত্রের দুই প্রধান অংশ প্রদর্শন করিলেন । প্রথমে রাজার চরিত্র । রাজ্য ও ঐশ্বর্যের দ্বারা দেবী সহধর্ম্মিণীকে অনাদর করিয়া, উর্কশীকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । ইহা আদর্শ রাজচরিত্র নহে । পরে আবার, সেই উর্কশী,—যাঁহার জ্ঞান, রাজা রাজ্য, ঐশ্বর্য—সমস্ত পরিভ্রাণ-পূর্ব্বক, দূর গন্ধমাদন-বনে চলিয়া



[७] उडुत्त उडुत्त

Mohila Press, Calcutta.

গিয়াছেন—সেই উর্বশীর সমক্ষে আবার, অত্ন এক বালিকার প্রীতি
অনুরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। এ সমস্ত পুঙ্করবার রাজ্যোচিত—
চন্দ্রবংশীয় প্রধান পুরুষোচিত কার্য্য হয় নাট। কবির এই চিত্রে
দেখিতেছি যে, একবার মর্যাদা লজ্জিত হইলে, পরে আর হৃদয়ের
বন্ধন থাকে না। বন্ধন রাখা যায় না। বন্ধনচ্যুত হৃদয় উদ্ধাম হইয়া
পড়ে। তাহার অশেষ দুর্গতি ঘটে।

তার উর্বশী—তাঁহার জন্ম রাজ্যে রাজসিংহাসন ছাড়িয়াছেন, রাজ্য-সুখ
ছাড়িয়াছেন, এমন কি সর্বাপেক্ষা অতাজা দেবী ঔশীনরীকে পরাস্ত
ছাড়িয়াছেন। আজ সেই উর্বশী, রাজ্যের সামান্য ক্রটিতে অগ্নান-হৃদয়ে,
তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অভিমানভরে বনান্তরে প্রবেশ করিলেন।
কোথায় ঔশীনরী, আর কোথায় উর্বশী ! উভয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।
ঔশীনরী তাঁহার প্রিয়তম পুঙ্করবার চিত্ত-প্রসাদনের জন্ম, প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন যে, যে বস্তুই আমার প্রিয়তমের প্রার্থনীয় হইবে, আমি তাহা
অনুসন্ধান করিব। এমন কি, যদি অত্ন কোন রমণীকেও তিনি তাঁহার
হৃদয়-রাজ্যের রাণী করিতে চাহেন, তবে তাহাও আমার সর্বথা প্রার্থনীয়।
তাঁহার সুখই আমার সুখ, তদতিরিক্ত সুখ আমার অভিপ্রেত নহে।
রাজ্য পুঙ্করবা এমন দেবীকে তাঁহার জন্ম উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই
উর্বশীর আজ এই ব্যবহার। অদ্ভুত প্রতিদান !

কুমারবনে যদি কখন কোন কন্তকা প্রবেশ করিতেন, তবে
তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ বনের লতারূপে পরিণত হইতেন। গৌরী-
'চরণ-রাগ-সম্ভব' 'সঙ্গমগির' স্পর্শ ব্যতীত, ঐ লতাময়ী কন্তকার
হার উদ্ধার হইত না। উর্বশী অভিমান-ভরে সেই বনে প্রবেশ করিয়া
লতাময়ী হইয়া আছেন। এ দিকে রাজা উন্মত্ত। তাঁহার বাহু জ্ঞান
একবারে বিলুপ্ত। তিনি সেই বনের কুঞ্জে কুঞ্জে, লতায় লতায়, তন্ন তন্ন
করিয়া উর্বশীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক পরে রাজগৃহীত

‘সঙ্গমগণি’-স্পর্শে উর্কশীর উদ্ধার হইল। রাজা, একদিন, উর্কশীর জন্য উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছেন, লতায় পাতায় উর্কশীকে খুঁজিতেছেন, এমন সময়ে এক অতি সমুজ্জ্বল মণি দেখিতে পাইলেন অমনি অপ্রবুদ্ধভাবে সেই মণি কুড়াইয়া লইয়া, তাহাকে কত আদর করিলেন, কত কথা কহিলেন। তাঁহার উর্কশীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু মণি কোনই উত্তর দিল না। তখন ক্রোধোন্মত্ত নরপতি, সেই মণিটি দূর নিক্ষেপ করিলেন, মণি গাংরা এক লতার উপরে পতিত হইল অমনি দেখিতে দেখিতে, সেই লতা হইতে রাজার সেই অভিনানিনী উর্কশী হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন। কুসুম সম্ভারে তাঁহার দেহ-লতাব সুষজ্জিত, হস্তে কুসুমের গুচ্ছ, বর্ণে কুসুমের অঙ্ক। যেন কুসুমগয়ী বন দেবতা, উন্মত্ত নৃপতিকে সাস্বনা করিবার জন্য, সহসা লতা-দেহ পরিহা করিয়া, মাহুগীরূপে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন।

উর্কশী রাজার সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন। রাজার উন্মাদ দূর হইল। অনেক দিন প্রতিষ্ঠান নগরী ছাড়িয়া আসিয়াছেন, রাজা সেদিকে ফিরিয়া নাই। আজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, উর্কশী বলিলেন, ‘আ এখানে থাকি ভাল নহে, প্রকৃতি-পুঞ্জ হয়ত, ক্রমে আবার উপর অসুস্থ-পরবশ হইয়া উঠিবে! অতএব চল রাজন, প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া নাই’ রাজার ত আর পৃথক সম্ভা ছিল না, তিনি অমনি বলিলেন—‘গদাঃ ভবতি’—নাহ! বল, অর্থাৎ ‘চল।’ কোথায় কৈলাসশিখরে গন্ধমাদন বন? আর কোথায় কত দূরে, প্রয়াগোপকণ্ঠবর্তিনী সেই প্রতিষ্ঠান নগরী? যখন আসিয়াছিলেন, তখন রাজা এবং উর্কশী—উভয়ে একটা বিমন উন্মাদের অধীন ছিলেন, একটা অপরিচ্ছেদা মোহে বিমূঢ় ছিলেন। তখন গম্ভাবস্থানের দূরত্ব চিন্তার তাহাদের অবসরও ছিল না,

১—বিক্রমোৎকলী, ৪র্থ অঙ্ক। উর্কশী। ‘মহান্ গলু কালস্তব প্রতিষ্ঠানাং নির্গতঃ অসুস্থস্তি মাং প্রকৃতয়ঃ। তদেহি নিবর্ত্যাবহে।’

বা সে চিন্তার উদয়ও হয় নাই। মোহে যখন টানিয়া লইয়া যায়, তখন 'কোথায় বাইতেছি'—এ জ্ঞান থাকে না। এখন মোহ অনেকটা কাটিয়াছে, সে তজ্জা, সে অবশ্যতা আর তেমনটি নাই, আর তাহা থাকেও না। থাকিলে কখন আজ উর্বশীর মনে একথা জাগিত না, যে, অনেক দিন রাজা রাজধানীতে অনুপস্থিত, ইহা আমার পক্ষে মঙ্গল-জনক নহে।

উর্বশী রাজাকে লইয়া আসিয়াছেন, নতুবা রাজার এত দূরে, এ অগম্য স্থানে আসিবার সামর্থ্য ছিল না। আজ ফিরিয়া বাইতে হইবে,—ইহাতেও রাজার সামর্থ্য নাই। রাজা শূন্য-নয়নে উর্বশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উর্বশী কহিলেন, 'মহারাজ ! কি উপায়ে আপনি দেশে ফিরিয়া বাইতে চাহেন?'—রাজা বলিলেন 'বেল-গমনে ! তুমি মেঘময়ী হও, আমি সেই মেঘখানে প্রতিষ্ঠানে যাত্রা করি।' কামরূপিণী উর্বশী 'আচ্ছা' বলিয়া মেঘের আকার ধারণ করিয়া রাজাকে লইয়া, সেই কৈলাস-শিখর হইতে, আকাশপথে প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত দিন, তবুও, রাজা এবং উর্বশী দুইজনেব অন্ততঃ নামতঃ একটা পৃথগ্ভাব ছিল, আজ উভয়ে একবারে সত্যসত্যি এক হইয়া গেলেন।

মহাকবি, বিশ্বকর্মার বিচিত্র বিশ্বের কোন পদার্থে তাঁহার নায়ক নায়িকার যান প্রস্তুত করিলেন না। তিনি, বিশ্বাতীত এক নূতন পুষ্পকে রাজাকে লইয়া আসিলেন। যখন কবির এই বিরাট্ সৃষ্টির কথা মনে ভাবি, তখন বিস্মিত হই, কবির বিচিত্র-সৃষ্টি-কৌশল দর্শনে ওস্তিত হই। নিম্নে বিশাল ধরণী, 'সুজলা সুফলা, শস্ত্র-শ্রামলা' বহুধা, আর উর্দ্ধে মেঘময়ী প্রিয়তমার আশ্রয়ে সঙ্করমাণ রাজা, এ এক অপূর্ব সৃষ্টি ! কালিদাসের এই গ্রন্থে, এই যে বিচিত্র কল্পনার উন্মেষ দেখিতেছি, ইহাই, মনে হয়, তদীয় রঘুবংশের ত্রয়োদশে, রাম-সীতার আকাশপথে অযোধ্যাগমনের বর্ণনে পরিপক্ভাব ধারণ করিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, কিয়ৎকাল অতিবাহনের পর, যখন

উর্কশী জানিলেন যে, তিনি তাঁহার যে সদ্যোজাত সন্তানকে রাজার অজ্ঞাত-সারে, চ্যবনাশ্রমে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সেই পুত্র এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি, ইন্দের আদেশ শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ! ভরতের অভিশাপের পর, ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, ‘যাও উর্কশী ! যত দিন রাজা পুরুরবা তোমার পুত্রের মুখ না দেখিবেন, তত দিন তুমি মর্ত্যে থাকিও ; রাজা যখন তোমার পুত্রমুখ দর্শন করিবেন, তখন পুনরায় স্বর্গে ফিরিয়া আসিও ।’ সুতরাং আজ উর্কশীর মর্ত্যবাস শেষ হইল । উর্কশী চলিয়া যাইবেন । সমস্ত রাজধানী বিষাদে মগ্ন । এমন সময়ে, হঠাৎ নারদ ইন্দের আদেশ লইয়া উপস্থিত হইলেন । ইন্দ্র নারদমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ‘উর্কশীর আর স্বর্গে আসিয়া প্রয়োজন নাই, সে মর্ত্যেই থাকুক । পুরুরবা আমার পরম স্নেহ, তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিবে ।’ উর্কশীর আর যাইতে হইল না । তিনি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—

‘অম্ম হে ! সন্নং বিম হিঅআদো অবনীদং !’ ‘আহা ! আমার হৃদয়ের শল্য যেন অপনোত হইল । উর্কশী পুত্রোৎসঙ্গবতী হইয়া হর্ষিত-হৃদয়ে, পুরুরবার পার্শ্বে চিরস্থায়িনী হইলেন । চপলা এত দিনে অচলা হইল । উর্কশীকে আর স্বর্গে গমন করিতে হইল না । আর তিনিও, পুরুরবা যে স্বর্গে নাই, সে স্বর্গে যাইতে ভ্রমেণ্ড বাসনা করিলেন না ।

মহাকবি কালিদাসের সৃষ্ট এই উর্কশী-চরিত্রে দেখিলাম, মাহুষের হৃদয়,—স্বর্গ-নরক উভয়ই গঠন করিয়া লইতে পারে । উর্কশী বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে মর্ত্যেও স্বর্গস্থ পাইয়াছিলেন ; সেই ইন্দের অমরাবতী, মন্দাকিনীসৈকত, নন্দনবন, কল্পপাদপ, সব ভুলিতে পারিলেন । যদি মনের মত মাহুষ পাওয়া যায়, তবে পৃথিবীই স্বর্গ, অন্তথা জগৎ নরকাধিক ভীষণ, দুঃসহ-বাতনাময় ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুরুষবার উদ্ভাদ ।

• পুরুষবার চন্দ্রবংশের অবতংস, সমাগরা ধরণীর অধিপতি । স্বর্গের যেমন ইন্দ্র, মর্ত্যের তেমন পুরুষ । তাঁহার অমিত পরাক্রম । স্বয়ং সূর্যনাথ, অমর-দমন-মানসে, প্রায়ই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন । তাঁহার হৃদয় দয়ার নিব্বার-স্বরূপ । আন্তর্জাণে তিনি সতত সমুদাত-কাম্যক । তিনি সূর্য্যের উপাসনাস্তে, যখন শূন্তপথে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, তখন দূরে রমণীর কর্ণস্বর শ্রবণে অগ্রসর হইয়া সখী-মুখে উর্কশীর বিপদের বার্তা বিদিত হইয়াই, অমরের কবল হইতে উর্কশীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । উর্কশীর উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে যে পতিত হইলেন, ঠা হ তখন বুঝিতে পারেন নাই । অথবা তিনি কেন, পৃথিবীতে এমন অতি অল্প ব্যক্তিই আছেন, বাঁহারা, যথাসময়ে, আত্মপতন বুঝিতে পারেন । তিনি প্রাণ দিয়া উর্কশীকে ভাল বাসিয়াছিলেন । স্বর্গের অমরা রাজার হৃদয় সর্বসাকল্যে অপহরণ করিয়াছিল । রাজার অগাধ-প্রেমপূর্ণ অন্তঃকরণ যখন উর্কশীর দিকে হেলিয়া পড়িল, তখন উর্কশী ত্রিলোক-প্রার্থিত স্বর্গের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন । যদি সত্য সত্যই প্রাণ দিতে পারা যায়, তবে এমন কেহই নাই, বাহাকে আপন করা না যায় । রাজা সমস্ত প্রাণটা উর্কশীর জন্ত চালিয়া দিয়াছিলেন, উর্কশীও তাঁহার ‘আপনার’ হইলেন । মহাকবির অল্পকম্পায় দেখিলাম, আশ্বোৎসর্গে অসম্ভবও সম্ভব হয়, দেবতাকেও মানুষের মত ঘরে বাঁধিয়া রাখা যায় ।

কবি, রাজাকে, প্রথম প্রথম উর্কশীর, নিকটে অধিকক্ষণ রাখেন নাই । প্রথমবার ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতেই চিত্ররথ আসিয়া, উর্কশীকে লইয়া গেলেন । রাজার দুঃখের আর অবধি রহিল না । দ্বিতীয় বার,

যখন রাজা উর্কশী-বিরহে অতীব কাতর, তখন যদিও কবি উর্কশীকে একবার রাজার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও অতি অল্পকালের জ্ঞাত । উর্কশী আসিতে না আসিতেই, স্বর্গের দেবদূত আসিয়া, লক্ষ্মী-স্বয়ংবর-অভিনয়ের জ্ঞাত, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন । এবারেও, রাজার ভাগ্যে, পর্যাপ্ত-রূপে, উর্কশীদর্শন ঘটিল না । কবি, এইভাবে ধীরে ধীরে, পুরুষবাকে একটু একটু অগ্রসর করিয়া, ক্রমে, একবারে, উর্কশীময় করিয়া তুলিলেন । রাজা প্রতিবারেই ভাবেন যে, আর একবার দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হইবে । তাই আবার দেখেন । অননি আবার দেখিতে বাসনা জন্মে ।

‘ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

ইবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে ব ভূয় এবাভিবর্জতে ।’

এই-মুহাসত্যের প্রমাণ, কবি, রাজ-চরিত্রের, প্রতিকার্যো দেখাইয়া দিলেন । তার পর, অনেক দিন পরে, যদিও উর্কশীর সহিত, রাজার সাক্ষাৎ-কার হইল, উভয়ে গন্ধমাদনে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সে স্থানেও তাঁহাদের মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না । আবার উর্কশীর অভাব ঘটিল তিনি অভিনান-ভরে কোথায় লুকাইলেন । তাঁহার প্রাণ, রাজার পাশে পড়িয়া রহিল, আর প্রাণ-শূন্য উর্কশী অচেতন লতার রূপ ধারণ করিলেন । কবির সকলই অদ্ভুত ! আলঙ্কারিকগণ যথার্থই বলিয়াছেন যে, কবিসৃষ্টি ‘নিয়তি-কৃত-নিয়ম-রহিতা, অনন্ত-পরতন্ত্রা ও হ্রাদৈকময়ী ।’

রাজার চরিত্র এতই কোমল যে, তাঁহাকে কতকটা জীর্ঘশ্রাক্রান্ত বলয়াইতে পারে । তিনি এত বড় পৃথিবীর শাসনকার্য্য-ভার মস্তি-পরিষদে উপর তুল্য করিয়া, কেবল আশ্র-প্রসাদ-বাসনায়, উর্কশীর নির্দেশমতে, গন্ধমাদন-বনে চলিয়া গেলেন । ইহা তদীয় রাজ-চরিত্রের অস্বাভাবিক নাই । তিনি উর্কশীকে পাইয়া, একপদে, দেবী ও শ্রীমতীর কথা বিস্মৃত

হইলেন, ইহাও তাঁহার জ্ঞায় প্রয়ণবান্ ভূপতির উপযুক্ত হয় নাই । তাঁহার হৃদয় উৰ্ব্বশীর প্রতি কিরূপ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাই প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, কবিকে ঐ সকল প্রতিকূল চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে । ঐ সকল চিত্রের সমালোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, পুরুষবীর হৃদয়ে এমন একবিন্দু স্থানও ছিল না, যেখানে উৰ্ব্বশীর প্রভাব প্রবেশ করে নাই । তিনি নামতঃ পুরুষবা, কিন্তু কার্যতঃ উৰ্ব্বশীর ছায়ামাত্র । যখন কুমারবনে উৰ্ব্বশী লতাকুপিনী হইলেন, আর রাজা তাহা না জানিয়া, তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখনকার ব্রহ্মাস্ত্র সত্য সত্যই পাষণ-বিদারক ! রাজার সে উন্মাদাবস্থার বর্ণনা পাঠ করিলে কাহার নয়ন না অশ্রুভারাপন্ন হয় ? মনে হয়, অমন একাগ্রতা ছিল বলিয়াই তাঁহার জ্ঞাত্য স্বর্গবাসিনী উৰ্ব্বশী স্বর্গের মারা পর্যাস্ত ছাড়িতে পারিয়াছিলেম । তাঁহার যে প্রকার হৃদয়, তাহার যদি যৎকিঞ্চিৎ অংশও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে স্বর্গ ত তুচ্ছ, যদি স্বর্গাধিক অস্ত্র কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহাও পরিত্যজা ।

উৰ্ব্বশী মানভরে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন । রাজা উন্মত্ত । উৰ্ব্বশীর অন্বেষণে ইতস্ততঃ প্রধাবিত । তাঁহার বাহু-জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত । তিনি কখন বনতরুর কুসুম-কিসলয়ে দেহ বিভূষিত করিয়া, লতা-বেষ্টিত-গুপ্ত করী যেমন বনে করিণীর অন্বেষণ করে, সেই ভাবে উৰ্ব্বশীর অন্বেষণ করিতেছেন । কখন আকাশে নবজলধর দর্শন করিয়া, তাহাকে, তাঁহার উৰ্ব্বশীর অপহারক কেশী দানব ভ্রমে, বাণ মারিতে উদ্যত হইতেছেন । কখন বা, ঘন-কুম্ভ মেঘ-দর্শনে উন্নত-কণ্ঠ ময়ূর পুচ্ছভার বিস্তার করিয়া কেঁকারব করিতেছে,—দেখিয়া, উন্মত্ত রাজা, তাহার নিকটে উৰ্ব্বশীর সন্ধান করিতে যাইতেছেন । কি জানি, যদি ময়ূর উৰ্ব্বশীকে চিনিতে না পারিয়া থাকে, তাই রাজা তাহাকে বুঝাইতেছেন যে, শুন শিশুণী ! আমার উৰ্ব্বশীর বদন মৃগাঙ্ক-সদৃশ, আর সে ময়াল-গমনা । ময়ূর

পৃথিবীপতির এই উন্মাদ-দর্শনে যথার্থই কাঁদিয়া ফেলিতেছে । রসাল-শাখায় পরভূতা বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া, রাজা যুক্তকরে, এক এক বার উর্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর সে কুহস্বরে কাননভূমি কম্পিত করিয়া তুলিতেছে । আকাশে কালো মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়া, রাজহংসগণ, মানস-সরোবরে বাইবার জন্ত, উৎসুক-হৃদয়ে, কূজন করিতেছে, আর উর্বশী-বল্লভ রাজা, সেই কুজিতকে তাঁহার প্রিয়ার নুপুর-শিঞ্জিত-মনে করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইতেছেন । রাজা উন্মত্ত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার এ উন্মাদের মধ্যেও আবার বেশ একটু শৃঙ্খলা আছে । উর্বশী-মহুর-গমনা, হংসগণও মহুর-গতি, রাজার ধারণা, উর্বশীর একটা চিহ্ন যখন হংসশ্রেণীর মধ্যে আছে, তখন উর্বশী-হরণ তাহাদেরই কার্য্য । অমনি তঙ্করের দণ্ড-দাতা রাজা উর্বশী-তঙ্করের দণ্ডদানে উদ্যত হইয়াছেন !

দূরে চক্রবাক চক্রবাকী বসিয়া আছে, তাহারা যদি উর্বশীকে দেখিয়া থাকে, এই আশায়, উন্মত্ত পুরুষা ছুটিয়া তাহাদের দিকে বাইতেছেন, কত অহুনয়-বিনয় করিয়া, উর্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন । চক্রবাক ‘ক ক’ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, রাজা ভাবিলেন, পাখী বুঝি তাঁহার পরিচয়-জিজ্ঞাসা করিতেছে তিনি অমনি বলিলেন,—

‘দূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যশ্চ মাতামহ-পিতামহৌ ।

স্বয়ংবৃতঃ পতির্দ্বাভ্যাং উর্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ’ ॥’

এস্থলেও রাজার উক্তি বেশ শৃঙ্খলা-পূর্ণ । তিনি উর্বশী এবং পৃথিবী উভয়েরই পতি, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে, উর্বশীই তাঁহার প্রধান পত্নী, পরে পৃথিবী, তাই প্রথমেই উর্বশীর নাম ।

১—বিক্রমোর্কশী । ৪র্থ অঙ্ক । দূর্য্য বাঁহার মাতামহ এবং চন্দ্র বাঁহার পিতামহ, উর্বশী এবং পৃথিবী বাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন, আমি সেই ব্যক্তি ।

সম্মুখে পদ্ম প্রস্ফুটিত, তাহার মধ্যে ভ্রমর নিষপ্ত হইয়া, মধুবর্ষী গুণ-
গুণ রবে সরসী-বক্ষে কেমন একটা আবেশময় ভাবের আনয়ন করিয়াছে ।
রাজা সেই ‘অস্তঃকণিত-যট্পদ’ পদ্মের দিকে অনিমেঘ-নয়নে চাহিয়া
আছেন, তাঁহার ধারণা, শতদল বুঝি অক্ষুট কুসুমের ভাষায়, তাঁহার
উর্কশীর সন্ধান বলিতেছে ।

কখনো ‘উর্কশী ! উর্কশী !’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন,
পর্বতের কন্দরে কন্দরে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আর রাজা ‘উর্কশী’
নাম শুনিয়া, সেই দিকে দ্রুতপদে যাইতেছেন ; কিন্তু কোথায় উর্কশী ?
—অমনি মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছেন ।

কখনো রাজা, বীচি-মালিনী, বিহগ-শ্রেণি-রশনা, ধবল-ফেন-বসনা,
ললিত-গতি, কলবাহিনী, তটিনীর তীরে যাইয়া বসিতেছেন, উর্কশীর
জ্ঞান-ভূত-তুল্য সেই বীচি-বিক্ষোভ, রশনা-তুল্য বিহগ পঙ্ক্তি, ধবল-বসন-
সদৃশ ফেন-গুঞ্জ, আর উর্কশীর সেই বিলাস গতিবৎ তটিনীর ললিত
গমন প্রভৃতি অনিমেঘ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, উন্মত্ত নৃপতির
ধারণা, তাঁহার উর্কশীই বুঝি, এই নদী-রূপে পরিণত হইয়াছেন, নতুবা
নদী এসব সম্পদ কোথায় পাইল ?

হরিণী তরুচ্ছায়ায় হরিণের ক্রোড়ে নিষপ্ত, রাজা তথায় উপস্থিত ।
হরিণীর চকিত-নয়ন-দর্শনে, উর্কশীর সেই আকর্ষণ বিশ্রাস্ত লোচনযুগল
তাঁহার মনে পড়িল । কত অনুনয় করিলেন,—যদি হরিণ-মিথুন, তাঁহার
উর্কশীর কোনও সন্ধান বলিতে পারে ।

উন্মত্ত মহীপতি; এইভাবে, বনের প্রতিবৃক্ষে, প্রতিলতায়, উর্কশীর
সন্ধান করিলেন । মিলনকালে, উর্কশী একাকিনী ছিলেন, আর এই
বিরহকালে তিনি যেন শতমূর্ত্তি হইয়া রাজনয়নে ইতস্ততঃ প্রতিভাত

হইলে লাগিলেন । রাজা যাহা কিছু দেখেন, তাঁহার মনে হয়, সে সবই যেন তাঁহার উর্কশী । বিরহের এমন সুন্দর চিত্র, উন্মাদের এমন প্রকটচ্ছবি অত্যাশ্চর্য্য বিরল ।

দয়াবতী বীণাপাণি, তাঁহার কল্পনার অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বারা বৃষ্টি উৎসৃষ্ট করিয়া কবির সমক্ষে ধরিয়াছিলেন । কবি, সেই সারস্বতী কল্পনার প্রভাবে, যখন যেটি ধরিয়াছেন, সেইটিকেই তখন সর্বোত্তম করিয়া তুলিয়াছেন । আসমুদ্র ধরণীর অধীশ্বর, তরু-লতা-পশু-পক্ষী, বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত—সকলের নিকটে, তাঁহার ব্যথিত-হৃদয়েয় জন্ত সমবেদনা প্রার্থনা করিতেছেন ; তিনি কখনো বসিতেছেন, কখনো কুতাঞ্জলি-পুষ্টে লিঙ্গা চাহিতেছেন, কখনো বা অগ্রপদে দণ্ডায়মান হইয়া, সরসী-বক্ষঃ-প্রতিবিম্বিত, তরঙ্গ-চঞ্চল, শতদলের মুক্তি দর্শন করিয়া, প্রিয়া-ভ্রমে, ধরিতে যাইতেছেন । ময়ূর-ময়ূরী, ভ্রমর-ভ্রমরী, হরিণ-হরিণী, করী-করিণী—সব, স্থির-নয়নে, উন্মত্ত নরনাথের কার্য্যাবলী অবলোকন করিতেছে । যেন সমস্ত বনস্থলী একটা বিষম বেদনায় ব্যথিত হইয়া ‘অন্তঃস্তুতি-বাস্পবৃষ্টি’ হইয়াছে । রাজার আজ অন্তর্ বাহির, সর্বত্রই উর্কশী । বিরহের এমন চিত্র সংস্কৃত অথবা কোন নাটকে নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যাশ্চর্য্য হয় না ।

যখন উর্কশী লতারূপ-বিচ্যুত হইয়া রাজার সহিত মিলিত হইলেন, এবং রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘মহারাজ ! তুমি কি ভাবে রাজধানীতে যাইতে চাও ?’ তখন রাজা বলিলেন ‘চল, উর্কশী ! যে মেঘে অচিরপ্রভার পতাকা পরিশোভিত, সুরমা ইন্দ্রধনুর নয়ন-রঞ্জন আলেখ্যে যে মেঘ-গাত্র সুরঞ্জিত, সেই নবীন মেঘময় বিমানে আমাকে লইয়া চল । খেল-গমনে ! তুমিত কতরূপ খেলা খেলিতে জান, আজ মেঘের খেলা খেল ।’

অনেক দুঃখ কষ্টের পর, অনেক উন্মাদের পর, ‘হুই’ জনের আবার

মিলন, ঘটয়াছে। আজ তাঁহাদের যে সুখ—যে উল্লাস উৎসাহ হইয়াছে, তাহা মর্তের নহে। মর্তে অত সুখ, অত উল্লাস জন্মে না, জন্মিলেও ক্ষণকাল বই থাকে না। উহা স্বর্গের বস্তু। নিশ্চল সুখ, নিরাবিল উল্লাস স্বর্গের পদার্থ। আজ উর্কশী-পুরুষবার হৃদয়ে সেই স্বর্গ-সম্পদ উদিত হইয়াছে। ধরায় ও সম্পদের স্থান নাই, ধরাতলের উৎকাদাহে উহা ঝলসিয়া যায়, তাই কবি তাঁহাদিগকে উপর দিয়া—অনেক উপর দিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারা আনন্দে—মোহে অবশ হইয়া, দুইজনে যেন এক হইয়া আকাশ-পথে চলিলেন, আর জড়জগৎ—পঙ্কিল সংসার তাঁহাদের নীচে—অনেক নীচে পড়িয়া রহিল।

কবিকুলোত্তম কালিদাস, এই উর্কশী-পুরুষবার মিলন, বিচ্ছেদ, পুনর্মিলন এবং পরিশেষে মেঘময়ী উর্কশীর আশ্রয়ে রাজার প্রস্থান, যেরূপ অল্পপম-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, এই বর্ণনায় তাঁহার স্বর্গমর্ত-ব্যাপিনী কল্পনার যে অদ্ভুত লীলাতরঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। হৃদয় বিমল আনন্দ-রসে আপ্তুত হয়।

রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্তির পরে যখন তনয়-মুখ দর্শনান্তে রাজা বুঝিলেন যে, উর্কশী আর থাকিবেন না, তাঁহার স্বর্গ-প্রস্থানের কাল উপস্থিত। তখন তিনিও মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন “আমার পুত্র এই ঔর্কশেয় ‘আয়ুকে’ আপনারা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন, অদাই ইহার অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হউক। আমি বনগমন করিব।” রাজা বুঝিলেন যে, তাঁহার পক্ষে উর্কশী-শূন্য রাজ্য কেবল বিড়ম্বনাময়।

পুরুষবার চরিত্রে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যখনই কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, তখনই রাজা দেখাইয়াছেন, তিনি উর্কশীর জন্ত

সমস্ত ভাগ করিতে পারেন । রাজ্য, ঐশ্বর্য, ধন, মান, প্রাণ—উর্কশীর
তুলনায় এ সমস্তই অতি তুচ্ছ । প্রণয়ের এ এক বিচিত্র অবস্থা । এ
অবস্থা সকল প্রণয়ে ঘটে না । সকলের ভাগ্যে ঘটে না । প্রণয়ীর
সখা কালিদাস, বিক্রমোর্কশী ত্রোটকে, প্রণয়ের এই অপূর্ণ মূর্তি
‘অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার প্রিয় সংস্কৃত ভাষার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন ।

রাজা পুরুষবাকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে”
পারি না বটে, কিন্তু তাঁহার এই অলৌকিক প্রণয়-সম্পদের এবং
অমরচূর্ণিত হৃদয়ের শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

দেবী ঔশীনরী ।

ঔশীনরী কাশীরাজের হুহিতা, মহারাজ পুরুষবার মহিষী । এই নাটকের মধ্যে দুই স্থলে,—একবার দ্বিতীয় অঙ্কে, আর একবার তৃতীয় অঙ্কে, তাঁহার উল্লেখ আছে । তিনি চন্দ্রবংশের প্রধান নরপতির পাটরাণী, কাশীরাজের কত্তা, 'পিতৃকুল, পতিকুল' উভয়ের গৌরবেই গৌরবান্বিতা । কিন্তু তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ, নিয়ত, সামান্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থ রমণীর হৃদয়ের মত সরল, গর্বশূন্য । মালবিকাগ্নিমিত্রের ধারিণীকে দেখিয়াছি, ইরাবতীকে দেখিয়াছি, ঔশীনরীর নিকটে তাঁহার উল্লেখযোগ্যই নহেন । ঔশীনরীর হৃদয় উদার, দয়া-পূর্ণ, ক্ষমা-প্রবণ । অথবা তিনি যেন শরীরিণী ক্ষমা । কিন্তু সে ক্ষমার মধ্যেও, তাঁহার সতীকুলের আভরণস্বরূপ, পতিব্রত-ব্যভিচার-বিষেব প্রবল । তবে সে বিধেযের বশে, তিনি, পরের সর্বনাশ করেন না, করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিই জন্মে না । তিনি আপন হৃদয়ানলে আপনাকেই ভস্মীভূত করিয়া, তাঁহার প্রিয়তমের প্রণয়-মার্গ নিষ্কটক করেন । বিদিশার রাণী ধারিণী, প্রতিপক্ষরাণী ইরাবতীর সর্বনাশের জন্ত, মালবিকারূপী শান্তি অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছিলেন । ধারিণী নিজেই মজিলেনই, অন্তকেও মজাইলেন । তাঁহার নিজের সুখ অনেক দিন ঘুচিয়াছিল, পরের সুখের পথেও কষ্টকর রোষণ করিলেন । আর ঔশীনরী যখন বুঝিলেন যে, এবারকার মত তাঁহার জীবনের প্রণয়-স্বপ্ন ভাঙিয়াছে, তখন শাস্তহৃদয়ে আসিয়া, তাঁহার সেই প্রাণাধিকের চরণে, আপন প্রণয়ব্রতের উদ্ঘাপন করিয়া গেলেন । তিনি নিজের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া সেই শোণিতে, তাঁহার প্রাণাধিকের নব প্রণয়-প্রতিমার অঙ্করাগ করিয়া দিলেন । হিন্দুর আদর্শ রমণী যনের দ্বারা, কার্য্যের দ্বারা, বা শরীরের দ্বারাও কখনো পতির প্রতিকূল

আচরণ করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ, ঔশীনরী ইহা বর্ণে বর্ণে পালন করিলেন । আৰ্য্যবংশের আদর্শ রমণী হইতে হইলে, তাঁহার কিরূপ ক্ষমা, তিতিক্ষা, নিম্মার্থপরতা ও আত্ম-মুখে স্ফূর্ততা থাকা চাই, তাহা ঔশীনরী আত্ম-দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করিলেন । আৰ্য্যবংশের সাক্ষী ললনা যে, আত্মভোগে নিয়ত অনুৎসেকিনী থাকিয়া কিরূপ ভাবে পতির চরণ-পরিচর্যা করেন, পতিরূপী পরম দেবের প্রীত্যর্থ জগতে আৰ্য্য-ললনার অনুৎসর্জনীয় যে কিছুই নাই, প্রয়োজন হইলে আৰ্য্য-ললনা আপন হৃৎপিণ্ড আপনি উৎপাটিত করিয়াও যে, প্রাণাধিকের চরণে সহাস্র-বদনে উপহার প্রদান করিতে পারেন, একথা ঔশীনরী আত্ম-দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ করিলেন । একরূপ উন্নতহৃদয়া দাক্ষিণ্যবতী, পতি-প্রীতিমাত্র-সম্বলা, সরলা, রমণী-দেবীর পরিচয়, আমরা সংস্কৃত অস্ত্র কোন দৃষ্টকাব্যে দেখিতে পাই না । আত্ম-ভাগের এতদূশ দৃষ্টান্ত অস্ত্র কোন রমণী দেখাইতে পারেন নাই । বিধাতৃ-সৃষ্টিতে একরূপ মানবী দেবী ভূর্ণভ । কবি-সৃষ্টিতে কদাচিত্ সস্তব । তাই কবি-সৃষ্টি বিধাতৃ-সৃষ্টির অতিবর্তিনী । এইরূপ একটি আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কবি সমাজের মে পরিমাণে উপকার করেন, শত বৎসর যাবৎ শত সহস্র বাগ্মী, তারকণ্ঠে বক্তৃত্তা করিয়া, তাহার কিয়দংশও সাধিত করিতে পারেন না । যে দেশের সমাজে ঐরূপ রমণী-চরিত্র আলোচিত হয়, সে দেশ এবং সেই সমাজ সর্বথা সম্মাননীয় ; আবার যে সকল মহাত্মা ঐরূপ আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সমাজে আদর্শের পূজা প্রবর্তন করেন, সেই বিধাতৃবর কবিগণও সর্বতোভাবে পূজ্য । কবিগণ চরিত্র সৃষ্টি করেন, লোকে সেই আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে স্ব স্ব সমাজ গঠন করিয়া লয় । পরোক্ষ ভাবে কবিগণই সমাজের গঠন-কর্ত্তা, মানুষের পরম হিতৈষী ।

উর্কশীর প্রথম দর্শনাবধি, রাজা কেমন যেন শূন্ত-হৃদয়, নিয়-
ঔদাসীন্যময় হইয়াছেন । তাঁহার নয়ন-মন, পুস্তলিকার ভ্রায় বিবরে

স্বরূপাববোধে যেন অক্ষম । তাঁহার চক্ষে, বদনে, অথবা সমস্ত দেহে, সমস্ত কার্য্যে, যেন কি একটা বিষম অনাসক্তি, বিষম উদাস আসিয়াছে । কিছুতেই আর পূর্ব্ববৎ রতি নাই । রাজা পূর্ব্বের জ্ঞায় সমস্ত কার্য্যই করেন সত্য, কিন্তু সে সমুদয়ে যেন প্রাণের অভাব । তিনি বাতাপহৃত তৃণের জ্ঞায় অবশ-ভাবে কর্ত্তব্যের অনুসরণ করেন মাত্র, কিন্তু নিয়তই নিকৃৎসাহ, বিমুঢ়, একবারে জড়বৎ । রাজ্যের অন্ত কেহ রাজার চিন্তের এই আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য না করিলেও, ইহা কিন্তু রাজমহিষী সাধ্বী ঔশীনরীর চক্ষু এড়াইতে পারিল না । তিনি ছায়ার জ্ঞায় রাজার অনুবর্তিনী থাকিয়া, তাঁহার এই বৈমনস্তের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । কিছুতেই যখন কারণ-নির্দেশে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন দেবী, পরিচারিকাকে বলিলেন ‘নিপুণিকে ! আৰ্য্য মানবক রাজার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, তুমি যাও, যে ভাবে পার, সেই বিদুষকের নিকট হইতে রাজার এই ঔদাসীন্তের কারণ জ্ঞাত হইয়া আইস’ ।

দেবীর নির্দেশানুসারে, চতুরা নিপুণিকা, বিদুষকের নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত,—কেন রাজার এমন ঔদাসীন্ত, কাহার জ্ঞাত তাঁহার এ গাঢ় চিত্তচঞ্চল্য,—জানিয়া আসিয়া, দেবীকে বলিল । দেবী, প্রথমতঃ, মনে মনে বিষম প্রমাদ গণিলেন । শেষে দেখিলেন, অধীর হইলে চলিবে না । যদি পারা যায়, তবে ধীর ভাবে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে । কিন্তু সহসা পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না । তিনি স্থির করিলেন, যে, একদিন নিৰ্জ্জনে রাজার সহিত এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিবেন । দেবীর আদেশ-মতে নিপুণিকা লক্ষ্য রাখিল যে, রাজা কখন উদ্যান-বাটিকার লতা-গৃহে শ্রান্তি বিনোদনার্থে গমন করেন । একদিন, নিপুণিকার কথায়

দেবী লতা-গৃহের দিকে চলিলেন, সঙ্গে পরিচারিকা-বৃন্দ । নিপুণিক সন্ধান পাইয়াছে যে, আজ রাজা বিদূষকের সহিত লতামণ্ডপে যাইবেন । দেবী চলিলেন, বাসনা,—যে ভাবে হউক, তাঁহার হৃদয়েশ্বরের মনোবেদনা দূর করিবেন । লতামণ্ডপের সমীপবর্তিনী হইয়া দেবী এক লতাবিতানের অন্তরালে দাঁড়াইলেন । ইচ্ছা, রাজার কথ-বাস্তা শ্রবণ করেন ।

কেশি-দানবের হস্ত হইতে, রাজা যখন মুচ্ছিতা উর্কশীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন, মুচ্ছাভঙ্গের পর, উর্কশী, ত্রাণকর্তা নরপতির প্রতি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে কিয়ৎ কাল নিরীক্ষণ করিতে না করিতেই, গন্ধর্ব-রাজ চিত্ররথ আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন । উর্কশী, সেই কন্দর্প-কাস্তি পুরুষবাকে আশা মিটাইয়া দেখিতেও পান নাই । তাই স্বর্গে বাইয়াও উর্কশীর স্বস্তি নাই । তিনি, আর একবার রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত মর্ত্তে আসিয়াছেন । সঙ্গে চিত্রলেখা । প্রভাববলে তাঁহারা জানিয়াছেন যে, বিরহিণী রাজা এখন বয়শ্বের সহিত লতাকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন । অস্ত্রের অদৃশ্যভাবে, তাঁহারা তথায় উপস্থিত । লতামণ্ডপে আসিয়া রাজা যখন উর্কশী-বিরহে উন্মত্ত-প্রায়, তখন চিত্রলেখার পরামর্শানুসারে উর্কশী, ভূর্জগত্রে একখানি প্রণয়পত্রিকা লিখিয়া সমীরণ-ভরে রাজার সম্মুখে উড়াইয়া দিয়াছেন । রাজা সেই পত্রখানা পাইয়াছেন, তাঁহার পরম আনন্দ । রাজা আবার বিদূষকের হস্তে সেই পত্রিকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন । ক্রমে উর্কশী ও চিত্রলেখা রাজার সহিত সেই লতামণ্ডপে সাক্ষাৎ করিলেন । কিন্তু এবারেও উর্কশী অধিকক্ষণ মর্ত্তে থাকিতে পারিলেন না । সহসা দেবদূত আসিয়া ‘লক্ষী স্বয়ংবর’ প্রয়োগাভিনয়ের জন্ত, তাহাদিগকে স্বর্গে ডাকিয়া লইয়া গেল । উর্কশীর অদর্শনে এবার রাজার উন্মাদ আরও বর্ধিত হইল । তিনি তখন বিদূষকের নিকটে সেই পত্র চাহিলেন । চঞ্চল বিদূষক অনেকে

ক্ষণ, সে পত্র হারাইয়াছে ! সে রাজাকে প্রথম প্রথম অন্তমনস্ক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল । যাহাতে রাজার মনে ঐ পত্রের কথা না উদ্ভিত হয়, সে পক্ষে স্থল-বুদ্ধি বিদূষক অনেক কৌশল করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না । রাজা সেট পত্রের জন্ত বার বার আশ্রয় করিতে লাগিলেন । উভয়ে ‘তন্ন তন্ন’ করিয়া নানাস্থানে অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু কোথাও পাইলেন না । রাজা যখন পত্রাশ্বেষণে, এইরূপে, অতিশয় ব্যস্ত, তখন সেট লতাগৃহের পার্শ্ববর্তী লতাঝিতানে আসিয়া দেবী শিশীরী দাঁড়াইলেন । তিনি অন্তরালে থাকিয়া, পত্রের জন্ত রাজার সেট উন্মাদ আকুলতা—একে একে সব দেখিতে লাগিলেন । তাঁহার হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইল । এমন সময়ে ধূর্ত দক্ষিণ সমীরণ কোথা হইতে উড়াইয়া আনিয়া সেই পত্র দেবীর নুগ্ন-সংলগ্ন করিল । দেবী পরিচারিকাকে তাহা কুড়াইয়া লইতে বলিলেন । পরিচারিকা লইয়া দেবীকে তাহা অর্পণ করিতে গেল, কিন্তু দেবী স্পর্শও করিলেন না । বলিলেন, ‘তুই আগে পড়িয়া দেখ, যদি আমার পড়ার মত হয় তবে আমাকে শুনাইবি, আমি পড়িব না ।’ সে পড়িল । পত্রের মন্ত্র দেবীকে বলিল । তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেবী বলিলেন, ‘পত্রের কথাগুলি মনে গাঁথিয়া রাখি’—দেবীর এই ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ের গভীরতার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় । ধারিণী বা ইরাবতী হইলে, হয়ত, এই পত্রব্যাপারে একটা খণ্ডপ্রলয় করিয়া বসিতেন ! কিন্তু দেবী দেবীর জ্ঞায় স্থির-চিত্তে কেমন সামঞ্জস্য করিয়া লইলেন । পরিচারিকা, দেবীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, হয়ত, কত অলঙ্কার-সহযোগে পত্রবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছিল, কিন্তু দেবী তাহাতে মহারাণীর স্বর্ণাঙ্গা বিশ্বত হইলেন না ।

রাজা, যখন পত্রের জন্ত যুক্তকরে বসন্তানিলের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তখন দাসী দেবীকে কহিল, ‘দেখুন মহারাণি ! রাজার ভাবটা

দেখুন ।’ অমনি দেবী বলিলেন—‘দেখিতেছি, তুই চূপ্ কর ।’ দেবী যেন নিস্তরঙ্গ সাগরবক্ষের স্তায়, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের স্তায় স্থির—অবিচলিত । ক্রমে রাজার ব্যগ্রতা, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল । তিনি ‘হা হতোস্মি’ বলিয়া একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন । এতক্ষণও দেবী স্থির ছিলেন, কিন্তু এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তাঁহার অভীষ্ট-দেবতার কাতরতাদর্শনে, তাঁহার ধৈর্য্যের সেতু ভগ্ন হইল । তিনি, ঐ পত্র হস্তে লইয়া, সহসা রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘আর্য্যপুত্র ! শাস্ত হউন, এই আপনার সেট পত্র’ ।

অকস্মাৎ দেবীকে দেখিয়া রাজা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, এবং সজ্জনমনে ও কম্পিতবচনে কহিলেন ‘দেবি ! এস, কতক্ষণ তোমার শুভাগমন ?’ দেবী ধীরভাবে বলিলেন ‘রাজন ! শুভাগমন নহে, এসময়ে আমার আগমন অন্তর্ভেরই কারণ ।’ রাজা প্রথমে আশ্চর্য্য-গোপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল । তখন রাজা অপরাধ স্বীকার করিলেন । দেবী বলিলেন ‘না আর্য্যপুত্র, আপনি আমার সর্ব্বস্ব, আপনার আবার অপরাধ কি ? বরং আমিই অপরাধিনী, কেননা, আমার দর্শন আপনার একান্ত অনভিপ্রেত জানিয়াও, আমি এখনও আপনার সম্মুখে রহিয়াছি ।’—বলিয়াই, শুশুনরী পরিচারিকাকে লভন প্রস্থানোদ্যত হইলেন^১ । রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন । পশ্চিমে দেবীর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন । তখন দেবীর হৃদয় ‘ক্ষত-সেতুবন্ধন জলসজ্জাতের স্তায়, প্রবল-বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । সতীর বুক যেন তানিয়া পড়িল । তিনি কাদিতে কাদিতে বলিলেন

১—বিক্রমোক্ষণী, ২য়-অঙ্ক ;—দেবা । উপেতা । আর্য্যপুত্র ! অলম্বাংগেন । এতঃ তৎ ভূর্জপত্রম্ ।

২—ই, ঐ,—দেবী । ‘নাস্তি ভবতঃ অপরাধঃ । অহমেবাত্র অপরাধা ।’ বা প্রাঃ কুলসর্গা ভূম্বা অগ্রতন্তে তিষ্ঠামি । অতোহং পশিষ্যামি ।

‘রাজন! আমি নীচ-হৃদয়া, আমার নিকটে কি তোমার অনুনয় শোভা পায়? এই অপকার্যের জন্য, তোমাকে অনেক অনুশোচনা করিতে হইবে, আমার ভয় হয়, সেই সময়ে কোব হৃৎটানা না ঘটে!’ দেবীর অভিমান কথায় এই প্রথম এবং এইই শেষ। তিনি সজল-নয়নে সে স্থান হইতে নিজাকান্ত হইলেন।

দেবীর এই অভিমান দোষাবহ নহে। ইহা আখ্যায়িকার অলঙ্কার, সস্তীর শিরোভূষণ। অগ্নিহার কণিনীর রোষ উন্মাদ প্রকৃতি-সিদ্ধ। এ অভিমান দম্ভের কার্য্য নহে। এ অভিমান হৃদয়-দেবতার চরণে আপন, হৃদয় বেদনার অভিবাক্তি মাত্র।

দেবী চলিয়া গেলেন। রাজার অনুনয়-বিনয়—সমস্তই বিফল হইল। বিদূষক রাজাকে সাহুনা করিয়া কহিলেন—‘বর্ষার অগ্রসন্ন স্রোতস্বতীর ছায়, দেখিতেছি, দেবী চলিয়া গেলেন। আর কর্তব্য কি? আপনি গাত্রোত্থান করুন।’ অমনি রাজা বলিলেন—‘সখে! দেবীর অপরাধ নাই। দেখ, কৃত্রিম-রাগ-যোজিত’ মণি যেমন, হারার কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে দক্ষ মণিকারের হৃদয় মুগ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ, ‘অন্ত-সংক্রান্ত হৃদয়’ দয়িতের রস-হীন প্রিয়-বচনময় শত অনুনয়েও মনস্থিরতা রমণীর অভিনায়ী হৃদয় কদাচ বিনুগ্ধ হয় না। আমার মন উর্ব্বশ-ময় হইলোও, কিন্তু, দেবী ঔশীনরীর প্রতি এখনও সে মন পূর্ণবৎ আছে, তবে দেবী আজ আমার এই যে ‘প্রণিপাত লজ্জন’ করিলেন, হারার প্রতিফল-স্বরূপ আমিও কিয়ৎকণ দেবী-দম্ভকে বিশেষ পর্য্যাবলম্বন করিব। দেখি, দেবীর হৃদয় কেনন দৃঢ়?

১—বিক্রমোর্কশী, ২য় অঙ্ক। শেষ অংশ।

২—বিক্রমোর্কশী ২য় অঙ্ক। রাজা। উখায়, বয়স্ত। নেদম্পপন্নম্। পশু—
প্রিয়-বচন-শতোহপি যোষিতাং দয়িতজনানুনয়ে রসাসূতে।

প্রবিশতি হৃদয়ং ন তর্ষিতাং মণিরিব কৃত্রিম-রাগ-যোজিতঃ।

—উর্ব্বশী-গত-মনসোহপি মে স এব দেব্যাং বহমানঃ। কিন্তু প্রণিপাতলজ্জনাং অহমন্তাঃ
ধেয়ামবলম্বিযোঁ।

দেবী প্রস্থান-কালে বলিয়া গিয়াছেন, 'তুমি আজ যে অনল-কুণ্ডে কাঁপ দিলে, কালে ইহার জন্ত অনেক অনুতাপ করিতে হইবে, আমার ভয় হয়, তখন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে'। দেবীর এ উক্তি দেবীর উপযুক্ত, চন্দ্রবংশের কুললক্ষ্মীর অনুরূপই বটে। তাহার হৃদয়-সর্বস্ব রত্ন অস্ত্রে অপহরণ করিলে, ইহাতে তাহার যত না দুঃখ, সেই রত্নের পরিণামে যদি কোন 'অত্যাধিক' সংঘটন হয়, এই ভয়ে, তাহার ঐতিহাসিক দুঃখ, ঐতিহাসিক ভাবনা। দেবীর এখানে যেন একটা পৃথক সত্তা নাই : রাজার সঙ্গই দেবীর সত্তা। তিনি রাজার কার্যের দোষ গুণ বিচার করিতে চাহেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে, রাজার এ অলিখ হৃদয়ের ইয়ত্ত পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেন, তবে তাহার রাজার প্রাণে অনেক বেদনা লাগিত। দেবী তাহা করিলেন না। তাহা সে প্রবৃত্তিই হইল না। তিনি সত্য, সাদরতা, পতিদেবতা ললনা, পতি-অপ্রিয় অনুষ্ঠানে তাহার রুচি হইল না। তবে, তিনি যেন দিবা চন্দ্র দেখিতে পাঠিলেন, যে, ভবিষ্যৎ, এই জন্ত, নাজকে ঘোর অনুশোচন করিতে হইবে, তাহার অশেষ কষ্ট হইবে। বাস্তবিক হইয়াছিলও বটে। চন্দ্রবংশের অবতরণ, সাগরদত্ত বসুন্ধরার একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও, তাহাকে রাজধানী পরিভ্রমণ-পূর্বক, বনে বনে কত কাল উন্মদ হইয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। পশু, পক্ষী, তৃণ, লতা—এমন কেহই অবশিষ্ট ছিল না, যাহার নিকট সেই পৃথিবীপতি যুক্ত করে কৃপা-প্রার্থনা না করিয়া ছিলেন। দেবী ঔশীনরী যেন পূর্বাঙ্কুর সাগংকালের এই গম্ভীর নৃর্ত্তির ছায়া দর্শন করিতে পাঠিয়াছিলেন, তাই সে সত্যের মুখ হইতে ঐরূপ ভয়ের কথা বহিগত হইল। তাহার প্রিয়তমের ভবিষ্যদ্বক্তার তদীয় কোমল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

কিয়ংকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল। রাজা ও দেবীতে পরস্পর সাফাৎ নাই। অভিমানী রাজা ইচ্ছা-পূর্বক, দেবীর সহি-সাক্ষাৎকার পরিবর্জন করিয়া চলিতেন। পতিব্রতা ঔশীনরীর প্রাণে

ইহাতে যারপর নাট বেদনা লাগিল। এরূপ ঘটনা, তাঁহার জীবনে এই প্রথম। রাজা পুরুষবার অল্প অবলম্বন ছিল, অল্প চিন্তা ছিল, কিন্তু রাজময়-জীবিতী ঔশীনরীর ত আর অল্প কোন ধানের বিষয় ছিল না,—তিনি রাজার এই কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে, বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি এতদিনে বুঝিলেন যে, অভিমান বৃথা। যাহার উপর তাহার এই অভিমান, তিনি ত আর এখন সে তিনি নাই। তবে আর এ অভিমানে লাভ? জগতে, যাহার অভিনয় ভঙ্গ করিবার কেহ নাই, তাহার আবার অভিমান কেন? এত সাধনী মহাশয়ী আপন অভিমানের শিরে আপনই পদাঘাত করিয়া পড়িয়াছিলেন, রাজার সম্বন্ধে, নিজের উপদ্রবিকা হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন। সে দিন রাজার অল্পনয়ে কর্ণপাত করেন নাই, স্থানীর 'প্রণীপাত লঙ্ঘন' করিয়াছেন,—যেহা অল্পনয় কর্ম করিয়া বসিয়াছেন, সেই অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। এ প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে নাই। ধর্মশাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত যত শুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এহা অসম্ভব নহে, আর এ কবির প্রায়শ্চিত্ত, অল্পের পক্ষে অসম্ভব, নাহি ঔশীনরীর ত্রায় আদর্শ দেখিয়াই দেখা। ইহার দণ্ড, চিরদিনের মত আয়-সুখে বিমর্জিত। তিনি যাহার কৈরী-সম্পাদন-পুস্তক, এত মহিষী-সমুচিত বেশভূষা পরিচালনা করিয়া, সংসারিনী ব্রহ্মচারিণী পড়িছেন গ্রহণ করিলেন। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্ম-গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মের নাম 'প্রিয়-প্রদান' উচ্চৈঃ, প্রিয়তমের প্রদত্ত-বিধান। এই সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া, দেবী, পরিচারিকা নিপুণিকার মুখে মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি এক এত গ্রহণ করিয়াছি। এহার সম্পাদনকাল নিকটবর্তী, একটামাত্র দিনের জন্য আমি মহারাজের দর্শনার্থিনী। অভিমান-গর্ষিত পুরুষবা মহিষীর এ কথার কোনই উত্তর দিলেন না। কয়েক দিন কাটিয়া গেল। মহিষী আবার বৃদ্ধ কঞ্চুকীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন যে, ব্রহ্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আজ মহিষী সঙ্খ্যা-বন্দনাদি সম্পন্ন করিয়া রাজার নিকটে যাইবেন। দেখিতে

দেখিতে দিনমণি অস্তাচলে আশ্রয় লইলেন । সায়ংকালের রক্তবসনের অব-
 গুণ্ঠন ঈষদ্ভ্রমোচিত করিয়া, ক্রমে বিশ্ববিমোহিনী রজনী, ললাটে যেন ইন্দু-
 ক্রপী স্নিগ্ধ সিন্দূরবিন্দু পরিয়া, হাসিতে হাসিতে, সহস্রী নিজার সহিত, মৃদু-
 মন্দ-পদ-ক্ষেপে ভুবনে অবতীর্ণ হইলেন । এদিকে দেবীর নির্দেশানুসারে
 পৃথিবী-পতি পুরুষবাও, বয়স্ক সমভিব্যাহারে, সুরমা মণিহর্যা-প্রাসাদে
 গমন করিলেন । প্রাসাদে উপনীত হইয়া, পুরুষা সম-প্রত্যাশ-হৃদয়ে বসিয়া
 আছেন, এক এক বার, তাঁহার হৃদয়ে উর্ধ্বশীর কথা জাগিতেছে, বিদূষকের
 সহিত তদ্বিবয়ক কথোপকথন করিতেছেন, আবার পর মুহূর্ত্তেই দেবীর
 আপতনভয়ে, কথাস্তরে সে প্রসঙ্গ গোপন করিতেছেন :—এমন সময়ে,
 দেবী ঐশানরী ব্রহ্মচারিণীর বেশে, সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন । পরিজন
 বর্গ, নানাবিধ ব্রতোপহার লইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপনীত হইল ।

প্রাসাদে প্রবেশকালে, দেবী, একবার নীলগগনের বিনল শশাঙ্কের প্রতি
 দৃষ্টপাত করিলেন । শেতিগীর সহিত সন্মিলিত হওয়ার, সে দিন চন্দ্র
 শোভা যেন শতগুণ বদ্ধিত হইয়াছিল । তাঁর পতির সেই দিনের ছবি
 দেখিতে দেখিতে, বিরোগিনী দেবী বলিলেন ‘আহ! শেতিগী-যোগে, মৃগাক্ষের
 আজ কি অপূর্ণ শোভাই জন্মিয়াছে!’ অমনি ঐশান প্রণলভ্য পরিচারিকাও
 বলিল, ‘দেবীর সহযোগে আজ আনন্দের ভর্ত্তীও এইরূপ শোভা জন্মিবে’
 দেবী পরিচারিকার কথা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না । একবার অলক্ষ্যে
 তাঁহার একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত হইল ! দেবী যখন প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ
 করিলেন, তখন পুরুষা তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, আহ
 দেবীর আর সে ভুবন-মোহিনী মহিষী-মূর্ত্তি নাই । আজ দেবী—

সিতাংশুকা মঙ্গল-মাত্র-ভূষণা

বিচিত্র-দূর্ব্বাকুর-লাঞ্ছিতালকা ।

। আজ দেবীর পরিধানে ধবল বসন, কলেবর চন্দন-চর্চিত, অলক-দাম 'বিচিত্র-দুর্গাক্ষর' শোভিত । রাজা ভাবিলেন, বুঝি ব্রতের ব্যপদেশে, মহিষী আজ রাজার অভিমান ভঞ্জন করিতে আসিয়াছেন । তিনি অতি সমাদরের সহিত হস্ত-ধারণ-পূর্বক, দেবীকে বসাইলেন । মহিষী ঔশীনরীও কাল-বিলম্ব না করিয়া, রাজাকে প্রণাম-পূর্বক কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র ! আজ আপনাকে সম্মুখে রাখিয়া, আমার একটি বিশেষ ব্রত সম্পাদন করিতে হইবে । ক্ষণকালের জন্ত আমার এই উপরোধ সহ্য করুন ।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ব্রত ?' দেবী নীরব । তিনি রাজার কথার কোনই উত্তর দিলেন না,—দিতে পারিলেন না । কেবল একবার, অবসন্ন-নয়নে নিপুংগিকার দিকে চাহিলেন । অমনি নিপুংগক বলিল, 'প্রভো ! মহিষীর এ ব্রতের নাম 'প্রিয়-প্রসাদন ।' দেবীর ইঙ্গিতমতে, কুমারী-গণ পূজোপহার আনয়ন করিল, দেবী, তদ্বারা প্রথমে জগদানন্দ চন্দ্রদেবের অর্চনা করিলেন, পরে কহিলেন 'আর্য্যপুত্র ! এইবার আসুন ।' রাজা যস্ত্র-চালিত পুত্তলিকাবৎ আসিয়া, আসনে বসিলেন । তখন দেবী পতির পাদ-পূজা-পূর্বক, কৃতাজ্জলিপুটে প্রণাম করিতে করিতে, বাম-স্তম্ভিতকর্থে বলিতে লাগিলেন—'ঐ নিম্নল গগনে সমুদিত রোহিণী মৃগ-লাঞ্ছনকে সাক্ষী করিয়া, আজ আর্য্যপুত্রের প্রসন্নতা-বিধানের জন্ত, আমি প্রীতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আর্য্যপুত্র যাহাকেই কামনা করিবেন, যে রমণীই আর্য্যপুত্রের সমাগম-প্রণয়িনী হইবেন, আমি তাঁহার সহিত নিৰ্ব্বিরোধে বাস করিব । আর্য্যপুত্রের স্ত্রের পথে আমি কণ্টক হইব না ।'

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ৩৬-অঙ্ক । দেবী । 'রাজা পূজাভিনীয় প্রাঞ্জলিঃ প্রাণপতা ।—

এবাহং দেবতা-নিধুনং রোহিণীমৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্য আর্য্যপুত্রমুপ্রসাদয়ামি ।

অন্যপ্রভৃতি বাঃ স্ত্রিয়ঃ আর্য্যপুত্রঃ প্রার্থয়তি, যা আর্য্যপুত্রস্ত সমাগম-প্রণয়িনী তদ্বা নরা অপ্রতিবন্ধেন ভবিতব্যমিতি ।'

বিদূষক দেবীর এই ব্রত-বাপারে একটু উপহাস করিল, বলিল, ‘দেবি ! আপনি ব্রত করিলেন, কিন্তু আমার সখা যে একেবারে উদাসীন, বাপার কি ?’ দেবী অমনি পদদলিত ফণিনীর শ্রায় শ্রীবা উন্নত করিয়া বলিলেন—‘মূঢ় ! আমি নিজের সুখের অবসান করিয়া, আমার আৰ্য্যপুত্রের সুখ-কামনা করিতেছি, ইহাতেই আমার সুখ ; এত কামনার অতিরিক্ত কিছুই আমার প্রার্থনীয় নহে । আর কিছুই আমি দেখিতে চাই না’ ।

রাজা এতক্ষণে বুঝিলেন যে, দেবীর ব্রতের উদ্দেশ্য কি ? ক্ষণকালের জন্ত তাঁহার নোহময় হৃদয়েও বিবেক-ধারা উদিত হইল । তিনি দেবীকে, সঙ্কল্পিত পথ হইতে প্রত্যাহত করিবার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু এখন চেষ্টা বৃথা । প্রতিমার বিসর্জন হইয়াছে, আর তাঁহার উলোলনের প্রয়াস কেন ? দেবী গম্ভীর কর্ণে কহিলেন ‘পরিচারিকাগণ ! আমার প্রিয়-প্রসাদন ব্রত সম্পন্ন হইয়াছে, চল, গৃহে যাউ ।’ সেই রাত্রি ‘নগি-হস্ত-প্রাসাদে’ অবস্থান করিবার নিমিত্ত, রাজা দেবীকে অতুরোধ করিলেন । দেবী কৃতান্তলিপুটে ও বাষ্প-শ্লিষ্ট-কর্ণে বলিলেন, ‘আৰ্য্যপুত্র ! আমি ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমি সংসমিনী, ক্ষমা করুন ।’—এই বলিয়া দেবী ঊর্শানরী চলিয়া গেলেন । তাঁহার জীবনের সুখতার অন্তর্নিহিত হইল । তিনি স্বানীর হৃদয়ের প্রসাদ-বিধান-মানসে, নিজের হৃৎপিণ্ড উচ্ছিন্ন করিলেন । রাজা পুরুষবা, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, অতুল্য চিত্ত-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি প্রতিকূলচারিণী থাকিলে, পদে পদে রাজার আকাঙ্ক্ষা বাধিত হইবে, তাঁহার প্রিয়তমের প্রাণে আঘাত লাগিবে, তাই তিনি নীরবে সরিয়া গেলেন । তিনি ভাবিলেন, কাজ কি এ সকল বিড়ম্বনায় ?

১—বিহ্বলোৎসাহী, ওয় অহঃ ! দেবী । ‘মূঢ় । অহং বলু আশ্রমঃ স্থাবসানেন আৰ্য্যপুত্রঃ নিবৃত্তশরীঃ কৰ্ত্তৃমিচ্ছামি । এতাবতা চিন্তয় তামং, প্রিয়ো নবা—ইতি ।’

যাহ্ন যাইবার তাহা ত চিরদিনের মত গিয়াছে, শত ঔশীনরীর বিনিময়েও
 তার সে রাজ-হৃদয় ফিরিয়া আসিবে না । তবে কেবল হৃদয়েখরের
 সুখের পথে কণ্টক হইয়া ফল কি ? তাহার জীবনের সুখ ত ফুরাইয়াছে,
 তবে আর রাজার সুখের অন্তরায় হইয়া লাভ কি ? দুই জনেই বেদনা
 ভোগ করা অপেক্ষা, এক জনে ভোগ করিলে যদি, অপরের মুক্তি হয়,
 তবে তাহাই ত বিদেশ, বিশেষতঃ স্বামী,—একদিন বিনি আদর করিয়া
 ভারতের অধীশ্বরীর পদে বসাইয়াছিলেন, জগতে কত সুখের, মোহের,
 আবেশের চিত্র দেখাইয়াছিলেন, আজ তাহারই প্রীতির জন্ত যদি নিজের
 সুখ বিসর্জন করিতে না পারিলাম, তবে আর আমার হৃদয়ের সামর্থ্য
 কি ? যাহাকে ভালবাসি, প্রাণ দিয়াও বাহার তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলে
 কুণার্ঘ্য হই, সেই প্রাণাধিকার প্রীতির জন্ত জীবনের কয়েকটি পরিমিত
 দিনের সুখও যদি ভাগ করিতে না পারি, তবে আমার এ ভালবাসার মূল্য
 কি ? দেবী বুঝিয়াছিলেন যে প্রণয় একটি প্রধান বস্তু, এ মহাবজ্ঞের
 আভিমান স্বার্থ, দক্ষিণা অভিমান । তাই আজ তিনি সেই মহাবজ্ঞে
 পূর্ণাহুতি দিয়া, বাত-বিকম্পিত বিশীর্ণ নৃত্যকার ত্রায়, কাঁপিতে কাঁপিতে
 স্বকক্ষে প্রবেশপূর্বক দ্বারকদ্ধ করিলেন । ইহার পর আর কেহ, কখনও
 তাহার মুখ দেখিতে পাইল না । সতী ললনার হৃদয় যে কত কোমল,
 কত সুন্দর, সতীর চিত্রে পতির জন্ত যে কত আকুলতা, ঔশীনরীর চিত্র
 তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । যে দেশের রমণী, পতির প্রজ্জ্বলিত চিতায়,
 হাসিতে হাসিতে আরোহণ করিতেন, ইহা সেই দেশের সতীর চিত্র ।
 সে দেশের রমণী—

“আর্ত্তার্থে, মুদিতে হৃষ্টা, প্রোষিতে মলিনা কৃশা,

মৃতে ত্রিয়তে—পত্যা”—

• ইহা সেই দেশের সতীর চিত্র । যে দেশের সাহিত্যে এতাদৃশী

দেবীর চিত্র অঙ্কিত, সেই দেশ, সে সাহিত্য এবং সেই প্রতিমার যিনি
চিত্রকর—তিনি,—সকলেই পূজাই। সংস্কৃত সাহিত্যে সীতা, সাবিত্রী,
দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি কতিপয় চিত্র ব্যতিরেক, এতাদৃশী মূর্ত্তি আর
নাট বলিলেও বোধ হয় অতুক্তি হয় না।

এক-পঞ্চাশ অধ্যায় ।

উপসংহার ।

এতক্ষণে সাধারণ-ভাবে, বিক্রোমোৰ্কশী ত্রোটকের চরিত্র-সমালোচনা এক প্রকার শেষ হইল । মহাকবি, এই কাব্যে দেখাইয়াছেন যে, প্রণয়োন্মত্ত হৃদয়ের গতি কত অধোমুখী । আবার সেই সঙ্গে, ইহাও দেখাইয়াছেন যে, মানব-হৃদয়ের পরিসর কত, সে হৃদয় কত বিশাল, সে হৃদয়ে কত অপরিমিত প্রেম থাকিতে পারে । মনের নত হৃদয় পাইলে, সুখময় স্বর্গের চিরসুখী অধিবাসীও, স্বর্গ ছাড়িয়া এই তাপ-পূর্ণ মর্ত্তে বাস করিতে চায় । প্রেমের পরিপূৰ্ত্তি হইলে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই আত্ম-প্রেমের ছায়া লক্ষিত হয় । সৰ্ব্বত্রই আপনার হৃদয়ের কমনীয় বস্তুর সত্তা উপলব্ধ হয় । প্রেমের পরিপূৰ্ত্তি হইলে, সেই সীমাবদ্ধ হৃদয়-নিহিত প্রেম, অসীম বিশ্বের অনন্ত পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । ‘আমিদের’ তখন ‘প্রসার’ হয় । তখন জলে, স্থলে, শূণ্ণে বৃক্ষবল্লরীর পত্র-পুষ্প-কিসলয়ে, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-পর্য্যন্তে আত্ম-হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ট হয় । অন্তরে বাহিরে আপনার ধোয় বস্তুর সন্দর্শন ঘটে । কবি দেখাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ প্রেমের চরম পরিণতি আত্ম-তাগ আত্ম-বলি । ভোগ প্রণয়ের কীট, আত্ম-তাগ প্রণয়ের সঞ্জীবন । ঔশীনরীর চরিত্র হার উজ্জল নিদর্শন ।

উৰ্কশী অম্বর, রাজার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধা । সে রাজার আর কিছুই দেখে না । দেখিবার প্রয়োজনও নাই । সৌন্দর্য্যমাত্রই তাহার দৃষ্টব্য । সে রাজার সৌন্দর্য্য-ভোগের জন্ত, আপন পুত্রকে পর্য্যন্ত তাগ করিয়াছিল । পুরুষবা যখন উৰ্কশীর গৰ্ভজাত পুত্রের মুখ দেখিবেন, তখন উৰ্কশীর রাজ-সহবাস ফুরাইবে, দেবতাদের এই আদেশ স্বরণ করিয়া, উৰ্কশী আপনার পুত্র আয়ুকে’ তপোবনে নিক্ষেপ করিয়াছিল ।

রাজার প্রতি তাহার যে অমুরাগ, তাহা ভোগ-মূলক । আর ঔশীনরীর অমুরাগ ভোগমূলক । কবি পরম্পরা সম্মুখীন করিয়া, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দুইটা পরিস্ফুট মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন । প্রবৃত্তিময়ী মূর্তি স্বর্গের, আর নিবৃত্তিময়ী মূর্তি মর্ত্যের । প্রবৃত্তির কোথাও স্থখ নাই, তার সাক্ষী উর্কশী । তাহার একবার স্বর্গে, একবার মর্ত্যে যাতায়াত করিতেই প্রাণান্ত প্রায় হইল । মুনিরূপী বিধাতার প্রবল অভিপায়ে, তাহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিল । আর নিবৃত্তির স্থখ সর্বত্র । তাহার দৃষ্টান্ত ঔশীনরী । তিনি নিবৃত্তির বলে স্বকীয় মন-হৃদয়েও অনারজুর্ন শাস্তিস্থাপন করিলেন । যতদিন হৃদয়ের জ্বলৎ প্রবৃত্তিও ছিল, ততদিন তাঁহাকে দুঃখ-কষ্টময় সংসারে পাদচারণ করিতে দেখা গিয়াছে । কিন্তু সে দিন হইতে সর্ব-ক্লেশ-নাশিনী নিবৃত্তির যথার্থ সেবা করিতে পারিয়াছেন, সেই দিন হইতেই, তাহার যাতনাময় দেহের যেন বিলোপ ঘটিল । তিনি নূতন শাস্তোজ্জ্বলদেহ ধারণ করিলেন । তাই তাঁহাকে নাটকের অভ্রত আর দেখিতে পওয়া যায় না ।

প্রবৃত্তির কার্য্য অনন্ত, কিন্তু তাহার ফল অতি অল্প । নিবৃত্তির কার্য্য অতি অল্প বটে, কিন্তু ফল তাহার অনন্ত । প্রবৃত্তিপরায়াণা উপাশা গাঠি সারা জীবন, ঝটিকা-পরিচালিত পর্ণের ভায় অবশ-ভাবে, কত দুর্গম স্থানে, কত পাশাড়ে, পর্বতে, গহন বনে, তৃপ্তি ভিক্ষা করিয়া ছুটাছুটি করিল, কত দুষ্কর কার্য্য করিল, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি সন্দর্শন পাইল না । আর নিবৃত্তিময়ী দেবী ঔশীনরী ইচ্ছামাত্রেরেই, আপন অভিপ্রেত কর্তব্য সম্পাদন করিলেন । অশান্ত হৃদয়ে চিরদিনের মত, শাস্তির প্রসবণ উন্মুক্ত করিয়া লইলেন । প্রবৃত্তি-রাক্ষসীর তাড়নে উর্কশীর স্বর্গ-চ্যুতি ঘটিল । মর্ত্যেও একস্থানে দু'দিন সে স্থির হইয়া নিশ্বাস ছাড়িবার অবসর পাইল না । আর নিবৃত্তি-দেবীর আশ্বাস-বাণী সম্বল করিয়া, ঔশীনরী এক প্রকার যোগ লাভ করিলেন । প্রবৃত্তির গতি প্রথর, নিবৃত্তির গতি মধুর । তাই গ্রহের সর্বত্রই প্রবৃত্তিময়ী উর্কশীর

ছায়া, আর কেবল দুইটি স্থলে নিবৃত্তিমতী রাজ্যের আবির্ভাব। উর্ধ্বশীর কার্যে রাজ্যের তথা রাজ্যের কোনই গঙ্গল হইল না। বরঞ্চ অমঙ্গলই ঘটিল। আর মহিষীর আত্মত্যাগে, রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইল, রাজসংসারে আপতিষ্মাণ অস্ত্র-কলহের মূলোচ্ছেদ হইল; প্রবৃত্তির এমনই কঠোর শাসন যে, সে শাসনে উর্ধ্বশী রমণী হইয়াও নাগ হইয়াও, পুত্রকে অভিনন্দিত করিতে পারিল না। উপেক্ষিত পুত্রের বহুকাল পরে দর্শন-লাভ করিয়াও বিন্দুমাত্র আনন্দানুভব করিল না, পরন্তু পুত্রের উপস্থিতিতে তাহার আত্মসুখের অবসান হইবে—এই ভাবনায়, সে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের সমক্ষেই কাঁদিয়া ফেলিল। লাগসাময়ীর অতিলাস হৃদয়ে ভোগ-সুখের পরিবর্তে পুত্রপ্রাপ্তি বাঞ্ছিত হইল না। আর নিবৃত্তির মধুর বংশীরবে উন্মাদিনী হইয়া দেবী ঔশানরী তাহার চির-পরিচিত, অস্ত্র-সংক্রান্ত-হৃদয়, প্রণয়ীর সুখার্থে সহাস্ত্রবদনে আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিলেন। প্রবৃত্তি তামসী শক্তির আধার, তাই তমোময়-হৃদয়া উর্ধ্বশীর স্বর্গ-স্থলন হইল। নিবৃত্তি সাত্ত্বিকী শক্তির কেন্দ্র, তাই সত্ত্ব-গুণময়ী দেবী নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রবৃত্তির পরিণাম বন্ধন। স্বর্গবিহারিণী মুক্তপাংগনী উর্ধ্বশীকে তাই সংসারে আসিয়া সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠাননগরে আবদ্ধ থাকিতে হইল। নিবৃত্তির পরিণাম মুক্তি। রাণী ঔশানরী তাই নার্তার জটিল গহনজালময় সংসারে থাকিয়াও, যথেষ্ট বিচারিণী বন-বিহগীর ছায় বিমুক্ত হইলেন। মহাকবি কালিদাস, এই রূপে, এই নাটকে, অনেকগুলি অমীমাংসিত রহস্তের উদ্ঘাটন এবং অমীমাংসা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত আদর্শ রমণীচরিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আদর্শ পুরুষের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, তাহা তাঁহার প্রতিপাদ্যও ছিল না।

দ্বি-পঞ্চাশ অধ্যায় ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা ।

“অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদাসের সর্বপ্রধান দৃশ্যকাব্য । ‘সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট । এত অপূর্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্বোৎকৃষ্টই সর্বোৎকৃষ্ট । যদি শতবার পাঠ কর, শতবারই অপূর্ব বোধ হইবেক । ইহাতে হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা দ্রুপদ, এবং মহর্ষি কথের পালিত-তনয়া শকুন্তলার, বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । মহাভারতের আদি পর্বে দ্রুপদ ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রচনা করিয়াছেন । উভয়বিধ উপাখ্যান দৃষ্টিগোচর করিলে, বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন । ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাসের চমৎকারিণী কল্পনা-শক্তি ও চিত্ত-হারিণী রচনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে । এই নাটক পাঠ করিলে সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিঃসংশয় ঐটি প্রতিটি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিত্তে পারে না । বস্তুতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ । ধন্য কালিদাস ! ধন্য অভিজ্ঞান-শকুন্তল ! প্রলয়ে পূর্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই । ধন্য বিক্রমাদিত্য ! এই কালিদাস তোমার বয়স্ক ও সত্যসদ ছিলেন ; এই অভিজ্ঞান শকুন্তল তোমার পরিতোষার্থে সর্বপ্রথম উজ্জয়িনীর রক্তভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল ।”

“ভারতবর্ষীয়েরাই যে স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে, দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা

তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়াছেন । নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষ-
দেশ-ভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম জোনস, শকুন্তলা পাঠ করিয়া,
‘এমন প্রীত’ হইয়াছেন যে, কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি
সেক্সপিয়রের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং জর্মনি দেশীয় অতি
প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি, গেটি, শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম
জোনস কৃত ইংরেজী অনুবাদের ফন্টর কৃত জর্মন অনুবাদ পাঠ করিয়া
লিখিয়াছেন,—

• ‘যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল-লাভের অভিলাষ করে, যদি
কেহ প্রীতি-জনক ও প্রকুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ
ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে,
তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি ;
এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল ।’—যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের
অনুবাদ পাঠ করিয়া এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে
স্বদেশীয়েরা যে সেট বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া কত প্রীত
ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন ।

“এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত । প্রথম অঙ্কে ছ্যাস্ত ও শকুন্তলার
সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয়ে রাজার বিদূষকের সহিত শকুন্তলা-বিষয়ক
যোগাৎকথন ও কথাশ্রমবাসী ঋষিগণ কর্তৃক রাজার নিকটে, কতিপয়
• ত্র আশ্রমে আতিথ্য-স্বীকার প্রার্থনা । তৃতীয়ে ছ্যাস্ত ও শকুন্তলার
মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার পতিগৃহে প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার ছ্যাস্ত
দমোপে গমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, এবং সপ্তমে শকুন্তলার
সহিত পুনর্মিলন ।

১—বিদ্যাসাগর ।

২—বিদ্যাসাগর ।

শকুন্তলা-প্রণয়নের পূর্বে, কালিদাস, বিক্রমোর্কশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচিত করিয়াছেন। একখানি স্বর্গ এবং মর্তের ঘটনায় পরিপূর্ণ অপর খানির ঘটনা-স্থল কেবল মর্ত। এক খানির নায়ক মর্তে অধিবাসী হইয়াও স্বর্গের দেবতার প্রায় সমকক্ষ, দেব-প্রভাব সম্পন্ন, নায়িকাও স্বর্গ-বাসিনী, অম্পরাদিগের সর্বোত্তমা। আর একখানি নায়ক, মর্তের—ভারতের সম্রাট, নায়িকাও মর্তের সমৃদ্ধিশালী বিদগ্ধ রাজার রাজকন্যা। এক খানিতে অমানুষ ব্রতান্তই অধিক; দেখি: দেখিতে, একটি রমণী মেঘের আকার ধারণ করিতেছে, নায়কও কথ: করিক্রমে, কখন হংসাকারে, কখন বা মৃগরূপে আয়ু-পরিচয় প্রদান করিতেছেন; বিবাহের কালে জগতের তাবৎ পদার্থের সহিত আয়ু-সদ নিশ্চিত করিয়া, কোন প্রকারে আয়ু-নির্বাণ প্রার্থনা করিতেছেন। তা একখানির নায়ক, নিরবচ্ছিন্ন স্বাভাবিক ঘটনায়, স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ সামাজিক-দিগকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। তাহার চরিত্রের কোথাও কোন প্রকার দৈবশক্তির প্রভাব নাই। দৈববলে তাহার কো: কার্যের সনাক্তান করিতে হয় নাই। অভিসম্পাতের সৃষ্টি করিয়া তাহার চরিত্রের মানসস্তর রক্ষা করিতে হয় নাই। কল্যাণ, বিক্রমোর্কশ এবং মালবিকাগ্নিমিত্র দুই খানি উৎকৃষ্ট দৃষ্টকাব্য, মুগ্ধকরির আনন্দিক কবিত্বের সঙ্গে দুই খানি চরিত্র, সহৃদয় হৃদয়-গ্রাহী। কিন্তু উহার কোন খানিতেই আদর্শ পুরুষের মূর্তি নাই।

বিক্রমোর্কশীর প্রাধান পুরুষ, প্রতিষ্ঠান-পতি, পুরুষবা, অম্পরা সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ নায়ক। সৌন্দর্য্য ব্যতীত অল্প কিছুই তাহার নয়ন-গো হয় না। গুণের গণনা তিনি করিতে চাহেন না। বহিঃ-সৌন্দর্য্যে চরণে, তিনি অন্তঃ-সৌন্দর্য্যের বলিদান করিতে কুণ্ঠিত নছেন। বহির্ভঙ্গ তাহার প্রাধান বিনোদ বস্তু, অন্তর্ভঙ্গতের শাস্তোজ্জ্বল মূর্তির কমনীয় চায়া তদীয় হৃদয়-দর্পণে মুচ্ছিত হয় না। তাই তিনি গুণবতী, হৃদয়বান্

সাক্ষী, পতিদেবতা ঔশীনরীকে উপেক্ষা করিয়া, লালসাময়ী অম্বর উর্বশীকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাসনার আপাতরমণীয় মধুর বংশীরবে আত্মবিস্মৃত হইয়া, মজ্জমুগ্ধের জায়, তাহার অমুবর্তন করিয়াছিলেন। আত্ম-সন্তায় একবারে বিসর্জন দিয়াছিলেন। পুরুষবা ভারত-সম্রাট হইয়াও, আত্ম-নরপতি হইয়াও রাজপক্ষে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সাম্রাজ্য-পালন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহাকে কদাচ আদর্শ পুরুষ বলিতে পারা যায় না।

- আর একজন, মালবিকায়িনিত্রের যিনি নায়ক, সেই অগ্নিমিত্রও ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট, পরম পরাক্রমশালী, অথচ ক্ষমাশীল, আত্ম-মর্যাদার, অথবা ভারত-সাম্রাজ্যের মহনীয় সিংহাসনে অলঙ্ঘ্য মর্যাদার কারণে, তিনি নিয়ত তৎপর। তাহার অনেক গুণ, অনেক সংপ্রবৃত্তি। কিন্তু তিনিও প্রণয়নয় হৃদয়। প্রেমময়-হৃদয় তাহাকে বলিতে পারি না। বলিতে সাহস হয় না। অনন্যপ্রার্থিত প্রেমরত্নের ঐ প্রকার নিঃশেষে অবমাননা না হউক, প্রেমের সম্মান করা হয় না। পুরুষবার জায় তাহারও প্রণয়োন্মাদ অগাধ। কিন্তু তিনি, পুরুষবার মত, প্রণয়ের কারণে আত্মকর্তব্য—রাজার কর্তব্য উপহার দিতেন না। তবে, বহিঃ-সৌন্দর্যের অতি-প্রভাবে, প্রতিষ্ঠান-পতির জায় তিনিও বিমূঢ় ছিলেন। বহিঃ-সৌন্দর্য্য তাহার এতটাই সেবনীয় ছিল যে, তিনি, নৃত্যাদি-নিপুণ।
- অপসী ইরাবতীকে,—যিনি ধার্মিক পরিচারিকা ছিলেন, রাজ-পরিণয়োচিত বংশোদ্ভবা না হইলেও, সেই ইরাবতীকে, মহিষী-পদে সমাক্রান্ত করিয়াছিলেন। ‘স্ত্রীরত্ন ছক্কুলাদপি’—এই শাস্ত্রদেশের অপবাখ্যার অমুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি বিশাল রাজ্যের নিয়ন্তা হইয়াও, পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধনটিকে, কেবল আত্ম-সুখের এবং আত্মতৃপ্তির কারণ মনে করিয়াছিলেন। নরনারীর পরিণয়, শুধু সেই পরিণীত দম্পতির নহে, সমাজেরও যে অশেষ-কল্যাণকর, একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাহাকে আদর্শ-

পুরুষ বলা যায়, যাহার চরিতাদর্শে, আত্মদেহের প্রতিবিম্বন করিয়া, সমাজ আপনাদোষ-গুণের, ক্ষতিবৃদ্ধির এবং ক্রটি ও পরিপূর্তির সম্যক উপলক্ষ করিতে পারে, তাদৃশ আদর্শ চরিত্র অগ্নিমিত্রে নাই। যে উদার এবং মহনীয় চরিত্রের প্রভাবে, সমাজ আপনিই মহনীয় হইয়া উঠে, যাদৃশ চরিত্রের গুণবস্তা-দর্শনে, সমাজে স্বতঃ-প্রবৃত্ত অহুচিকীর্ষার উদয় হয়, এবং ঐ অহুচিকীর্ষা-প্রভাবে, সমাজও ক্রমে 'আদর্শ-সমাজে পরিণত হয়,' তাদৃশ আদর্শ চরিত্র অগ্নিমিত্রে দেখিতে পাঠি না। যে দেশের এবং যে সমাজের আদর্শ পুরুষ রাম-যুধিষ্ঠির-ভীষ্ম, কৰ্ণ-দিলীপ-জয়ান্ত, পুরুষ বাঃ অগ্নিমিত্র সেই দেশের সেই সমাজের আদর্শ পুরুষ হইবার যোগ্য নহেন। আবার যে দেশ, পার্শ্বতী, সীতা, সাবিত্রী, দরমস্তী, শৈব্যা, লোপামুদ্রা, চিন্তা, শকুন্তলা প্রভৃতি আদর্শ রমণী-গণের বহুগীর চরিত্রালোকে সমুদ্ভাসিত, সেই দেশে পুরুষাব উর্কশীর, বা অগ্নিমিত্রের দারিণী, ইরাবতী এবং মালবিকার স্থান অনেক নিম্নে। তবে পুরুষের প্রধান মহিমা দেবী ঔশানরী আদর্শ-রমণী-শ্রেণির অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও, কিন্তু, তিনি কাবোদ তথা কাবোব্লিখিত প্রধানপুরুষের 'উপেক্ষিত' প্রতিনায়িকামাত্র তাহার চরিত্র কাবোর উপজীব্য নহে। কেবল প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য।

পুরাণকর্তাদের গঠিত মূর্তির সহিত, পৌরাণিক কালের পরবর্তী কবিদের নিম্নিত মূর্তির তুলনা করা যদিও অসঙ্গত, তাদৃশ তুলনায় পুরাণ কর্তৃগণের মহিমা যদিও খর্ব করা হয়, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে যে, যদি পুরাণকর্তাদিগের রচিত মূর্তির সহিত অল্প কোনও কবির রচিত মূর্তির তুলনা সম্ভবপর হয়, তবে তাহা একমাত্র মহাকবি কালিদাসের অঙ্কিত মূর্তির, অন্তের নহে। পুরাণ-কর্তৃগণ যে সকল সৃষ্টি করিতেন, তাহা বিরাট, অথও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। পূজনীয় ঋষিগণ 'ক্রান্তদর্শী' ছিলেন। যোগবলে, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান দেখিতে পাইতেন। হৃদয় তাঁহাদের স্বার্থ-মুক্ত ছিল। আত্ম-পর-ভেদ ছিল না।

এতাদৃশ সমুন্নত হৃদয়ের স্ফুটপ্রসূত কল্পনা বেক্রপ হইবে, সংসার-ক্ষেত্রে
 বিচরণ-শীল অপর কোনও ব্যক্তির কল্পনা তাদৃশী হইতেই পারে না।
 গাঠ, পুরাণ-কর্তৃগণের পরম আদরের মূর্তি সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা প্রভৃতির
 তুলনা নাই। ঐ সকল চিত্র ঋষিস্থষ্টির যেমন চরমোৎকর্ষ, একাংশে
 মালবিকাও তেমনি, পৌরাণিক যুগের পরবর্তী কালের কবিস্থষ্টির পরম
 উৎকর্ষ। সীতা-সাবিত্রী যেমন পৌরাণিক যুগের আদরের মূর্তি,
 মালবিকাও তেমনি, ৩২পরবর্তী কালের কবিদিগের আদরের মূর্তি।
 মালবিকা যে সময়ের ললনা, তখন ভারতে বিদ্যাসের স্রোতঃ খরতরভাবে
 প্রবাহিত, ভারত বহিঃশত্রুর আক্রমণভয় হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। তৎকালের
 কি রাজা, কি প্রজা, কি রাজ-কন্মচারী—বিলাস-মাধুরী সকলেরই একমাত্র
 অবকাশ-রঞ্জিনী। সুতরাং তৎকালের ললনা মালবিকা, কালানুবাদিনী
 শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শিনী, নৃত্য-গীতাদি-কলা-বিদ্যায় পরম-বিভূষা ছিলেন।
 সেই সময়ে, তাদৃশ কলাবর্তী নারীদিগের মধ্যে, মালবিকা অতিউচ্চ-
 গান-ভাগিনা হইলেও কিন্তু, আর্ব্য-সমাজের আদর্শরমণীর মধ্যে তাহাকে
 গণ্য করা যাইতে পারে না।

সুতরাং বুঝিতে পারিলাম যে, বিক্রমোৎকর্ষ বা মালবিকায়মিত্রে,
 সমাজের হিতকর আদর্শ চিত্র নাই। মহাকবি, তাদৃশ চরিত্র-চিত্রণে
 প্রয়াসও করেন না। ঐ সকল কাব্যে, কবির প্রতীপাদ্য ছিল প্রণয়-
 বর্ণনা এবং প্রণয়োন্মাদ-বর্ণনা। মানবহৃদয়ে প্রণয়ের উন্মাদ যে কতদূর
 রম-সীমায় উপনীত হইতে পারে, প্রণয়ীর নয়নে প্রণয়ানুকূল পদার্থ
 প্রতিরিক্ত আর কিছূই যে প্রতিবিম্বিত হয় না, হইতে পারে না, প্রণয়ের
 বক্রপ, তুমি যতই বড় কল্পনা কর না কেন, তাহা যে তদপেক্ষাও অনেক
 বড়, অনেক উচ্চ, কল্পনার দ্বারা অপরিস্রব,—ইহাই কবি, ঐ দুই কাব্যে
 প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রণয়-ধারা আবার যে ভাবে প্রবাহিত হইলে, শুধু
 প্রণয়ীর নহে, সমাজেরও অশেষ মঙ্গল হয়, প্রণয় যে কেবল প্রণয়ীর নহে,

স্ববিশুদ্ধ প্রণয় জগতেরও যে অশেষ তৃপ্তির এবং হিতের সাধন,—ধর্ম-ভাব-শূন্য প্রণয়ে, অথবা প্রণয়চ্ছদ্য পাশ-বন্ধনে প্রণয়ীর তথা সমাজের এবং জগতের যে পরিমাণে অমঙ্গল, ধর্ম-ভাবময় প্রণয়ে, প্রণয়ীর তথা সমাজ ও জগতের আবার যে তত, অথবা ততোধিক মঙ্গল, এ তত্ত্ব কবি, ঐ দুই কাব্যে উদ্ঘাটন করেন নাট। তাই বিক্রমোৎকর্ষী এবং মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচনের পর, মহাকবি, তাঁহার সকল সাংগঠ্য ব্যয় করিয়া অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রণয়ন করিয়াছেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, তাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রতিভার, ব্রহ্মাণ্ড-বাণিনী কল্পনার ও সর্বকাম্যায়িনী রচনার চরম নিকষোপল! স্বরচিত বিক্রমোৎকর্ষী ও মালবিকাগ্নিমিত্রে, কবি যে সমুদয় দিবা দৃশ্যের, দিবা মূর্ত্তির অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ত শকুন্তলায় আছেই, পরন্তু, শকুন্তলার আরও এমন অনেক মূর্ত্তি, অনেক বস্তু আছে, বাহা নিজে নিজেই কেবল অনুভব করা যায়, অপরকে অনুভূত করান যায় না, নিজে বুঝা যায়, কিন্তু ভাবার সাহায্যে অপরকে বুঝান যায় না! অভিজ্ঞান-শকুন্তল, তাই, কবিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। রসিক সামাজিক যথার্থ বলেন ‘কালিদাসস্য সর্বস্বং অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।’ অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদাসের সর্বস্ব, তাঁহার অপার্থিব-কল্পনা-রূপিনী উদ্যান-বাটিকা-অমৃতময়ী পারিজাত-লতিকা। প্রেম এবং ধর্ম—উভয়ের সম্মিলনে জগৎ যে মধুর আনন্দের উৎস উখিত হয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তলরূপী স্বচ্ছ দর্পণে তাহাই প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা মহাকবির চরম সৃষ্টি, ‘বাণীর বরপুত্রের’ অক্ষয় আলেখ্য!

ত্রি-পঞ্চাশ অধ্যায় ।

কল্পনা ।

.. কালিদাসের অশ্রাব্য কাব্য-সম্বন্ধে, তত অধিক না হইলেও শকুন্তলা-সম্বন্ধে, বঙ্গ ভাষায়, এপর্য্যন্ত, অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে । শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা প্রভৃতিকে অনেক মনস্বী, অনেকভাবে দেখিয়াছেন, অনেকেও দেখায়াইছেন । সুতরাং এই অধ্যায়ে আমি, প্রথমতঃ সংক্ষেপে, যুগ্ম-ভাবে, একবার অভিজ্ঞান শকুন্তলের বর্ণিত চরিত্র-সমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । শকুন্তলা সম্বন্ধে আমার বাহা বাহা বক্তব্য, এই আলোচিত অংশকে তাহারই স্বতন্ত্ররূপে ধরিয়া, পরে এই স্বতন্ত্রই ব্যাখ্যা করিব । আমার ধারণা, ইহাতে নাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তির অভিপ্রায়-প্রকাশের সৌকর্য্য হইবে । আর এই অংশ, প্রচলিত শকুন্তলা-সমালোচনা-সমূহের সহিত, মলাইয়া পাঠ করিবার পক্ষেও বিদ্যার্থি-গণের বিশেষ সুবিধা ঘটবে ।

কিয়ংকাল পূর্বে, পরম শ্রদ্ধের কবির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা কাব্যের ‘উপেক্ষিতা ।’ কবির প্রকার বসন্তের পিক-রঞ্জনের জায়, মুহূর্ত্তমধ্যে দিগ্দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল । তখন অনেকেরই মুখে ঐ এক কথা—‘কাব্যের উপেক্ষিতা ।’ আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কথাটার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই । ভাবিয়াছিলাম,—অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র, যেমন গিরিজায়ার পর্য্যন্ত বিবাহ দিয়াছেন, কালিদাসও যদি, তেমনি, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার পর্য্যন্ত বিবাহ দিতেন, গিরিজায়ার জায়, তাঁহাদিগকেও হইট ছোট ছোট নারিকা সাজাইতেন, তবে তাহাই কি আমাদের বর্ত্তমান সুধী-সমাজের রুচি-সঙ্গত হইত ? সখীস্বয়ের ‘উপেক্ষিতত্বের’ নিরাস হইত ? শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, তাহা হইলে কবিরও প্রমাদ, পাঠকেরও প্রমাদ ।

দেখিলাম, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’ নহে, বিলক্ষণ অপেক্ষিতা । মহাভারতের শকুন্তলা বড় মুখরা, প্রগল্ভা, যেন পরিণত-বয়স্কা কর্তৃত্বাভিমানিনী গৃহিণী । সৌন্দর্যের কবি কালিদাসের চক্ষে, তদীয় সর্বোত্তম নাটকের প্রধান নায়িকার এ মূর্তি অক্লিষ্ট বিষম এবং অসুন্দর বোধ হইল । পৌরাণিক শকুন্তলার ভ্রাতা, কালিদাসের শকুন্তলাও যে নিজেই রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ‘আত্ম-পরিচয় প্রদান’ করিবে, নিজের দূতী সাজিয়া অভিনয়ে বাইবে, কালিদাসের ইহা সুন্দর বোধ হইল না । তাই তাঁহাকে, মহাভারতের শকুন্তলা ভাঙ্গিয়া, স্বকীয় অনুপম কবিত্বের উপযোগিনী করিয়া, নূতন শকুন্তলা গঠন করিতে হইল । সৌন্দর্যের অনুরোধে, তাঁহাকে, মহর্ষি-ক্ষুধ-পথ-পরিভ্রাণ-পূর্বক, এক নূতন পথে যাত্রা করিতে হইল । এক শকুন্তলার চিত্র নিরবদা করিবার নিমিত্ত, দুইটি সখীর সৃষ্টি করিতে হইল । মনে করুন, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা যেন নাষ্ট, আর শকুন্তলা একাকিনী, জনহীন আশ্রমে, রাজার পুনোবস্থিনী হইয়া, প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়েই আপনি আপন পরিচয় প্রদান করিতেছেন, সেই বসন্তকালবৃত্ত মেনকা-বিশ্বামিত্র সংবাদ, রাজাকে নিজেই গাতিয়া শুনাইতে ছেন, তাহা হইলে সে গান মিষ্ট লাগিত কি ? স্বাভাবিক হইত কি ? সৌন্দর্য্য-বিকাশের অনুকূল হইত কি ? যদি না হয়, তবে একজন সখী বা দূতীর প্রয়োজন । কুমারসম্ভবেও দেখিয়াছি, কালিদাস, চন্দ্রশেখরের সম্মুখে, পার্কতীর একজন সখীর দ্বারাষ্ট পার্কতীর অনেক কথা বলাইয়াছেন । পার্কতীকে বেশী কথা বলিতে দেন নাষ্ট ।

আচ্ছা স্বীকার করিলাম যে, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইলে, এক জন সখী বা দূতীর প্রয়োজন, কিন্তু দুজন কেন ? এবার সমস্তা কিছু কঠিন । কালিদাস কিন্তু দেখিলেন, যে, একজন সখীতে, প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না । একজন সখীতে, ‘-চরিত্রে শবলতা-দোষ জন্মিবে । কালিদাসের শকুন্তলা ব্যাসের শকুন্তলার ভ্রাতা ঋষিকণ্ঠা নহেন ।

নি অঙ্গার কণ্ঠা । কণ্ঠার উপর মাতৃ-প্রভাব বড়ই প্রবল । অঙ্গার কণ্ঠা না হইলে অত রূপ, অমন 'প্রভা-তরল' দেহ-জ্যোতিঃ 'বসুধাতলে' কদাচ সম্ভবিত্তে পারে না । অঙ্গার আত্মজা হইলেই শকুন্তলাকে পদে পদে নোহে আত্মবিস্মৃত হইতে হইবে । আত্ম-বিস্মৃতির পরিণাম বিপৎসঙ্কুল । সুতরাং শকুন্তলার সেই ঘোর আত্ম-বিস্মৃতির সময়ে, সর্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে পারে, এমন একজন লোকের প্রয়োজন । যদিও শকুন্তলার পিতা কণ্ঠের আশ্রনে গৌতমী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অগ্রজ কণ্ঠকে লইয়াই বাস্তু, অগ্রজের সেবা ও তাঁহার গুণ-গান লইয়াই গৌতমী-চরিত্র । তিনি তপঃক্লেশ কণ্ঠের প্রতি উদাসীন হইয়া কদাচ শকুন্তলার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইতে পারেন না ।

তাহা হইলেই দেখিতেছি, কালিদাসের শকুন্তলাকে লোকের নয়ন-পথবর্তিনী করিতে হইলে, তাঁহার সহিত একজন দূতী এবং একজন তত্ত্বাবধায়িকার আনয়নও একান্ত অপেক্ষিত । এই দুইজন্যের মধ্যে যিনি দূতী, তিনি যে কেবল প্রেমা দূতী, তাহা নহেন । তিনি দূতী, সকলের নিকটেই দূতী । তিনি তাঁত কাণ্ডপের দ্বারা শকুন্তলার পরিণয় অনুমোদিত করিয়া, সেই সংবাদ লইয়া, অনঙ্গার নিকটে দৌড়া করেন । অসংকৃত প্রতিধ্বি ছুঁর্বাসা যখন শাপ দিয়া চলিয়া বান, তখন তিনিই কোপ-জ্বলনয়ন ছুঁর্বাসার নিকটে শকুন্তলার হৃৎখের দূতীরূপে উপনীত হইয়া কণ্ঠা ভিক্ষা করেন । সম্পদে, বিপদে, যখনই আবশ্যক, তিনি দূতীর কার্য করেন । আবার যিনি তত্ত্বাবধায়িকা, তিনিও সর্বত্রই শকুন্তলার প্রতৎপরা । শকুন্তলার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত তাঁহার যেন অত্র কার্যই নাই । অঙ্গার কণ্ঠা শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া অবধি আত্ম-বিস্মৃতা, আশ্রম-বিরোধী বিকার-গ্রস্তা, কিন্তু তত্ত্বাবধায়িকার তাঁহার প্রতি আদ্যস্ত স্নেহ দৃষ্টি । প্রথম অঙ্কে, তৃতীয়ে, ও চতুর্থে—সর্বত্রই তিনি বিমুগ্ধা শকুন্তলার সুপার্বিনী তত্ত্বাবধায়িকা, স্নেহময়ী পরিপালিকা । ছায়াস্তের নিকট,

কথের নিকট, দেবতাদের নিকট, সর্বত্রই তিনি শকুন্তলার তত্ত্বাবধায়িক। শকুন্তলার সন্তোষ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষিকা। সুতরাং ‘কালিদাসে শকুন্তলার, এই দুইটি সহচরীই একান্ত অপেক্ষিতা, দুইটির কোনটির ‘উপেক্ষিতা’ নহে। ‘উপেক্ষিতা’ নহে বলিয়াই, ‘গিরিজায়্যা’ নহে বলিয়াই, কথমুনি, তাঁহাদিগকে শকুন্তলার সঙ্গে হস্তিনা-পুরের রাজবাড়ীতে প্রেরণ করিলেন না। বাললেন—‘ইমে অপি প্রদেয়ে’ ।

কালিদাস নামের দ্বারা, এই দুইটির প্রকৃতি বুঝাইয়া দিয়াছেন, দূতী যিনি, তিনি ‘প্রিয়ংবদা’, বড়ই মিষ্টভাষিণী, সরস আলাপিনী। কিন্তু তাঁহার সে সরসালাপে তীব্রতা নাই। সে সরসতা আমোদিনী কিন্তু মৰ্ম্ম-ভেদিনী নহে। তাঁহার রসিকতায় রসের ভাগই অধিক, ব্যঙ্গের ভাগ তাহাতে একেবারেই নাই। আর যিনি তত্ত্বাবধায়িকা বা পরিরক্ষিকা, নিরন্তর শকুন্তলার ভাবনাতেই যিনি আকুল, তাঁহার নাম অনশ্য়া। অনশ্য়ার অর্থ, পরের মঙ্গলে যার ঘেঘ নাই, পরে ভাল দেখিলে, যাহা চক্ষে যজ্ঞা হয় না, যিনি গুণে গুণই দেখেন, দোষ দেখেন না, নিরর্থক দোষারোপ করেন না।

বল দেখি, এই দুইটির মধ্যে কোনটির প্রতি কালিদাসের সমর্থিত আদর? নিশ্চয়ই অনশ্য়ার প্রতি। কারণ, শকুন্তলার সর্বত্র সকল কার্যেই অনশ্য়া অগ্রবর্তিনী আর প্রিয়ংবদা তাঁহার পশ্চাদ্গামিনী। শকুন্তলা ‘ইদো ইদো সহীয়ো,’—বলিয়া ডাকিবার পরই, অনশ্য়া প্রথম কথা কহিলেন। রাজাকে দেখিয়া শকুন্তলা অশ্রুমনস্ক হইলে, অনশ্য়াই তাহা সর্বপ্রথমে বুঝিতে পারিলেন। তৃতীয় অঙ্কেও বিরস কাতরা শকুন্তলার শোচনীয় অবস্থা-দর্শনে তাঁহারই প্রথম ভাবনা। তিনিই প্রথমে শকুন্তলাকে, তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। চতুর্থ অঙ্কেও, শকুন্তলার ওতামুখান-পলা অনশ্য়ার

১—এৰ্বাৎক, ইহাদিগকেও সম্প্রদান করিতে হইবে।

প্রথম উপস্থিত হইয়া, দেবার্চনার জন্ত কুসুম-চয়ন করিতে গেলেন । শকুন্তলার মনের বেদনা তিনিই ভাল বুঝেন, তিনিই ভাল জানেন । তাই বলিতেছিলেন, ‘অননুয়া কবির সমধিক আদরিণী ।

- আবার দূতীকর্মে প্রিয়ংবদাও কম দক্ষা নহেন ! ‘এ গাছটিতে জল দাও, এইখানে এমনি ভাবে একবার সোজা হইয়া দাঁড়াও, ভ্রমরের অত্যাচার, আমি কি করিব ? দুবাস্তুর দোহাট দাও,’—এ সমস্তই মঞ্জু-ভাষিণী-প্রিয়ংবদার উক্তি । রাজার সমক্ষে, শকুন্তলাকে দণ্ডায়মান করিয়া, তাঁহার জন্মবৃত্তান্তের ‘প্রব্রতস্টাও’ প্রিয়ংবদাই উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন । প্রিয়ংবদার অপত্রপ আলাপে, শকুন্তলা যখন চলিয়া যাঁইতে চান, তখন আবার, প্রিয়ংবদা নিজেই নিষেধ করিয়াছিলেন, নিষেধ না মানিলে, তিনিই গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন । আতিথ্যের যদি কোনও ক্রটি ঘটয়া থাকে, তজ্জন্ত তিনিই রাজার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন । তিনি ফুলের মধ্যে লুকাইয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন, গান্ধর্ব্ব বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন । আপন্ন আশ্রমবাসীর আপন-নিবারণ রাজার প্রধান কর্তব্য—বলিয়া, এই বালিকা প্রিয়ংবদাই প্রবীণ ভারতেশ্বরকে রাজ-ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন । আবার অবসর বুঝিয়া, ‘হরিণ ধরিতে চল’ বলিয়া এই প্রিয়ংবদাই সরলপ্রাণা অননুয়াকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন । প্রিয়ংবদা-চরিত্রের পূর্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, প্রবাস-প্রত্যাগত কথের অগ্নি-শরণ-গৃহে যে দৈববাণী হইয়াছিল, যে দৈববাণী উপর বিশ্বাস করিয়া, কথ শকুন্তলার গুপ্ত পরিণয়-ব্যাপার অনুমোদন করিয়াছিলেন, সেটিও বুঝি বা প্রিয়ংবদারই কীর্ত্তি !

তার পর শকুন্তলা । এ জাতীয় প্রেমের কথা কালিদাস আর লেখেন নাই । তাঁহার মালবিকা বাগিকা হইয়াও বেশ প্রাধান্তময়ী, স্বয়ং ভাব-গোপনে বিশেষ পারদর্শিনী । মালবিকার মুখ দেখিয়া

মনের ভাব বুঝিবার সাধ্য নাই । বিদূষক কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া, বকুল-বলিকা অনেক প্রয়াসে, তাঁহার মনের কথা বাহির করিয়াছিলেন । আর শকুন্তলার মাত্র মুখ দেখিয়াই, অনন্থয়া, শকুন্তলার হৃদয়খানি পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইলেন । কালিদাসের উচ্ছ্বসী পুত্রবীর প্রেমে আত্মহার্য্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তিনি প্রোঢ়া, আপন অভিপ্রায় সাধন করিতে তিনি কদাচ বিস্মৃত হইতেন না । আর শকুন্তলা “এসব কিছুতেই” নাই । তিনি প্রথম হইতেই একবারে সেন গলিয়া পড়িলেন । তাহা বলিতেছিলাম, এ জাতীয় প্রেমের কথা কালিদাস আর লেখেন নাই ।

মহাভারতের যে শকুন্তলা, ভারতেশ্বরের ঋক্ষিমতী পরিবর্দে প্রগল্ভাভায়ে বক্তৃতা দ্বারা, পরিণয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্বীকৃত রাজাকে অপমান করিয়া, ‘আপনার’ ‘সব’ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কালিদাস সেই শকুন্তলাকে কমনীয়তা বুদ্ধি করিবার জন্ত, তাঁহার সঙ্গে, মহর্ষি কথের দুইটি শিষ্য ও বর্ষীয়সী ভগিনীকে প্রেরণ করিয়াছেন । এবং রাজার চরিত্র রক্ষার নিমিত্ত দুর্জয়সার শাপের সৃষ্টি করিয়াছেন ।

মহর্ষি কথ শকুন্তলার প্রকৃতি, পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন : তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এমন আত্মহার্য্য মনের অদৃষ্টে তথৈব অনিবার্য্য তাই তিনি, তাঁহার ‘দ্বিতীয় উচ্ছ্বসিত’-রূপিণী শকুন্তলার হৃদ-শাস্তির জন্ত, সোনতীর্থে গিয়াছিলেন ।

সংসারে বাল-বিশ্বাদিগকে অশ্রু-মনস্ক রাখিবার জন্ত, শৌক্যক পিতামাতা মেনন, তাহাদিগকে গৃহকার্য্য এবং দেব-সেবায় নিযুক্ত করেন, সেই প্রকার, মহর্ষি কথ, তীর্থপ্রণাণ কালে, নবনীত হৃদয় শকুন্তলাকে আশ্রমের কর্ত্তী করিয়া রাখিরা গিয়াছিলেন । আশ্রমের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম যে অতিথি-সেবা, তাহাতেই শকুন্তলাকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন । তাঁহার ধারণা, আশ্রম-কর্ম্মে নিরত থাকিলে, শকুন্তলা হয় একটু শক্ত-সমর্থ হইবেন, তাঁহার শরীর একটু কষ্ট-সহিষ্ণু হইবে, আশ

মোচিত তপঃক্ষাম হইবে, আর সেই সঙ্গে শকুন্তলা নিজেও, কাজকর্মে, কতকটা অল্পমনস্ক থাকিতে পারিবেন। হৃদয় শূন্য পাইলেই তাহাতে নানাবিধ চিন্তা উদ্ভিত হইবার অবসর পায়। কন্ঠ হৃদয়ে সে অবসর প্রায়ই ঘটে না। তাই কবি এই ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মহর্ষির এ গণনায় ভুল হইল। তিনি ঋষি, চিরদিন কঠোর তপশ্চর্য্যাই করেন, প্রেমের প্রভাব ত তিনি বিদিত নহেন। তাই তাহার এ উদ্দেশ্য বাৰ্ণ হইল। শকুন্তলা সব ফেলিয়া, আত্মহার্য্য হইলেন। অতিথি-সৎকার, যেটি আশ্রমের প্রধান ব্রত, সেটিকে পর্য্যন্ত ভুলিলেন। কিন্তু সনাজের কঠোর শাসন বড়ই নির্দয়, বড়ই নিশ্চয়। সেই কঠোর শাসনেব নিদ্রা মুক্তি—হুর্দাসা। তিনি বালিকা শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিলেন না, শকুন্তলার মনের কোমলতা বুঝিলেন না। শকুন্তলা আপন কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, আপনার চিন্তায় সনাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, আত্মার্থে সনাজকে অবমানিত করিয়াছেন, তাই সনাজের প্রতিনিধি-রূপী হুর্দাসা, তাহাকে কঠোর শাস্তি দিলেন,—‘তুই যাহার চিন্তায় আপন কর্তব্য বিস্মৃত হইলি, সে তোকে বিস্মৃত হইবে।’

কণ্ঠ মুনি আশ্রমে প্রত্যাহত হইয়া সব শুনিলেন, অথবা দেখিয়াই বুঝিলেন, বুঝিলেন যে, এ মেয়েকে আশ্রমে রাখা আর উচিত নহে। তাহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু মহর্ষি গন্তীর-প্রকৃতি ও করুণাময়। গুহ্য বিরক্তির কোনরূপ চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। বরং উত্তন হইয়াছে, আমি যেক্রপ পাত্র চাহিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। শকুন্তলা সৎপাত্রেরই অর্পিত হইয়াছে। রমণীর পণ্ডিতগৃহে, পণ্ডিত সনোপে থাকাই সঙ্গত—’বলিয়া তিনি, শকুন্তলাকে আশ্রম হইতে বিদায় করিলেন। তার পর, শকুন্তলার আর কোন সংবাদ লইলেন না। তাহার করুণাময়ী মূর্তির উপাসক শারদ্বত, প্রত্যাহান-কালে, শকুন্তলাকে বলিয়া দিলেন—

‘পতিগৃহে তব দাস্তমপি ক্ষমম্’ ।

সেই সঙ্গে আরও বলিলেন—

‘—কিং পিতুরুৎকুলয়া স্বয়াং ?’

এতক্ষণে শকুন্তলার মোহভঙ্গ হইল । তখন আবার, কণ্ঠের কঠোর মূর্তির সেবক, সেই রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—

‘আঃ পুরোভাগিনি ।

অতঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ ।

অজ্ঞাত-হৃদয়েষেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্ ॥

অভাগিনী শকুন্তলার ক্রন্দন ভিন্ন আর গতি রহিল না । তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে কাদিতে রাজ-পুরোহিতের সহিত তাঁহার বাটীতে চলিয়া গেলেন !
রাজবাটীতে কণ্ঠহিতার একটু স্থান হইল না !!

১—শকু, মে অঙ্ক ;—পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি-গ্রহণও তোমার পক্ষে লোভ্য ।

২—এ, মে অঙ্ক ;—কুলভাগিনী তুমি, তোমার দ্বারা পিতার লাভ কি ?

৩—এ, মে অঙ্ক ;—আঃ দোষ-দর্শিনি ! এই ভ্রম্ভই বিশেষ-পরীক্ষা-পূর্বক প্রণয়-বিধান কর্তব্য । অজ্ঞাত-হৃদয়ে আত্ম-সমর্পণ ঐরূপ শত্রুতাভেই পরিণত হইয়া থাকে ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সৃষ্টি-কৌশল ।

এতক্ষণে, সাধারণ ভাবে, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের কথা কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইল । এক্ষণে, আরও একটু গভীর ভাবে কবির সৃষ্টি-কৌশল বুঝিতে চেষ্টা করি । ইতিপূর্বে কালিদাসের যে দুইখানি নাটকের সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত, শকুন্তলার একটি বিষয়ে যে পার্থক্য আছে, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই । সুতরাং প্রথমতঃ তাহাই উল্লেখ্য ।

মালবিকাগ্রিমিত্রের নায়ক রাজা অগ্রিমিত্রের তিনটি মহিষী । ধারিণী, ইরাবতী ও মালবিকা । ধারিণীই প্রথম এবং প্রধান মহিষী । পরে ইরাবতী । তার পর মালবিকা । মালবিকাগ্রিমিত্র জ্ঞী-চরিত্র-প্রধান কাব্য । কবি রঙ্গমঞ্চে তিন মহিষীকেই আনয়ন করিয়াছেন ; একজন, পুরুষ, আর তাঁহার তিনটি জ্ঞী । যেন বঙ্গের কোলোত্ত ! বিক্রমোর্কশীতেও দেখি, কাব্যের প্রধান পুরুষ, রাজা পুরুষবা, আর তাঁহার প্রণয়িনী দুইটি, ঔশীনরী ও উর্কশী । প্রধান ঔশীনরী আর অপ্রধান উর্কশী । কবিগণ স্থলবিশেষে বিধাতৃ-সৃষ্টির অনুগামী, আবার স্থলভেদে, কবি-সৃষ্টি বিধাতৃ-সৃষ্টির অতিশায়িনী । তাই বিধাতৃ সৃষ্টির স্থায়, কবি-সৃষ্টিতেও আজ যিনি প্রধান, কাল তিনি অপ্রধান । তাই প্রধান মহিষী ধারিণী ও ঔশীনরীর প্রাধান্য লোপ হইল, আর অপ্রধান ইরাবতী ও উর্কশীর প্রাধান্য ঘটিল । প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া প্রণয়ের হেমকাস্তি, কবিগণ, সম্যক্ প্রকারে ফুটাইতে পারেন না । শ্রব্যকাব্যে কবিদিগকে এতটা নিয়মের অধীন থাকিতে হয় না । কিন্তু দৃশ্যকাব্যে দর্শকদিগের অভিনয়-দর্শন করিয়াই মাধুর্য্যোপলব্ধি করিতে হয়, ধীরে ধীরে ভাবিয়া 'ভাবিয়া রসগ্রহ করিবার' অবসর তাঁহাদিগের ঘটিয়া উঠে না । তাই

দেখিতে পাই, শ্রবাকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাবোই কবিগণ, এই নায়িকা-বাহুল্যের অনুসরণ করেন । নিকষোপলে কর্ষণ করিলে, যেমন কাঞ্চনের প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া পড়ে, তজ্রূপ, প্রতিঘাতেও প্রণয়ের প্রকৃত রূপ, প্রকৃত লাবণ্য প্রকাশিত হয় । দর্শকগণ অতি সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ।

পূর্বে—নাটক-রচয়িতা কবিগণের আবির্ভাবের অনেক পূর্বে, সকল-লোক-মোহনের জন্ত, রানায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সমূহ রচিত, পঠিত, কীৰ্ত্তিত ও গীত হইত । লোকের ভক্তির সহিত ঐ সকল বিরাট-সৃষ্টিনয়া স্ববিচিনা পাঠ করিত । ঐসকল পুরাতন কাব্যে কবিত্ব আছে, রচনা আছে, উপদেশ আছে, আনন্দ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, অথবা এক কথার বলিলে বলা যায় যে, সব আছে, কেবল একটি জিনিষ নাই । পাঠকের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি নাই । পাঠক-হৃদয়ের আকাজক্ষার পরিমাণে ঐ সমুদয় কাব্য রচিত হয় নাই । গ্রন্থ-রচনার সময়ে, যদি পরের মুখের দিকে চাহিয়া, গ্রন্থের প্রতিপাদ্যের সঙ্কেচ বা প্রসারণ করিতে হয়, তবে, তদপেক্ষা অধিক তার ব্যঞ্জন্যের বিষয় লেখকের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না । স্ববিগণ লোকহিতার্থে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া, লোকের, তথা সমাজের শিক্ষার নিমিত্ত বিরাট মূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেন, তখন পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তির সৃষ্টি-বিধান অস্ত্রের পক্ষে,—অনাথ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব । স্ববিগণের রজোমুক্ত হৃদয়ে, বাহ্য লোকহিতাত্মক কুল বোপ হইত, তাহাই, তাহার প্রচারিত করিতেন । পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদিগকে গ্রন্থ বিবচন করিতে হইত না । তাহ স্ববিগণের কাঁধকেও কালিদাস বা ভবভূতির তায়, ‘আপরিতোবাদ্ বিজ্ঞানং’ ।

১—শব্দ, ১ম অঙ্ক ;—আপরিতোবাদ্ বিজ্ঞানং ন সাধুনস্তে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্ ।

বলবদপি শিক্ষিতানাং আশ্রয়প্রত্যায় ১৮তঃ ।

কিংবা ‘যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাঃ’^১। বলিয়া সমাজিকের হৃদয়াকর্ষণ করিতে হয় নাই। তাঁহাদের রচিত কাব্য, পাঠ্য, গেষ, এবং শ্রাব্য ছিল, অভিনেয় বা দৃশ্য ছিল না। ক্রমে পরে এমন সময় আসিল, যখন পাঠ্য বা শ্রবণ করিবার সময় নাই, অথবা শুনিয়া শুনিয়া, সে কল্পনার অমৃতত্বদে, সেট ভাবের সমুদ্রে ডুবিবার, এবং ডুবিয়া রসগ্রহী করিবার অবশর নাই, তখন দেখা আবশ্যক হইল, দেখিয়া বুঝা আবশ্যক হইল। এইরূপে, ক্রমে শ্রবাক্যাব্যবহল ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্যের অর্থাৎ নাটকের সৃষ্টি হইল। যে পদার্থ দেখিয়া দেখিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা যত ভাল করিয়া দেখান যায় ও দেখা যায়, ততই মঙ্গল। যিনি দেখিবেন এবং যিনি দেখাইবেন—সে উভয়েরই তৃপ্তির কারণ। তাই নাটককারদিগকে, দর্শকগণ কোন্ পদার্থ কি ভাবে দেখিতে চান, এতা বিবেচনা করিয়া নাটক প্রণয়ন করিতে হইল। শ্রবাক্যবো যে বস্তু অনুমানের সাহায্যে বুঝিতে হইত, দৃশ্যকাব্যে তাহা দেখিয়া বুঝিতে হইবে। অনুমানের শক্তি অসীম, আর দর্শনের শক্তি পরিলিখিত। যতটুকু দেখিবে, তদতিরিক্ত বোধ করাইবার ক্ষমতা দর্শনের নাই। তাই নাটককার কোথাও অনুমানী কোথাও বা প্রতিযোগী পদার্থের সাহায্যে প্রতিপাদনের বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই জগত্ দেখিতে পাই, একটি নায়ক বা নায়িকার চরিত্র ফুটাইতে যাওয়া, কবিদিগকে, আরও ছয় তিনটি প্রতিনায়ক এবং প্রতিনায়িকার শরণ গাইতে হইয়াছে। মাপের প্রতিনায়ক নন্দনের এবং মালবিকার প্রতিনায়িকা ধারিণী ও ইরানতীর সৃষ্টির এই উদ্দেশ্য।

১—মালতীমাধব, ১ম, অঙ্কঃ—যে নামকেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাঃ

জানন্তি তে কিনাপি, তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ ।

উৎপত্ততেহস্তি মম কোহপি সমানর্থঃ।

• কালোহর্যঃ নিরবধিবিপুলো চ পৃথ্বী ।

বঙ্গের প্রধান ঔপন্যাসিক অমর বঙ্কিমচন্দ্রকেও এই নিয়মের অধীন হইতে হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসাবলীর কোনখানিতে দুইটি স্ত্রী, একটি পুরুষ, কোনখানিতে আবার একটি স্ত্রী, আর তাঁহার প্রণয়ার্থী পুরুষ দুই জন। কিন্তু ইহাই যে কবিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ, এঁ কথা বলা যায় না। ফুল আপন সৌরভে যদি বন আমোদিত না করে, তবে তাহাকে উৎকৃষ্ট ফুল বলিব কেন? রঘুের সৌন্দর্য্য যদি দীপের সাহায্যে দেখিতে হয়, তবে তাহাকে ‘সর্বোত্তম রত্ন’—এ আখ্যা দেওয়া যায় না। বিক্রমোৎকর্ষী ও মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচনের পর, শকুন্তলার প্রণয়নকালে, কালিদাস তাই, এক নতুন পথে যাত্রা করিয়াছেন। শকুন্তলার নায়ক একজন, নায়িকাও একাকিনী। প্রতিনায়ক বা প্রতিনায়িকার সাহায্যে দ্রুপদ-শকুন্তলার চরিত্র-সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে হয় নাই। সুরভি কুমুম যেমন আপন সৌরভে সমস্ত বনস্থলীকে সৌরভময়ী করিয়া তুলে, তদ্রূপ, দ্রুপদ-শকুন্তলাও আপন চরিত্র সৌন্দর্য্যে সামাজিকদিগকে বিমুগ্ধ ও আত্ম-বিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্তই বলিয়াছি, অভিজ্ঞান-শকুন্তল কবিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। বীণাপাণির কমলীর কণ্ঠহারের ত্যাগময় অধ্যায়গণ।

তবে এই চরম উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া, কবিকে হুঁকাসার শাপ, দৈববাণী প্রভৃতি কতিপয় অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেই সেই উপায়, নাটকীয় বস্তুর অর্থাৎ অভিনয়ের পদার্থের একান্ত অমুকুল হইয়াছে সত্য, কবির অমুপম কল্পনার প্রভাবে সে সমুদয় অতিশয় সুসংলগ্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু কবির কল্পনাকে স্বর্গমর্ত্তরসাতল পর্য্যটন করিতে হইয়াছে। কালিদাস স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল-ব্যাপিনী কল্পনার রাজা ছিলেন, তাই তিনি, অস্ত-চরিত্র-নিরপেক্ষ হইয়াও, কেবল শকুন্তলার দ্বারা শকুন্তলার এবং দ্রুপদের দ্বারা

দ্রব্যাস্তের চরিত্র ফুটাইতে পারিয়াছেন। অত্বে পক্ষে ইহা অতীব দুষ্কর। এক্ষণে বুঝিলাম, দ্রব্যাস্ত নিজের চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, আর শকুন্তলাও অল্প-চরিত্রের প্রভাবে অনন্ত প্রভাব-সম্পন্ন। ইহাদের কেহই কখন সুখে, দুঃখে, মোহে আত্ম-চরিত্রের প্রভাব-বিচ্যুত হয়েন নাই। মহাভারতের দ্রব্যাস্ত বা শকুন্তলার চরিত্র এমন প্রভাবপূর্ণ বা সুদৃঢ় নহে।

মহাভারতে আছে,—একদা যুগয়া করিতে যাইয়া, রাজা দ্রব্যাস্ত, অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, মহর্ষি কণ্ণের আশ্রমে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন, কণ্ণ অল্পপস্থিত, আশ্রমে শকুন্তলা একাকিনী। শকুন্তলাকে দেখিয়াই দ্রব্যাস্ত অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি ভারতের অপ্রতিরথ সম্রাট, ইঁহার অভিনায অপূর্ণ থাকিবার নহে। তিনি শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শকুন্তলা নিজেই সে কাহিনী পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রব্যাস্তকে বিবৃত করিলেন। তৎক্ষণে রাজা ইঁহাকে বিবাহ করিবার অভিনায প্রকাশ করিলে, শকুন্তলা বলিলেন, ‘রাজন্! আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, আমার পিতা কলাহরণ করিতে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন, তিনি আসিয়া আমাকে সম্প্রদান করিবেন।’ অসহিষ্ণু দ্রব্যাস্ত শকুন্তলার এ নিষেধ শুনিলেন না। নানাবিধ প্রলোভন-বাক্যে শকুন্তলাকে বিমুগ্ধ করিয়া, রাজা ইঁহার পাণিপীড়ন করিলেন। কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিয়াই দ্রব্যাস্ত প্রস্থানোদ্যত হইলেন, এবং শকুন্তলাকে বলিলেন, ‘আমি চলিলাম’ শুচিস্মিতে! সম্বরই বিপুল বাহিনী প্রেষণ-পূর্ব্বক, আমি তোমাকে আমার রাজধানীতে লইয়া যাইব। এখন আমি যাই।’—এই বলিয়া, ‘তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন কণ্ণ যখন এই ব্যাপার বিদিত হইবেন, তখন কি হইবে?’—ভাবিতে ভাবিতে, দ্রব্যাস্ত বিরস-হৃদয়ে, প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তপরেই কণ্ণ আসিলেন, কিন্তু সলজ্জ-হৃদয়ে ভাবময়ী শকুন্তলা, আর পূর্ব্বের ভয় পিতা কণ্ণের সম্মুখে

যাইতে পারিলেন না । দিব্য-চক্ষুঃ মহর্ষি সমস্তই বুঝিলেন, এবং শকুন্তলাকে অভয় দিলেন । যথাকালে শকুন্তলার একটি অমিতর্ভেজা কুমার ভূমিষ্ঠ হইল । ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সেই কুমারকে লালন-পালন করিয়া, মহর্ষি কথ, পুত্রবতী শকুন্তলাকে শিষ্য-পরিবৃত করিয়া, ‘দ্রুপদে’র নিকটে প্রেরণ করিলেন । হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া, শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং দ্রুপদের ‘সেই সকল আশ্বাসবাণী, প্রলোভন-বাক্য, একে একে স্মরণ করাইয়া দিলেন । রাজার সকল কথাই মনে পড়িল । কিন্তু লোক-লজ্জা-ভয়ে সমস্তই অস্বীকার করিলেন । শকুন্তলা রাজাকে অনেক প্রকারে স্মারিত করিতে প্রয়াস করিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা-বিস্মৃত রাজার কিছুই মনে পড়িল না । তখন শকুন্তলা একান্ত ক্রোধাক্ত হইয়া, রাজাকে নানা প্রকার কটুক্তি করিলেন । রাজাও শকুন্তলাকে অকথা ভাবায়, নানাবিধ তিরস্কার করিলেন । উভয়ে অনেকক্ষণ দাবং বাগ্‌বিতণ্ডা হইল । রাজা কিছুতেই যখন আত্মকৃত কার্য স্বীকার করিলেন না, তখন ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠী তাপস-বেশ শকুন্তলা করিলেন, ‘আগ্নি আশ্রমে ফিরিয়া চলিলাম, কিন্তু তোমার এই পুত্র রহিল, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তুমি ইহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য ।’ রাজা দেখিলেন—প্রমাদ ! তিনি অগ্নি রাজনীতি-বিশারদের জ্ঞায় বলিলেন,—

ন পুত্রমভিজানামি হুয়ি জাতং শকুন্তলে ।

অসত্য-বচনা নার্যাঃ কস্তুে শ্রদ্ধাস্রতে বচঃ ?

মেনকাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা, মহর্ষীগাং পিতা চ তে ।

তয়োৱপত্যং কস্মাৎ স্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে ?

অশ্রদ্ধেয়মিদং বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে ?

‘বিশেষতঃ মৎসকাশে ? দুর্ভতাপসি ! গম্যতাম্ ।’

সর্বমেতৎ পরোক্ষং মে যৎ স্বং বদসি তাপসি ।

নাহং স্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং স্বয়া ॥

রাজার উক্তি শুনিয়া শকুন্তলার ক্রোধের সীমা রহিল না । তিনি রাজাকে অনেক তিরস্কার করিলেন । শেষে তিনি, যখন পুত্রকে রাজার নিকটে রাখিয়া, স্বয়ং চলিয়া বাইতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে, হঠাৎ আকাশবাণী হইল যে, শকুন্তলা রাজার পরিণীতা ভার্যা, এই পুত্র রাজার আত্মজ । রাজার সকল রহস্ত উদ্ভিন্ন হইল । তিনি তখন নিরুপায় হইয়া, পুত্রবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন । অনেক কটুক্তি করিয়াছেন, তাই লজ্জা হইল । তাহাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল, যে, শকুন্তলা যে তাঁহার পরিণীতা ভার্যা, এবং এই বালকও যে তাঁহারই পুত্র, ইহা তিনি জানিতেন, তবে লোক-লজ্জা-ভয়ে, এসমস্ত জানিয়াও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন ।

মহাভারতের এই উপাখ্যান-ভাগে, দুঃস্বাস্ত-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষিত হয় নাই ; বরং তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দুঃস্বাস্ত একজন ঘোর প্রবঞ্চকও সাজিতে পারেন । এই মহাভারতীয় দুঃস্বাস্ত-চরিত্রের, অনেকে আবার অনেক প্রকার আধ্যাত্মিক বাখ্যা করিয়া, তাহার

১—মহাভারত, আদি, অধ্যায় ৭৪ । যথাক্রমে শ্লোক—

৭৩—শকুন্তলে ! তোমার পুত্রকে আমি চিনি না । নারীজাতি মিথ্যাবাদিনী, সুতরাং

• কে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে ?

৭৪—তোমার মাতা মেনকা অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা । পিতা তোমার মহর্ষিগুপ্তের বরপুত্র ।

• তাঁহাদের সন্তান হইয়া, কেন তুমি ব্যভিচারিণীর স্তায় আলাপ করিতেছ ?

৭৫—একেত মিথ্যা বাক্য, তাহাতে আবার আমার নিকটে ? ছি ? তোমার কি এই সকল কথা কহিতে লজ্জা হইতেছে না ? দুষ্টতাপসি ! যেখানে ইচ্ছা গ্রহণ কর ।

৭৬—তুমি যাহা কিছু বলিতেছ, সে সমস্তই আমার পরোক্ষের ঘটনা, আমি তোমাকে চিনি না । যেখানে ইচ্ছা, বাইতে পার ।

নিৰ্জলকল্প-প্রতিপাদনে যত্ন করিয়া থাকেন, এস্থলে তাহা অনালোচ্য । সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস দেখিলেন, মহাভারতের ছ্যাস্ত-চরিত্রে, ইন্দ্রিয়েরই প্রবল প্রতাপ, মনের প্রতাপ তাহাতে একবারেই নাই । প্রবল ইন্দ্রিয়-শক্তির নিকট, ছ্যাস্তের মানসিক শক্তির বিকাশই হইতে পারে নাই । তাই তিনি, মহাভারতীয় উপাখ্যানে যাহা নাই, সেই ছর্যাসার শাপের সৃষ্টি করিয়া, ছ্যাস্ত-চরিত্রের দুৰ্ণীয় ভাগের পরিহার করিলেন । মহাভারতের কবি যে চরিত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন, শকুন্তলার কবি, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া, এক অপূৰ্ব, সমাজ-হিতকর, সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করিলেন । ছ্যাস্তের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ-কারের সময়ে, শকুন্তলার সঙ্গে দুইটি সখীর সৃষ্টি করিয়া, এবং হস্তিনাপুরে রাজার সম্মুখে বখন শকুন্তলা উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহার সঙ্গে দুই জন শিষ্য ও ‘আর্য্য গৌতমীকে’ প্রেরণ করিয়া, কবি, শকুন্তলার চরিত্র পরিমার্জিত ও সৰ্ব্বাংশে নিরবদ্য করিয়া লইলেন । কোন সময়েই কালিদাসের শকুন্তলাকে, মহাভারতের শকুন্তলার ত্রায়, প্রগলভা, কটুভাষিণী, অপভ্রপা, ক্রোধাক্তা বা বহুজল্পিনী হইতে হয় নাই । কালিদাসের শকুন্তলা প্রথমেও যেমন মঞ্জুভাষিণী, মুগ্ধ-হৃদয়া, সারল্যময়ী, শেষেও ঠিক সেইরূপ । মহাভারতে যেমন কলহ অমনিই প্রণয়, যেমন প্রত্যাখ্যান অমনিই স্বীকার । আর কালিদাসের শকুন্তলার কলহের পর প্রণয়ে, এবং প্রত্যাখ্যানের পর স্বীকারে—ব্যাপার অনেক । বৈচিত্র্য অনেক । মহাভারতে চমৎকারিতার যে অংশে ন্যূনতা, কালিদাসের চমৎকারিতা তথায় অসীম । মহাভারতে যে বিষয়ের ভূয়োবর্ণন, কালিদাসে তাহা এক কথায় সম্পূর্ণ । আবার মহাভারতে যে অংশ বর্ণনীয় সম্বন্ধে উপেক্ষিত, কালিদাস কর্তৃক তাহা অতি সূচক-ভাবে বর্ণিত । এই সূচক-বলিতে ইচ্ছা করে, কালিদাসের শকুন্তলা-সৃষ্টি কল্পিত-সৃষ্টিরও অতিশয়িনী ।

হিন্দু, উপাশ্রু দেবতার ধ্যান করিয়া পূজা করেন। যেরূপ মূর্তিতে উপাসকের হৃদয় প্রসন্ন হয়, উপাসক মনে মনে, তাঁহার উপাশ্রুত সেইরূপ মূর্তি কল্পনা করিয়া লয়েন। ইহারই নাম উপাসনা। উপাসনার উদ্দেশ্য, 'দেবতার চিন্তা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিধান, চিত্তে ধর্ম্মভাবের স্করণ করিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে জগতের সকল জাতিই স্ব স্ব দেবতার রূপ-কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই কল্পিত রূপ যত সুন্দর হইতে পারে, সেই রূপের যিনি আধার, তাঁহাকে যত সুন্দর করা যাইতে পারে, উপাসক তাহা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ হিন্দু সম্বন্ধে, তাঁহারা আবার মনের মত সাজ-সজ্জায় পর্য্যন্ত আপন আপন ধ্যেয় দেবতাকে সাজাইয়া থাকেন। কখনো আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রী, কখনো দয়াময়ী অন্নপূর্ণা, কখনো আবার রিপুদল-নাশিনী ভীমা মহিষ-মর্দিনী আকারে স্ব স্ব অতীষ্ট দেবতাকে চিন্তা করেন। এই সকল চিন্তারই উদ্দেশ্য কিন্তু এক, চিত্তের শুদ্ধি-বিধান। কবির কবিতাও ঠিক এই প্রকার। কবির কাব্যের উদ্দেশ্য সমাজের শুদ্ধি-বিধান ও লোকের শিক্ষাবিধান। কিন্তু কবি এমন ভাবে তাঁহার কাব্য সৃষ্টি করেন, এমন ভাবে তাহার সাজ-সজ্জা করেন যে, দেখিলেই মনঃপ্রাণ বিমুক্ত হয়, একবারে তন্ময় হইয়া পড়ে। যে মূর্তি তন্ময়তা জন্মাইতে পারে না, যাহাকে দর্শন করিলে, হৃদয় বিষয়াস্তর-নিরঙ্কপ হইয়া, মাত্র তাহাকেই চিন্তা করে না, তাহাঙ্গী মূর্তির প্রভাব বা সংস্কার মানব-হৃদয়ে অতিঅল্পকাল-স্থায়ী। তাহাঙ্গী মূর্তির প্রদর্শনে সমাজের কোন প্রকার হিত-সাধন হয় না। যাহা সুন্দর, যাহার বহিঃ, অভ্যন্তর, উভয়ই সুন্দর, তাহারই প্রভাব বা সংস্কার হৃদয়ে পাঁচাণের রেখার ছায় দৃঢ় হইয়া থাকে। তাই যে কবির কাব্য যত সুন্দর, সেই কবির দ্বারা সমাজ তত উপকৃত। কালিদাস চরম সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া তাঁহার কাব্যোন্নিখিত পাঁচসমূহের চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাজের অশেষ মঙ্গলকাম হইয়া কাব্য নির্মাণ

করিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্যের যে স্থলেই একটু অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টি করি, দেখি, সেই স্থলেই সমাজ-হিতৈষণা, লোক-হিতৈষণা, অন্তঃ-সলিলা নদীর জ্ঞান প্রবাহিত ।

স-সাগর। পৃথিবীর অধিপতি, শায়ক-সন্ধান করিয়া শরব্য যুগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান, এমন সময়ে, যেমন একজন চীরধারী বৈখানস আসিয়া বলিলেন—‘ন হস্তবাঃ’—‘হনন করিও না’, অমনি রাজা সংহিত শায়কের প্রতिसংহার করিলেন । পৃথিবী-পতির প্রতি পর্যাস্ত একজন দীনহীন ব্রাহ্মণের কত আধিপত্য ! ব্যাপারটি আপাততঃ অতি সামান্য বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্তে দেখিলে, ইহাতে দুঃস্বাস্ত-চরিত্রের মহনীয়ত্ব যে কত অধিক, তাহা বুঝিতে পারা যায় । আর সেই সঙ্গে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রাধাত্যও যে কি অপরিসীম ছিল, তাহারও কতকটা ধারণা হয় ।

এইভাবে কালিদাস, তাঁহার চিরপ্রতিজ্ঞাত, দেব-ঈশ্বরে ভক্তি, কর্তব্যের পালন, নারীর সম্মান-রক্ষা, ক্ষমতা, তিতিক্ষা, আত্ম-ত্যাগ, পরার্থ-প্রীতি, সংযম, ইন্দ্রিয়-বিজয়, অতিথি-পূজা প্রভৃতি গৃহস্থের মিতাকর্ভবা ও সমাজের হিতকর বহুবিধ বিষয়ের উপদেশে শকুন্তলা-কাব্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন । নধুর মনো নিমগ্ন করিয়া, অতি তিত্ত ঔষধও যেমন উদরসাৎ করিলে দেহ রোগমুক্ত হয়, অথচ ঔষধের তিত্তত্ব অনুভূত হয় না, তদ্রূপ, কালিদাস, তদীয় মাদুরানন্দ কল্পনার আবেশে আবৃত করিয়া, সমাজের হিতকর উপদেশগুলি সানাজিকের হৃদয়ে দৃঢ়-সঙ্গি বিষ্ট করিয়াছেন । সানাজিকগণ, যখন কবির কল্পনার চমৎকারিতাময় লীলাতরঙ্গ দেখিতে দেখিতে, একবারে তন্ময় হইয়া পড়েন, তাঁহাদের হৃদয় হইতে সংসারের ‘অজ্ঞান’ সমস্ত বিষয়, সমস্ত সংসার ক্রিয়াকালের জন্ম, অন্তরিত হয়, শুধু—সেই বিষয়ান্তরাষ্ট্র নির্মল হৃদয়ে, কবির উপদেশের সংস্কার চিরস্থায়িভাবে সংলগ্ন হইয়া যায় । নির্মল পট ব্যতীত যেমন আলোকা

চিত্রিত হইতে পারে না, তজ্জন, নির্মল হৃদয় ব্যতীতও সচুপদেশ স্থায়ী হয় না। তাঁই কবি প্রথমে কল্পিত সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতল অনুভবায় সামাজিকদিগের অন্তঃকরণ প্রফালিত করিয়া, পরে সেই নির্মল ক্ষেত্রে উপদেশের বীজ, শিক্ষার বীজ বপন করেন। মালবিকাশ্চিন্তিত বা বিক্রমোর্বশীতে কবির ঐ উদ্দেশ্য, ওঁত সূচাক্রমে সাধিত হয় নাট। শকুন্তলায় তাঁহার সে মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে।

এই অধায় এবং তাঁহার পূর্ববর্তী অধায়ে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের সমস্ত পাত্রেরই প্রায় কথঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, এইক্ষণে শকুন্তলা এবং ছন্দোময় চরিত্র একটু বিশেষভাবে আলোচিত হইলেই, সেই সঙ্গে অপরাপর অপ্রধান পাত্রের চরিত্রও কিয়ৎ পরিমাণে পুনরালোচিত হইবে, সুতরাং অপ্রধান পাত্রের চরিত্রাবলার আর পৃথগ্ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তাঁই সর্বোপে শকুন্তলা-চরিত্রের আলোচনা করা যাউক।

পঞ্চ-পঞ্চাশ অধ্যায় ।

শকুন্তলা ।

সংস্কৃত নাটকের নারীচরিত্রের নাম করিতে গেলেই সৰ্ব্বাঙ্গে সীতা এবং শকুন্তলার কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে । ভবভূতি সীতার এবং কালিদাস শকুন্তলার চরিত্র-চিত্রণে আপন আপন অলৌকিক কল্পনা-শক্তির চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন । এই রমণীদ্বয়ের চরিত্রের সৌসাদৃশ্য যেমন অনেক, বৈসাদৃশ্যও তেমনি অনেক । কিন্তু তাহা হইলেও উভয়েরই অদৃষ্টচক্রের নিয়ন্তা যেন একই অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর । বৈসাদৃশ্য এই যে, ভবভূতির সীতা রাজার কন্যা, বয়ঃপ্রাপ্তা রাজ-মহিষী, আর কালিদাসের শকুন্তলা আশ্রম-পাণিতা বালিকা, তাপস-দুহিতা । নতুবা ছুঃখিনী সীতার জায় শকুন্তলাও পতিকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা । বিপদের সময়ে সীতার যেমন বাগ্ম্যিক, শকুন্তলারও তেমনি কথ এবং মারীচ আশ্রয়দাতা । নির্বাসিতা সীতাকে রামের সহিত পুনর্মিলিত করিতে সংসার-বিরক্ত দয়াদ্রি-হৃদয় বাগ্ম্যিকের যেমন প্রয়াস, যেমন উদ্বেগ, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে ছদ্মাস্ত্রের সহিত মিলিত করিতেও মারীচের সেইরূপ যত্ন । রাম গর্ভভরালসা সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, ছদ্মাস্ত্রও আপন্ন-সত্ত্বা কথ-দুহিতাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । সীতার সহিত পুনর্মিলনের পূর্বে, তপোবনে তাপস-বেশী সীতাকুমারের সহিত রামের সাক্ষাৎকার হয় । শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলনের পূর্বেও মারীচাত্মনে, তপস্বি-কুমার-কল্প সর্বদমনের সঙ্গে ছদ্মাস্ত্রের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল । লবকুশকে রাম প্রথমে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন নাই ; ছদ্মাস্ত্রও সর্বদমনকে না চিনিতে পারিয়া, ‘ভোমার পিতার নাম কি ?’—বলিয়া পরিত্রয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; সীতা এবং শকুন্তলা উভয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় বনবাসে কাটাইয়াছেন । সে বনবাসের প্রথম অংশ

বড়ই সুখের। যখন রামের সহিত সীতা বনবাসে ছিলেন, তখন সীতার অপার সুখ; আবার শকুন্তলাও যখন নিতাস্ত বালিকা, মুগ্ধ-প্রকৃতি, তখন কথাশ্রমে, প্রথমে সখীদের লালন-পালনে এবং দয়াময় পিতার করুণ-স্নেহে, আর পরে ভ্রাতৃপুত্রের সম্পর্কে পরম আনন্দে ছিলেন। রামকর্তৃক নির্বাসনের পর সীতার বনবাস-কাল কাদিতে কাদিতে কাটিয়াছিল। ভ্রাতৃকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখিনী শকুন্তলাও, তাপসী-বেশে কাদিতে কাদিতে বনবাস করিয়াছিলেন! বনের তরুলতা, নয়ন-ময়ূরী, মৃগ-মৃগী দুইজনেরই জীবিত-নির্বিশেষ ছিল। দুইজনেই বনবাসকালে, সমবয়স্ক। সহচরীদিগের ‘দ্বিতীয় উচ্ছ্বসিত’কল্প ছিলেন। উভয়েই মুগ্ধ হৃদয়া, সরল, উভয়েই করুণরসের যেন শরীরিণী মূর্তি, কোমলতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পতিদেবতা ললন। তাই বলিতেছিলাম,— সংস্কৃত নাটকের নারীচরিত্রের নাম করিতে গেলেই সর্বত্রই সীতা ও শকুন্তলার পবিত্র মূর্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠে।

শকুন্তলা অপ্সরার কন্যা, বন-মধ্যে উপেক্ষিত। তাঁহার জীবনের প্রথমে যেরূপ উপেক্ষা, পরিণত জীবনেও সেইরূপ উপেক্ষা। প্রথমবার মাতা কর্তৃক, দ্বিতীয়বার পতিকর্তৃক। কথ্য মূনি তাঁহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সন্তানাদিক যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। তিনি একান্ত মুগ্ধ-স্বভাবা সত্ত্বেও, অতি অল্প বয়সেই আশ্রম-কণ্ঠে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। লেখা পড়ায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। সখীগণ বলিবাগাত্রই, তিনি, হৃদয়ের কথা, দুই চারিটি অক্ষরে প্রকাশ করিয়া, কেমন সুন্দর একখানি পত্র লিখিলেন। আশ্রমের তরু লতিকা তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা। তিনি সখীদের সহিত কুসুম চয়ন করেন, আগবাল-পরিপূরণ করেন, আশ্রমতরু-স্থলিত লতাবধূকে জৈবভ্রান্তালিত করিয়া, পুনরায় তরু-কণ্ঠে দোলাইয়া দেন। তিনি যখন বনদেবীর শ্রায়-তপোবনে বিচরণ করেন, তখন কেসর-বৃক্ষ, ‘বাতেরিত পল্লবাজুলির’

সঙ্কেতে, তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া লয়। নবমালিকা লতাক্কে, ভালবাসিয়া, তিনি ‘বন-জ্যোৎস্না’ বলিয়া ডাকেন, সহকার-তরুর সহিত তাহার বিবাহ দেন। তাঁহার প্রিয় বন-জ্যোৎস্নার প্রথম ফুল-ফুটিলে, তিনি আনন্দ-ভরে তাহাকে ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিয়া, ‘নবকুসুমবোবনা’ বলিয়া, কতই না আদর করেন। যখন নব-পল্লবোন্মিস্ত-সহকার-কণ্ঠে বন-জ্যোৎস্না কুসুম-ভরন-প্রাপ্তী হইয়া বীর-সমীরণে ছলিতে থাকে, তখন তিনি অনিমেষ-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, মনে মনে কত কি ভাবেন। তাহার আনন্দের অবশি থাকে না। তাহার কুসুম-কোমল হৃদয়ে অপার স্নেহ, অনন্ত ভালবাসা।

আশ্রমের কোনও মৃগের মুখ যদি কদাচিত্ ‘কুশ-হৃচি-বিন্দু’ হয়, তবে শকুন্তলা স্বহস্তে ঈক্ষুদা চূর্ণ করিয়া তৈল-প্রস্তুত করেন, এবং মৃগের সেই ক্ষত স্থানে প্রলেপ দেন। পিপাসায় মরিয়া গেলেও, তপোবন-তরুতে জলসেচন না করিয়া, তিনি নিজে ভল্লবন্দু পান করেন না। বন-কুসুম-পল্লবের অলঙ্কার পরিতে তাহার বড়ই লাগে, কিন্তু গ্রহা হইলেও, মেহনয়ী শকুন্তলা, আশ্রমের কোনো একর ফুল বা পল্লব, প্রাণ ধরিয়া, ছিঁড়িতে পারেন না। তাহাতে তাহার প্রাণে বড়ই বাথা লাগে^১। তিনি যদ্যো-জ্ঞাত মৃগশিশুকে কোলে বসাইয়া, গ্রামাণাত্মের কোমল অগ্রভাগ খাইতে দেন। জননীর ছায় মেহ-পূর্ণ হৃদয়ে, তাহার গীত্রে কর-সঞ্চালনা করেন। কণাশ্রমের তিনি যেন মূর্ত্তিনতী দয়া, করুণাময়ী শান্তি-প্রতিমা। তাহার ছায় দগ্ধাবতী বালিকা, কাহারও দৃষ্টি-বিষয়ে বা অতি-গোচরে কখনও পতিত হয় নাই। তাহার চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, বুঝি

১—শকু, ৪র্থ অঙ্কঃ—যন্ত ভয়া ত্রণবিরোপণসিদ্ধীনান্ তৈলং ছবিচাত মুখে কুশহৃচি-বিন্দু ।

গ্রামাক-বৃষ্টি-পরিবর্জিতকো মহাতি সোঃয়ং ন পুত্র-কৃতকঃ পদবীঃ মৃগন্তে ।

পাতুং ন প্রথনং ব্যবহৃত্তি জলং যুগ্মাশ্বপীতেশু বা ।

নামন্তে প্রিয়-সন্তানহপি ভবতাং মেহেন যা পল্লবন্ ।

দয়াবতী রমণীজাতিকে, অধিকতররূপে, স্নেহ, দয়া, কোমলতা, সরলতা ও মধুরতা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই কালিদাস শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে হয়—পুণ্ড্রীচোর প্রধান সৃষ্টিমিরণ্ডা বা ডেন্ডিননাও যেন হৃদয়ের 'কোমলতাবহুপাতে, প্রাচ্যের শকুন্তলার সমদেশ-বর্ত্তিনী নহেন।

তাঁহার সখীদিগের তিনি সর্বস্বভূত। সখীগণের অল্প কার্য্য নাই, অল্প কার্য্য তাহারা জানেন না। শকুন্তলাও যেন তাহাদের সব, ইহকাল ও পরকাল। তাহারা শকুন্তলার জন্ত কুসুমচয়ন করে, শকুন্তলার জন্ত নানা গাঁথে, শকুন্তলার আদরের লতাপাদপ নিচয়ে জলসেচন করে। কোনলাগ্নী শকুন্তলার জল তুলিতে পাছে কোন কষ্ট হয়, তাই তাহারাট কলসে কলসে জল আনিয়া শকুন্তলাকে 'দার' দেয়। যখন শকুন্তলার শরীর মন 'প্রোবন-বিরোবা' এপে ক্লিষ্ট হয়, তখন তাহারা আকুলমনে বসিয়া, শকুন্তলাকে কামলিনী-পত্রের বাতাস করে। শকুন্তলার মুখ অন্ধকার দেখিলে, তাহারা কাদিয়া ফেলে, শকুন্তলাকে দুঃস্বপ্নদায়িনী দেখিলে, তাহাদের চিস্তার আর পরিসীমা থাকে না। শকুন্তলা নিজের ভাবনা করেন না, বা করিতে জানেনও না, তাহারাও শকুন্তলার ভাবনায় নিরন্তর অস্থির। যখন 'সুদভ-কোপ' দুর্দাসা, দুঃখিনী শকুন্তলাকে, অজ্ঞাতসারে অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া যান, তখন তাহারাও বাইয়া ঋষির পায়ে পড়িয়া, কত অনুন্নয় করিয়া শাপমোচনের উপায় করিল। শকুন্তলাকে, সেষ্ট ঘোর বিপদের কথা কিছুই জানিতে দিল না বাটে, কিন্তু নিজে নিজে তাহারা অতলু বিবাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। ভাবনায় আকুল হইল।

তাঁহারা তিন সখী সর্বদাই একত্র থাকেন। কেহ কখনো কাহাকেও ক্ষণকালের জন্ত নয়নের অন্তরালবর্ত্তিনী করেন না। তাহাদের তিন জনের শরীর পৃথক্ হইলেও মনঃপ্রাণ যেন একই সূত্রে গ্রথিত! এক লতিকার তাঁহারা যেন তিনটি শাখা, একবৃক্ষে তাঁহারা যেন তিনটি ফুল। পরস্পরের সৌরভে, পরস্পরের সৌন্দর্য্যে, পরস্পরের মাহাত্ম্যে তাঁহারা বিমুগ্ধ।

মহর্ষি কথ, শকুন্তলার ছুর্দৈব-প্রশমনের জন্ত তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন । বাইবার সময়ে, আশ্রমের ভার শকুন্তলার উপর ছাড়া করিয়া গিয়াছেন, শকুন্তলা তাঁহার ‘দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসিত’-স্বরূপ । কথ যখন আশ্রমে থাকিতেন, তখন তিনিও অনেক বৃক্ষের ‘আলবাল-পূরণ’ করিতেন, অনেক আশ্রমতরঙ্গ সেবা করিতেন । আজ তিনি অল্পবয়স্ক । একা শকুন্তলাকেই, আজ নিজের প্রাত্যহিক নিদ্রিষ্ট কার্য্য এবং তাঁত কণ্ঠের কার্য্য,—সমস্তই করিতে হইতেছে । সঙ্গে অননুয়া এবং প্রিয়বন্দা, যখন বতটুকু পারিতেছেন, তাঁহার সহায়তা করিতেছেন । শকুন্তলার জলসেচন দেখিয়া, শকুন্তলার পরিশ্রম দেখিয়া, তাঁহার অশ্রুতরা প্রিয়সখী অননুয়ার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে । অননুয়া এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, কিন্তু এক্ষণে, আর থাকিতে পারিলেন না, হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, “সখি শকুন্তলে ! বোধ করি, তাঁত কথ তোমা অপেক্ষা, আশ্রম পাদপদিগকে অধিক ভালবাসেন; দেখ, তুমি ‘নব-মল্লিকা-কুসুম-কোমল,’ তথাপি তাঁত কাণ্ডপ গোনাকে আলবাল-জল-সেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন ।” কথাটা অননুয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা পরিহাস নহে; ইহা শকুন্তলার সমবেদনাময়ী প্রিয় সখীর মর্ম্মের কথা, গভীর স্নেহের কথা । শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ‘সখি অননুয়ে ! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই, জলসেচন করিতে আসিয়াছি, এনন নহে; আমারও ঈহাদের উপর সহোদর-স্নেহ আছে ।’ শকুন্তলার ঈহাট দ্বিতীয় কথা । ইহার কিছু পূর্বে একবার তিনি, ‘ইতইতঃ সখ্যঃ’ বলিয়া সখীদিগকে নিকটে ডাকিয়াছিলেন । শান্ত আশ্রমের শান্ত কুসুম-কানন চারিদিকে ফুলের শোভায় শোভমান । সখী-দ্বয়, হয় ত সেট কুসুমবীথিকার কোণায় একটু অস্তরিত হইয়াছেন মাত্র । আর শকুন্তলা অগনি, যেন পলকে প্রলয় গণিয়া, ‘এই দিকে এই দিকে, বলিয়া, তাঁহাদিগকে ডাকিতেছেন ।’ সেই একবার প্রথম তাঁহার

কোমল হৃদয়ের, স্নেহময় হৃদয়ের, মধুর বাক্যের শুনিয়াছি, আর এই আর একবার শুনিলাম। 'ইত উতঃ সখাঃ', বলিয়া প্রথম বাহার মধুর বাক্যের শুনিয়াছিলাম, এইবার স্নেহময়ী শকুন্তলার সেই অনুপম স্নেহের পূর্ণ প্রকট মূর্তি দর্শন করিলাম। এই একটি কি দুইটি কথাই দ্বারাই, কবি, শকুন্তলার গভীর হৃদয়ের স্নেহ যে কত অগাধ, কত অপরিমিত, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

রাজা দ্ব্যস্ত অনেকক্ষণ আশ্রমে আসিয়াছেন। বৈখানস যখন তাহাকে আশ্রমে আসিবার জন্ত অনুরোধ করেন, তখন তাহার মুখে, রাজা কণ্ঠস্থিত শকুন্তলার নাম শুনিয়াছিলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, দূরে—নিশীথবীণাধরনিবৎ, কার যেন কণ্ঠস্বর শুনিতে পাটয়, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, 'তিনটি অন্নবয়স্ক তপস্বি-কন্তা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবাহে জলসেচন করিতে আসিতেছেন। রাজা তাহাদের রূপের মধুরা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। পাদপাস্তুরালে দণ্ডায়মান হইয়া, অনিমিষনয়নে, তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।' অদূরে, বৃক্ষের অন্তরালে যে কে দণ্ডায়মান, তাহা, মুখ্য তপস্বি-কন্তাকারী জ্ঞাত নহেন। তাহারা তিন সখীতে, সেই নির্জন তপোবনে, কত প্রাণের কথা কহিলেন। নিকটে, গ্রীষ্মের মৃদু-মন্দ সমীরণে বকুলের নবীন কিসলয় কাঁপিতেছিল, যেন বনদেবতা তাহার চম্পকভ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শকুন্তলাকে ডাকিতেছেন। মুগ্ধ-হৃদয়া কণ্ঠস্থিত তাহা দেখিলেন, তিনি বকুলের এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাহাকে আদর করিতে দ্রুত-পদে সেই দিকে চলিলেন। কবি, ধীরে ধীরে, অতি সস্তর্পণে, যেন এক এক খানি করিয়া, শকুন্তলার হৃদয়স্তর গুলি তুলিয়া ধরিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইতেছেন যে, সে বালিকা-হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্নেহের সুধাধারা কিরূপ খরভাবে প্রবাহিত।

প্রার্ট্‌কালের নবজল-সম্পাতে, বন-লতা যেমন দেখিতে দেখিতে বাঁড়িয়া উঠে, নবযৌবনের আবির্ভাবে, কুশাঙ্গী শকুন্তলার দেহযষ্টিও তদ্রূপ পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত হইতেছিল। শকুন্তলা নিজে কিন্তু ইহার কিছুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। কেন যে তাঁহার পরিহিত বকুল ‘অতিপিনন্ধ’ বোধ হয়, ইহার কারণ আশ্রম পালিতা কুমারী জানেন না। তাঁই তিনি, যে তাঁহাকে বকুল পরাইয়া দিয়াছিল, সেই প্রিয়ংবদাকেই দোষ দিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদাও মুখের উপর বেশ ছ’কথা গুনাইয়া দিয়া, বলিল, নে, দোষ গ্রাহ্যও নয়, বকুলেরও নয়, দোষ শকুন্তলার নিজের, আর তাঁহার নবাগ্ন ও নবা যৌবনের। শকুন্তলা যখন বকুলপাদপের দিকে যান, তখন তাঁহার পরিণামো,— এক সহকার বক্ষকে একটি নব মালিকা লতিকা সে বেঠেন করিয়া ছিল, আর কুলের ভায়ে, ঐ লতিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি সে, হেলিয়া, বায়ুভরে ছলিয়া ছলিয়া খেলা করিতেছিল,— ক্ষুদ্র গতি-নিবন্ধন শকুন্তলা তাহা দেখিতে পান নাই। সহচরী অনস্রয়া কিন্তু সেটি দেখিলেন। নিম্নল সুনীল গগনে তারারাজির ছায়া, সেত গ্রামল কাননে নবমালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমরাশি ফুটিয়া, বনের শ্রাণাঙ্গ যেন আলোকিত করিয়াছে,—অনস্রয়ার বড় ভাল লাগিল, তিনি তাঁহার প্রিয়সখা শকুন্তলাকে তাহা দেখাইলেন। শকুন্তলা দেখিলেন। কিন্তু অনস্রয়া যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, সে ভাবে নহে, তদপেক্ষাও মধুরতর ভাবে নবমালিকার ঐ কুসুমত্রীসন্দর্শন করিলেন। তিনি স্বহস্তে লতাটি উন্মোচিত করিয়া, একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া, দেখিয়া, দেখিয়া, কহিলেন ‘সখি! দেখ, কি রনণীয় সময়েই এই লতাপাদপ দম্পতির মিলন ঘটিয়াছে; দেখ, নবমালিকার নবকুসুমরূপী পূর্ণ যৌবন, আর সহকারও নব-কিসলয়-সম্ভারে সমলঙ্কৃত, পরম উপভোগ-ক্ষম’—এই বলিয়া, শকুন্তলা মুগ্ধ-নয়নে, সেই লতা-পাদপ-মিথুনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেন যে সেই লতাপাদপের প্রতি তাঁহার

এত প্রীতি, কেন যে, তাঁহাদের দিকে নিমেষবিধুর লোচনে সে চাহিয়া আছে, তাহা তিনিও জানেন না, অনসূয়াও জানেন না। ঐ পাদপংক্কে অনসূয়াই প্রথমে দেখিয়াছিলেন, পরে শকুন্তলাকে তিনিই দেখাইয়াছেন। যিনি প্রথম দেখিয়াছেন, তিনি বনের শোভা বলিয়া দেখিয়াছেন। ষাঁহাকে তিনি দেখাইলেন, তিনি কেবল বনের শোভা নহে, তদপেক্ষা আরও অতিরিক্ত কিছুও যেন তাহাতে দেখিতে পাইলেন। অনসূয়ার মনে যে শোভার অনুভবের সামর্থ্য নাই, অথবা সামর্থ্য জন্মে নাই, শকুন্তলা সেই শোভা দেখিলেন। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা, তিন সখীই সমবয়স্কা বটেন, কিন্তু সম হৃদয়া নহেন। অনসূয়া প্রিয়ংবদার উৎপত্তি পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু শকুন্তলার জানি। কবি বলিয়াছেন যে, তিনি স্বর্গের অপ্সরার কন্তা, জন্মাবধি আশ্রমে প্রতিপালিতা। তাঁহার হৃদয়, আশ্রমমহাশ্রো, সম্পূর্ণভাবে তপস্বিজনোচিত হইলেও, বংশের প্রভাব, বিশেষতঃ কন্টার উপর মাতার প্রভাব যে একবারেই ছিল না, একথা বলিলে, একান্ত অসম্ভাবিক হয়; তাই কবি, অতঃকৌশলে, ক্রমে শকুন্তলার হৃদয়ের অল্প অল্প পরিচয় দিতে লাগি-
লেন। তিনি অপ্সরার কন্তা অথচ আশ্রমপালিতা। তাঁহার দেহ অপ্সরার সৌন্দর্য্যে আলোকিত, আর তাঁহার হৃদয় 'শম-প্রধান' আশ্রমের শান্তোজ্জল-প্রভার পরিশোভিত, কিন্তু তথাপি, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের উপাদান যে ঐবদ্ অল্প-বিধ ছিল, ইহা কবি, এত লতা-পাদপ-দর্শন-রহস্যে বুঝাইয়া দিলেন।

‘লতা-পাদপ-মিথুনের’ মূলে দাঁড়াইয়া, অনসূয়া এবং শকুন্তলায় এই-রূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে, প্রিয়ংবদা, সহাস্রবদনে, অনসূয়াকে কহিলেন, ‘অনসূয়ে! কেন শকুন্তলা সর্বদা এই বন-জ্যোৎস্নাকে উৎসুকনয়নে নিরীক্ষণ করে, জান?’ অনসূয়া অত ব্যাকচাতুর্য্য জানেন না, প্রিয়ংবদার ভাষা অত রস-ভাবময়ী নহেন,

তিনি সরল-ভাবে বলিলেন ‘না, জানি না, বল দেখি ।’ অমনি মঞ্জুভাষিণী প্রিয়ংবদা কহিলেন, ‘শকুন্তলা মনে করে যে, বন-জ্যোৎস্না যেমন সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও বৈশিষ্ট্যে সেই প্রকার আপন অমুরূপ বর পাই—’ শকুন্তলা কহিলেন, ‘এটি তোমার নিজের মনের কথা ।’ সত্য সত্য এটি কার মনের কথা, শকুন্তলার না প্রিয়ংবদার, তাহা কবি খুলিয়া বলিলেন না । রসজ্ঞ সামাজিক-দিগের উপর সে মীমাংসার ভার দিলেন । তবে কবি, সে মীমাংসার অমুরূপ প্রমাণ-প্রয়োগের উপজ্ঞাসে রূপণ হয়েন নাই । তিনি প্রথমে, লতঃ-পাদপ-নিখুনের পার্শ্বে নিরীক্ষমাণা শকুন্তলাকে অবস্থাপিত করিয়া, শকুন্তলা-হৃদয়ে যে ভাবোন্মেষের রেখাপাত করিয়াছিলেন, প্রিয়ংবদার কথায়, সেই ভাব একপ্রকার পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিয়া দিলেন । কালিদাস এবং ভবভূতির এই এক অদ্ভুত কৌশল । এ কৌশল অগ্ৰজ এমন স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় না । ইহার প্রথমে অতি গভীরভাবে বক্তব্যের আভাস দেন ; ‘অভিক্রপ’ (expert) সামাজিক, সেই আভাসেই কবির উদ্দেশ্য বুঝিয়া লয়েন । পরে, কবি, সকল শ্রেণির সামাজিকদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত, ঐ আভাসিত বক্তব্য আরও বিশদ করিয়া বলেন । প্রথমে সামান্যতঃ প্রতিপাদ্যের উল্লেখ করিয়া, পরে বিশেষ-ভাবে উহার ব্যাখ্যা করেন ।

সখীত্রয় এইভাবে কথাবার্তা কহিতেছেন, আর অদূরে, পাদপান্তরিত রাজা হৃষ্যস্ত তাহা শুনিতেছেন । শকুন্তলা, অননুয়া, প্রিয়ংবদা—তিনজনেরই কথা, একটি একটি করিয়া রাজা মনে গাঁথিয়া লইতেছেন । বৈখানসের মুখে যে কথ ছুহিতার নাম শুনিয়াছিলেন, এতক্ষণ স্থির-মনে তাঁহাকে দেখিলেন । রাজা নিজে তাঁহার বহিঃসৌন্দর্য্য দেখিলেন, আর সখীদ্বয়, নামাবিধ কথোপকথনে, ‘রাজাকে শকুন্তলার অন্তঃ-সৌন্দর্য্য দেখাইলেন ।

অনন্তর-প্রদর্শিত বন-জ্যোৎস্নানায়ী সেই নবমালিকা লতিকায় যেমন শকুন্তলা কলস আবর্জিত করিলেন, অমনি লতা-নিষ্পন্ন একটি ভ্রমর উড়িয়া আসিয়া, তাঁহার বদন-কমলে পতিত হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা যে দিকে যান্, যে দিকে মুখ ফিরান্, ছুট ভ্রমরও ততক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবিত হয়। গুণ্-গুণ্ করিয়া, তাঁহার ‘কর্ণাস্তিকে’ কূজন করে। ‘তিনি কর-পল্লব আনর্জিত করিয়া যত বাধা দেন, অবিনীত ভ্রমরের পতন লিপসা ততই বর্দ্ধিত হয়। নিহস্ত নিরুপায় হইয়া শকুন্তলা সেই অনর্থকারিণী নবমালিকার সন্নিধি ভাগ করিয়া অন্তত চলিলেন। চলিতে চলিতে দেখেন, ভ্রমরও তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তখন তিনি সত্য সত্যই অতি কাতর হইয়া বলিলেন, ‘সখী-গণ! ছুঁকিনীত মধুকরের হস্ত হইতে তোরা আমাকে রক্ষা কর।’ সখীদ্বয়, এতক্ষণ ভ্রমর-শকুন্তলার এই ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, শকুন্তলাকে এইক্ষণ, পরিভ্রাণ প্রার্থিনী দেখিয়া, তাঁহার সহানুভবদনে কহিলেন—‘আমরা পরিভ্রাণ করিবার কে? তপোবন রাজ্যের রক্ষিত, সূতরাং সেই রাজা ছ্যাস্তকে ডাক।’ শকুন্তলার এবার অনুপায়! তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এ দিকে অনন্তর এবং প্রিয়ংবদা, সেই ভ্রমর-বাধা-রমণীয়া কধ-ছহিতার, চঞ্চল নয়ন, কমলাভ গণ্ডস্থল, বাত-বিকম্পিত চম্পক-কলিকাবৎ ইত্যন্তঃ বিস্ময় অঙ্গুলির প্রভা, দ্রাসার্ত অধর-কাস্তি প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন। শকুন্তলাকে এত সুন্দরী তাঁহার আর কখনো দেখেন নাই। শকুন্তলা তাঁহাদের উভয়েরই প্রাণাধিকা। তাঁহার ক্লেশ-বহুল আশ্রমে বসতি করেন সত্য, কিন্তু শকুন্তলার সাহচর্যে তাঁহাদের কোন ক্লেশেরই অনুভূতি হয় না। তাঁহার আনন্দ-পূর্ণ-হৃদয়ে ‘ভ্রমরাভিলম্বন’-ভীতা শকুন্তলার মুগ্ধ-সুন্দর দেহ-সৌর্ভব দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন শকুন্তলা এই ভাবে ভ্রমর-সম্বাধ-বিধুরা, যখন সখীদ্বয় বলিলেন, ‘আমরা পারিব না, যাঁহার অধিকারে এই তপোবন, তাঁহাকে

ডাক, সেই ছ্যাস্ত পারেন ত পরিজ্ঞাপন করুন', ঠিক সেই সময়ে, বৃক্ষান্ত-
 রালবর্তী রাজা ছ্যাস্ত,—যিনি এতক্ষণ তিরোহিতমূর্ত্তি হইয়া শকুন্তলার
 এই সব দেখিতেছিলেন, জীবনে যাহা কখনো দেখেন নাই, যে সৌন্দর্য্য
 কখনো করনাও করেন নাই, সেই সৌন্দর্য্য, সেই চকিতমধুরা 'লোলা,
 'দৃষ্টি' অলতিকার বিভ্রম প্রভৃতি যিনি দেখিতেছিলেন, আর দেখিয়া দেখিয়া
 দেখিয়া বিস্ময়-বিমোহিত হইতেছিলেন,—সেই রাজা ছ্যাস্তও অমন চকিত
 চকিতা মুনি-তনয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার
 আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না । যেমন বলিয়াছেন, 'রাজাকে ডাক'—অমনি
 কে এ রাজাকৃতি পুরুষ সহসা আবির্ভূত হইলেন ? আর শকুন্তলার ও
 কথাই নাই, তিনি ভয়ে, সঙ্কোচে, যেন 'এ গটুকু' হইয়া গেলেন ।

অনসূয়া যখন, 'আমাদের এই সখী ভ্রমরের যাতনায় বড়ই কাতরা'
 বলিয়া, অঙ্গুলি-নির্দেশ-পূর্ব্বক, ছ্যাস্তকে শকুন্তলা-প্রদর্শন করিলেন,
 এবং রাজাও শকুন্তলাকে 'জিজ্ঞাসা' করিলেন যে, কেমন তপশ্চরণের কোন
 বিষয় নাই ত ?—তখন শকুন্তলা লজ্জায় জড়ভূত ও আনত-বদনা হইয়া
 রহিলেন । রাজাকে কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না । কিন্তু উত্তর না
 দিলে কি হইবে ? আশ্রমের সনস্ত ভারই ত তাঁহার উপর ব্রত । বিশিষ্ট
 অতিথির শুভাগমন হইয়াছে, তাঁহাকেই ত অতিথি সৎকার করিতে
 হইবে । এইক্ষণে যাহার দিকে একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারি-
 তেছেন না, ক্ষণকাল পরেই ত পাদার্থ্য দ্বারা তাঁহাকে অভার্গিত করিতে
 হইবে । শকুন্তলা মহা সঙ্কটে পড়িলেন । মহাকবি, এইভাবে, ছ্যাস্তকে
 শকুন্তলা দর্শন করাইলেন ।

ছ্যাস্ত পৌরবকুলের যশস্বী অবতংস, ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট,
 সৌন্দর্য্য বল, বিলাস বল, তাঁহার রাণধানীতে কিছুই অভাব ছিল না ।
 তিনি নিদাঘের দিবাসানে সমুচিতকায়! লজ্জালতিকা এবং ভ্রমর-পদ
 হুঃসহা শিরীষ-যষ্টি দেখিয়াছেন, বর্ষার নীপরোগাঞ্চিকা শ্রাব্য বনস্থলী

এবং শারদা উবার মন্দানিলাহতা পতনোন্মুখী শুভ্র-ছাতি স্ফালিকা দেখিয়াছেন, তিনি হেমন্ত-রজনীর প্রভাতে ‘শিশির-মখিতা’ পদ্মিনী দেখিয়াছেন, তিনি বসন্ত-গন্দ মন্দ মরুদান্দোলিত বনশোভিনী মাধবী দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সনাঃসাতা, অনরাহতা, বহিরন্তঃশুভ্রা, ‘বন-ভোষিণী’ নবমালিকা, তিনি জীবনে আর কখনও দর্শন করেন নাই। মহাকবি, তাঁহাকে এ সৌন্দর্য্য দেখাইলেন। অকস্মাৎ পুরুষ-শ্রেষ্ঠের অভ্যুপাগমে, সখীদ্বয় কিঞ্চিৎ ব্যগ্রতানহকারে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিলেন। সরল-হৃদয়া অননুয়া কহিলেন, ‘শকুন্তলে! অতিথির অভি-লাষানুবর্তন আমাদের একান্ত কর্তব্য। প্রিয়ংবদার কথায়, তিনি ত বসিয়াছেন, এস, আমরাও তাঁহার নিকটে উপবেশন করি।’

তাঁহার সকলেই সেই ‘প্রচ্ছায়-শীতল’ ‘সপ্তপর্ণ-বেদিকায়’ উপবিষ্ট হইলেন। উপবেশনান্তর, শকুন্তলা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “কেন এই অপরিচিত ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াই আমার হৃদয়ে এমন ‘তপোবন-বিরুদ্ধ’ ভাবের উদয় হইল?” জন্মাবধিই শকুন্তলা আশ্রম-বাসিনী। তরু-লতা, ফুল-ফল, পত্র পল্লব, ময়ূর-হরিণ—এই সমুদয়ই তিনি জানেন, ইহাদের কাছেই বসেন, উঠেন, খেলা করেন, আর যখন শ্রান্তি হয়, তখন দয়াময় পিতা কণ্ঠের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া স্নেহে নিদ্রা যান। এভাবে ত তিনি কখনো বসেন নাই, বসিতে জানেনও না। এভাবে এই তাঁহার নূতন উপবেশন। এই ‘সপ্তপর্ণ-বেদিকার’ মুখে, এই অননুয়া এবং এই প্রিয়ংবদার সহিত, এমনি ভাবে, শকুন্তলা আরও কতবার বসিয়াছেন, উঠিয়াছেন, কৈ? আর কখনও ত তাঁহার মন এমন করে নাই! এখন তাঁহার মনের যে অবস্থা, তাহার যে কি নাম, কি বলিয়া তাহার পরিচয় দিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত তিনি জানেন না। তিনি মাত্র জানিয়াছেন যে, তপোবনে যাওয়া বাস করে, এ অবস্থা তাঁহাদের অনুপযুক্ত—ঘোর বিরোধী। অননুয়া, প্রিয়ংবদা কিছুই

জানিলেন না, কিন্তু শকুন্তলার হৃদয়াকাশে, এই ভাবে, একটা নূতন গ্রহের—অদৃষ্টের পরম জ্যোতিষ্মান্ গ্রহের ছায়াপাত হইল। কাহারও অদৃষ্টে এই গ্রহ ধ্বংসকারী উদ্ধার আকার ধারণ করে, কাহাকেও 'আবার, শরদিন্দুকান্তি পরিগ্রহ-পূর্বক, ইহলোকেই স্বর্গের ছবি সন্দর্শিত' করে।

সমাগত অতিথিকে একটু বিশেষভাবে জানিবার জন্ত শকুন্তলার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। তিনি মনের ঔৎসুক্য মনেই রাখিলেন। 'আর কেই বা তাঁহার ঔৎসুক্য নিবারণ করিবে? এমন সময়ে অননুয়াস্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শকুন্তলা বাঁচিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'হৃদয়! উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার আকাঙ্ক্ষা অননুয়াসই পূরণ করিতেছে।'

রাজার প্রদত্ত পরিচয় শ্রবণ করিয়া, হর্ষিত-হৃদয়ে, যখন অননুয়াস বলিলেন, 'আজ তপস্বীদিগের পরম সৌভাগ্য, আপনার আগমনে, এত দিনে তাঁহার স-নাথ হইলেন,'—তখন 'স-নাথ'—এই কথাটি শ্রবণ করিয়া মাত্রই, শকুন্তলার বদন-কমল লজ্জার অরণ্যরাগে রঞ্জিত হইল। রাজাও পূর্বাপেক্ষা ঈশদাগ্রহ-সহকারে লজ্জানন্ত-মুখী, আরক্ত-গণ্ডহীনী শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। রাজাকে দর্শন করা অবধি শকুন্তলার 'অবিদিত সংসার-ব্রহ্মাস্ত' নির্মল হৃদয়ে যে পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল, যে পূর্বরাগের সম্মোহন-মগ্নের প্রভাবে, শকুন্তলা জানিয়া গুনিয়াও, অবশ-চিত্তে, 'তপোবন-বিরোধী' ভাবের অনুবর্তিনী হইয়াছিলেন, যে পূর্বরাগের প্ররোচনায় প্রলুদ্ধ হইয়া তাঁহার কোমল হৃদয় রাজার পরিচয় জানিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, এতক্ষণে, হৃদয়-কন্দর-গুপ্ত সেই পূর্বরাগ লজ্জাভূষণে বিভূষিত হইয়া, শকুন্তলার অমল কপোল-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইল। উদয়োন্মুখ অকণের জায়, দেখিতে দেখিতে, শকুন্তলার অজ্ঞাত-সারে, তদীয় হৃদয়াকাশে প্রণয়রবি স্বমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। কন্মঠ ভ্রমর যে শুভকার্যের 'ঘটকানি' করিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার 'পাকা দেখা' বা 'আশীর্বাদ' সম্পন্ন হইল।

রাজার এবং শকুন্তলার আকার-প্রকার দর্শন করিয়া, সখীদ্বয়, প্রণয়-
স্নিগ্ধ-কণ্ঠে, শকুন্তলাকে জনাস্তিকে কহিলেন, ‘প্রিয়সখি! আজ যদি
তাত আশ্রমে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে,—তাহা হইলে, তাঁহার
জীবিত-সন্মুখ দিয়াও এই অতিথি-শ্রেষ্ঠের সম্মান-রক্ষা করিতেন।’
শকুন্তলার মহা সঙ্কট। তিনি হৃদয়ের মন্মথুলে যেরূপ কথা লুকাইয়া
রাখিয়াছেন, তাহার বুঝি বা উদ্বেদ হয়, ভাবিয়া, তিনি একান্ত
অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু প্রণয়-দুতিকা চাতুরী অমনি তাহার দ্বারা
বলাইল যে, তোমাদের অভিসন্ধি ভাল নয়, আঁন আর তোমাদের কথা
শুনিতে চাহি না। মহাকবি কেমন সতর্কহস্তে, ধীরে ধীরে শকুন্তলার
হৃদয়রূপ রহস্য-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিলেন।

রাজা হৃষীকেশ, শকুন্তলার পরিচয়-শ্রবণের বাসনা প্রকাশ করিলে,
অনন্তর সমস্ত বর্ণন করিলেন। স্বর্গের অপ্সরা-দিগের প্রধান মেনকা
তাঁহার মাতা,—এই কথা শুনিয়া রাজার সন্দেহ দূর হইল। আশ্রম-
বাসিনী তপস্বিনীর গর্ভ-সম্ভবা কুমারীর যে এত রূপ কদাচ সম্ভবিত্তে পারে
না, মহা রাজা পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। এতরূপে তাঁহার সে
অনুমান সত্য হইল—ভাবিয়া, তিনি শতমুখে শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় আঁও অশ্রুগুণ্ঠিত হইলেন।
সংসারে, রূপের প্রিয়কৃত প্রশংসা রমণীকুলের একান্ত হৃদয়ানন্দিনী।
কবি, শকুন্তলাকে সম্মুখবর্ত্তিনী করিয়া, তাঁহারই সমক্ষে, রাজার দ্বারা
তদীয় রূপের কত প্রশংসা করাইলেন। শকুন্তলা এত দিনের পর বুঝিতে
পারিলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে কত রূপ দিয়া গঠন করিয়াছেন। বুঝিতে
পারিলেন যে, যথার্থই তাঁহার দেহ-লতিকার ‘প্রসন্নতরল-ও
‘বসুধাতলে’ অসম্ভব, তিনি অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের আধার’।

১—শকু. ১ম অঙ্ক,—নানুঘীভ্যঃ কথং হুঁতাদ্যন্ত রূপন্ত সম্ভবঃ।

ন প্রভা-ভরলং জ্যোতির্জদেতি বহুখাতলাৎ ॥

শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজা, কিয়ৎক্ষণ মোনাবলম্বন করিয়া রহিলেন । তাঁহার হৃদয়ে, এতক্ষণ, যে আশা-লতিকা অঙ্কুরাবস্থায় ছিল, এক্ষণে তাহা পল্লবিত হইল । তিনি বুঝিলেন—‘শকুন্তলা তাপস-কুমারী নহেন, তিনি ক্ষত্রিয়-কুমারী সুতরাং ক্ষত্রিয়-নরপতির বিবাহ-যোগ্যা ।’ রাজার মোনাবলম্বনে শকুন্তলা নিঃশ্বাস ছাড়িবার অবসর পাইলেন । তাঁহার মুখের উপর, সখাদের সঙ্গক্ষে, তাঁহারই প্রিয়তম, তদীয় অলৌকিক লাবণ্যের গুণ-গান করিতেছিলেন, তিনি ইহাতে লজ্জায় যেন মরিয়া ছিলেন । এক্ষণে তাঁহার স্বস্তি হইল । প্রিয়বদা এটুকু বুঝিলেন, অমনি সন্মিত-বদনে একবার স্মিত-পূর্ষ-ভাবিণী শকুন্তলার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই, রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, ‘আর্য্য ! আপনি যেন আরও কি বলিতেছিলেন,—’ শকুন্তলা এবার প্রমাদ গণিলেন । রাজা হয়ত আবার সেই রূপগাথার সঙ্গীত করিবেন, সেই বিশ্রাস্ত-প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করিবেন,—ভাবিয়া শকুন্তলার অতিশয় সঙ্কোচ-বোধ হইল । তিনি তখন রাজার অগোচরে, প্রিয়বদাকে অঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জন করিলেন । শকুন্তলার হৃদয়-নিহিত ভাব, এতক্ষণে, আরও কিঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিল । তিনি প্রথমে, ‘তপোবন বিকল্প’ বলিয়া, যে ভাবের প্রতি উদাসীন্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে আবার যে ভাব, তাঁহার অজ্ঞাত-সারে তাঁহারই কপোল-পন্ন রক্তাভ করিয়াছিল, এইক্ষণে, সেই ভাব—হৃদয়ের সেই প্রথম বিক্রিয়া, পূর্নাপেক্ষা পরিপুষ্টাকারে, শকুন্তলার তর্জ্জনী আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল । প্রথম বাহার বীজ রপন হইয়াছিল, পরে বাহার অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল, এতক্ষণে, ক্রমে, সেই ভাব, তরুর আকার ধারণ করিল । অচিরেই পল্লবিত হইবে । রাজা অননুয্যাকে বলিলেন—‘আমার বক্তব্য এই যে, তোমাদের সখীর এই

তাপস-ব্রত কি বিবাহ-কাল পর্য্যন্ত, না চিরজীবন-ব্যাপী? অনহুয়া উত্তর দিবার পূর্বেই, প্রিয়ংবদা বলিলেন, ‘আমাদের তাত কথের সঙ্কল্প এই যে, অনুরূপ বর পাইলেই, ইহাকে সম্প্রদান করিবেন।’ শকুন্তলা দেখিলেন—এতদিন যে প্রিয়ংবদা তাঁহার একান্ত অনুকূল-চারিণী ছিল, আজ রাজার সম্মুখে, সে যেন সত্য সত্যই প্রতিকূল-কারিণী হইয়াছে। নতুবা যে যে কথায়, তাঁহার লজ্জার সীমা থাকে না, বুক ফাটিয়া যায়, প্রিয়ংবদা যেন বাছিয়া বাছিয়া, সেই কথাগুলিই প্রকাশ করিয়া দিতে প্রতিক্ষা করিয়াছে। তিনি অলোক কোণের সতিত বলিলেন—‘অনহুয়ে! তোমরা থাক, আমি চলিলাম। প্রিয়ংবদার মাহা মনে আসিতেছে, তাহাই বলিতেছে, আমি সাই, পিঙ্গিয়া নিকটে যাউয়া উহার এই সকল ধুষ্টতার কথা বলিয়া দিউ।’ চানহিণী মৃগী যেনন অতি যত্নে, অতি সতর্কতার সহিত, নিজের চানহাটি রক্ষা করে, অপরকে দেখিতে দিতে চায় না; মণিভূষণা ফণিনী যেনন, শিগোমণিটি সতত স-যত্নে ধারণ করে, গন্ধ-হরিণী যেমন নাভি-স্থিত কস্তুরিকার নিয়ত সংগোপন করে, তরুণ, শকুন্তলাও, তাঁহার হৃদয়োরঙ্গিত মিত্র ভাবটিকে, অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিতেছিলেন। মাহুষ ত দুঃর কথা, আকাশের বায়ুতে পর্য্যন্ত ইহা জানিতে পারে,—তাঁহার তাহা বাঞ্ছিত নহে। তাই, প্রিয়ংবদা যত তাঁহার হৃদয়ের আবরণ উন্মোচিত করিতে লাগিলেন, তত, তিনিও, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তর যত্নে, আদরে, সন্তর্পণে, হৃদয়ের সেই অযাচিতো-পন্নত অতিথিকে লুকাইতে আরম্ভ করিলেন। অনহুয়া নিষেধ করিলেন, কিন্তু শকুন্তলা উক্তি-প্রতুক্তি না করিয়া, প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন

১—শকু, ১ম অঙ্ক। রাজা—বৈখানসঃ কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানীং বাপার-রোধি মদনস্ত

নিবেদিতবান্ ?

অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণ-বলভাভিরাহা নিবৎস্ততি সমঃ

হরিণাজনাভিঃ ?

প্রিয়ংবদা অশ্রুবর্জিতা হইয়া, 'সখি ! যাও কি বলিয়া ? তুমি আমার দুই কলসী জল ধার, অগ্রে তাহা শোধ কর, পরে যাইও'—বলিয়াই বলপূর্বক গমনোন্মুখী বালিকাকে নিবর্তিত করিলেন । শকুন্তলার কোণ্ঠ আরও বর্দ্ধিত হইল । তিনি ভ্র-লতা স্রবদাকুক্ষিত করিয়া, বার বার প্রগলভা প্রিয়ংবদার দিকে চাহিতে লাগিলেন । প্রিয়ংবদার এ ভ্রাতাচারে দর্শনময় ভারতেশ্বরের প্রাণে ব্যথা লাগিল । তিনি স্বকীয় অঙ্গুলি হইতে, অঙ্গুরীয়ক উন্মুক্ত করিয়া, ধারিত জল-কলসের মূল্যরূপে, প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন । প্রিয়ংবদা তখন সস্নিহ-বদনে শকুন্তলাকে কহিলেন, 'সখি ! এই অতিথি—অথবা অতিথিবেশী মহারাজ তোমার উপর একান্ত সদয় হইয়া, আমার নিকট হইতে তোমাকে স্বর্ণ-মুক্ত করিলেন, এতক্ষণে, বেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার ।' শকুন্তলার তখন আর এমন সামর্থ্য নাই যে, সে স্থান হইতে পদ-মাত্রও গমন করেন । তিনি বাহাকে এতক্ষণ অতিথিজ্ঞানে, হৃদয়ের সমস্ত সম্পদে সংকার করিতেছিলেন, অনহ্যা এবং প্রিয়ংবদা, তদ্বৎ-অঙ্গুরীয়ক-খোদিত-নামাক্ষর-পাঠে বলিয়াছে যে, তিনি সামান্য অতিথি নহেন, তিনি পুরু বংশের অবতংস, ভারতের সম্রাট, মহাবীর ছ্যাস্ত । তাই প্রিয়ংবদার কথার উত্তরে, শকুন্তলা মনে মনে কহিলেন, 'আর গিয়াছি !'—শকুন্তলার এখনও বিশ্বাস যে, 'তাহার এ ভাব সখীরা জানিতে পারে না', তিনি প্রাণান্তেও, ইহা, পরিহাস-প্রিয়া সখীদিগকে জানিতে দিবেন না । তিনি প্রিয়ংবদাকে কিঞ্চিৎ কুপিত-কণ্ঠে কহিলেন 'আমি যাই আর না যাই, তাহাতে তোমার কি ! আমাকে বাওয়াইবার বা রাখিবার তুমি কে ?' পুরোবর্তী পৌরব-শ্রেষ্ঠ ছ্যাস্ত কোপাক্রম-বস্ত্রী শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে, অদূরে মহানু কোলাহল শ্রুত হইল । ছায়াতে সকলেই উদ্ভিগ্ন হইলেন । অল্পচর-গণ কর্তৃক বুধি বা তপোবনের কোন বাধা ঘটয়াছে,—ভাবিয়া, রাজা ব্যগ্রভাবে সেই দিকে প্রস্থানোদ্যত হইলেন । তখন

বিনীতবচনে कहিলেন—‘আৰ্য্য! আপনি অতিথি, আমরা আপনার যথোচিত সৎকার করিতে পারি নাই। সুতরাং বলিতে লজ্জা করে, যে, আপনি আর একবার, অমুকম্পাপূর্বক, আমাদের দর্শন-দানে কৃতার্থ করিবেন।’ রাজা कहিলেন—‘সে কি! তোমাদের দর্শনেই আমি যথেষ্ট সৎকৃত ও পুরস্কৃত হইয়াছি।’

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা দুই চারি পা চলিয়াই कहিলেন ‘অনন্থয়ে! অভিনব কুশাঞ্চে আমার চরণ-তল দ্বত হইয়াছে, তোমরা একটু ধীরে চল। আর এই দেখ, কুরুবক-শাখায় আগার পরিহিত বঙ্কল সংলগ্ন হইয়াছে, একটু না হয় দাঁড়াও, ছাড়াইয়া লই।’ এই বলিয়া, বঙ্কল-বিমোচনচ্ছলে, শকুন্তলা সাতীকৃতকণ্ঠে ও সতৃষ্ণ-নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সখ্যদিগের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন^২।

সেই প্রথমে—তপোবন-পাদপে জল-সেচনের সময়ে, একবার শকুন্তলাকে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। নব-কিসলয়-শোভী সহকারের সহিত বন-তোষিণী মিলিত হইয়াছে, আর শকুন্তলা তথায়, অনিনেয়-লোচনে, তাহাদের সেই শুভ সম্মিলন দেখিতেছেন—দেখিয়াছি। তখন শকুন্তলার হৃদয় মিলনের স্বপ্নগমী কল্পনায় পরিপূর্ণ, মিলনের মধুর বীণা-স্বাক্ষরে প্রতিধ্বনিত। তাই তিনি, প্রথমে তাহাকে যে বকুল-পাদপ ‘বাতেরিত-পল্লবাজুলি-

১—শকু, ১ম অঙ্ক—সখ্যো। আৰ্য্য। অসম্ভাবিতাতিথি-সৎকারা ভূয়োংপি প্রেক্ষণ-নিমিত্তং লজ্জামহে আৰ্য্য বিজ্ঞাপয়িতুম্।”

রাজা। মা মৈবম্। দর্শনে নৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোহস্মি।

২—শকু, ১ম অঙ্ক। শকুন্তলা। অনন্থয়ে! অভিনব কুশ-স্থচ্যা পরিদ্বিতঃ মে চরণং, কুরুবক-শাখা-পরিগলং চ বঙ্কলং। তাবৎ পরি-পালয়তং মাং, বাবৎ এতৎ মোচয়ামি।”

(রাজানবলোকয়ন্তী, স-ব্যাঞ্জং বিলম্ব্য, সহ সখীভ্যাং নিব্ধীকৃত্য)।

সঙ্কেতে' নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, যে ডাঁকে নাই, সেই 'লতাপাদপ-মিথুনের' নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার শোভা দেখিতেছিলেন। বনতোষিণীর প্রস্ফুটিত কুমুদ-রাশি, বা সুঁহকারের আত্ম কিসলয়-কলাপ তাঁহার দ্রষ্টব্য নহে, তাহাদের মিলনই তাঁহার দ্রষ্টব্য ছিল। তিনি দাঁড়াইয়া, অনন্ত-মনে সেই জড়ের মিলন দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইতেছিলেন, আর তাঁহার অজ্ঞাত-মারে, তদীয় হৃদয়ে বাস্তব মিলনের অস্পষ্ট ছায়া ক্রমে মূর্তি-পরিগ্রহ করিতেছিল। 'শকুন্তলার অনুরূপ বর-লাভের বাননা জন্মিয়াছে'—বলিয়া বিদগ্ধ প্রিয়ংবদা যখন শ্লেষচ্ছলে শকুন্তলার মনের কথাটি বলিয়া দিল, আর শকুন্তলাও তাহা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে গেলেন, তখনই বুঝিয়াছি যে, শকুন্তলার হৃদয়-বর্ত্তিনী সেই মিলনের ছায়াময়ী মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন আর সে যথেষ্ট-স্পৃহা নহে, এখন সে উপাত্ত প্রতিমা।

শকুন্তলা আৰ্য্য ঋষির হুহিতা, আৰ্য্যভাবনয়ী। হৃদয়ের অমূল্য রত্ন প্রেম কথায় প্রকাশ করা আৰ্য্যহৃদয়ের বাঞ্ছিত নহে। প্রেমের পণ্যচর্চা একান্ত গহনীয়। তাই প্রিয়ংবদা বা অননুয়া শত চেষ্টা করিয়াও, শকুন্তলার মনের একটি কথাও, তখন, জানিতে পারেন নাই। সেই বন-তোষিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যে শকুন্তলা একবার, তাঁহার হৃদয়ের মিলনাশাময়ী পবিত্র কল্পনার ঈষদ্রুম্যে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই ক্ষণে সেই শকুন্তলাই, কুশকত-চরণা এবং কুরুবক-শাখা-লগ্ন-বকলা হইয়া, রাজাকে বক্রকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিয়া, অপ্রবুদ্ধ-ভাবে, আত্ম-হৃদয়ের সেই মধুর মিলন-কল্পনার পূর্ণ মূর্তি দেখাইলেন। জড় বনতোষিণী-সহকারের সমীপে, তাঁহার হৃদয়ে যে ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজ চেতন দ্রব্যস্তের সম্মুখে, তাহা বর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পূর্ণায়ত হইল। বহির্জগতের ছায় অস্তর্জগতেও জড়ের আশ্রয়ে চৈতন্তের আবির্ভাব হইল।

শকুন্তলা আশ্রম-বাসিনী তাপস-কন্যা, তপশ্চর্য্যাই তাঁহার প্রধান

ব্রত। তিনি কোনও ফল-কামনায় তপশ্চর্যা করেন না। ধনসঞ্চয়-
মানসে লতাপাদপে জল-সেচন বা হরিণ-শিশুকে আহার দান করেন না।
আশ্রমে থাকিলে, এ সকল করিতে হয়, সকলে করে, তিনিও করেন।
হিন্দু গৃহস্থ নিলিপ্তভাবে সংসারাত্মনের নিত্য-কর্তব্য সম্পন্ন করিবেন, ইহাই
শাস্ত্রের আদেশ। নিঃস্বার্থ-ভাবে কর্তব্য করিয়া যাওয়াই হিন্দু সকল
আশ্রমের তুল্য উপদেশ। কি পর্ণকূটারবাসী বনমুনাগী তপস্বী, কি
সৌধতল-নিবাসী গৃহী—সকলেই, এইভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে
পারিলে, আপনাকে ধন্য মনে করেন। আপনার জন্ত তাহার বাস্তু
নহেন, পরের ভাবনাই তাঁহাদের অধিক। তাঁই তাঁহাদের হৃদয়ে, যদি
কখনো আপনার ভাবনা জাগিয়া উঠে, তবে, তখনই তাঁহারা বিচলিত
হয়েন। এ ভাব হিন্দু নজ্জাগত। নজ্জাগত বলিয়াই, রাজা ছবাস্তকে
প্রথম দেখিবার পর, যখন শকুন্তলার হৃদয়ে আপনার ভাবনা উদ্ভিত
হইয়াছিল, তখন তিনি, সেই অপরিচিত ভাবের বথার্গ স্বরূপ বুঝিতে
না পারিলেও, কিন্তু, ঐ ভাব যে আশ্রনবাসীর হৃদয়ের ‘বিরুদ্ধ,’
ইহা তাহার বুঝিতে বাকি ছিল না। শকুন্তলা যদি ‘শকুন্তলা’ না
হইতেন, তবে তাহার হৃদয়ে, হয়ত, ঐ প্রকার ‘বিরুদ্ধ’-জ্ঞানের উদয়ই
হইত না, তিনি প্রথম হইতেই ঐ ভাবের জ্যোতে আপনাকে ভাসাইয়া
দিতেন, তিনি প্রতিপদে আত্ম-গোপনের প্রয়াস করিতেন না, আপনাকে
জগতের অন্তরালে রাখিতে অত আগ্রহবতী হইতেন না। কিন্তু প্রেমে হউক,
শৌকে হউক, স্নেহে হউক, মানুষের মন যখন মাতিয়া উঠে, তখন তাহার
আত্ম-ধারণ-ক্ষমতার ক্রমে ভ্রাস হয়। মানুষ ত চেতন জীব, অচেতনতা
পৃথিবী পর্যন্ত, নব-জল-সম্পাতে, বক্ষের দ্বার উন্মোচন-পূর্বক, হৃদয়-
নিহিত সৌরভ বিকীর্ণ করেন, অচেতন জলদের আগমন-ধ্বনি-শ্রবণে,
বক্ষের লুক্কায়িত বৈদূর্য্যরসে, সেই নবীন মেঘের সংবর্দ্ধনা করেন।
মানুষের ত কথাই নাই। সেই মানুষের মধ্যে আবার যাহারা সংসারো-

দ্যানের শিরীষবৎ কোমল-হৃদয়া রমণী, যাঁহাদের হৃদয়, কেবল 'প্রেম, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি স্বর্গীয় উপাদানেই গঠিত, তাঁহাদের হৃদয় যখন, সাগর-গামিনী স্রোতাবহার ভায়, অবাধগতি সম্পন্ন হয়, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া লজ্জের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাঁহার গতিরোধ করে, কাঁহার সাধা ? তাই শকুন্তলা যখন দ্রুয্যস্তকে দেখিলেন, দেখিয়াই সাগরোন্মুখী, তরঙ্গিণীর ভায়, সেই দিকে যাত্রা করিলেন, অবশ-হৃদয়ে, যন্ত্র-চালিত পুত্ৰলিকার মত চলিতে লাগিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে, তাঁহার পূর্বসংস্কার, হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়াও, আর তাঁহাকে প্রত্যাবর্তিত করিতে পারিল না । তাই, দ্রুয্যস্ত যেমন তাঁহাকে দেখিয়া, তিনি পরিণয়-যোগ্যা কি না, সম্বংশ-সম্ভবা কি না,—প্রভৃতি কত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সেরূপ কিছুই করেন নাট, করিতে পারেনও নাই । তিনি দ্রুয্যস্তকে দেখিয়াই আত্ম-বিস্মৃত হইলেন ! দ্রুয্যস্ত যে পুরুবংশের প্রধান পুরুষ, ভারতের অধিষ্ঠিত অধিপতি, ইহা জানিবার পূর্বেই তাঁহার আত্ম-ভ্রম ঘটিল । শকুন্তলার যেমন দ্রুয্যস্ত-দর্শন, অমনিই আত্মবিস্মৃতি, দ্রুয্যস্তকে আত্ম-সমর্পণ । আর দ্রুয্যস্তের শকুন্তলা-দর্শনের পর, কত বিচার, মনে মনে কত বিতর্ক, সংশয়, পরে—নিশ্চয়-জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, তার পর আত্ম-দান ।

দ্রুয্যস্তকে সেই স্থানে,—যে স্থানে ভ্রমের আক্রমণে শকুন্তলার বিভ্রম ঘটয়াছিল, অননুয়া প্রিয়ংবদার সহিত শকুন্তলার কত প্রণয়ের কৌপ, কলহ, বাদানুবাদ হইয়াছিল, যে স্থানে গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে প্রিয়ংবদা বাহ-গীতাবেষ্টনে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, আর দয়ার্জ দ্রুয্যস্ত স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক-প্রদানে অবরুদ্ধার মোচন করিয়াছিলেন,—দ্রুয্যস্তকে সেই স্থানে, সেই বন-ভোগিণীর পার্শ্ববর্তিনী, প্রেচ্ছায়-শীতলা, সপ্তপর্ণ বেদিকায় দ্রুয্যস্ত, শকুন্তলা সখীদ্বিগের সহিত চলিয়া গেলেন । সখীরা আশ্রম-বালিনী, জগতের কোন জটিল ভাবনাই তাঁহাদের নাই, মনে কখনো

উদিতও হয় না। তাঁহারা একান্ত সরল-হৃদয়া। তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিভাবলে উপস্থিতমতে, ছব্যাস্তের কথাবার্তার উত্তর-প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন। কোন যুগ পিপাসীভূত হইয়া আসিলে, যেমন তাঁহারা তাহাকে জলদান করেন, আশ্রমের আতপ-দত্ত পাদপ-নিচয়ে, যেমন তাঁহারা জলসেক করেন, শোক-ময়ূরদিগকে যেমন তাঁহারা আহার দান করেন, ঠিক সেই বুদ্ধিতে ছব্যাস্তের তাঁহারা আতিথা করিয়াছিলেন। তাহাতে অল্প উদ্বেগ ছিল না। তাঁহাদের হৃদয় যেমন মুক্ত গগনের ত্রায় নির্মল, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপও সেইরূপ নির্মল। রাজাকে সেই লতা-কুসুম-পরিবেষ্টিত সপ্তপর্ণকুঞ্জে বিসর্জন করিয়া, তাহারা, অত্যাঁজ দিনের ত্রায়, অদাও 'প্রসন্ন-হৃদয়ে কুটীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর শকুন্তলা,—

তিনি কথের তথা কথাশ্রমের যথাসর্বস্বভূতা। তাঁহার উপর আশ্রমের ভার গুস্ত করিয়া, মহর্ষি নিশ্চিন্ত মনে, তাঁহারই হৃদৈব-প্রশমনের জন্ত তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। অতিথি-সৎকার তাঁহারই করিবার কথা। অনন্থ্য প্রিয়ংবদা, বার বার তাঁহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। অতিথির অর্চনার নিমিত্ত, উটজ হইতে 'ফল মিশ্রিত' অর্ঘ্য আনিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল। তিনি তাহা করেন নাই। করিতে পারেন নাই। মহর্ষির সন্নাস্ত ভার যে ভাবে বহন করা উচিত, তাহা করিতে পারেন নাই। ইহাতে আশ্রম-ধর্মের কোন হানি না হইলেও, শকুন্তলার আত্মকর্তব্যের বুঝি সম্যক পালন করা হয় নাই। যে প্রণয়ের অঙ্কুরেই এটি প্রকার আত্ম-বিশ্বাস, কর্তব্য-বিশ্বাস, সে প্রণয়ের পূর্ণাবস্থার মূর্তি যে কীদৃশ, তাহা ভাবিবার বিষয়, পরিণামে যে ঘোর আত্মবিশ্বাসের ফলে, অতিথিরূপী ছর্কাসার অভিশাপ পতিত হইবে, কবি, এই প্রথম-সন্দর্শনেই বুঝি তাহার রেখাপাত করিলেন। যে সন্মোহ, এই প্রথম-দর্শনে শকুন্তলাকে, অতিথির অর্ঘ্যানয়নে বিশ্বাস করিল, সেই সন্মোহই পরে, পরিণতাকারে, কুটীরদারোপনত ছর্কাসাকেও শকুন্তলা কর্তৃক

বিস্মারিত করিবে। শকুন্তলা কর্তৃক অতিথির অপরিজ্ঞান এবং তাহার ফলে দুর্ভাসার অভিসম্পাত—এই সমুদয়ের জন্ত, কবি যেন সামাজিক-দিগকে প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

• শকুন্তলা সমবয়স্কা সখীদিগের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া, তপোবনের কোন্ গাছটিতে পল্লব বাহির হইল, কোন্ লতিকায় ফুল-ফুটিল, কোন্ লতা কোন্ তরুকে স্বয়ং বরণ করিল,—এই সমুদয় নিম্নলিখিত দৃশ্য দেখিয়া দিন কাটাষ্টেন! দিন-মাসিনী তরলতার সহবাসে তাঁহার অন্তঃকরণও যেন তরললতিকায় ছায় নিম্নলিখিত সৌন্দর্য্যময় হইয়া গিয়াছিল। যখন তিনি জল-সেচনের জন্ত উপস্থিত, সখীদিগের সহিত কথোপকথনে ব্যাপ্ত, দেখিয়াছি, তখন তাহার সবটাই সুন্দর, সবটাই নিম্নলিখিত। অনন্থা বলিল, “তুমি এই লতাটিকে বুঝি বিস্মৃত হইয়াছ?” তিনি অমনি বলিলেন—“উহাকে যে দিন ভুলিব, সে দিন নিজেকেও ভুলিয়া যাউব।”—এত সুন্দর, এত কোমল, এত নিম্নলিখিত তাঁহার হৃদয়। কবি, প্রথমতঃ, সখীদের সহিত ছুঁ-চারিটি কথাবার্তা বলাইয়া শকুন্তলার হৃদয়খানি যেন খুলিয়া দেখাইলেন যে, দেখ, সে বালিকা-হৃদয়ের কোথাও কোন প্রকার রেখা বা বিন্দুটি পর্য্যন্ত নাই, সে হৃদয়ের সমস্তই স্নেহ, সমস্তই প্রীতি। সে হৃদয় বর্ষার জলদাবৃত বা হেমন্তের শিশিরাবৃত গগনবৎ নহে, সে হৃদয় শারদ-গগনবৎ নিম্নলিখিত, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত। শরতের তটিনীর ছায় সে হৃদয় নিম্নলিখিত স্নেহ-প্রীতির মন্দ-প্রবাহ-পূর্ণ, বর্ষার নদীর ছায় কুলপ্লাবী নহে। যখন শকুন্তলার হৃদয় এমনট সর্বাঙ্গ-সুন্দর, সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ, কুসুমিত লতিকার সহবাসে সৌরভময়, সেই সময়ে কবি, সেই নিম্নলিখিত, সংসার-বৃত্তান্তানভিজ্ঞ, সরল হৃদয়ে প্রণয়ের অরুণ-কিরণ-পাত করিলেন। ঈষৎ পরিণত কমলের উপর বালার্কমরীচি পতিত হইয়া যেমন, তাহাকে সহস্রাষ্ট রূপান্তরিত করে, তাহার অক্ষুট কোরকাকুতি প্রক্ষুটিত শতদলে পরিণত করে, কবিও তদ্রূপ, শকুন্তলার অক্ষুট হৃদয়-কুসুম প্রণয়ের প্রভাতরাগে

প্রস্তুতি করিলেন । সেই কাননের প্রান্তদেশে, সপ্তপর্ণ-বেদিকায়, শকুন্তলার হৃদয়-গগনে, এষ্ট যে নবীন তরুণি-রাগ উদ্ভাসিত হইল, সখীরা ইহার কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না, শকুন্তলা বুঝিলেন । কিন্তু তিনি তাপস-হুহিতা, সংযমশীল আশ্রমের অধিদেবতারূপিণী, তাঁহার হৃদয়ের পরিমাণ অনেক, তাহা সহজে পরিজ্ঞাত হইবার নহে । তিনি নিজের মনের মধ্যে যেমন, তাহার মধ্যে ঐ নবোদিত আকাজক্ষা লুকাইয়া রাখিলেন ।

ষট্-পঞ্চাশ অধ্যায় ।

সতীর আত্মমর্যাদা ।

বসন্তের সমাগমে, উদ্যানের তরুলতা অপূর্ণ শ্রী ধারণ করে । তৃণি-
জল-সেচন কর না কর, উদ্যানে যাও না যাও, তাহার লতা-পাদপে ফুল
আপনিই ফুটিবে । বসন্তের মলয়-পবনে হেলিয়া ছলিয়া, সে ফুল আপনিই
কত খেলা খেলিবে । ফুলের খেলা তোমাকে দেখাটবার জন্ত নহে,
তোমাকে বিমুগ্ধ করিবার জন্ত নহে, সে প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতি আপনিই
খেলেন । কাহাকেও আহ্বান করিতে হয় না, কোকিল ভ্রমর প্রভৃতি,
তখন আপনিই আসিয়া সে উদ্যানে উপস্থিত হয় ।

শকুন্তলার হৃদয়ে, বসন্ত-সমাগমে উদ্যান-কুসুমবৎ, প্রেমকুসুম
প্রস্ফুটিত হইয়াছে । অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী-প্রভৃতি আশ্রমের
আর কেহ তাহা জানিলেন না বটে, কিন্তু সে কুসুমের নর্তনে, সে
কুসুমের সৌরভে, শকুন্তলার হৃদয়োদ্যান পরিপূর্ণ হইল ।

যে দিন, সেই ভ্রমর বাধার সময়ে, রাজার প্রথম-সন্দর্শন লাভ করিয়া-
ছেন, তারপর সপ্তপর্ণ-বেদিকায়, সেই প্রসন্ন-গম্ভীরা রাজ-মুর্তির ছায়ায়
বসিয়া, আত্মার অপরিজ্ঞেয় কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন, সেই
দিন হইতে, শকুন্তলার স্বস্তি, চিত্র-প্রসাদ প্রভৃতি, একটু একটি
করিয়া, প্রস্থান করিয়াছে । তাঁহার স্নিগ্ধ হৃদয়ে এতদিন বাহারা সুখে
বাস করিতেছিল, আপনাদের ক্রীড়োদ্যানের ভ্রাম, যে হৃদয় তাহাদের
লীলাতরঙ্গের ক্ষেত্র ছিল, এখন তাহাতে অভ্রের অধিকার দেখিয়া,
তাহারা—সেই স্থির-প্রসাদ, উৎসাহ, উন্নাস, শান্তি প্রভৃতি চিরপরি-
চিত বৃত্তিগুলি কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে । দিনে দিনে, ঐশ্বের
প্রতিকার ভ্রাম, শকুন্তলার দেহ-বষ্টি ক্ষীণ ও লীর্ণ হইয়া পড়িতেছে ।

সতীর তিনী জীবন-প্রতিমা । তাঁহার মিন-বামিনী শকুন্তলাকে

লইয়াই থাকেন । তাঁহারা বুদ্ধিমতী সত্য, কিন্তু তাপস-কত্তা, তপোবনের শাস্তি-ধারা-বর্জিতা লতিকা, ঐশ্বরের প্রবল প্রভাপ তাঁহারা বিদিত নহেন । তাঁহারা শরতের কৌমুদীই জানেন, বসন্তের পবনই চিনেন, নিদাঘ-রবির প্রথর-কিরণ তাঁহারা জানেন না, তাহার প্রভাব যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না । শকুন্তলা যে, দিনে দিনে কাতর হইয়া পড়িতেছেন, প্রতি-ক্ষণেই তাঁহার কাতরতা যে বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন, কিন্তু ইহার নিদান তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাট । তাঁহাদের সরল হৃদয়ে, এই কার্য-কারণ-ভাবে নির্দ্ধারণ-প্রবৃত্তি আদৌ উদিতই হয় নাই । কালিদাস এই একই স্থলে, পরস্পর সম্মুখীন করিয়া দুই শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । একখানি সখীদ্বয়ের, অপর খানি শকুন্তলার । স্ব স্ব চমৎকারিতায় দুইখানিই মনোরম, দুইখানিই নিরবদ্য, দুইখানিই নিরুপম !

শকুন্তলার কাতরতা-দর্শনে সখীদ্বয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন । কি করিলে, শকুন্তলার এ অবস্থার প্রশমন হইবে, ভাবিয়া তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । তাঁহারা কখন কুটীর মধ্যে রাখিয়া শকুন্তলার কত প্রকার গুণ্ণাষা করেন, কখন শীতল শিলাতলে নব পল্লব ও নলিনী-দল-প্রভৃতি দ্বারা শয্যা-নিষ্কাণ-পূর্বক, তাহাতে শয়ন করাইয়া নানাবিধ উপায়ে, ক্রশাদী শকুন্তলার হৃদয়-নির্ব্বাণের প্রয়াস করেন । তাঁহারা তাপসী, 'তপোবন-বিরুদ্ধ-বিকার' তাঁহাদের নিকট অপরিচিত ।

শকুন্তলাকে দর্শন করা অবধি, রাজা দুয্যস্তেরও অতিশয় ভাবান্তর ঘটিয়াছে । সপ্তপর্ণ-বেদিকা-মূল পরিত্যাগের পর হইতেই, তাঁহারও প্রাণ অস্থির । কিন্তু শকুন্তলার জ্ঞায়, একবারে, তাঁহার আত্ম-বিশ্বস্তি ঘটে নাই । অন্তর্লীন অনল-শিখায় শমীতরুর জ্ঞায়, তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তর দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু তদীয় কর্তব্য কার্য্যের তাহাতে কোন প্রকার বাধা জন্মিতেছে না । যখন বো কার্য্য উপস্থিত হয়, তিনি তখনই তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করেন ।

কবি এই স্থলে অতিক্ষুণ্ণভাবে দেখাইলেন যে, ছ্যাস্ত এবং শকুন্তলা—
ইহাদের কাহার হৃদয় কোন অংশে কীদৃশ ! ছ্যাস্ত শকুন্তলাকে ভাবেন,
নিয়ত শকুন্তলাময় হইয়াই থাকেন, কিন্তু তাহার মধ্যেও তাঁহার কর্তব্য-বুদ্ধি
অতি দৃঢ়, কর্তব্য-বিশ্বস্তি তাঁহার একবারেই নাই। আর শকুন্তলার
‘অন্ত কোন জ্ঞান নাই, সকলই তিনি বিশ্বস্ত হইয়াছেন, তাঁহার একমাত্র
ধ্যেয় সেই ছ্যাস্ত। আপনার ছ্যাস্তময় হৃদয়ের মধ্যে তিনি যেন নিমগ্ন।
তিনি বহির্বাণীর পরিজ্ঞানে এমনই বিমূঢ়া যে, সখীদ্বয় তাঁহাকে পল্লব-
শয্যায় শায়িত করিয়া, সলিল-সিক্ত শতদল-পদ্মে বাজন করিতে করিতে
যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সখি শকুন্তলে ! কেমন, এ নলিনী-দল-বায়ুতে
তোমার তৃপ্তি হইতেছে ত ?’—তখন বিশ্বস্তিময়ী তাপস বাল্য উদ্ভাস-
ভাবে কহিলেন, ‘সখি ! তোমরা কি বাতাস করিতেছ ?’ তাঁহার এই
উত্তরে সখীদ্বয়ের মুখ বিবর্ণ হইল, নয়ন স-জল হইল।

ছ্যাস্ত এবং শকুন্তলা—এই উভয়ের বিষয় পর্যালোচনায় এস্থলে
আমরা দেখিতে পাঠিতেছি যে, তাঁহারা দুইজনেই দুই জনের প্রেমে
উন্মত্ত বটে, তবে রাজার সে উন্মাদ জ্ঞানের অমোঘ অঙ্কুশে নিয়তই
সংযত। তাহা কখনও উচ্ছ্রাবল হইতে পারে নাই। আর
শকুন্তলার উন্মাদের নিকট জ্ঞান পরাহত। রাজার হৃদয় শকুন্তলাগত
হইয়াও কার্য্যাস্তব-দক্ষ, আর শকুন্তলার হৃদয় একবারে রাজানুগত,
রাজ-চিন্তা-নিমগ্ন, সম্পূর্ণভাবে কার্য্যাস্তব-বিমূঢ়। ছ্যাস্তের নিকট
হৃদয় পরাজিত, আর শকুন্তলা নিজেই নিজের হৃদয় কর্তৃক অপহৃত।
ছ্যাস্ত পুরুষ, তিনি আত্মধারণে সমর্থ, শকুন্তলা রমণী, তিনি তাহাতে
অসমর্থ। ছ্যাস্তের দাওব্য-বিষয় বিচার-প্রধান, আর শকুন্তলা অত বিচার-
বিতর্ক করেন না, বাহ্য দিবার, তাহা একপদেই দিয়া ফেলেন, দানের
অবশিষ্ট কিছুই রাখেন না। পুরুষ এবং রমণীর হৃদয়ে এই প্রভেদ। এই
প্রভেদ আছে বলিয়াই হৃদয়-সম্পদে রমণী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গরীয়সী।

এইস্থলে হুয্যন্ত যদি শকুন্তলার ভায়, আর শকুন্তলা হুয্যন্তের ভায় হইতেন, তাহা হইলে, উভয়েরই চরিত্র-ক্ষতি হইত। মনীয়ত্বের ব্যাঘাত ঘটিত। সেইরূপ নহেন বলিয়াই, হুয্যন্ত পুরুষ-প্রধান, আর শকুন্তলা অধিতীয়া রমণী।

হুয্যন্ত অধিতীয় পুরুষ এবং অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই, সেই প্রথম-সন্দর্শন-কালে, শকুন্তলাকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার গ্রাহ্যগ্রাহ্যত্বের বিচার করিতে পারিয়াছিলেন। সখীদ্বয়ের নিকটে শকুন্তলা-বিষয়ক কত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আর শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়াই একেবারে বিমুগ্ধ হইলেন, পূর্বাপর চিন্তা না করিয়াই তাঁহাকে আত্মদান করিলেন। এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ ইহাও বুঝা গেল যে, পুরুষ অনেক ভাবিয়া, আপনার লাভালাভ বিচার করিয়া দান করেন, আর রমণী, উন্মুক্ত-হৃদয়ে, আত্ম-নিরপেক্ষ হইয়া, আপনার কথা একেবারে নিশ্চিত হইয়া, দানীয়পাত্রে যথাসর্বস্ব দান করিয়া ফেলেন। এ অংশেও পুরুষ অপেক্ষা রমণীর শক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়। রমণী স্বভাবতই কোমল-প্রাণা, তাহার মধ্যে আবার শকুন্তলার প্রাণ যে কত কোমল, কত সুন্দর, তাহা কবি, এই স্থলে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

শকুন্তলার হৃদয় এত একাগ্র, এত একমুখী, এত নির্ভরদক্ষ যে, সেই উদ্যান-বাটিকায়, তিনি নিমেষের মধ্যে, নিজের হৃদয়-পুষ্পটির দ্বারা যে অতিথির আতিথ্য করিয়াছিলেন, যে অতিথির চরণে অর্ঘ্যরূপে স্বকীয় সমগ্র হৃদয়খানি উপহার দিয়াছিলেন, সেই অতিথি, ক্ষণকাল পরে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেও, বহুদিন পরে পরিদৃষ্ট ও তাদৃশ প্রত্যাখ্যান পর হইলেও কিন্তু, শকুন্তলার সেই প্রদত্ত হৃদয় কুসুম, তেমনি ভাবে, তাঁহারই উদ্দেশে পড়িয়া ছিল। নলিনো যেমন যামিনীযোগেও, ভবিষ্যৎ দিবসের আশায়, উর্জনরনে চাহিয়া থাকে, মুগ্ধা তাপস-বানর হৃদয়ও তরুণ, শতপ্রত্যাখ্যান-প্রাপ্ত হইয়াও, সেই একমাত্র আরাধ্য দেবতার ধ্যানেই নিমগ্ন ছিল।

অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, যখন উত্থান-শক্তি-বর্জিতা, হৃৎক্লান্ত-হৃদয়া, শকুন্তলাকে স্তম্ভীতল শিলাতলে শয়ন করাইয়া ত্যাগ করিতেছিলেন, তখন পর্য্যন্তও কিন্তু তাঁহারা শকুন্তলার মানসী বেদনার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন নাই। শকুন্তলা অর্ধ মূর্ছিতা। আর তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী সখী অনসূয়া প্রিয়ংবদা কখন নিম্নোক্তাকার শকুন্তলার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, কখন বা, পরস্পর ‘মুখ চাওয়া চায়ি’ করিতেছেন। আশ্রম-পতি কথ অল্পগস্থিত। তাঁহাদের বিপদের সীমা নাই। অনসূয়া নিতান্ত মুগ্ধ-প্রকৃতি, শকুন্তলার তাদৃশী অবস্থায়, তিনি এক প্রকার হতচৈতন্য। তিনি মধ্য মধ্য শকুন্তলার এ বিপদের কারণ নির্ণয় করিতে যান, কিন্তু পরক্ষণেই, শকুন্তলার দিকে চাহিবারামাত্র তাঁহার বুদ্ধিধারা বিচ্ছিন্ন হয়, এক প্রকার লুপ্ত হয়, তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। প্রিয়ংবদা ভাবিয়া ভাবিয়া, কুসুম শয্যাশায়িনী শকুন্তলার অগোচরে, তাঁহাকে বলিলেন, ‘অনসূয়ে! সেই রাজর্ষির প্রথম-দর্শন-দিন হইতেই, শকুন্তলার এই ভাব, সেই রাজাই কি, আমাদের সখীর এই ছরবছার কারণ?’ স্তম্ভোৎথিতার জ্ঞান অনসূয়ার চমক ভাঙিল। তিনি তখনই শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন,— ‘কিছুতেই বলিব-না, আর সহসা বলিবার শক্তিও আমার নাই।’

পুরুষ এবং রমণীর হৃদয়-গত গান্ধীর্থ্যের তারতম্য, কবি এই স্থলে অতি প্রাঞ্জল-ভাবে প্রদর্শন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ হৃৎক্লান্ত, তাঁহার হৃদয়ের শকুন্তলাগত উদ্ভাদের কথা গোপন করিতে পারেন নাই। চকলমুষ্টি বদন্ত বিদূষককে সব বলিয়া ফেলিয়াছেন। বলিবার পর বুঝিয়াছেন যে, কাজটা ভাল করেন নাই। তাই আবার তাহার অস্তথা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। আর শকুন্তলা সখীময়-জীবিতা। তাঁহারা যেন একই বস্তুর তিনটি মূল। তবুও কিন্তু শকুন্তলার হৃদয়ের লুক্কায়িত কুসুম-সৌরভ সখীময় জানিতে পারেন নাই। ইচ্ছা করিয়া, অতি

যে, হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়াছেন। পুরুষ অপেক্ষা নারীহৃদয় যে, ভাব-প্রধান, পুরুষ অপেক্ষা নারী-হৃদয়ের গাভীর্য্য যে অনেক অধিক, এ অংশও পুরুষ অপেক্ষা রমণী যে অধিকতর বলশালিনী, তাহা এই বৃত্তান্তে অতি-সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল।

সখীদ্বয়ের নির্বন্ধাতিশয়ে, শকুন্তলা মনোবেদনার কারণ বলিতে, অতি কষ্টে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু বলিবার পূর্বে তাঁহার তাদৃশ যা জনাপূর্ণ হৃদয়েও সখীদিগের ভাবনা জাগিল। তাঁহার হৃৎকের কথা শুনিলে যে সখীদেরও হৃৎকের অবধি থাকিবে না, তাঁহারাও যে তাঁহার ভ্রায় বেদনার অতীব কাতর হইবেন, এই ভাবনায় তিনি আরও চঞ্চল হইলেন। যে সমবেদনার বৈদ্যতবলে, সখীদ্বয় শকুন্তলার হৃৎকের কারণ পরিজ্ঞানের জন্ত অস্থির, তাহারই প্রভাবে শকুন্তলা বেদনার হেতু-প্রকাশে অস্বীকৃতা। যে বৃত্তিতে শকুন্তলাকে, এই প্রকারে, প্রিয়-সখীদের নিকটে, হৃৎক-হেতু-প্রকাশে পরাস্থখী করিয়াছে, সেই বৃত্তির উৎপত্তিস্থল রমণীরই হৃদয়-স্বর্গ। পবিত্র নারীহৃদয়ের ইহা একটি চিরসুন্দর অলঙ্কার। ক্রমে অনেক অহুরোধের পর, শকুন্তলা সখীদের নিকটে, আপন বেদনার কারণ প্রকাশ করিলেন। সখীরাও তাঁহার গুণাভিমুখী চিত্তবৃত্তির শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনেক কথার পর, প্রিয়বদার আগ্রহানুসারে, স্থির হইল যে, শকুন্তলা একুথানি পত্র লিখিবেন, আর সেই পত্র কুসুমের দ্বারা আবৃত করিয়া, সুগুণভাবে, আশ্রম-প্রান্তবর্তী রাজার নিকটে প্রেরণ করা যাইবে। শকুন্তলার কিন্তু, এই প্রস্তাবে, বুক কাঁপিয়া উঠিল। সংকুল-সন্তবা সতী লগন্যর আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান অতি প্রবল। তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার জন্ত সহাস্তবদনে মরিতে পর্য্যন্তও প্রস্তুত। আত্ম-সম্মান-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের অদেয় কিছুই নাই। যে রমণীর হৃদয় এই মর্য্যাদায় শিথিল-প্রবল, সে রমণী নহে, সে গিলাচী।

শকুন্তলা পত্র লিখিবেন, রাজা যদি তাহাতে আস্থা-প্রদর্শন না করেন, অবজ্ঞা করেন, তখন উপায় ? একেই ত শকুন্তলার এই কষ্ট, এই বাতনা, তখন যে আবার ইহা অপেক্ষাও বিপদ, মৃত্যুতে এ বাতনার শেষ আছে, কিন্তু সে বাতনার বুঝি মরণেও শেষ নাই। রমণী সব সহিতে পারেন, কিন্তু পতি-কুরু-অবজ্ঞা, উপেক্ষা প্রভৃতি সহিতে পারেন না। তাই কলিত রাজকৃত উপেক্ষা স্মরণ করিয়া, মহর্ষি-হুহিতার হৃদয় ছক ছক কাঁপিয়া উঠিল।

মহাকবি, নিপুণ মণিকারের ছায়, শকুন্তলার হৃদয়াকর হইতে মণিরত্নগুলি একটি একটি করিয়া তুলিয়া ধরিয়া, সামাজিকদিগকে যেন দেখাইতে লাগিলেন যে, সে তাপস-কুমারীর হৃদয় কত অপার্থিব রত্নের আধার, সে হৃদয়ের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে কি শোণিত প্রবাহিত। প্রকৃতি যেমন প্রভাতে স্বকীয় উদ্যান-রূপ হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া, পখিকের সমক্ষে আপনার শিশির-বিন্দু-খচিত কুসুম-রাশির ডালা সাজাইয়া তুলিয়া ধরেন, কবিও তদ্রূপ, শকুন্তলার হৃদয়খানি যেন একবারে খুলিয়া, তুলিয়া ধরিয়া, দর্শকদিগকে সে হৃদয়ের গুণ-সম্পৎ-সমূহ দেখাইতে লাগিলেন।

হার শকুন্তলে ! আজ লিখিত পত্রের উপেক্ষা কল্পনা করিয়াই তোমার মুগ্ধ হৃদয় এত অধীর, আর যখন তোমার সমক্ষে, স্বদীর হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা তোমাকে উপেক্ষা করিবেন, তখন তোমার এই অভিমানী হৃদয়ের যে কি অবস্থা হইবে—তাহা ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়। চক্ষে জল আসে !

পত্রের উপেক্ষা-কল্পনার শকুন্তলার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শুনিয়া—সখীস্বর সম্বরে বলিয়া উঠিলেন—‘আত্ম-গুণাবমানিনি ! কোন্ মুখ আত্মপ্রভের দ্বারা শরীর-নির্কাপিকা শরদী জ্যোৎস্না নিবারণ করিয়া থাকে ?’

‘আত্ম-গুণাবমানিনী’ নহেন, শকুন্তলা আত্ম-গুণানভিজ্ঞা। যিনি আত্ম-গুণের পরিমাণ জানেন, তিনি সেই গুণের গণনা না করিলেই, ‘গুণাবমানিনী’ হইতে পারেন, কিন্তু শকুন্তলা ত জানেন না যে তাঁহার কত গুণ, বিধাতা তাঁহাকে কত রূপ—কত গুণ দিয়া ধরায় পাঠাইয়াছেন। তিনি ত বিদিত নহেন যে,—‘ম প্রভাতরলং জ্যোতিরুদ্ধতি বসুধাতলাৎ—’ যদি জানিতেন,—যদি তাঁহার আত্ম-গুণের একটা সামান্য ধারণাও থাকিত, তাহা হইলে, সখীদের উক্তিই ঠিক হইত, তাঁহার মনে, হয়ত, তাদৃশ আশঙ্কার উদয়ই হইত না। যে নিগুণ, যাহার কিছুই নাই, বিধাতার রূপায় যে বস্কিত, সেই আত্ম-গুণের অনুসন্ধান করে, যাহার গুণ আছে, সেই গুণবান কখনো আত্ম-গুণের কথা ভাবেন না। ওদিকে তাঁহার লক্ষ্যই থাকে না! বিশেষতঃ রমণী-জাতি। যে রমণী যত অধিক আত্ম-বিস্মৃত হইবেন, তাঁহার তত সুখ, তাঁহার হৃদয় তত মধুর, তত উচ্চ, অথবা রমণীর তত দিনই রমণীয়ত্ব। রমণী যদি কদাচ মনে করিলেন যে, তাঁহার এত সৌন্দর্য্য, এত রূপ, এত গুণ, এত সম্পদ,—তবে জানিও, সেই দিন হইতে, সে রমণীহৃদয়ে ঘুণ ধরিল, তাঁহার দেবত্বো অস্তর্য্যানের আর অধিক বিলম্ব নাই।

প্রিয়ংবদা কর্তৃক উপহৃত, ‘সুকোদরবৎ সুকুমার নলিনী পদ্মে’ প্রিয়ংবদারই আশ্রয়শীল্যে, শকুন্তলা, নথ দিয়া, একটি গান লিখিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজা ছব্যাস্ত, অনেকক্ষণ হইতে—যখন সখীদ্বয় শকুন্তলাকে শিলাশয়নে গুপ্তাশ্রয় করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে, বিমনায়মান হৃদয়ের সাস্তুনার আশায়, কাননে প্রবেশ করিয়া, বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া—সখীদ্বয়ের এই সকল কথোপকথন শুনিতেন।

শকুন্তলার গান রচিত ও লিখিত হইলে পর, যখন শয়ানা ত্যাগ

শকুন্তলা, তাহা পাঠ করিয়া সখীদিগকে শুনাইলেন, তখন অমনি রাজাও, সেই সঙ্গীত-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সহসা আশ্চর্য-প্রকাশ করিলেন । সখীদ্বয় তদ্বর্ণনে পরম পুলকিত হইলেন । শকুন্তলার প্রাণ বাঁচিল, তাঁহারা, তাঁহাদের আর আনন্দের অবধি রহিল না । শয়ানা ক্রীণাদী শকুন্তলা, অকস্মাৎ সেই চিরখ্যাত মূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া গাত্রোৎকান করিতে বাইতে ছিলেন, কিন্তু ক্লশতা-নিবন্ধন পারিয়া উঠিলেন না । আর দয়ার্হ্র ছব্যস্তও নিবেদন করিলেন । অনন্থ্য রাজাকে সেই কুসুম-বাসিত শিলাতলে উপবেশন করাইলেন । প্রিয়ংবাদিনী প্রিয়ংবদা ধীরে ধীরে, শকুন্তলার মনোবেদনার কথা রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন ।

শকুন্তলার এখন আর সে ভাগসীভাব নাই । তিনি বধুভাবে সলজ্জ-বদনে অশোমুখী হইয়া রহিলেন । এতদিন বে বাতনার, বে ছুখে, হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছিল, হঠাৎ তাহা যেন কার মন্ত্রবলে অপসৃত হইল ।

‘আমরা বাঁচিলাম’—বলিয়া প্রতিভাময়ী প্রিয়ংবদা অনন্থ্যাকে লইয়া হরিণশিশু ধরিতে প্রস্থান করিলেন । শকুন্তলা কহিলেন—‘সখি ! আমি নিরাশ্রয়া, তোমাদের একজন ফিরিয়া আইস ।’ তখন সখীদ্বয় সমকণ্ঠে বলিলেন, ‘পৃথিবীর যিনি নাথ, তিনি তোমার নিকটে, আর তুমি নিরাশ্রয়!—’

রাজা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন । কিন্তু রাজার সম্মুখে থাকিতে যুঁহা শকুন্তলার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিল ! তিনিও গমনোন্মুখী হইলেন । রাজা তাঁহাকে বাইতে দিলেন না, গতিরোধ করিলেন ।

অনেক কষ্টের পর, অনেক বেদনার পর, শকুন্তলা বাহিত-সম্বর্ধন

১—সহ, ৩য় অঙ্ক । শকুন্তলা বাচয়তি ।

‘তব ম জানে হৃদয় মন পুং: কান: দিবা অপি, রাত্রৌ অপি ।

নিরুপ: তপতি বলীক: দ্বিঃ বৃত্ত মনোরথানি অজানি ।

পাইরাছেন। কিন্তু তথাপি তিনি বিনয়ের মৰ্যাদা বিস্মৃত হইলেন না। ক্ষীণ-কণ্ঠে,—খলিত-কণ্ঠে,—রাজাকে কহিলেন, ‘গৌরব ! আমার আত্মার আমি প্রভু নহি।’ তিনি জানেন, পবিত্র আশ্রমের তিনি অধিবাসিনী, পবিত্রমনাঃ কণ্ঠের তিনি হুহিতা। পবিত্রতা-রক্ষা করিতে বৃদি মরিতেও হয়, তবে তাহাও তিনি পারেন। হৃষ্যস্তকে ভাবিতে ভাবিতে জীবন-পাত করাও বরং ভাল, তথাপি, গোপনে, আশ্রম-বিরোধী উপায়ে, ঋষিহুহিতা বাহিতলাভ করিতে অভিলাষিনী নহেন !

রাজা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, রাজর্ষি-কন্তাদের চিরদিনই গাঙ্কর্য বিবাহ প্রচলিত, শকুন্তলা রাজর্ষি-কন্তা, স্ততরাং ঐ বিবাহই তাঁহার প্রশস্ত।

কিয়ৎকাল পরেই, প্রিয়ংবদা দূর হইতে সঙ্কেতে জানাইলেন—গৌতমী আসিতেছেন। শকুন্তলার ত্রাস হইল। এক মুহূর্ত্ত পূর্বে ঐহাকে দেখিবার জন্ত অত আকুলতা, এক্ষণে, নিজেই তাঁহাকে কহিলেন ‘আর্য্য! গৌতমী আগতপ্রায়, রাজন্ ! তুমি বিটপাস্তুরিত হও।’

হৃষ্যস্তকে শকুন্তলা মনে মনে পতিভে বরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বৈধ গাঙ্কর্য বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তবুও কিন্তু লজ্জাবতী শকুন্তলা, তাঁহার প্রবীণা গিসিমাতার সমক্ষে, তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সমীপে অবস্থানে অভিলাষিনী হইলেন না। এই লজ্জা ভারত-কামিনীর আভরণ। এই আভরণে যিনি বিমণ্ডিতা, তিনিই হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া, ললন-ধর্ম্মের পালন করিতে পারেন। নিজের কষ্ট গণনা না করিয়া কর্তব্য-হুরোধে জীবন-সর্বস্বকেও বিদায় দিতে পারেন। শকুন্তলা আত্ম-বিস্মৃত ছিলেন বটে, কিন্তু আত্ম-বিমূঢ়া ছিলেন না। ক্ষণমধ্যেই গৌতমী উপস্থিত হইলেন। সখীদ্বয়ও বিছাদ্বেগে শকুন্তলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৌতমী শান্তিভলে শকুন্তলার মস্তক অভ্যাক্ত করিয়া, সকলকে লইয়া উটজাতিমুখে বাত্মা করিলেন। বাত্মা-কালে, শকুন্তলা পদমাজ পশ্চাদ্-

বর্তিনী হইয়া, যে লতাবলয়ে রাজা তিরোহিত ছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া কহিলেন, ‘সস্তাপহর! লতা-বলয়! প্রার্থনা করি, আবার যেন তোমাকে পাই।’—

• সেই শকুন্তলা,—যিনি বনতোষিণীর পার্শ্ববর্তিনী সপ্তপর্ণ-বেদিকায় বসিয়া প্রিয়ংবদার সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন, অভিন্ন-হৃদয়া সখীর নিকটেও আত্ম-গোপন করিয়াছিলেন, সেই শকুন্তলা আজ বিটপান্তরিত দুষ্যন্তের নিকটে সেই প্রিয়ংবদারই সমক্ষে, হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। সপ্তপর্ণ-বেদিকামূলে শকুন্তলার হৃদয়ে, যে প্রণয়-সরস্বতী অপ্রকাশিত ছিল, এতদূরে বহিয়া আসিয়া, তাহার ধারা প্রকাশ পাইল। ‘যুক্তবেণী’ এত দিনে ‘মুক্তবেণী’ হইল। এত দিন তিন সখীতে এক মূর্ত্তিবৎ ছিলেন। এক্ষণে শকুন্তলার যেন একটা পৃথক্ সত্তা জন্মিল। সে সত্তা আর কিছুই নহে, দুষ্যন্তের ছায়া মাত্র। কণ্ঠের তাপসী কণ্ঠা, এত দিনে, ক্রমে দুষ্যন্তো ছায়াময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন।

সপ্ত-পঞ্চাশ অধ্যায় ।

শাপ না শাসন ?

রাজা হুয়াস্ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোনই সংবাদ নাই। অননুয়া-প্রিয়ংবদার প্রাণ ক্ষতির হইয়াছে। তাহার নিজের ভাবনা জানে না। দিবারজনী শকুন্তলার কথাই ভাবে। ‘কেন রাজা কোন সংবাদ দেগ না, তিনি কি ভুলিয়া গেলেন’—এই ভাবনায়, তাহাদের আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছে। ‘কি করিলে শকুন্তলার এ ছরদৃষ্ট খণ্ডিত হয়’—, নিরন্তর তাহাদের এই চিন্তা। অননুয়া আজ প্রিয়ংবদাকে লইয়া আশ্রমোপাস্তে কুসুম চয়ন করিতেছে, বাসনা,— ডালা ভরিয়া ফুল তুলিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি ফুলের দ্বারা, আজ দুঃখিনী শকুন্তলার মৌভাগ্যদেবতার অর্চনা করিবে,—ইহাতে যদি তিনি প্রসন্ন হয়েন, এই শুভানুষ্ঠানের ফলে, রাজার যদি শকুন্তলাকে মনে পড়ে। হিন্দু সংসারে যখনই কোন দৈবহুর্কিপাক আপতিত হয়, বিপদ ঘটে, তখনই আমরা এই সুন্দর দৃশ্যটি দেখিতে পাই। সংসারের বাঁহারা প্রাণ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সেই রমণীরা অনন্ত-হৃদয়ে, আপৎ-প্রশমনের জন্ত, দেবতার অর্চনা করেন, কত ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন। রমণী-জাতির মজ্জায় মজ্জায় যদি এইরূপ ধর্ম্মভাব আবহমান কাল হইতে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে, হয়ত, এতদিনে হিন্দুধর্ম্মের আরও কত অধঃপতন ঘটিত। কবি, কেমন সুন্দর করিয়া, ধর্ম্ম-প্রভাব-পূর্ণ হিন্দু-সমাজের তথা হিন্দু-রমণীর হৃদয়ে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিলেন।

অননুয়া প্রিয়ংবদা এইরূপে কুসুম-চয়নে ব্যস্ত রহিয়াছেন, এ দিকে আশ্রমে শকুন্তলাও একাকিনী, তাঁহার আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন। তিনি এক দিকে, অনিমেঘ-নেত্র্যে চাহিয়া আছেন। কিন্তু সে দৃষ্টির দৃষ্টিশক্তি নাই। সে দৃষ্টি-বহিঃস্থ হইয়াও বাহ্যবস্তুর দর্শন করিতে

পারিতেছে না । সে দৃষ্টি, শকুন্তলার মর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার ঘোর, হৃদয়াক্ত মূর্তি দেখিতেছে । পুতলিকার নয়নের জ্বালা, সে নয়ন যেন চিত্রিত, নিষ্পন্দ, বস্তুরূপ-পরিগ্রহে অসমর্থ !

সেই বনতোষিণী, সপ্তপর্ণবেদিকা, ভ্রমর-বাধা,—সেই অতিথির আবির্ভাব, প্রিয়ংবদার রহস্তোক্তি, শকুন্তলার আত্মগোপন,—সেই শিলাতলে কুসুম-শয়ন, পত্র-লেখন, সহসা রাজার অভ্যুপ-পতন, আর তার পর আবার, সেই—সখীদ্বয়ের অন্তর্ধান, হৃদয়াক্ত শকুন্তলার পরম্পর আত্ম-সমর্পণ, শকুন্তলার কাতরতা, রাজার অনুনয়,—হঠাৎ বিয়রূপিণী গোঁতমীর আগমন,—আজ একে একে সব শকুন্তলার মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত । শকুন্তলা আজ বহির্জগৎ ছাড়িয়া, অন্তর্জগতের মধ্যে একবারে বিলুপ্ত, মিশ্রিত । জীবের স্থলদেহ পড়িয়া থাকে, স্থলদেহ চলিয়া যায়, আজ শকুন্তলারও স্থলদেহ মালিনী-তটের কুটীর-দ্বারে পতিত, আর তাঁহার স্থল দেহ কোথায় অন্তর্হিত ! অনন্থর প্রেম, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি এই লোকের সামগ্রী নহে, লোকান্তরের পবিত্র বস্তু, তাই আজ প্রেমময়ী শকুন্তলার প্রাণও যেন লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহার নন্থর দেহ এই নন্থর লোকে পড়িয়া আছে ।

করুণাময় পিতা কথ, দ্বিতীয়-হৃদয়-সদৃশী অনন্থরা, “প্রাণতুল্যা প্রিয়ংবদা, নেহমরী আৰ্য্যা গোঁতমী—এ সকলকেই আজ শকুন্তলা ভুলিয়াছেন । কথের বড় আদরের আশ্রম, আশ্রম তরুণতা, বড় আশ্রমের আশ্রম-পন্থ-পালন, অতিথির অর্চনা প্রভৃতি, তিনি, তীর্থ-গমন-কালী, শকুন্তলার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন । শকুন্তলা আর এখন সেই আশ্রম-বাসিনী নহেন, পার্থিব আশ্রমের অনেক দূরে, অনেক উচ্চে যে আশ্রম, সেই আশ্রমের যে সর্বপ্রধান সঞ্জীবন তরু, সেই তরুর সর্বপ্রধান সন্মোহন ফলের আন্বাদনে শকুন্তলা এখন উন্মাদিনী । কথ তাপস, চির দিন তপস্বী করেন, বনে থাকেন, ফলমূল আহরণ করেন ।

হৃদয়ের বেগ বা প্রেমের প্রতাপ যে কত প্রবল, জীবের উপর তাহার যে কৃত আধিপত্য, তাহা বুঝি সংসার-বিরক্ত বনবাসী ঋষি বিদিত নহেন । তাই তিনি, বিশ্বতময়ী মুখা শকুন্তলাকে, একটু কন্দর্প, আশ্রয়-ধারণ-সমর্থ করিবার জন্য, তাহার উপর আশ্রমের ভার, অতিথি-সংস্কারের ভার স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন । প্রেমের প্রভাব যদি তিনি বিদিত থাকিতেন, নারী-হৃদয়ের প্রকৃত পরিমাণের যদি তাহার জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে, ক্রান্তদর্শী মহর্ষি, কদাচ, মুখা, কোমল-প্রকৃতি, অপ্সরী কন্তার উপর এ গুরু-ভারের অর্পণ করিতেন না । তিনি স্নেহময় পিতার চক্ষেই শকুন্তলাকে দেখিতেন, পিতৃ-নিরপেক্ষ হইয়া কদাচ তিনি শকুন্তলাকে দেখেন নাই । তাই শকুন্তলার হৃদয়ের সকল অংশ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই ।

আশ্রম-পালিকা, মুখ-হৃদয়া শকুন্তলা এই ভাবে, বামহস্তে কপোল-বিজ্ঞাস-পূর্বক, কুটীর-দ্বারে, অন্তর্লীন-নয়না, স্পন্দহীনা, আলিখিতা প্রতীয়ার জায় উপবিষ্টা, পতিভ্যান-তন্ময়ী, বাহ্যজ্ঞানশূন্য । আর এ দিকে, দৈবহুর্কিপাকে, অতিথি-রূপী ‘মূলভ-কোপ,’ হুর্কাসা ঋষি উপস্থিত । তিনি আসিয়াই ঐ চিত্রোপ্তাবৎ স্পন্দ-রহিতা বালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন,—‘আমি অতিথি ।’ হৃদয়-গত-হৃদয়া শকুন্তলার কর্ণে হুর্কাসার সে নিখোঁয় প্রবেশ করিল না । অমনি হুর্কাসা, অতিথির অবজ্ঞা-দর্শনে ক্রোধাক্ত হইয়া বলিলেন, ‘আঃ ছরচাণি ! আমি অতিথি, তুই আমার অবমাননা করিলি ! তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, আজ আমার অবমাননা করিলি, আমার অভিযোগ,—তুই শত প্রকারে স্মরণ করাইয়া দিলেও, প্রমত্ত ব্যক্তির জ্ঞায় সে তোকে স্মরণ করিতে পারিবে না ।’

১—শকু, চতুর্ভুজের বিকৃতক । হুর্কাসা ।

২—আঃ অতিথি-পরিচয়বিধি !

৩—কিষ্কিন্ধ্যী বনবাস-মানসা তপোধনং বেৎসি ন বায়ুপহিতং ।

৪—পরিচয়বিধি আঃ ন স যোষিতোহপি সন্ কথং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃত্যবিধি ।

কোমল-প্রাণা শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার মস্তকে, এই-ভাবে অভিসম্পাতরূপ বজ্র-নিষ্ক্ষেপ করিয়া, দুর্কীসা ত্বরিতপদে নিজ্রাস্ত হইলেন । শকুন্তলা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না । তাঁহার শুভ শলাটপটে একটি কাল রেখার পাত হইল ।

মানুষের এমন এক একটা অবস্থা বা সময় আসে, যখন সে, লোক, লজ্জা, ভয়, সমাজ, সদাচার—সব ভুলিয়া যায় । আপনাকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয় । সে বিস্মৃতির ফল ভাল কি মন্দ, ভুল কি অক্ষয়, অমৃত কি গরল, তাহা মানুষ তখন বুঝিতে পারে না । বুঝিবার সামর্থ্যও তাহার তখন থাকে না । তরুণি যত ক্ষণ নিমগ্ন না হয়, ততক্ষণই তাহার বহন-যোগ্যতা, ততক্ষণই সে পারাপার করিতে সমর্থ, একবার নিমগ্ন হইলে, কোথায়—কতদূরে যে তাহার নিমজ্জনের শেষ, কতদূরে যে তাহার মৃত্তিকাস্পর্শ সম্ভাবনা, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে ? শকুন্তলা তরুণি নিমগ্ন হইয়াছে, কতদূরে তাহার আশ্রয় মিলিবে,—কে বলিবে ?

সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমাজের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ । পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফল, প্রভৃতি লইয়া যেমন একটি তরু, প্রত্যেক মানব, ছোট বড় সকলকে লইয়া তেমনই এই সমাজ । এটি বিশাল সমাজ-মহীকরের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া, মানব আয় নিরীকণ প্রাপ্ত হয় । সংসারের তাপ-যাতনা বিস্মৃত হয় । সমাজ অনাথের নাথ, অপুত্রকের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মেহমণ্ডি মাতার স্থানীয় । হিন্দু সমাজ এমন ভাবে গঠিত যে, ইহাতে কাহাকেও একাকী থাকিতে হয় না, আত্মীয়-শূত্র থাকিতে হয় না । ইহাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মীয় । ইষ্টকের উপর ইষ্টক, তাহার উপর ইষ্টক রাখিয়া যেমন অভ্রভেদী সৌধ প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক পরস্পরের সাহায্যে সংস্কৃত, আবার সকলের সাহায্যে, সকলের সমবায়ে

সৌধ, দণ্ডায়মান, ইষ্টকসমূহ খুলিয়া লইলে যেমন সৌধের সৌধস্থ ধ্বংস হয়, সেইরূপ, সকল মানুষ লইয়াই সমাজ । সমাজে প্রতিমানব পরস্পরের সাহায্যে সংস্কৃত, সমাজের ক্রোড়ে সুখে অবস্থিত । ঐ পরস্পরাপেক্ষিণী মানব-বাহিনীর সমবায়ের নামই সমাজ । ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু সমষ্টিভাবে আবার সকলেই সমাজের অধীন । সেই পরাধীনত্ব বা পরস্পরাপেক্ষিত্ব আছে বলিয়াই সমাজ সুখের সদন । যে সমাজে এই পরস্পরাপেক্ষিত্ব নাই, প্রত্যেকেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, পরের কথা যে সমাজের লোকে ভাবিতে জানে না, যে সমাজের সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান, সে সমাজে সুখ নাই, গ্রাহ্য উচ্ছৃঙ্খল না হইয়াই থাকিতে পারে না, তাহা মানব-সমাজ নহে, দানব-সমাজ । কেবল আত্মসুখের অন্বেষণে, তাদৃশ সমাজেই নিয়ত সুন্দ উপসুন্দের কলহ হয়, তারক-বৃত্র-প্রভৃত অসুরের উৎপত্তি হয় ।

সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে—সকল অবস্থাতেই তুমি সমাজের অধীন । কোন সময়ের কোন অবস্থাতেই তুমি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নহ । সমাজের নিকট তোমার অশেষ কর্তব্য । সমাজের মঙ্গলামঙ্গল, —সুতরাং বিপুল জন-সমষ্টির মঙ্গলামঙ্গল, তোমার উপর শ্রুত । তুমি শোকেই অন্ধীর হও, আর সুখেই উন্মত্ত হও, কখনও সমাজকে বিস্মৃত হইও না, হইলে চলিবে না । তাহাতে তোমারও অমঙ্গল, সমাজেরও অমঙ্গল । তোমার সুখ-সম্পদ সমাজের সুখ-সম্পদ হইতে স্বতন্ত্র নহে । তুমি যখন তোমার আত্ম-সুখকে সমাজ হইতে পৃথক করিয়া লইবে, কেবল নিজের সুখেরই স্বপ্ন দেখিবে, তখনই জানিও, তোমার পতন নিকটবর্তী । তোমার সুখ-যামিনী অবসিত-প্রায় ।

শকুন্তলা আপনার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, জগৎকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কথ, কথাশ্রম, আশ্রমতরু, আশ্রমবৃক্ষ প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়াছিলেন । তিনি নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের ভাবনা,

সমাজের অঙ্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন, সমাজের চির-সংস্কৃত
 গ্রন্থি শিথিল করিয়াছিলেন, সমাজের অঙ্কশায়িনী থাকিয়াও, তিনি
 জ্ঞাত-সারেই হউক, আর অজ্ঞাত-সারেই হউক, সমাজকে অবজ্ঞা
 করিয়াছিলেন। তিনি বহুজনমধ্যবাসিনী থাকিয়াও আপনাকে,
 তাঁহার ক্ষুদ্র নিজত্বকে, একাকী, অসহায়, অশ্র-নিরপেক্ষ করিয়া
 লইয়াছিলেন, তাই সমাজের কঠোর শাসন তাঁহার উপর পতিত
 হইল। তিনি একাকিনীই সে দণ্ড ভোগ করিলেন। সমাজের অশ্রু
 কেহ তাঁহার ছায়াস্পর্শও করিল না। তিনি যতই ব্যাকুলা হউন, যতই
 আত্ম-বিশ্বস্ত হউন, সমাজের নিকট তাঁহার যে কর্তব্য, তাহা তাঁহাকে
 পালন করিতে হইবেই হইবে। যদি তাহা না করেন, সমাজের তিনি
 ক্ষমার অযোগ্য। সমাজের কঠোর শাসনবজ্র তাঁহার মস্তকে পতিত
 হইবে। প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক, সে দণ্ডের পতন অনিবার্য।
 অতিথি-সেবা আশ্রমের প্রধান কর্তব্য, শকুন্তলা আপনার জন্ত অঙ্ক হইয়া
 সে কর্তব্য বিশ্বস্ত হইয়াছেন, তাই সমাজের কঠোর শাসনরূপী ছুরীসার
 নিঃশ্রম অভিসম্পাত বিশ্বস্তিনয়ী শকুন্তলার উপর নিপতিত হইল।
 শাসনের উদ্দেশ্য সংশোধন, ধ্বংস নহে, তাই ছুরীসার কোপে শকুন্তলা
 ভস্মীভূত হইলেন না। সে অভিশাপ অঙ্গুরীয়ক-দর্শনান্ত হইল
 একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত, সমাজরূপী নৃপতির দণ্ডাজ্ঞা হইল। যে
 মোহে শকুন্তলার এই আত্ম-বিশ্বস্তি, সে মোহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

মহাকবি, এই অভিশাপের সৃষ্টি-পূর্বক, একদিকে, মহাতারতের
 কামুক ছদ্মবেশের কামুকত্ব নিরাস করিলেন, মহাতারতের পার্থিব ছদ্মবেশকে,
 অপার্থিব এবং অমর করিলেন; প্রাচীন কীট-দষ্ট, দারুণয়ী, প্রতিমা-
 পরিবর্তে স্বর্ণপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন; নিখিল শারদ-কৌমুদী দ্বারা
 আবার সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া লইলেন; আর অশ্রু দিকে,
 কবি, সমাজ এবং সমাজ-বাসীর সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, সমাজ এবং

সামাজিক—পরম্পরের পরম্পরাপেক্ষিতা তথা অত্মোত্ত-কর্তব্যতার
 অলসী মূর্তি প্রদর্শন করিলেন। নির্মাণদক্ষতার প্রভাবে, কবি একই
 চিত্রপটে, এমন মূর্তি আঁকিলেন যে, দুই দিক হইতে দেখ, সেই একই
 মূর্তিতে দুইটি হৃদয় ছবি দেখিতে পাইবে। সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ইহা পরাকাষ্ঠা,
 কবিত্বের ইহা চরম উৎকর্ষ !

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

বিদায় ।

আজ শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের দিন । প্রবাস হইতে কণ্ঠ আসিয়া ছেন, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন, তাঁহার প্রীতির পরিসীমা নাই । একজন শিষ্যকে বলিয়া রাখিয়াছেন ‘অতি প্রভূষে উঠিও, সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে ।’ শিষ্য গুরুর আদেশমতে কুটারের বহির্দেশে আসিয়াই দেখিলেন—প্রভাত হইয়াছে । শিষ্যের সহসা চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন হইল । একদিকে রজনীপতির অন্তঃগমন, অত্রদিকে দিনপতির অভ্যুদয় দেখিতে দেখিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—‘হায় ! এই চন্দ্র-সূর্য্যের জায় মাঝবেরও ত উদয় এবং অস্ত, উন্নতি এবং অবপতন নিয়মিত ! ক্ষণকাল পূর্বে যিনি স্বকীয় অমৃত-পানীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই ওষধিপতি চন্দ্র ঐ একদিনে অস্ত গত প্রায়, আর সূর্য্যদেব ঐ অপর দিকে সমুদিত । চন্দ্রের অস্তপদের সময়, তাঁহার সঙ্গে আর কেহই নাই, তিনি একাকীই ভ্রমণ করেন । আর দিন-মণির এই অভ্যুদয়ের সময়, তাই তাঁহার আগমনের পূর্বেই, অরুণ অগ্রসর হইয়া, তাঁহার রাজ্যের ভিত্তির নাশ করিতেছেন ।’

‘ঐ দূরে শরী অন্তর্মিত, কুমুদিনীর আর এখন সে শোভা নাই, তাহা এখন স্মৃতির বিষয় হইয়াছে । মুহূর্ত্ত-পূর্বে, যে কুমুদিনী আনন্দ সাগরে নিমগ্ন ছিল, মুহূর্ত্তপরে, সেই কুমুদিনীরই এই দশা ! ইহা দেখিয়া মনে হয়, অবলাজাতির বাহিত-বিয়োগের চুঃখ বুঝি বা বড়ই ভয়ঙ্কর, বড়ই অসহ্য !’

শকুন্তলার পতিগৃহ-প্রস্থানান্তর আরও হইবার পূর্বেই, রজমঞ্চে কণ্ঠ-শিষ্যকে আনিয়া, চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তোদয় ও কুমুদিনীর অবসানের বর্ণনাজলে, কবি, দর্শকদিগের অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবনার সঞ্চার

করিলেন। উদয়ের পর অস্ত, হর্ষের পর বিষাদ,—ইহা বিধাতার অপরিবর্তনীয় নিয়ম ;—এ কথাটা শতশঃ বিদিত থাকিলেও দর্শকদিগকে আর একবার, ঐ সত্য মনে করাইয়া দিলেন। বাহ্লি-বিয়োগ-হঃখ, অবলাদের,—বাহাদের হৃদয়ের পতিচিন্তা, পতিখান ব্যতীত অন্য বস্তু নাই, সেই অবলাদের যে কি অসহ্য, কি কাতনা-প্রদ, তাহা কুমুদিনীর নিদর্শনে, দর্শকদিগকে অনেকটা বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। আর কিয়ৎকাল পরেই, শকুন্তলার প্রত্যাখান-সময়ে, যে হৃদয়-বিদারী শোকের,—যে ভয়ঙ্কর হঃখের অভিনয় হইবে, তজ্জন্ত, দর্শকদিগের হৃদয়-ক্ষেত্র, যেন কবি, এখন হইতেই প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই শিষ্য-বাক্য-শ্রবণে, দর্শকদিগের হৃদয়ে যে চিত্রের অম্পষ্ট ছায়া পতিত হইল, শকুন্তলার প্রত্যাখান সেই চিত্রেরই অম্পষ্ট মূর্তি।

আজ শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের দিন প্রিয়ংবদা আসিয়া অনন্থ্যাকে কহিলেন, অনন্থ্য! পরম আনন্দ হইল, কিন্তু শকুন্তলা আজই যাইবেন—ভাবিয়া, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। প্রিয়ংবদা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, ‘সখি! আমাদের উৎকর্ষার কথা আমি তত ভাবি না, আহা! দুঃখিনী শকুন্তলা ত নিরুত্তি লাভ করুক, তাহার কষ্ট আর দেখা যায় না’। ‘দুঃখান্ত চলিয়া যাওয়ার পর, শকুন্তলার অবস্থা যে কৌতূহলী শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা কবি এই প্রিয়ংবদা-বাক্যে প্রকাশ করিলেন।

• অনন্থ্য, প্রিয়ংবদাকে লইয়া শকুন্তলার শুভযাত্রার উপকরণ কুসুমাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শুভ লগ্ন উপস্থিত। শকুন্তলা যাত্রা

১—শকু, ৪র্থ অঙ্ক। অনন্থ্য। প্রিয়ংবদামান্নিবা। ‘সখি! প্রিয়ং যে, কিন্তু অদ্য

এব শকুন্তলা নীয়েতে, ইতি উৎকর্ষা-সাধারণঃ পরিতোষঃ অমুভবামি।’

প্রিয়ংবদা ‘সখি! আবার তাৎ উৎকর্ষাঃ বিনোদয়িষ্যামঃ, সা তপস্বিনী নিরুত্তা ভবতু।’ •

করিবেন । অপরূপ আশ্রম হইতে তাপসীগণ আসিয়া, গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করিলেন । সখীদ্বয় তাঁহার কত স্নহের বেশভূষা করিয়া দিলেন । সম্মুখে গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত দণ্ডায়মান, পার্শ্বে অননুয়া ও প্রিয়ংবদা, আর পশ্চাতে তাপসীগণ সকলেই বেন কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন । এমন সময়ে সজল-নয়ন কথ তথার উপস্থিত হইলেন । শকুন্তলা তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন । কথের কল্পিত কণ্ঠ হইতে আশীর্কচন উদ্গীরিত হইল । শকুন্তলা বাজা করিলেন, সঙ্গে গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত । তরুণিরে কোকিলগণ কুজন করিয়া উঠিল, গৌতমী বলিলেন, ‘বাছা ! বনদেবতার! তোমাকে বড়ই ভালবাসিতেন, ঐ শুন, তাঁহারা কোকিল-কুজন-চ্ছলে তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম কর ।’ শকুন্তলা প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অগ্রপূর্ণ-নয়নে ও কাতর-বচনে কহিলেন, ‘সখি ! অর্ঘ্যপুলকে দেখিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় একান্ত আকুল হইয়াছে সত্য, কিন্তু তপোবন ছাড়িতে হইবে—ভাবিয়া আমার পা উঠিতেছে না !’ তখন স্নান-মুখী প্রিয়ংবদা বলিলেন, ‘সখি ! তপোবনের বিরহে কেবল যে তুমিই কাতর হইতেছ—একুপ নহে, তোমার বিরহে আজ তপোবনেরও কি দশা ঘটয়াছে, একবার চাহিয়া দেখ,—ঐ দেখ, হরিণগণ আহার বিহারে পরাজুখ হইয়া—স্থির-নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া আছে, ঐ দেখ, তাহাদের মুখের গ্রাস মুখ হইতে পুড়িয়া বাইতেছে । ময়ূর-ময়ূরী, ঐ দেখ, নৃত্য ছাড়িয়া, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিয়াছে । কোকিলগণ আত্ম-মুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরবে বসিয়া আছে । স্রমর-স্রমরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও শুণ্ণ শুণ্ণ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে’ !,—শকুন্তলার চক্ষে জল আসিল । তিনি তাঁহার

—শকু, ৪র্থ, অঙ্ক । প্রিয়ংবদা । ‘ন কেবল তপোবন-বিরহ-কাতরা সখী এষা যদা উপস্থিত-বিরোগিত তপোবনত অপি তব সন্মুখা দৃশ্যতে ।’

সেই বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন—‘বনতোষিণি ! বনজ্যোৎস্নে ! তোমার শাখা-বাহুদ্বারা আজ একবার আমাকে স্নেহের সহিত আলিঙ্গন কর, আজ হইতে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম,’—শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন, এই দৃশ্বে তাঁহার সখীরাও কাঁদিল। শকুন্তলা সেই লতাটিকে কাঁদিতে কাঁদিতে ধরিয়া সখীদ্বয়কে কহিলেন—‘দেখ, তোমাদের হস্তে আমার এই বনতোষিণীকে সঁপিয়া গেলাম।’ শকুন্তলার হৃদয়ের প্রকৃত স্বরূপ এতক্ষণে প্রকাশিত হইল। সে হৃদয় যে স্নেহ-মমতার একমাত্র আধার, তাহা, তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতিবর্ণে, প্রতিপাদবিক্ষেপে প্রকাশ পাইল। কোথায় কোন্ হরিণী আসন্ন-প্রসবা, তাহার জন্ত শকুন্তলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বনের পশুগুলিও তাঁহার জন্ত কাঁদিয়া ফেলিল ! হরিণশিশু আসিয়া পায়ে পড়িয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। তখন কোমলপ্রাণা তপস্বি-দুহিতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাত কণ্ঠের দিকে চাহিলেন। সমীপে সরোবরে নলিনী-পত্রের অন্তরালে, চক্রবাক লুকাইয়া আছে, তাহাকে না দেখিয়া, চক্রবাকী করুণ-কণ্ঠে ডাকিতেছে,—শকুন্তলার সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। চক্রবাকী ক্ষণকালমাত্র প্রিয়তমের অদর্শনে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছে, আর তিনি এই দীর্ঘকাল প্রিয়-বিরহিতা, তরুণ বাঁচিয়া আছেন ! তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল।

কণ্ঠ যখন বলিলেন, ‘বৎসে ! আমাকে এবং তোমার সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন কর’—তখন শকুন্তলার চমক ভাঙিল। তিনি এতদিন পরে আজ বুঝিলেন যে, তাঁহার গম্ভব্য স্থান এক, আর সখীরা অত্র পথের যাত্রী। তখন তিনি, পিতার ক্রোড়ের মধ্যে বাইয়া সজলনয়নে ও গদগদবচনে কহিলেন, ‘তাত ! আপনাকে না দেখিয়া আমি কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব ?’ ছুই চক্ষের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃ প্রাণিত হইল। তিনি পরশু-নিকৃতা শালযষ্টির দ্বারা, কণ্ঠের পাদমূলে পতিত হইলেন। ক্রমে, সখীদের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন, তিন সখীতে যুক্তকণ্ঠে

শ্রোদন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল পরে, হৃদয়ের কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন ‘সখি ! যদি রাজা সত্ত্বর তোমাকে চিনিতে না পারেন, তবে, তাঁহাকে তাঁহার নামাক্রান্ত এই অঙ্গুরীয়কটি দেখাইও ।’ সখীদের কথা শুনিয়া, শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিল । তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে, একটা উত্তুঙ্গ তরঙ্গ উঠিয়া, সমগ্র হৃদয়-খানিকে যেন একটা প্রবল আঘাত করিয়া গেল । সখীরা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন । তিনি কথকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘পিতঃ ! আবার কবে আমি এ আশ্রম দেখিতে পাইব ?’—সজল-নেত্র কথ কহিলেন ‘মা !—

ভূত্বা চিরায় চতুরস্তু-মহৌ-সপত্নী

দৌষ্যস্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য ।

ভত্রী তদর্পিত-কুটুম্ব-ভরেণ সার্কিং

শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেহস্মিন্ ॥

শকুন্তলা আবার কথকে আলিঙ্গন করিলেন, কথও আবার আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন । দেখিতে দেখিতে, শিষ্যদ্বয় ও গৌতমীর সহিত শকুন্তলা অনেক দূর চলিয়া গেলেন । ক্রমে শ্রানল বনরাজি তাঁহাকে চাকিয়া ফেলিল । সখীরা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল । দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন করিয়া, গৃহস্থ যেমন সজল নয়নে ও শূন্য হৃদয়ে, শূন্য-মন্দিরে প্রবেশ করে, তজপ, অননুয়া-প্রিয়ংবদাও শূন্যহৃদয়ে, শূন্য-তপোবনে কথের সহিত প্রবেশ করিলেন ।

শকুন্তলা আশ্রম বাসিনী ছিলেন, চিত্তসংযম যে স্থানের প্রধান ব্রত, সেইস্থানে তাঁহার বাস ছিল । অননুয়া-প্রিয়ংবদার আকার-প্রকার-দর্শনে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কথের কোনই চিন্তা ছিল না । কিন্তু বালাবধি শকুন্তলার

‘চতুরস্তুমহৌসপত্নী’ অর্থপ্রতিরথ পুত্রকে ভারতের সিংহাসনে নিরূপিত করিয়া, স্বামীর সহিত, পুনরায় এই আশ্রমে অধিগত ।

মুখ্যভাবে দেখিয়া, কণ বুঝিয়াছিলেন যে, আমার এ মেয়ে আশ্রমের কঠোরতা বুঝি সহ্য করিতে পারিবে না। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন, অল্পরূপ ধর পাঠলেই শকুন্তলাকে সম্প্রদান করিবেন। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, অথচ বরের সন্ধান নাই, তাই ঋষি, কথার দুর্দৈব-শাস্তির জ্ঞাতীর্ণে গমন করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহার যে আশঙ্কা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে! তখন মনস্বী মহর্ষি স্থির করিলেন, ‘আর শকুন্তলাকে আশ্রমে রাখা সঙ্গত নহে।’ তিনি শকুন্তলাকে বিদায় দিলেন। তাঁহার ক্রোধের কোন কারণ ছিল না, তিনি ক্রোধ করেনও নাই। শকুন্তলা ক্ষত্রিয়-কন্যা, দুষ্যন্তও ক্ষত্রিয়-প্রধান। কণ বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন! তবে এ প্রকার সম্মিলনের পরিণাম যে বড় সুখজনক নহে, এইরূপ অজ্ঞাত হৃদয়ের বিনিময় যে বড় ভূভোদর্ক নহে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই দুইজন ব্যবহারজ্ঞ শিষ্য ও ভগিনী গৌতমীকে শকুন্তলার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুষ্যন্তকে কি কি বলিতে হইবে, কোন্ কোন্ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। শিষ্যগণ শকুন্তলাকে লইয়া বিদায় হইলেন, মহর্ষি কণও যেন পুনর্জীবন-লাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভার লঘু হইল। স্নেহের প্রভাবে, তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইল বটে, কিন্তু তিনি মনস্বী, মনের উপর তাঁহার প্রবল আধিপত্য, তিনি কর্তব্যের দিকে চাহিয়া সে কষ্ট সহ্য করিলেন।

১—শকু, ঋষি-অঙ্ক, কণ।

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব, তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ

জাতো বনায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রতাপিত-শ্রাস ইবাস্তরাস্মা ।

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

অপরিচিতা ।

শাঙ্গ'রব, শারদ্বত ও গৌতমীর সহিত, শকুন্তলা, কত আশার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হস্তিনাপুত্রে উপনীত হইলেন। সেই মালিনীতীর, সেই উদ্যান, সেই অনশ্রুয়া, প্রিয়ংবদা, বনজ্যোৎস্না, সেই ময়ূর-ময়ূরী, শৃগ-মিথুন, চক্রবাক-চক্রবাকী, আর সেই দয়ার 'নাগর তাত কাঞ্চন— এই সমস্ত, কখনো একে একে, কখনো বা যুগপৎ, শকুন্তলার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া, যেমন মুগ্ধা তাপস-হুহিতাকে বিমনায়মানা করিতেছিল, অমনি কুহকিনী আশা কত ঐক্সজালিক ছবি দেখাইয়া, তাঁহাকে সাশ্বনা করিতেছিল। অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া মায়াবিনী আশা, তাঁহাকে কত সুখের স্বপ্ন দেখাইতেছিল! শকুন্তলা সেই অলীক স্বপ্ন বাস্তববস্তবৎ দেখিতে দেখিতে, তাঁহার কল্পিত-স্বর্গ হস্তিনাপুরে, ছায়াস্তের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাসেতর নয়ন ঘন ঘন বিস্মুরিত হইতে লাগিল। রাজা, সেই অকস্মাদুপনতা, 'অবগুণ্ঠনবতী,' 'নাতিপরিষ্কট-শরীর-লাবণ্যা,' পুরোবর্তিনী ললনার দিকে একবার চাহিতে বাইতেছিলেন, কিন্তু দৃষ্টিসংঘম করিয়া লইলেন। প্রতিহারী কহিল 'কি স্নানর আকৃতি? ইনি কে মহারাজ?' রাজা অমনি নয়ন পরাবৃত্ত করিয়া রুষ্ঠস্বরে কহিলেন 'হউক স্নানরী, পরজ্ঞী-দর্শন অসঙ্গত!' শকুন্তলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি মনে মনে কহিলেন, 'হৃদয়! কেন কাঁপিতেছ? আর্ধ্যপুত্রের সেই সব ভাব কি তুমি ইহারই মধ্যে বিস্মৃত হইলে? স্থির হও।'

ক্রমে রাজা ও শিষ্যগণের স্বাগত-জিজ্ঞাসা শেষ হইলে, শাঙ্গ'রব বলিলেন 'রাজন। আমাদের গুরুদেবের প্রেরিত সংবাদ শ্রবণ করুন,— তিনি বলিয়াছেন, আপনি আমার অজ্ঞাতসারে মদীর হুহিতা, শকুন্তলার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, আমি সন্তোষ সহকারে তাহা অমুমোদন

করিলাম। আমার কণ্ঠা এক্ষণে আপন্ন-সত্তা, আপনি ইহাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করুন।’ বর্ষীয়সী গৌতমী कहিলেন, ‘মহারাজ! আমারও কিছু বলিবার ঝুঁকি ছিল, কিন্তু কি বলিব? শকুন্তলা গুরুজনের কোনই অপেক্ষা রাখে নাই। আর তুমিও শকুন্তলার বন্ধুবান্ধবকে কোন কণ্ঠা জিজ্ঞাসা কর নাই। সুতরাং তোমরা দুইজনে, দুইজনের মতামুসারে যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে অপরের আর কি বক্তব্য আছে?’

শকুন্তলা শক্তিত-হৃদয়ে কাণ পাতিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আৰ্য্যপুত্র এখন কি বলেন! দুর্কীসার শাপ-প্রভাবে রাজা শকুন্তলা-গত তাবৎ বৃত্তান্তই একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার কিছুই মনে পড়িল না। তিনি সমস্ত অস্বীকার করিলেন। শকুন্তলার সেই বামেতর নয়ন-স্পন্দন সফল হইল। ক্রমে, শাক্ত-রব, শারদ্বত, গৌতমী এবং রাজায় অনেক কথোপকথন হইল। রাজা স্পষ্টতঃ বলিলেন, ‘তাপসগণ! আমি যে এই রমণীকে কোন দিন গ্রহণ করিয়াছি, ইহা ত কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না, সুতরাং আমি কি করিয়া, এই ‘অভিব্যক্ত-সত্ত্ব-লক্ষণা’ রমণীর পরিগ্রহ করিব?’ এতক্ষণ শকুন্তলা, বার্তাহত-কদলীর স্তায়, কম্পিতদেহে, ইঁহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, যখন রাজার প্রীতি জন্মাইবার জন্ত, গৌতমী, আনত-বদনা সজল-নয়না শকুন্তলার অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়াছিলেন, তখনও শকুন্তলার চিত্তে কথঞ্চিৎ দৈর্ঘ্য ছিল, কেন না, তখনও আশা ছিল যে, তাঁহার আৰ্য্য-পুত্রের হস্ত ভ্রাস্তি ঘটিয়াছে, অচিরেই তাহা অপনোদিত হইবে; কিন্তু এক্ষণে রাজার এই কথার পর, অভাগিনীর হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল, শরীর অবসন্ন হইল, তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন। ‘হায়! পরিণয়ে পর্য্যন্ত সংশয়! কোবার আমার সে হুঁশা? আমি হস্তিনাপুরে আসিয়া আমার দ্বিরধ্যাত দেবতার চরণে স্থান পাইব, আমার এই দীর্ঘ যাতনার সন্ধান হইবে, আমার হৃদয়ের শত বৃত্তিক-দংশন প্রশমিত হইবে!

কোথায় আমার এই সকল ছায়াশা ?’—ভাবিতে ভাবিতে, শকুন্তলা মস্ত-বিমূঢ়ার ছায়, হত-চৈতন্যার ছায়, বজ্রাহতার ছায়, চিত্রাৰ্পিতার ছায়, নিষ্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন । প্রবল ঝটিকার পূৰ্বক্ষণে প্রকৃতির যে গভীর অবস্থা, অগ্ন্যুদগমের পূৰ্বে পৰ্ব্বতবক্ষের যে অবস্থা, প্রজলিত হইবার পূৰ্বে ধূমায়মান অনলকুণ্ডের যে অবস্থা, শকুন্তলা তদবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন । এমন সময়ে শারদ্য, শব্দঘনবৎ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—‘শকুন্তলে ! আমাদের যাহা বক্তব্য, বলিয়াছি, রাজারও প্রত্যুত্তর শুনিবে, এখন তোনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, বলিতে পার ।’

শকুন্তলা রাজার অগোচরে কহিলেন, ‘তাদৃশ অসৌম্য অমুরাগের যখন এই পরিণাম, তখন আর বলিব কি ? তবে রাজার সংশয়ে আমার সৰ্বনাশ, আমার অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, আমি ব্যভিচারিণী-রূপে প্রমাণিত হইতে যাইতেছি, সুতরাং এক্ষণে, যে ভাবেই হউক, আমার যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হইবে, আত্ম-শুদ্ধির প্রমাণ করিতে হইবে ।’ ভগ্নহৃদয়া তখন ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—‘আর্য্যপুত্র !’—‘আর্য্যপুত্র’ বলিয়াই শকুন্তলার চমক ভাঙিল । মনে পড়িল যে, এখন আর সে দিন নাই, এস্থান সেই মালিনীতীরবর্তী তপোবন নহে,—ইহা হস্তিনাপুর, আর ইনিও সেই মৃগয়াবশী অতিথি নহেন,—ইনি ভারত-সম্রাট, এখন পরিণয়ে পর্য্যন্ত সন্দেহ, সুতরাং ওরূপ সম্বোধন আর শোভা পায় না । এই ভাবিয়া অতি কষ্টে হৃদয়-বেগ নিরুদ্ধ করিয়া বলিলেন—‘পৌরব ! সেই জনহীন আশ্রমে, সেই শতবার শপথ-পূৰ্ব্বক, এই প্রকৃতি-সরলা তপস্বী-কন্তাকে প্রতারিত করিয়া, এইক্ষণে, এইরূপ পক্ষযব্যক্যে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হওয়া আপনার ছায় নৃপতির কর্তব্যই বটে । যদি আমার মুখের কথায় আপনার প্রত্যয় না জন্মে, তবে আমি আপনাকে উপযুক্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিতেছি’—বলিয়াই শকুন্তলা আপন অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক মোচন করিতে গেলেন । কিন্তু কোথায় সে অঙ্গুরীয়ক !

শকুন্তলা ‘হা পিক্! হা পিক্!’ বলিয়া বিষম বদনে ও কাতর-নয়নে গৌতমীর দিকে চাহিলেন ।

আম্বিয়ার কালে, এই অঙ্গুরীয়কের কথাই সখীরা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল । ইহার আবশ্যকতা যে কত, তাহা তাহারা জানিত, শকুন্তলা জানিতেন না । তবে তাহারা শকুন্তলাকে জানাইয়াছিল সত্য, কিন্তু শকুন্তলা তাহা বুঝেন নাট । বুঝিলে, সে অঙ্গুরীয়ক অঙ্গুলী-চ্যুত হইত না । বুঝিলে, অঙ্গুরীয়ক থাকিত বটে, কিন্তু শকুন্তলার চরিত্র-ক্ষতি হইত । আমার প্রণয় অভিজ্ঞান সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া যে ব্যক্তি, সেই অভিজ্ঞানের রক্ষা কবে, এবং তাহারই সাফল্য প্রণয়ের নৌকন্দনায় ডিক্রী পাইতে চায়, তাদৃশ প্রণয়ী, কবির তথা কবিতা-রসামোদীর করুণার পাত্র । কালিদাস অত্ন কেহ নহেন, তিনি ‘কালিদাস’, সুতরাং তাহার কল্পিত প্রণয়ে, ওরূপ অভিজ্ঞান-রক্ষা-প্রযুক্তি কদাচ বর্ণিত হইতে পারে না ।

গৌতমী কহিলেন, ‘শত্রুভোগে অবগাহনকালে তাহা নিশ্চয়ই স্থলিত হইয়াছে ।’ অননি রাজা দ্ব্যস্ত সন্মিতবদনে বলিলেন, ‘লোকে স্ত্রী-জাতির যে প্রভাৎপন্ননতির শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকে, ইহা সেই প্রভাৎপন্ননতিই ! অন্য জাতির ইহা নাই ।’ তখন শকুন্তলা আরও কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করিলেন । রাজা স্থির-ভাবে সমস্ত শ্রবণ পূর্বক ঐবৎ হস্ত করিয়া কহিলেন, ‘কামিনীগণ এই প্রকার মধুমাখা কথা বীরগণ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া, আত্ম-কার্য্যাসিদ্ধি করিয়া লয় ।’ আজন্ম-শুদ্ধা মুখা শকুন্তলার প্রতি রাজার এই কটুক্তিবর্ষণে গৌতমীর প্রাণে বড়ই বাথা লাগিল । তিনি কহিলেন ‘রাজনু! শকুন্তলা জন্মাবধি আশ্রমে প্রতিপালিতা, প্রবঞ্চনার লেশও সে জানে না ।’ তচ্ছবণে, সমস্ত স্ত্রীজাতিকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা আরও কতকগুলি কটুক্তি করিলেন । রক্ষী জাতির স্বভাবের উপর কটাক্ষ করায়, সাধবী তপস্বি-দুহিতার

বৈধব্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রোষ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, ‘অনার্থ্য ! তুমি নিজের হৃদয়ানুসারে জগৎ দেখিতে চাও ? তুণীচ্ছন্ন কুপের ত্রায় ধন্য-কঙ্কুকে তুমি বহিরাবৃত্ত, তোমার অন্তরে প্রবঞ্চনা ! তোমার যে আচরণ, তাহাতে অল্প কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ‘নারীজাতিকে তোমার নিজের মত ভাব ?’ ইহা তোমার বিষম ভ্রম !’ পদদলিতা ফণিনীর ত্রায় শকুন্তলার গর্জনে, সমুখবর্তী ভারতেশ্বরেরও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন—‘তাইত, এ কোপ ত কৃত্রিম নহে, এ যে সতী রমণীর কোপ, তবে কি এই রমণী বথার্থই আমার পরিণীত-পূৰ্ব্বা ?’ শকুন্তলা মর্শাস্তিক-বেদনাভরে স্থলিত-কণ্ঠে আবার বলিলেন ‘তুমি আমার ব্যভিচারিণী প্রতিপন্ন করিলে ? তুমি পুরুবংশীয় নৃপতি, আমি তোমার ওকথায় বিশ্বাস করিয়া, তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম না যে, তোমার মুখে মধু আর হৃদয়ে কালকূট !’ বলিতে বলিতে, অঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া, হতভাগিনী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শার্ঙ্গরবের আর সহ হইল না। তিনি সক্রোধে শার্ঙ্গধনিবৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—‘পূৰ্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া, কার্য্য করিলে, তাহার পরিণাম এইরূপ হয়। এই নিমিত্তই সমস্ত কার্য্য, বিশেষতঃ যাহা নিৰ্জ্জনে করা যায়, বিশেষভাবে পরীক্ষা-করিয়া করাই কর্তব্য। ‘অজ্ঞাত-হৃদয়ে’ বদ্ধতা স্থাপন করিলে, তাহা এই প্রকার শত্রুতায় পরিণত হয় *।

শার্ঙ্গরব যথার্থই বলিয়াছেন। বদ্ধতা, বিশেষতঃ পরিণয়, ঠেল কদাচ গোপনে করণীয় নহে। পরিণয় যে কেবল দম্পতিরই সুখের কারণ, তাহা নহে; সমাজেরও অশেষ সুখ, অশেষ মঙ্গল, ব্যক্তিগত

*—শঙ্কর, ৫ম অঙ্ক। শার্ঙ্গরব। ইদমাস্ত্রকৃত্যং পরিহৃতং চাপলং দহতি।

অতঃ পরীক্ষা কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতঃ রহঃ।

অজ্ঞাত-হৃদয়েষেবং বৈরীভবতি সৌহারদ্যং।

দাম্পত্য-সুখের উপর নিহিত, দাম্পত্য-মঙ্গলের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। পরিণয় মানব-জীবনের একটি প্রধান সংস্কার, সমাজের হিতজনক কার্য। যাঁহা সমাজের হিতজনক, যাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের ফলভোগ শেষে সমাজকেই করিতে হইবে, তাঁহা, তুমি একাকী, নির্জনে, অপ্রবুদ্ধভাবে করিবার, কে ? তুমি বিস্মৃত হইও না যে, তুমি স্বতন্ত্র হইয়াও কিন্তু সমাজ হইতে সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্র। তুমি সমাজেরই অগ্রতম অঙ্গ। সুতরাং যাঁহাতে সমাজের অঙ্গহানি ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কার্য তোমার করা উচিত নহে। করিতে পার না। লোকতঃ ধর্মতঃ পার না। তোমার নিজের মঙ্গলামঙ্গল তুমি স্বয়ং যতটা বুঝিবে, তোমার উপর যাঁহারা স্নেহ-শীল, তোমার সুখে যাঁহাদের সুখ, তোমার দুঃখে যাঁহাদের দুঃখ, তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক অধিক বুঝিতে পারেন; সুতরাং তুমি নিজের জন্ত, নিজেই অত উদ্বিগ্ন হইও না। উহাতে সফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক।

শারদ্বত বলিলেন ‘রাজন্! শকুন্তলা আপনার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন, না হয় পরিত্যাগ করুন’। আমরা চলিলাম। গৌতমি! আগে আগে চলুন।’ ‘ধূর্ত কর্তৃক আমি প্রবঞ্চিত হইলাম, তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া চলিলে?’ বলিয়াই রোদুদ্যমানা শকুন্তলা উঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তখন অনুগামিনী শকুন্তলার দিকে চাহিয়া, কোপাক্রণলোচন শাঙ্গীরব কহিলেন—‘শকুন্তলে! তুমি এখনও স্নেহাচার করিতে চাও? ঐতকাণ্ডেও তোমার শিক্ষা হইল না? তুমি জান না যে, রাজার কথা যদি সত্য হয়, তবে কুলটা তুমি, পিতার গৃহে তোমার স্থান হইতে পারে না। আর যদি তোমার আত্ম-পবিত্রতায় সন্দেহের কিছু না থাকে,

—শকু. সে অসম্ভব। শারদ্বত। ‘রাজন্!—

‘তদেবা ভবতঃ পত্নী তাজ্জীবনং গৃহাণ বা।

উপযুক্তি দাঁড়ই প্রভূতা বিশ্বতোমুখী।

‘আপন চরিত্রে যদি তোমার আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে পত্নীগৃহে দাসীবৃত্তিও তোমার পক্ষে শ্লাঘ্য ! তুমি থাক, আমরা চলিলাম’ ।

তীতা শকুন্তলা খর খর কাঁপিতে লাগিলেন । ছ্যাস্তের সহিত তাঁহার যে পরিণয়, কথাশ্রমের একটি প্রাণীও তাহা জানিতে পায় নাই । তাহারই ফলে, আজ শার্ঙ্গব, ‘রাজার কুখা যদি সত্য হয়’—এই বাগবজ্র-নিষ্ক্ষেপের অবসর পাইলেন । পরিণয় একটা প্রণাম বন্ধন । সে বন্ধনের কোন স্থলে, যদি কোনও ত্রুটি থাকে, তবে আজ হউক, কাল হউক বা দশ বৎসর পরে হউক, সে বন্ধনের দৃঢ়তার ভ্রাস হইবে । গ্রস্থি শিথিল হইবে ।

তাপসগণ চলিয়া গেলেন । নিরাশ্রয়া শকুন্তলা, ‘বসুধে ! আমার স্থান দাও’ বলিয়া, কাদিতে কাদিতে প্রবীণ ছ্যাস্ত-পুরোহিতের নির্দেশক্রমে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ।

শকুন্তলা গহনবনে একাকিনী আশ্রয়িত হইয়া, গুরুজনের পর্য্যস্ত অপেক্ষা না করিয়া ‘অবিজ্ঞাত-হৃদয়ে’ আশ্রয়দান করিয়াছিলেন । ক্ষুদ্র আপনার জন্ত বিরাট বিশ্বকে বিশ্বত হইয়াছিলেন, তাই আজ, তাঁহার এই ছুঃখের দিনে আর কেহই আসিল না । যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও ফেলিয়া চলিয়া গেল । ভারবাহী যেমন মস্তকের ভার অবতীর্ণ করিয়া আপনাকে লবু বোধ করে, তদ্রূপ তাহারাও যেন তাহার অব, অবতীর্ণ করিয়া পরিভ্রাণ পাইল । শকুন্তলার সুখের সময়েও তিনি একাকিনী ছিলেন । তাঁহার সুখ দেখিলে যাহাদের সুখ, তাঁহাদিগকে পর্য্যস্ত তিনি সুখী হইতে দেন নাই । আজ ছুঃখের সময়েও, তিনি একাকিনীই সমস্ত ছুঃখটা ভোগ করিলেন । একটি সমবেদনার কথা বলে, এমন একজন লোকও তাঁহার নিকট আসিল না । যাহারা বা আসিল,

১—শকু, ৫৯ অঃ । শার্ঙ্গব । শকুন্তলে ।—

যদি বখা বদতি ক্রিতিপন্থাঃ হবসি কিং পিতৃকুললয়া ভয়া ।

অথ তু বেৎসি শুচিত্তবান্ধনঃ পত্নীগৃহে তব দাস্যমপি ক্রমঃ ।

তাহারা সত্য-প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল, বলিল, 'এরূপ ব্যাপারের পরিণাম এই প্রকারই হইয়া থাকে।' অভাগিনী শকুন্তলার ক্রন্দন বাতীত আর গতি রহিল না। সেট বনতোষিণী-মূলের অমুরাগের—সেই মালিনী-তটবৃত্ত মহাযজ্ঞের পরিণাম যে এই প্রকার হইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন না। ব্রহ্মাণ্ডের তিনি কিছুই চিনিতেন না। তাঁহার কিছুই ছিল না। কেবল সম্বলের মধ্যে ছিল, তাঁহার একখানি অগাধ প্রেমায় হৃদয়। সেখানিও তিনি পূর্বেই দান করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন তাঁহার কোন সম্বলই নাই। মহর্ষি কণ্ঠের আদরের কণ্ঠা নিরাশ্রয়ে নিঃসম্বলে কোথায় চলিয়া গেলেন !

ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

সতীত্বের জয় ।

শকুন্তলার আর কোন সংবাদ নাই । তিনি কোথায় গেলেন, কে তাঁহাকে আশ্রয় দিল,—কেহই কিছু জানে না । যখন শাক্ত-রব-শারদ্বত-গৌতমী চলিয়া গেলেন, বোরদ্যমানা কথহুহিতা ছ্যাস্ত-পুরোহিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, সেই সময়ে, ঈশাৎ স্বর্গ হইতে এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আসিয়া, তাঁহাকে উপরে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে । সে যে কে, কাহার মূর্তি, কোথায় তাহার স্থান, কোন্ জগতে তাহার বাস,—কেহই জানে না । অমন অসামান্য রূপ, অমর-দুর্লভ গুণ, অল্পম হৃদয় ধীর, তাঁহার যে এই পরিণতি, ইহা ভাবিয়া সামাজিকগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিবার সম্ভাবনা । চঞ্চল-চিত্তে রসোৎপত্তি অসম্ভব । তাই কবি, শকুন্তলা-সংবাদোৎসুক সামাজিকদিগকে শকুন্তলার একটু সংবাদ দিলেন । শাপ-ব্যবহিত-স্মৃতি ছ্যাস্তের সমীপে ছায়াময়ী সান্নমতীকে পাঠাইয়া, কবি জানাইলেন যে, শকুন্তলা মরেন নাই, সে অমরী মূর্তির,—সে মানবী দেবীর একেবারে তিরোধান হয় নাই । তিনি এখনও জীবিত আছেন । এখনও ছ্যাস্তের উদ্দেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিনপাত করিতেছেন ।

ধীবরানীত অঙ্গুরীয়ক দর্শনের পর, শাপ-মুক্ত-স্মৃতি হইয়া, রাজা শকুন্তলার জন্ত আবার উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন । আর ‘তিরঙ্করিণী-প্রতিচ্ছিন্না’ ছায়াময়ী অঙ্গুরী সান্নমতী, রাজার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সমস্ত কার্যাবলী দেখিতেছে । শকুন্তলার জন্ত রাজার আকুলতা, উন্মাদ প্রভৃতি দেখিয়া দেখিয়া, সে মনে মনে শকুন্তলার সৌভাগ্যের কত প্রশংসা করিতেছে । সে মেনকার সখী, মেনকা শকুন্তলার মাতা । সুতরাং শকুন্তলা তাহারও এক প্রকার ‘শরীরভূতা ।’ শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজা ঈর্ষে আছেন, না হুর্ষে আছেন, তাহা দেখিবার ক্ষমতা সান্নমতীর আগম ।

সে যদি বুঝিতে পারে যে, রাজার পশ্চাত্তাপ জন্মিয়াছে, শকুন্তলার কথা^১ রাজার মনে পড়িয়াছে, রাজা শকুন্তলা-প্রাপ্তির জন্ত একান্ত উৎসুক, তাহা হইলে, সে, এই সকল বৃত্তান্ত, যাইয়া সেই হুঃখিনী সতীর সকাশে বর্ণন করিবে। তাহাতে হয় ত শকুন্তলার প্রজলিত হৃদয়ানলের কিয়ৎপরিমাণেও উপশম হইবে। কবি এই সানুভূতী সৃষ্টি করিয়া, এই ভাবে দর্শকদিগের কোতূহল চরিতার্থ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে বিবাদিনী শকুন্তলার আশ্বাসেরও কথঞ্চিৎ উপায় করিলেন।

একদিন কুঞ্চুকী, দূর হইতে, অনুতাপ-বিমনা বিরহ-ক্ষাম রাজার দিকে চাহিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছিলেন—‘আহা! এমন উৎকর্ষার মধ্যেও রাজা কি প্রিয়দর্শন! এখন আর ইঁহার পূর্বের তায় বেশ ভূষা নাই, দেহ এত ক্ষীণ হইয়াছে, যে, দক্ষিণ হস্তের কাঞ্চন-বলয় কোথায় খুলিয়া পড়িয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহেন; নিয়ত উষ্ণ-শ্বাস-নির্গমে অধর রক্তাভ হইয়াছে, চিস্তিত-হৃদয়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটান বলিয়া, নয়নের গ্লানি যেন লাগিয়াই রহিয়াছে। দেহ শীর্ণ, তবুও কিন্তু শরীর-প্রভায়,—মনে হয়, যেন পূর্ববৎই আছেন।’^২ সানুভূতী কুঞ্চুকীর এ কথা শুনি, শুনিয়া একবার স্থিরনয়নে রাজার দিকে চাহিল, তাহার অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল। সে বলিল, ‘সার্থক শকুন্তলার ক্লেশ। ইনি প্রত্যাখ্যান করিলেও শকুন্তলা যে ইঁহারই জন্ত অত ক্লেশ, অত হুঃখ সহ্য করিতেছে, দিন রাত্রি, ইঁহার ভাবনায় উন্মাদিনী হইয়া রহিয়াছে,—সে সব একরূপ প্রণয়ের অনুরূপই বটে! শকুন্তলা ধন্ত!’

১—শকু, ৬ষ্ঠ, অঙ্ক, কুঞ্চুকী—

‘প্রত্যাদিষ্ট-বিশেষ-সমুদয়বিধিবান-প্রকোষ্ঠার্চিতম্,

বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।

চিস্তা-জাগরণ-প্রতাপ্ত-নয়নস্তেজোঃগাদাশ্রয়ঃ

সংস্কারোন্মিথিতো মহামণিরিব ক্ষীণোহপি নালঙ্কতে!!

এই স্থানে কালিদাস, সাহুমতীর মুখ দিয়া, শকুন্তলার সংবাদ এবং শকুন্তলার দেবহৃদয় হৃদয়ের সংবাদ প্রদান করিলেন । একদিন, এইরূপ দেবীহৃদয়ের পরিচয়, কালিদাসের রঘুবংশে সীতা-চরিত্রে পাইয়াছি । নির্বাসিতা সীতার সেই—

ভূয়ো যথা মে জননাস্তুরেহপি

স্বমেব ভর্তা, নচ বিপ্রযোগঃ^{২৮} ।

অলৌকিক উক্তি শুনিয়া ছিলাম । আর আজ, সাহুমতীর মুখে প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার কথা শুনিলাম । হৃষ্যস্তোঃ জন্তু, তাঁহার যে কত ক্লেশ, তাহার আভাস পাইলাম । আসিবার কালে, কণ্ব বলিয়া দিয়াছিলেন যে, শকুন্তলে ! যদি পতি-কর্তৃক শতবিড়ম্বনাও প্রাপ্ত হও, তবুও কদাচ তাঁহার বিরুদ্ধচারিণী হইও না । পিতার এই আদেশ, পিতার এই শুভকামনা, দৈব-শক্তির আয়, কন্তার হৃদয়ে বর্তমান রহিয়াছে । রাজা ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে, মন্দ মন্দ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন বলিতে লাগিলেন, ‘হায় ! আমার হত-হৃদয় সেই তখন, যুগলোচনা শকুন্তলা কর্তৃক বার বার প্রতিবেদিত হইয়াও যেন নিদ্রিত ছিল, কিছুতেই বুঝিতে পারে নাট, আর এখন, পশ্চাত্তাপ-জনিত হৃৎথ ভোগের জন্তই বুঝি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছে ! একে একে, সেই সব বিশ্বস্ত ঘটনাবলী ননে পড়িতেছে, কিন্তু আজ কোথায় শকুন্তলা ?’—তখন রাজার এই কথা শ্রবণে সাহুমতী বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা, কেন শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাট; কেন বার বার স্মরণ করাইয়া দিলেও স্মরণ করিতে পারেন নাট । সাহুমতী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক কহিলেন, ‘আহ ! হতভাগিনী শকুন্তলার কি দুরদৃষ্ট !’

শকুন্তলার সেই প্রস্থানোদ্যত কণ্বশিষ্যের অমুগমনচিকীর্ষা, তাঁহাদের তিরস্কার, হৃৎখিনী শকুন্তলার অশ্রুবর্ষণ, রাজাকে আত্ম-পরিচয় দিবার

সময়ে বিবাদিনীর সেই মলিন ও আশঙ্কাপূর্ণ মুখচ্ছবি, সজলনয়নে রাজার প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত—প্রভৃতি সব একে একে রাজার মনে জাগিতে লাগিল। রাজা একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজার ব্যাকুলতা যত বাড়িতে লাগিল, ছায়ানয়ী সাধুমতীর আনন্দও তত বৃদ্ধি পাইল। তিনি বৃত্তিতে পারিলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয়-উচ্ছ্বসিত রূপিণী শকুন্তলা, সত মতাই উপেক্ষিত নহে, একান্ত অপেক্ষিত। সাধুমতী ভাবিতে ছিলেন—‘এমন অগাধ প্রণয়ের বিশ্বৃতিই বিশ্বয়ের কারণ, স্বৃতিতে বিশ্বয় নাই।’ তখন নিজের অপভ্রুকতার বিনয় চিন্তা করিতে করিতে, রাজা মোহ-প্রাপ্ত হইলেন, তখন ছায়ানয়ী অপরাহ্ন আর পৈর্বাণাণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, “হায়! দীপ প্রজ্জলিত, কেবল বাবধান-দোষে রাজ গাড়ি অন্ধকারে নিমগ্ন! একটু আর দেখিতে পারি না। যাহ, আনিষ্টে গিয়া রাজাকে সাধনা করি! বলি গিয়া যে, রাজন্! তুমি অপভ্রুক নও, তোমার দিবা পুত্র বিদ্যমান। অথবা প্রয়োজন নাট। সে দিন ছদ্মনায়মান শকুন্তলাকে যখন মহেন্দ্র জননী সাধনা করেন, তখন বলিয়াছিলেন, ‘দ্ব্যস্ত সাধাতঃ সত্ত্বরই তদীয় যমপত্নী শকুন্তলাকে অভিনন্দিত করেন, দেবগণ অচিরে প্রায়ঃ ব্যবস্থ করিবেন।’ সুতরাং আর এখানে বিবন্ধ করিব না। যাহ, ছদ্মস্তো! এই বিবাহকুল অবস্থার কথা বলিয়া আনীর প্রিয়মথাকে আশ্বস্ত করি গিয়া।”—বলিয়াই সাধুমতী উদ্ভ্রান্ত-গমনে অস্তহিত হইলেন।

সামাজিক-গণ এতক্ষণে বুঝিলেন যে, শকুন্তল স্বর্গে—যে স্থানে শচী-

১—গকৃ. ৬ষ্ঠ অঙ্ক। সাধুমতী। ‘নম্রোহঃ পলু নিম্নয়নায়াঃ, ন প্রতিবোধঃ।’

২—গকৃ. ৬ষ্ঠ অঙ্ক। রাজা। ‘অহো! ছদ্মস্তো সংশয়মাক্রুড়া পিতৃভাজঃ,—কৃতঃ—

অস্মাৎপরাং বত যথাক্রমি সন্তু তানি কো নঃ কুনে নিবগনানি করিষ্যতা ত।

নুনং প্রযুক্তি-বাক্যেন যয়া প্রসিক্তং যোভাশ্র-শেযমুদকং পিতব্যঃ পিবন্তি ॥’

(মোহমুগতঃ)

চপলা-প্রভৃতি অমরগণ, পুত্রবতী শকুন্তলা সেই স্থানে আছেন । মহেন্দ্র-জননী স্বয়ং তাঁহার জন্ত ব্যাকুল । তিনি শকুন্তলাকে আশ্বাস দেন, সাশ্বনা করেন । দেবগণ পর্য্যন্ত শকুন্তলার হুঃখে হুঃখিত, শকুন্তলার যাতনা-নিরাসের জন্ত ব্যস্ত । আর বিলম্ব নাই, সত্ত্বরই হুঃখিনীর হুঃখের অবসান হইবে । কবি এই ভাবে, দর্শক-হৃদয়ে শকুন্তলার নিমিত্ত যে দুঃশিস্তা জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করিলেন । কবির এই অল্পপম চিত্রে দেখিলাম,—স্বর্গে—সেই—চিরানন্দময় স্থানেও শকুন্তলার আনন্দ নাই,। তাদৃশ হুঃখ-বিমুক্ত স্থলেও পতিব্রতা আপনার হুঃখে সর্বদা হুঃখিনী । রাজকৃত প্রত্যাখ্যানে সে প্রণয়, অনল-দহু হেনের জায়, যেন আরও অধিকতর উজ্জল মূর্তি ধারণ করিয়াছে ! আদর অপেক্ষা উপেক্ষায়, সতীর সতীত্ব নিজের প্রকৃত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । সতীর সে মহনীয় মূর্তি দর্শনে দেবতারাও বিস্মিত হইয়াছেন । সে মূর্তির প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন । তাই তাঁহার পর্য্যন্ত সতীর গৌরবরঞ্জে উদ্যত ! সতীর হৃদয়-রঞ্জে বন্ধ-পরি-কর ! দেখিলাম, পতিবিরহিণী পতিব্রতার চক্ষে স্বর্গও অকিঞ্চিৎকর, নন্দনকাননও রুদ্রাশ্রয়ানবৎ, জর্ণ অরণ্যবৎ । দেখিলাম, সতীর হৃদয় আদরে উদ্বেল বা উপেক্ষায় চঞ্চল হয় না । দিগ্-দর্শন-যন্ত্রের শল্যকার জায়, সে হৃদয় সকল অবস্থাতেই স্থির-লক্ষ্য, পতির অভিমুখীন । এক-বার সেই কুমারসম্ভবে, মদন-ভ্রমের পর, পিনাকপাণি কর্তৃক অবজ্ঞাতা পার্শ্বতীর তপস্তা দেখিয়াছি ; তার পর রঘুবংশে, রামকর্তৃক নির্বাসিতা সাধ্বী জনকভনয়ার সেই—

তপস্বি-সামান্যমবেক্ষণীয়া—

প্রভৃতি উক্তিময়ী মূর্তি দেখিয়াছি ; আর এখন কবির সর্বস্ব-ভূত এই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে সাধ্বী শকুন্তলার দেবীমূর্তি দেখিলাম । যে পতি, কলঙ্কিনী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, না না, কেবল কলঙ্কিনী বাধ্য নহে, বিগৃহ-চরিত্রাকে কলঙ্কিনী প্রতিপন্ন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,

সেই পতিরই উদ্দেশে, গত-জীবিত-কল্পা, 'পরিধূসর-বসন-বসনা,' 'নিয়ম-
কাম-মুখী,' 'এক-বেণীধরা,' 'শুদ্ধশীলা,' নিষ্করণ পতির 'দীর্ঘ-বিরহ-ব্রত-
ধারিণী,' 'শরীরিণী' করুণার আয়, শকুন্তলার মূর্তি দেখিলাম। দেখিলাম,
রমণীহৃদয়' অগাধ সমুদ্রবৎ অতলস্পর্শ, অনন্তরত্নের আকর। সেই সঙ্গে
আরও দেখিলাম, রমণী সব সহ করিতে পারে, প্রিয়তমের প্রীত্যর্থ,
সহাস্তবদনে মৃত্যুকেও ডাকিয়া লইতে পারে, চিরদিনের মত হৃৎকের সৃষ্টি-
ভেদা অন্ধকারে আত্মবিসর্জন করিতে পারে, কিন্তু তাহার একমাত্র সম্বল
সত্যিষের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ সহ করিতে পারে না। সত্যিষের
মর্যাদারক্ষার জন্ত, সে অসাধ্যও সাধন করিতে পারে, কুসুম-কোমলা
হইয়াও ভীমা রণরঙ্গিণী সাজিতে পারে; জগতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম,
চিরধোয়, প্রাণাধিকেব হৃদয়েও 'অনার্য্য' বলিয়া বাকাবাণ বিদ্ধ করিতে
পারে। ত্রিজগতে এমন কিছুই নাই, যাহা সত্যী ললনা, সত্যিষের অমু-
রোধে পরিত্যাগ করিতে না পারেন। দেখিলাম, পতির সেই শত কটুক্তি,
শত প্রত্যাখ্যান সত্যী পতিমুখ-সন্দর্শন-মাত্রেরেই বিস্মৃত হইলেন। হৃদয়ের
বলে হৃদয়কে ধারণ করিলেন। দেখিলাম, পতির উপা দোষারোপ
করিতে সত্যী অভাস্ত নহেন। তিনি আপন হৃদয়েই সকল হৃৎকের
হেতু বলিয়া মানিয়া লয়েন। আপনারই ত্রুটি দেখেন, পতির ত্রুটি তিনি
দেখিতে চান না, বা দেখিতে পারেনও না। তিনি পতির মুখ দেখিয়া,
নিমেষ-মধ্যেই সকল বিস্মৃত হইয়া, কেবল, 'জয়তু আৰ্য্যপুত্র!' বলিয়া,
হৃদয়সনে হৃদয়েশ্বরকে পুনঃস্থাপিত করেন! কোপ, অভিমান, আত্ম-
প্রাণা প্রভৃতি, সত্যী, পতিমুখ-দর্শনে এতপদে বিস্মৃত হয়েন। দেখিলাম,
যখন আত্ম-কৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া পতি কাতর-হৃদয়ে সত্যীর পদপ্রান্তে
পতিত হইয়া অমুনয় করিতে যান, তখন সাধবা, সমস্ত অপরাধ নিজেই

১—শকু, ৭ম অঃ।—বসনে পরিধূসরে বসনা নিয়ম-কাম-মুখী বৃত্তকর্ণা,

অতিনিষ্করণ শত শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘ বিরহ-ব্রতঃ বিভর্তি।

স্বীকার করিয়া লইয়া, নিজকেই সকল দোষে দোষী করিয়া, পতি-দেবতাকে দোষ-নির্মুক্ত করেন* । সতী পতির চরিত্রে কলঙ্কের ছায়াপাত সহ্য করিতে পারেন না ।

মালিনীতটে, সহ-প্রধান তপোবনে, সাত্ত্বিক-হৃদয়া শকুন্তলার যে প্রণয়ের উন্মেষ ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, রজঃপ্রধান হস্তিনাপুরের রাজ-প্রাসাদে ভ্রমঃপ্রভাব-বিকৃত হৃদয়ন্ত কষ্টক শকুন্তলার যে উপযাচিত প্রণয়ত্ব উপেক্ষিত হইয়াছিল, এতদিনে সেই প্রণয়, আবার সহ-গুণ-প্রধান দেব-সদনে আদৃত হইল । তপোবনে সে প্রণয়ের প্রথম অঙ্কুরোৎপত্তি, তাপস-কাজিকৃত অনরভবনে বর্দ্ধিত পল্লবিত সেই প্রণয়তরু কুসুমিত ও কলিত হইল । তপোবনে প্রথম মিলন, পরে লোকালয়ে বিচ্ছেদ, শেষে আবার তপোবনাদিক শান্তিময় স্বর্গে সেই তাপস-ভনয়ার পুনঃমিলন । হিমালয়-ছাঁহা ভাগীরথীর বিশ্রাম সাগর-সঙ্গমে । বহুছাঁহা শকুন্তলার বিশ্রাম স্বর্গে । ভাগীরথীর পুত্র ভ্রমঃ ত্রিজগৎসিন্ধুত । শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনও ত্রিলোক-বিশ্রাভ । স্বয়ং উপনয়ঃ সহস্রমুখীকে যে রাজা চিনিতে পারেন নাহি, প্রতাপবান করিয়াছিলেন, আর সেই প্রতাপবানঃ সতী-রাজ-পাথেরা রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছিলেন, শেষে সেই রাজাকেই আবার সেই সতীর জন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতকর হইতে হইল । কত অশ্রুদগ্ন করিতে হইল । যত্ন করিয়া সেই ‘অপ-রিচি প্রাকেষ্ট’ চিনিয়া লইতে হইল । সত্যের গোরব কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না । কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না । সে গোরব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয় । নতুন সে গোরব আদৃত না হইলেও স্বর্গের দেবদেবী তাহার পূজা করেন । হৃদয়ন্তও শকুন্তলার গোদব বর্দ্ধিত করিলেন । ‘অভিব্যক্ত-সম্ব-লুপ্তা’

*—শকু, ৭ম অঙ্ক । শকুন্তলা । ‘উৎকীর্ণত্ব আর্ধ্যপুত্রঃ । নুনং মে স্বচরিত-প্রতিবন্ধক’ নয়ু কৃতং তেহু দিবসেহু পরিণাম-নুগং আসাদ্য, তেন সাহুক্রোশঃ অপি আর্ধ্যপুত্রঃ কিমসংসংকতঃ ।’

এবং 'কলঙ্কিনী' বলিয়া একদিন যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আপন
 লম্ব বুদ্ধিতে পারিয়া, ছদ্মস্ত সেই পুত্রবতী শকুন্তলাকেই পবিত্র-হৃদয়া
 'বলিয়া, স্বয়ং যাইয়া গ্রহণ করিলেন। একদিন পরকলত্র বলিয়া যাহার
 মুখের দিকে চাহিতেও ক্লপণ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার চরণে পতিত
 হইয়া, ভারত সম্রাট সতীত্বের জয়-ঘোষণা করিলেন। আর ভারতের
 অদ্বিতীয় কবি, তাঁহার 'কল্লনার মোহন বাশরীতে সেই জয়-গীতিকার
 বাক্য করিলেন। •

একষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

দুঃস্বপ্ন ।

শকুন্তলার চরিত্র-প্রসঙ্গে দুঃস্বপ্ন-চরিত্রের অনেক কথাই বলা হইয়াছে । দুঃস্বপ্ন যে কি প্রকার অসীম-শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ, তাহার চরিত্রের বল যে কত অপরিমিত, হৃদয় যে কিরূপ উদার, নিকলঙ্ক, তাহা শকুন্তলার প্রত্যাগ্যান পর্বে অতি স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে । তথাপি হিমালয়বৎ সে বিশাল ও সমুচ্চ চরিত্রের মহত্ব আরও একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথম অঙ্কে, প্রস্তাবনার শেষে, সূত্রধারের মুখে, আমরা দুঃস্বপ্নের প্রথম পরিচয় পাইতেছি । রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া সূত্রধার তাহার প্রিয়তমাকে গান গাহিতে বলিয়াছিল । সে গান করিয়াছে । সেই গানে, সূত্রধার এমনই আত্মবিশ্বস্ত ও তন্ময় হইয়াছে যে, সে যে অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটক অভিনয় করিতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ, এ কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছে । সে স্বপ্নোন্মিতের ভাষা, উদ্ভাস-ভাবে তাহার প্রিয়তমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আর্যো ! কোন্ নাটক আমাদের অভিনয়ে ?’ সূত্রধার-পত্নী হাসিয়া বলিল—‘সে কি ? তুমিই’ত এই মাত্র কহিলে যে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল অভিনয় করিতে হইবে, তবে আবার এখন এরূপ বলিতেছ কেন ?, তখন সূত্রধার সন্মিত-বদনে কহিল, ‘ঠিক কথা, তুমি ঠিকই মনে করাইয়া দিয়াছ ! তোমার মনোহর গীত-রাগে আমার অদ্যকার কর্তব্য অভিনয় বিশ্বস্ত হইয়াছিলাম । ঐ দেখ, ঐ যে আমাদের পুরোবর্তী রাজা দুঃস্বপ্ন, ঋতগতি যুগোদ্ধার, যেমন হঠাৎ কোথায় হৃত হইতেছেন, তজ্জপ তোমার সঙ্গীতেও

আমারে মন হত হইয়াছিল। তাই আমি ঐ রূপ অসংবদ্ধ কথা বলিয়াছি।’

এই প্রথম দৃশ্যস্তর নাম শ্রবণ করিলাম ও দৃশ্যস্তকে দেখিলাম। অভিনয়ের নাটক আরম্ভ হইবার পূর্বেই, প্রস্তাবনাতেই দেখিতেছি, যে জল্প সূত্রধার উপস্থিত, তাহা সে বিশ্বৃত হইয়াছে। তাহার প্রধান কর্তব্য যে অভিনয়, তাহার নাম পর্য্যস্ত ভুলিয়া গিয়াছে। তার পর দেখিতেছি দৃশ্যস্তকে; তিনিও বিশ্বৃত। বেগবান্ বজ্রমৃগ, তাঁহাকে বলপূর্বক কোথায় ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে, তিনি অবশহৃদয়ে মৃগের অনুবর্তন করিতেছেন, আত্মপরাবর্তনের যেন শক্তি নাই। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং পরে, এই প্রকার বিশ্বৃতি-বাহুলা প্রদর্শন করিয়া কবি অতি-নিগূঢ় ভাবে ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে, এই নাটকে বিশ্বৃতিরই প্রাধান্য। নাটকের যিনি প্রধান পুরুষ, তিনি বিশ্বৃতিকে লইয়াই রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করিলেন। ইহাতে বুঝিতেছি যে, তাঁহার জীবনে বিশ্বৃতিরই অধিকার। বনচারী মৃগের দ্বারা, স-সাগরা ধরণীর অধীশ্বর ‘প্রসভ-হৃত’ হইলেন, তাঁহার জীবন যে কীদূশ বিশ্বৃতি-প্রধান, বনবাসীর আধিপত্য যে সে জীবনে কত অধিক, তাহার কতকটা আভাস এই প্রারম্ভেই বুঝিতে পারা গেল। বনবাসিনীর সন্দর্শনে একবার তিনি আত্মবিশ্বৃত, বনবাসী তাপস দুর্কাসার দুঃসহ অভিশাপে আর এক বার তিনি আত্ম-ক্লিষ্ট। হরিণ-দর্শনে তাঁহার যে বিশ্বৃতির প্রথমোন্মেষ, হরিণাক্ষী শকুন্তলার সন্দর্শনে সেই বিশ্বৃতির বহিঃপ্রকাশ, আর দুর্কাসার অভিশাপে তাহার পূর্ণত্ব। দৃশ্যস্তের জীবন-ত্রিযামার তিনটি যামেই যেন, একই বিশ্বৃতি তিন রূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। ইহা

১-শকু. ১ম অঃ। সূত্রধারঃ।

ভবান্ধি গীতরাগেণ হরিণা প্রসভং হৃতঃ

এব রাজেব দুঃশস্তঃ সারঙ্গেশাতিরংহসা ॥

মহাকবির এক অপূর্ণ কৌশল । সমস্ত অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটকের ইহা এক বিশেষ রহস্য ।

দু্যস্ত বিশাল পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট । মুগ্ধা করিতে, নির্গত হইয়াছেন । শরব্যমৃগ অদূরে ধাবমান । অবার্থ-সন্ধান রাজ্য বাণ-সন্ধান করিয়াছেন, বধ্যমৃগ বাণাহত হয় আর কি, এমন সময়ে সহসা একজন বনবাসী ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার বাণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন । ব্রাহ্মণের আশ্বসনায় অগাধ বিশ্বাস, আপন ব্যক্তিত্বে অপরিমিত নির্ভর । তাই অকুতোভয়ে, বীরশ্রেষ্ঠ দু্যস্তের বাণের পথে দাঁড়াইতে পারিলেন । আশ্রমের মৃগ আশ্রমবাসীর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, তাই আশ্ব-প্রাণের দিকে ক্রক্ষেপ না করিয়া ব্রাহ্মণ মৃগের প্রাণরক্ষার্থে উপস্থিত । ইহা একটি বিরাট চিত্র । যে দেশের ব্রাহ্মণ, আশ্ব-দেহের মাংস কাটিয়া দিয়া, শ্রেনপক্ষীর কবল হইতে আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, দুর্গত ইন্দের প্রার্থনায়, যে দেশের ব্রাহ্মণ আপন অস্থি স্মিতমুখে অর্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই দেশের ব্রাহ্মণের প্রতিকৃতি ।

বাণপথে ব্রাহ্মণ দণ্ডাগ্রমান—গুনিয়াই, রাজা স-সন্তমে সারথিকে কহিলেন, ‘সত্তর অশ্বের রশ্মি-সংযম কর ।’ রথ স্থির হইল । ব্রাহ্মণও অগ্রসর হইয়া কহিলেন, রাজন, আশ্রমের মৃগ হনন করা অলুচিত । ‘হনন করিও না’—এ কথা ব্রাহ্মণ বলিলেন না । ‘হনন অলুচিত’—কেবল ইহাই বলিলেন ! এই বাক্যও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব পূর্ণভাবে প্রকটিত । রাজা অমনি বলিলেন ‘এই বাণ সংহার করিলাম ।’ আর বিক্রমিত নাহ । যেমন আদেশ, অমনি পালন । এই চিত্রে, শরব্য-বধে বাণ-প্রাপ্ত পৃথিবীপতি, ব্রাহ্মণের আদেশ পালন করিয়া, ব্রাহ্মণকে যত বড় করিছেন, নিজে তদপেক্ষা অনেক বড় হইলেন । দেবদ্বিজে ক্ষিতীশ্বরের যে ভক্তি-শ্রদ্ধা কৃত, তাহা এই সামান্য ঘটনাতেই বেশ অল্পভব করা যায় ।

বৈথানসের অহুরোধ ক্রমে, রাজা মালিনী-তীরবর্তী, কধের আশ্রমে

চলিয়াছেন। সে মৃগয়া-বেশ, সে বর্ম্ম, কবচ, শিরস্কাণ, সে তুগীর, ধনুঃ, বাণ পরিভাগ করিয়াছেন। ক্রমে ‘বিনীত-বেশে’ তিনি শাস্ত আশ্রমের দ্বারে উপনীত হইলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিবেন, এমন সময়ে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল। মনস্বী ছায়াস্তের মনে, যেন একটু আশার বিছাৎ, চকিতে খেলা করিয়া গেল। নিমেষের জন্ত রাজা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া গেলেন।—এমনই সময়ে নেপথ্যে ধ্বনি হইল—‘ইদোঁ ইদোঁ সহায়ো।’ শাস্ত্র তপোবনের স্নিগ্ধ সমীরণে ভাসিতে ভাসিতে সে ধ্বনি রাজার কাণে প্রবেশ করিল। না—না, কাণে নহে, ‘কাণের ভিতর দিয়া’ সে ধ্বনি, যেন রাজার ‘মরমে’ প্রবেশ করিল। রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথম বুঝিতে পারিলেন না, যে উহা কিসের ধ্বনি? কাহার ধ্বনি? নিশীথরজনীতে স্তপ্তোষ্মিতের কর্ণে দূরগত বীণাধ্বনির শ্রাব্য, বহুকাল পরে প্রবাস-প্রত্যাগতের কর্ণে স্ব-জনালাপের শ্রাব্য, বসন্ত-বামিনীর শেষ-ভাগে, দূরোখিত অস্পষ্ট-শ্রুত কোকিল-বন্ধারের শ্রাব্য, পিপাসার্ত্ত পথিকের কর্ণে সারস-কুজিতের শ্রাব্য, সে ধ্বনি কাননের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, পৃথিবী-পতিকৈ উন্নয়ন করিয়া তুলিল। রাজা ছায়াস্ত একান্ত বিশ্বয়াবিষ্ট-হৃদয়ে ও বাহ্য ভাবে কাণ পাতিয়া রহিলেন। নিমেষমাত্র পরে তাঁহার মনে হইল, যেন, দক্ষিণ দিগ্-বর্ত্তিনী বৃক্ষ-বাটিকায় ঐ ‘আলাপ’ শ্রুত হইতেছে। কাহার আলাপ? কিসের আলাপ? তিনি বীণার ‘আলাপ’ শুনিয়াছেন, ত্রিতন্ত্রী ‘আলাপ’ শুনিয়াছেন, ভ্রমরীর ‘আলাপ’ শুনিয়াছেন, কোকিলার ‘আলাপ’ শুনিয়াছেন; তিনি চক্রমা-শালিনী মধুযামিনীর অঞ্চলে বসিয়া, বীচিমালিনী তটিনীর কুল কুল ‘আলাপ’ শুনিয়াছেন,—কিন্তু এমন স্বপ্নময়—আবেশময়—‘আলাপ’ ত ‘জীবনে আর কখনো শুনে নাই! তিনি প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই যে, ইহা কি কোন মানবীর কণ্ঠধ্বনি? না কোন বনদেবতার অমৃতবর্ষি-কণ্ঠনিঃসৃত রাগের ‘আলাপ’ সরসী-বন্ধো-বিহারী রাজ-হংসকে যেমন

তরঙ্গ-লেখা পদ্ম হইতে পদ্মাস্তরের নিকটে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই স্রাবি-
জাত-পূর্ব স্বরতরঙ্গও তরঙ্গ রাজাকে সেই দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল ।
সে স্বর-লহরী তখনও যেন বাতাসে ভাসিতেছিল । তখনও তাহার লয় হই
নাই । রাজা সেই দিক ধরিয়া অবশ চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । রাজা
কিয়দূর যাইতে না যাইতেই দেখিলেন, —অদূরে তিনটি, তপস্বিকৃত্তা
জলপূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া, তাঁহারই দিকে আসিতেছেন । রাজা দূর
হইতে সেট 'মধুর-দর্শনা' বালিকাদিগকে দেখিতে লাগিলেন । কলসী-
দিগকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাঁহার মনে হইল, 'বিধাতা যেন অনন্ত
সৌন্দর্যের আধার করিয়া উহাদিগকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । রাজার
অন্তঃপুরেও তাদৃশ সৌন্দর্য্য জ্বলিত ! যদি সত্য সত্যই ইহার আশ্রম-
বাসিনী এবং তপস্বিকৃত্তা হইলেন, তাহা হইলে, এতদিনে, অবতর-বর্দ্ধিতা
বন-লতিকার নিকটে যত্ন-রক্ষিতা উদ্যান-লতিকা পরাজিত হইল' ।

সেই কলসীত্রয়ের দর্শনে, ভারতেশ্বরের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়া-
ছিল, তাহা কবি, তাঁহারই মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন । এই একটি
কবিতা দ্বারাষ্ট পুরুষপ্রধান চর্যাস্তরের হৃদয়-ভাণ্ডার কবি যেন উন্মুক্ত
করিয়া দেখাইলেন ।

সৌন্দর্য্য লিপ্সা নিন্দার বিষয় নহে । জগতে এমন লোক অতি
বিরল, যিনি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহেন । যদি কেহ থাকেন, তিনি
করুণাময়ের অনুরূপে বঞ্চিত, কুপার পাত্র : কেহ বহিঃসৌন্দর্য্য ভাল
বাসেন, কেহ অন্তঃসৌন্দর্য্য ও বহিঃসৌন্দর্য্যের সমবায় প্রীত হইবেন
কেবল মানুষের নহে, সৌন্দর্য্য জীবমাত্রেয়ই অভিপ্রেত, তৃপ্তিপ্রদ ।
সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হইয়াই যুগ, চিত্রার্ণবের জায় স্থির হইয়া, উল্লসকে, ক্রমের

১—শব্দ, ১ম অঙ্ক । রাজা ।

‘ওদ্যন্ত-জল-ভসিতং বপুঃপ্রবাসিনীং বহি জনত ।’

সুসীকৃত্তা পল্লু ভগ্নৈকদ্যান-লতা বন-লতাজিঃ ।’

গুণ-গুণ-বাক্য প্রবণ করে। সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হইয়াই ফণী, বাঁশরীর রবে ফণা উত্তোলন করিয়া নাচে । সৌন্দর্য্য-লোভেই চকোর শীতল্যুতি চক্রে-
 'দিকে ধাবমান হয়' । সৌন্দর্য্য-লোভেই পতঙ্গ অনলে প্রাণ-পাত করে ।
 যে হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা নাষ্ট, তাহা কার-দগ্ধ, অহুর্কর উষর ক্ষেত্রে
 তুল্য । বিবাতোর এই সুন্দর বিশ্ব তাহার জন্ত নহে, সে হতভাগ্য । দৃশ্য-
 স্তের সৌন্দর্য্য-প্রীতি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল । তিনি সুন্দরী ধরণীর অধি-
 পতি, সুন্দর বিশ্বের শয়নস্থ, নীল-পয়োনিমির নীলাঘরে তাহার বসুন্ধরা
 সুশোভিতা । তাহার হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের অতিপ্রিয়তা না থাকাই দোষের
 বিষয় । নীল গগনের নবোদিত শশাঙ্কের সৌন্দর্য্য লোকে যে ভাবে
 দেখে, তিনি তাপসকুমারীদিগের সৌন্দর্য্যও যদি সেই ভাবে দেখিতেন,
 তবে, তাহাতে বলিবার কিছুই থাকিত না । তিনি তাহা দেখেন নাই ।
 তিনি অন্তভাবে দেখিয়াছেন । তিনি যে ভাবে, ধাবমান মৃগের 'শ্রীবা-
 ভঙ্গাভিরাম' মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তিনি যে ভাবে, 'নিরায়ত, পূর্বকায়'
 'নিম্পন্দ-চামর-শিখ' 'নিভৃতোদ্ধকর্ণ' গুহ-গতি অশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া-
 ছিলেন, যদি আজ সেই ভাবে, তাপস-দুহিতাদের সৌন্দর্য্য দেখিতেন,
 তবে তাহা অধিকতর রুচিকর হইত । তিনি তাহা দেখেন নাই । তিনি
 'স্বকীয়' অস্তঃপুরবাসিনী কামিনীদিগের সহিত তুলনা করিয়া, 'পরকীয়'
 কল্পকাগণের রূপদর্শন করিয়াছিলেন । আপনার সৌভাগ্যের সহিত
 অস্তের সৌভাগ্যের তুলনা করিয়াছিলেন । এতাদৃশী তুলনার পরিণাম
 স্বকল-প্রদ নহে । যে স্থলে পরের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়া

১-শকু, ১ম অঙ্ক । রাজা ।

শ্রীবা-ভঙ্গাভিরামঃ মুহুরমুপততি তন্মানে বহুদৃষ্টিঃ

পশ্চাৎ প্রবিষ্টঃ পরপতন-ভয়াং ভূয়সা পূর্বকায়ম্ ।

নৈর্ভরদ্ধাবলীঢ়ঃ শ্রম-বিবৃত-মুখভ্রংশিভিঃ কীর্ত্তিমা

পশ্চোৎপন্নুত্বাদি বিয়তি বহুতরং তোকমুখ্যাং প্রয়াতি

পরকে বুঝিতে হয়, যে স্থানে পরের সমৃদ্ধি-দর্শনে আপনার ঋদ্ধি-চিন্তা মানসে উদ্ভিত হয়, জানিও, সেই স্থলে আত্ম-ভাবনা বড় অধিক । আত্মার্থটি সে স্থলে মুখ্য, পরার্থ তথায় গৌণ । ছুয়াস্তের এই তাপস-দুহিত-দর্শনও আত্মার্থ-মূলক । তাঁহার অজ্ঞাত-সারে, তদীয় হৃদয়ে, আত্মার্থ-পরতা প্রকট-রূপ ধারণ করিয়া বসিল ! তিনি তৎপরচিত্ত হইয়া, তপস্বি-কল্পকাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন । এই দৃষ্টক, তাঁহার হৃদয়ের পূর্বরাগ নহে, তবে পূর্বরাগ-রূপিণী উষার দোহক প্রাভাতিক নক্ষত্র ইহাকে বলা যাউতে পারে ।

ছুয়াস্ত দেখিতে লাগিলেন । অনন্তর কথার পর, যখন শকুন্তলঃ কথা কহিলেন, নবমালিকার শিরে জল-সেচন করিলেন, তখন ছুয়াস্ত মনে মনে কহিলেন,—

‘কথমিয়ং সা কণু-দুহিতা ?

অসাধু-দর্শী খলু তত্রভবান কাশ্যপঃ,

য ইমাং আশ্রম-ধর্ম্মে নিযুক্তে ।’

ছুয়াস্ত অপ্রবুদ্ধ-হৃদয়ে আর এক পদ অগ্রসর হইলেন । তখন আর তাঁহার এমন সামর্থ্য নাট, যে, সে রূপ-দর্শন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়েন, অথচ বয়স্হা ললনার নির্জনে দর্শন দৃষ্য, ইহাও তাঁহার রাজ-হৃদয়ের অবিদিত নহে । তাই তিনি ‘পাদপাস্ত্রিভ’ ইত্যঃ দেখিতে লাগিলেন । ছুয়াস্ত এবার আরও অনেক দূরে আসিয়া পড়িলেন । যখন তুমি আত্ম-প্রকাশ করিতে কুন্তিত হও, জানিও, তখন তোমার আত্মার উপর প্রভুত্ব হ্রাস হইয়াছে । আত্মা আর তোমার অধীন নাট, তখন তুমিই আত্মার অধীন

‘১—শকু, ১ম অঙ্ক’ এই কি সেই কণু-দুহিতা ? মহর্ষি কণু, দেখিতেছি, অসাধু-দর্শী, যেহেতু, তিনি এমন বালককে কঠোর আশ্রম-ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন ।

হইয়া পড়িয়াছ । মহাকবি, এইভাবে, ছ্যাস্তকে, বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান করাইয়া, শকুন্তলা প্রদর্শন করিলেন ।

বরপুংগের লোক, যখন বিবাহের পূর্বে, কন্তাকে দেখিতে যায়, তখন, গ্রাহ্যার যেমন কন্তার নাক, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, কর চরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে দেখিয়া লয়; আবার সেই লোক চতুর হইলে, ঐ কন্তা হাশিলে কেমন দেখায়, দাঁড়াইলে কেমন দেখায়, চলিলে কেমন দেখায়, গ্রাহ্যও কোশলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া লয়, ছ্যাস্তকেও যেন সেই ভাবে, কালিদাস শকুন্তল-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কলস-কফল আনত-নিঃশব্দে শকুন্তলার কেমন রূপ, শিখিলবকলা উন্নমিত-দেহা শকুন্তলার কেমন রূপ, জনক-বান-বাকুল্য আনর্তিত-নয়না শকুন্তলার কেমন রূপ, কবি রাজাকে দেখাইলেন । রাজা একটি একটি করিয়া, শকুন্তলার সেই রূপ লহরী দেখিলেন । আর আপনার মনে, আপনিই পৃথক পৃথক ভাবে, সেই রূপের বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন ।

ছ্যাস্ত সেই রূপ শ্রবণে ডুবিয়া গেলেন । ছ্যাস্ত ডুবিলেন বটে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব ডুবিল না । ছ্যাস্তের জড়দেহ তন্ত্রালস হইল বটে, কিন্তু তাহার বিজ্ঞানময় দেহ জাগরুক রহিল । তাহ দেখিতে পাঠ, জড়-ছ্যাস্তকে প্রস্তুতমূর্তিবৎ অবস্থাপিত ও পশ্চাৎপদ করিয়া, বিজ্ঞানময় ছ্যাস্ত বিচার করিতে লাগিলেন যে, 'এই বালিকা কুৎসার্তের 'অসবর্ণক্ষেত্র-সমুদ্র' কি না? জড়চৈতন্যের এসমবায় বড়ই সুন্দর । যে স্থলে জড়ত্ব প্রাধান্য, তথায় চৈতন্যের এ শক্তি মন্দীভূত । চৈতন্য দীপালোক সে স্থলে ক্ষীণ, অকম্পনা । সে, একবার জড়ত্বের মধোও হয়ত, আপনার অস্তিত্ব প্রদর্শন করে বটে, কিন্তু তাহা, বিজ্ঞানবিশেষের জ্ঞান, জ্যোতিরিক্তব-প্রকাশের জ্ঞান অগম্য । তাই দম্ভারও চিত্তে কদাচিত্ নিবৃত্তির ধ্বনি উঠিয়া থাকে । যিনি সত্য সত্যই মহাপুরুষ, গ্রাহ্য হৃদয়ে এ চৈতন্য চির-প্রবুদ্ধ । সুখে, দুঃখে, সংযোগে, বিরোগে, এ চৈতন্য সর্বদাই

প্রথর । তাই ছ্যাস্ত তন্ময়-চিত্তে শকুন্তলা-সন্দর্শন-রত হইলেও, শকুন্তলা-গত নানাবিধ জিজ্ঞাসা তাহার মনে জাগিয়াছিল । তাই শকুন্তলাকে দেখিবার বাসনা তাঁহার মনে যত অধিক ভাবে জাগিতেছিল, ততই তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, এ বালিকা নিশ্চয়ই-আমার পরি-গ্রহণ-যোগ্যা, নতুবা আমার মন ইহার প্রতি এত আসক্ত হইবে কেন ? ছ্যাস্তের চরিত্র এমনই দৃঢ়, এমনই সত্যপ্রবণ, যে, তাঁহাকে সত্যের নির্ণয়ে কোন প্রয়াসই করিতে হয় না । তিনি যাহা সত্য নির্ণয় করিবেন, তাহাই সত্য, তিনি যাহা অসত্য মনে করিবেন, তাহাই অসত্য । তাঁহার বংশ-পরম্পরা-ক্রমে, সত্য সেবিত হইয়া আসিতেছে, আদৃত হইয়া আসিতেছে ; সে বংশীয়গণের হৃদয় এমনই উপাদানে গঠিত যে, যাহা সত্য, তাহাই তাহাদের সেবা, সেই দিকেই তাহারা আসক্ত । যাহা অসত্য, যাহা নীচ, যাহা ঘৃণিত, তাহাতে তৎসংশ্লিষ্টগণের হৃদয় অনুরক্ত হয় না, হইতে পারে না । তাই ছ্যাস্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন, ‘সত্যং হি সন্দেহ-পদেবু বস্তবু, প্রমাণমন্তঃ-করণ-প্রবৃত্তয়ঃ’ ।’ তাঁহার হৃদয় এত বলিষ্ঠ, এত জাগ্রত । তাঁহার হৃদয়োদ্যানে এক দিকে যেমন বসন্ত-মলয় প্রবাহিত, বসন্ত বনরাজি কুমুদিত, অল্পদিকে তেমনই চৈতন্তের-মিথু শরদ-কৌমুদী উল্লসিত । সে উদ্যান যেন শরৎ-বসন্তের, যুগপৎ লীলাক্ষেত্র ! তাই শকুন্তলার সৌন্দর্য্য-দর্শনে তাঁহার হৃদয় যখন একান্ত বিমুগ্ধ, তখনই আবার তাপস-তনয়া শকুন্তলার গ্রাহ্যগ্রাহক-নির্ণয়ে নিযুক্ত, শকুন্তলার প্রকৃত স্বরূপাববোধের নিমিত্ত উৎসুক । মোহ-জ্ঞানের এই সমবেতভাবই মহাপুরুষের প্রধান লক্ষণ । এই কারণেই মহাপুরুষকে কিছুতেই অপথে পরিচালিত করিতে পারে না । এই জন্যই রাজা, শকুন্তলার জাতি, কুল, উৎপত্তি বৃত্তান্ত প্রভৃতি অবগত হইবার উদ্দেশে অত ব্যগ্র হইয়াছিলেন । রাজা আত্ম-মর্যাদার অমূল্য-কুল-

ভাবে শকুন্তলাকে দেখিতে ও ভাবিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই আত্মমর্যাদার অনুরোধে মহাপুরুষ অতি প্রিয় গ্রাহ্য বস্তুকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন, অতি হৃদ্যকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন। প্রাকৃত জনের তাঁহা অসামান্য। প্রাকৃত আর মহাপুরুষে এই প্রভেদ। এই মর্যাদাজ্ঞান বত দিন থাকে, তত-দিনই মানুষ মানুষ-পদবাচ্য। ইহার অভাবে মানুষ পশুতুল্য। এই জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষের হৃদয় যে মুহূর্ত্তে কুসুমবৎ কোমল তাহার পরক্ষণেই পাষাণবৎ কঠিন। ছ্যাস্তের এই দুর্লভ জ্ঞান অতি প্রথর ছিল। তাই, এই দেখিতেছি, তিনি নবনীতবৎ কোমল-হৃদয়, আবার পরক্ষণেই যেন বজ্রবৎ কঠোর! দেখিতেছি, যে মুহূর্ত্তে ছ্যাস্ত,—

‘কিংশু খলু যথা বয়মশ্রাম্, এবমিয়মপ্যশ্রাম্

প্রতি স্মাৎ। অথবা লঙ্কাকাকাশা মে প্রার্থনা’।*

বলিয়া, মনে মনে শকুন্তলার ভাবনা করিতে করিতে, একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই আবার, তপস্বীগণের ‘তপোবনসম্বরণ-ব্যাঘ্রভার’ কথা এবং অনুচরবর্গের তপোবনোপারোদের কথা শ্রবণ করিয়া, তন্নিবারণে বীরের ভ্রায় সন্নদ্ধ হইতেছেন। শকুন্তলার চিন্তা যেন দূরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক, ‘প্রতিগমিষ্যামস্তবাৎ’ বলিয়া সিংহের ভ্রায় গাত্র-কম্পন করিয়া দাঁড়াইতেছেন। সে হৃদয় যেন সত্য সত্যই—

‘বজ্রাদপি কঠোরাণি যদূনি কুসুমাদপি’।—

এ অংশে শকুন্তলা অপেক্ষা ছ্যাস্তের প্রাধান্য। শকুন্তলা শ্রোতব ফুলের ভ্রায়, হৃদয়খানিকে ঘটনা-প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছেন। আর ছ্যাস্ত,

১—শকু, ৩য় অঙ্ক। ইহার সম্বন্ধে আমার চিন্তা যে প্রকার উৎস্ক, ইনিও কি আমার সম্বন্ধে সেই প্রকার উৎস্ক-হৃদয়। অথবা আমার প্রার্থনা ত পরিপূর্ণপ্রায়।

আহিতুণ্ডিকের আয়, তাঁহার তেজস্বী হৃদয়কে যখন বে দিকে ইচ্ছা প্রেরণ-
সংহরণ করিতেছেন। ছ্যাস্ত আত্ম-হৃদয়ের দ্বারা বস্তুর গ্রাহ্যত্ব পরি-
হার্য্যত্বের বিচার করিতে পারিতেন, মুগ্ধ-হৃদয়া শকুন্তলার সে শক্তি ছিল
না। শকুন্তলা রমণী। রমণী আপন হৃদয়কে অত কঠিন পথে, জটিল
বিষয়ে পাঠাইতে চাহেন না। তাঁহার বাহু ভ্রগতের মুখাপেক্ষী নহেন,
ঐতর্য্য বহির্ভ্রগতের দীতি-নাতি আইন-কানুনে, তাঁহার দৃকপাতও করেন
না। অন্তর্ভ্রগৎ তাঁহাদের বিচরণ ক্ষেত্র। সে জগতে বহির্ভ্রগতের আয়,
এত লৌকিকতা, এত পরিচয়-বিনোদ-প্রিয়তা, এত আত্মার্থপরতা নাই।
এই শকুন্তলা, আপনার ভাবনা বা আপন জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী করিতে
জানেন না। আর ছ্যাস্ত পুরুষ, একটা বিশাল সামাজ্যের অধাশ্বর।
অনেক সনয়ে, তাঁহাকে দোকাভরণে, মনাজানুগোষে বা বর্ত্তবানুগোষে
অন্তর্ভ্রগৎ অপেক্ষা বহির্ভ্রগতের অধিক মুখাপেক্ষা হয়। চলিতে হয়।
স্বাধীন নৃপতি হইতেও এ অংশে তিন পরাধীন। পরের মঙ্গলামঙ্গল
তাঁহার উপর তত্ত্ব। ঐতর্য্য তাঁহাকে, অনেক সনয়ে, পরের ভাণ-চতু
করিতে হয়। এই তাঁহার হৃদয় শকুন্তলার হৃদয়বৎ সবেগ নহে। ছ্যাস্ত-
স্তের হৃদয় কেবল জঙ্গম নহে, স্থাবর জঙ্গমাশ্রয়ক। আর শকুন্তলার হৃদয়
কেবল জঙ্গম। সে হৃদয় কেবল চলিতেছে, ফিরিতেছে না, দাঁড়াইতে
পারিতেছে না। আর ছ্যাস্তের হৃদয় এই চলিতেছে, এত দাঁড়াইতেছে,
যেনন গতি, তেননই স্থিতি। যখন সে ছ্যাস্ত হৃদয়ে তরঙ্গ উদ্ভিত হয়,
তখন তাঁহার রূপ সংক্ষেপিত মাগর অপেক্ষাও ভাবন, জীবন যখন সে
হৃদয় নিস্তরঙ্গ, তখন প্রশান্ত বারিধিও তাঁহার প্রশান্ত-ভাবে নিকটে
• প্রস্রাবিত। এমনই বিচিত্র উপাদানে ছ্যাস্ত-হৃদয় গঠিত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

• ধর্মের জয় ।

‘দু্যন্ত রাজা, কথাস্রম তাঁহারই অধিকার-গত । পবিত্র পৌরবকুলে তাঁহার জন্ম ।’ নিজে প্রস্তুত-বশা, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র । শকুন্তলাও ক্ষত্রিয়-কন্তা, অবিবাহিতা । শকুন্তলার সখীদিগের মুখে রাজা শুনিয়াছেন যে, অল্পরূপ পাত্রের, মহর্ষি কথের শকুন্তলা সম্প্রদানের বাসনা । তাঁহার অপেক্ষা অল্পরূপ বর, স্থূলত কি ছল্ভ, সে কথা তিনি নিজেই বিচার করিয়া দেখিতে জানেন । ‘পৃথিবী-পতি দু্যন্ত শকুন্তলার পরিণয়ার্থী’,—এ কথা শ্রবণ মাত্রই যে মহর্ষি কথ প্রসন্ন হৃদয়ে তাঁহার করে শকুন্তলাকে অর্পণ করিবেন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই । তথাপি রাজা বিননাঃ, শকুন্তলার জন্ত উৎকণ্ঠিত । তিনি কথকে এ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারিবেন না । তিনি নিজে আসমুদ্র-করগ্রাহী, অথত্র করপ্রদ হইতে তাঁহার হৃদয় প্রস্তুত নহে । তিনি ঈঙ্গিত-মাত্রেরই শকুন্তলাকে লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা তাঁহার বাঞ্ছিত নহে । বরং শকুন্তলার কথা বিশ্বত হওয়া ভাল, তবুও নিজের প্রার্থনা নিজে প্রকাশ করা ঈঙ্গিত নহে । তাঁহার বিচার-শক্তি এতই গরীয়সী, এতই প্রখর । তাই তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন,—

• ‘সাঁ বালা পরবতীতি মে বিদিতম্’—

• ‘সেই বালা যে পরাধীনা, ইহা ত আমি জানি । কিন্তু,—

‘অলমস্মি ততো হৃদয়ং তথাপি নেদং নিবর্তয়িতুম্ ।’

‘তথাপি সেই শকুন্তলা হইতে, আমি কিছুতেই আমার চিত্তকে নিবর্তিত করিতে পারিতেছি না ।’—তাহা হইলেই বুঝিতেছি যে, রাজা শকুন্তলা-গত সমস্ত বিষয় বিচার-পূর্বক, হৃদয়-নিবর্তন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই । যদি আরও চেষ্টা করিতেন,

তাহা হইলে, হয়ত, পারিতেন । যদি সত্য সত্যই বুঝিতেন যে, শকুন্তলা অগ্রাহ্য, রাজ পরিগ্রহের অবোগা, তাহা হইলে, তিনি যে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন, ইহা সহজেই অনুমেয় । তাঁহার চরিত্রের এ বড় বশ মহত্বের কথা নহে । এ বিচারশক্তি পৃথিবী-পতিরই অনুরূপ । যাহার বিশেষ জ্যোতিষানুজ্ঞান-চক্ষু আছে, তিনিই এইভাবে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপদর্শনে সনর্থ হয়েন, তথ্য নির্ণয়ে পারগ হয়েন । রাজা দুঃশাস্ত্রের চরিত্রের এমনই বৈচিত্র্য যে, অতিমোহের মধ্যেও অতিনিমজ্জনের মধ্যেও, সে হৃদয় সতত জাগ্রত । তিনি, একদিকে যখন চক্রে এবং বন্দপক্ষে উদ্দেশ করিয়া, কত কথা কহিতেছেন, কত প্রলাপ বকিতেছেন, আবার, তখনও অন্তরিক্কে, শকুন্তলার গ্রাহ্যগ্রাহ্যের বিচার করিতেছেন । তাঁহার হৃদয় বেন, তাহারই করস্থিত নোমের পুতুল । যখন যে ভাবে ইচ্ছা, তাহাকে ভাজিতেছেন, গড়িতেছেন । তিনি যখন তাঁহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেন, তখন সে হৃদয়ের ভাবতরঙ্গে সনস্ত বিশ্ব বেন ভাসিয়া যায় । তিনি আপনার ভাবে, বিশাল ধরণীকে অনুপ্রাণিত করিয়া লয়েন । পর্বত নির্গত-নির্ঝরের জায়, তাঁহার হৃদয়ের ভাব-প্রবাহ, সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকেই আপনার সঙ্গে ভাদাইয়া লইয়া যায় । বলিষ্ঠ হৃদয়ের ইহা একটি বিশেষ ধর্ম । যাহার হৃদয় বলিষ্ঠ, তিনি যখন কাঁদেন, তখন বিশ্বত্রস্তাও তাঁহার সঙ্গে হাসিয়া উঠে, আবার তিনি যখন কাঁদেন, তখন তাঁহারই সঙ্গে কাঁদিয়া পড়ে ।

যখন গৌতমী আসিয়া শকুন্তলাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, জাগ্রতান্তরিত দুঃশাস্ত্র বাহির হইয়া, যে স্থানে শকুন্তলা বসিয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া, উন্মুক্ত-হৃদয়ে, ‘কোথায় যাই? অথবা এই লগ্নাকুঞ্জে শকুন্তলা ছিলেন, সুতরাং এই স্থানেই ক্ষণকাল থাকি’ । —এই কথা

১—‘শকু, ওয় অক। ক হু থলু গচ্ছাবি ! অথবা ইহেব প্রিয়া-পরিউক্ত-মুক্তে লতা-বলয়ে মুহূর্ত্তং হাস্তাদি—’

বলিয়া উদ্ভাস্ত-ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তখন দর্শকগণও যেন তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ উদ্ভাস্ত-হৃদয় হইয়া পড়িলেন ।, তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে সেই শকুন্তলা-প্রতিমা-শূন্য লতাকুঞ্জের চতুর্দিকে দৃষ্টি-নিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কৈ শকুন্তলা, কোথায় শকুন্তলা, বলিয়া রাজার সঙ্গে তাঁহারও যেন উন্নত হইয়া উঠিলেন ।
তখন বিরহ-কাতর ভূপতি,—

‘তত্ৰাঃ পুষ্পময়ী শরীর-লুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং

ব্রাস্তো মন্থথ-লেখ এষ নলিনী-পত্রে নথৈরপিভঃ ।

হস্তাদ্ভ্রম্মিদং বিসাত্তরগমিত্যাসজ্যমাণেক্ষণে

নির্গন্তুং সহসা ন বেতস-গৃহাৎ শক্ৰোমি শূন্যাদপি’ ॥—

বলিয়া, হৃদয়ের করুণ-ভাব-রসে সমগ্র বনভূমি পর্য্যাস্ত করুণাদ করিয়া ডুলিলেন, তখন দর্শকগণও যেন তাঁহারই সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করিয়া উঠিলেন । সেই শিলাশয্যা, সেই নলিনী-দল-লিখিত পত্র, সেই মুগাল-বলয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন । সেই পৃথিবীপতির পার্শ্বে লাড়াইয়া, তাঁহারই করুণ-কণ্ঠে কণ্ঠ নিশাইয়া, যেন সমগ্র সামাজিক-মণ্ডলী কাঁদিয়া ফেলিলেন । অভিনেত্রী সহিত দর্শকদিগকে এমন করিয়া নিশাইয়া ফেলিতে, এমন করিয়া, ভাবের সিন্ধুটি দিয়া, উভয়ের হৃদয় এক করিয়া গাঁথিতে কালিদাস সিক্ত হইল ।

কৃষান্তের দৃষ্টি-শক্তি অংশয় ত্যজ ! ভগবতের কোন বস্তু তাঁহার চক্ষু

- ১—শকুন্তল জঙ্ঘ । ‘এই তার কুহনশয্যা, নলিনী পত্রে নগের দ্বারা লিখিত, এই তার ব্রাস্ত মন্থথ-লেখ, এই তার করমকল-খলিত মুগালবলয়, হায়, এই সব দেখিতে, দেখিতে আসি এতই উন্মনা হইয়াছি যে, এই বেতস-কুঞ্জ হইতে নির্গতও হইতে পারিতেছি না, ইহাতে থাকিতেও পারিতেছি না ।

এড়াইতে পারে না । স্বচ্ছ দর্পণ-তুল্য তাঁহার নিশ্চল-হৃদয়ে তাবৎ লক্ষ্যার্থই স্ফূটরূপে প্রতিবিম্বিত হয় । জড়তার বা অজ্ঞতার অধিকার সে হৃদয়ে নাই । সে হৃদয় সতত সোৎসাহ, সতত সতর্ক, সতত কণ্ঠ্য ।^১ আত্মরেণ আর্তনাদে সে হৃদয় কাঁদিয়া ফেলে, বীরের আস্থানে সে হৃদয় তখনই সম্বদ্ধ হয়, আবার ভ্রমরের গুঞ্জে বা কোকিলের বাক্যধ্বনিসে হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে । যখন রাজকার্য্যপর্যালোচনাস্তে ছ্যাস্ত বয়স্কের সহিত বসিয়া, শ্রম-ক্লান্ত চিত্তের শ্রান্তি দূর করেন, তখন দূর হইতে যদি কাহারও বিবাদ-গীতিকা তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অমনিষ্ট তিনি আপনাতঃ শ্রান্তি ভুলিয়া যান । সেই বিবাদ-সঙ্গোত্তরে করুণধ্বনিতে আশ্র-বিশ্বাস হন । তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে : রাজা তিনি, তিনি শুধু পার্শ্বিবি জগতের রাজ নহেন, কেবল বাহুবস্তুর উপর রাজত্ব করেন না, লোকে হৃদয়ের উপরও যেন তাঁহার অটুট অধিকার । তাই পরের হৃদয়ের হুঃখ গীতিকায় তিনিও হুঃখিত হইলেন ! পরের কাহ্নরতায়, তিনিও কাহ্ন হইয়া পড়েন ।

অনেক দিন হইল, মালিনী-তীরে শকুন্তলাকে ফেলিয়া আসিয়াছেন । দুর্কাসার অভিশাপে, তাঁহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন; কিছুই মনে নাই । জীবনে যে অমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সংস্কার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত । এমন বিলুপ্ত যে, উপেক্ষিতা হংসপদিকা যখন, তাঁহার হৃদয়ের গভীর হুঃখের ভার সহিতে না পারিয়া, নিজে নিজে গান করিতেছিলেন, তখন রাজা সেই গান শ্রবণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, ‘একি ? আমার ত কোন ইষ্টজন-বিরহ নাই, তবে এ গান শ্রবণ করিয়াই, আনি, এত উৎকণ্ঠিত হইলাম কেন ?’ দুর্কাসার অভিশাপ তাঁহাকে ‘মন্ত্র-মুগ্ধের ভাষা বলাটল—‘ইষ্টজন-বিরহ নাই,’—তিনি এখন ‘ইষ্টজন-সঙ্গত ।

১—শকু, যে অক্ষ । রাজা । আশ্রগতম্ ।

কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন-বিরহানুভবেপি বলবৎকণ্ঠিতোহস্মি ?

তাঁহার হৃদয় সর্বাংশে এখন পরিপূর্ণ, তাহার সকল স্থান অধিকৃত, তাহাতে এখন ইষ্টান্তরের স্থান নাই !

মানুষের হৃদয় ত্বাকাশ-কন্য । তাহাতে সর্বদা বিগল কোমুদী খেলা করে না, চকোরের নর্তন হয় না । তাহাতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যও উদ্ভিত হয়, শ্রোণপক্ষীও বিচরণ করে । তাহাতে নিরন্তর নয়নরঞ্জিনী সুনীল-জলদমালা ক্রীড়া থাকে না, অগ্নিবর্ণ আবর্তও উপস্থিত হয় । যখন সায়াংকালে, তটিনীর নিৰ্জ্জন তটে বসিয়া, মানব সেই সাগর-গামিনীর উল্লসিত হৃদয়ের কুল-কুল-প্রণয়-গীতিকা শ্রবণ করে, যখন রজনী-যোগে, সৌধ-শিরে উপবশন-পূর্ব্বক, সংসার-তাপ ক্লান্ত মানব, একাকী প্রশান্ত-গম্ভীর নৈশগগনের দিকে চাতিয়া থাকে, যখন মানব পৰ্ব্বতারোহণ করিয়া, অশোদেশ-বর্তিনী তরুলতা-শোভিনী শ্রামারমানা পৃথিবীর নয়ন-তর্পণ মূর্ত্তি দর্শন করে, তখন তাহার হৃদয়ে, সে হৃদয় যতই কক্ষ হউক, সরস হউক, মুগ্ধ হউক, দুঃস্থ হউক, বিবৃদ্ধ হউক, ইষ্টজন-সঙ্গত হউক, তাহাতে কিন্তু কেমন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অশ্রুতর ভাবের উদয় হয় । কণকালের জন্ত মানুষ সব ভুলিয়া যায় । সংসার ভুলিয়া যায়, আপনাকে ভুলিয়া যায়, বর্তমান ভুলিয়া যায় । এখন তাহার হৃদয়ে অতীতের সুখদুঃখের ছায়া পতিত হয়, অতীতের স্মৃতি উদ্ভিত হয় । মানুষ তখন অতীতের মধ্যে ডুবিয়া পড়ে । তখন প্রাণের কত পুণ্যজন কথার অম্পষ্ট গীতি হৃদয়-তন্ত্রিতে বাজিয়া উঠে । আজ হংসপদিকার গীতধ্বনিতেও রাজার হৃদয়ের অবস্থা সেইরূপ হইয়া উঠিল । পরিপূর্ণ সন্তোষ, আপন হৃদয়ে তিনি যেন কি অপূর্ণতা অনুভব করিতে লাগিলেন । অতিশয় ‘পর্যুৎসুক’ হইলেন । ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে কত কথা জাগিতে লাগিল ।

১—শব্দ, ৫৭ অঙ্ক । রাজা ।

২. রম্যাদি বাক্য বহুব্রাণ্ড নিশা শব্দান্

পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোহপ জন্তঃ ।

জগতের অত্যাচারে তুলনায়, তিনি যে কত ক্ষুদ্র, কত অসম্পূর্ণ, তাহা ভাবিতে লাগিলেন । তিনি দিব্যরজনী অক্লান্তভাবে, আত্মসুখ-নিরপেক্ষ হইয়া, জগতের পালন করেন । পরের চিন্তায় নিকরবেগ-হৃদয়ে নিদ্রাও ঘাইতে পারেন না । কিন্তু কৈ ? তাহাতেই বা সুখ কোয়ার ? লোকে প্রার্থিত-প্রাপ্তিতে সুখী হয়, তাঁহার ত সে সুখও নাই ! অত্যা ভাবে, রাজার কতট সুখ । তিনি ত গ্রহ দেখেন না ! সংসারে নাহার তরুতলবাসী, দীন, তাহারও বুঝি, প্রামাদ-বিহারী দুঃখান্ত অপেক্ষা অধিকতর সুখী ! রাজা এষ্ট ভাবে কত দিন ভাবিতেছেন । তাঁহার মতঃ হৃদয়ে নর্ত্তের অসীকল্প, স্বপ্নময় এই ভাবে আসিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে । তিনি একান্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন ! এমন সময়ে কপ্তকী আসিয়া সংবাদ দিল, ‘কাশ্যপাশ্রম হইতে ঔষধীরা আসিয়াছেন ।’ যেমন শ্রবণ, অননি তাঁহার সেই বিষয়নাথ যেন তিনি নিমেষে ভুলিয়া ঋষিদের অভ্যর্থনায় তৎপর হইলেন । কর্তব্যের জন্য আত্মভাবন, আত্ম-সুখতঃপ মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইলেন । যেমন পূর্বে ছিলেন, তেমনই হইলেন । চরিত্রের এ মহত্তে তিনি অদ্বিতীয় ! তিনি যেন সত্য সত্যই—

‘অধ্ব্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ ।’

দৃশ্যস্তের কোনরূপ ইষ্টজন-বিরহ ছিল না, তিনি পরমসুখে, প্রকুল-হৃদয়ে ও নিশ্চিন্তভাবে, কালতিপাত করিতেছিলেন ।

অদূরে শকুন্তলা-সহস্রাত্রী ঋষিগণ উপনত-প্রায় । কবি সেই অভিশপ্ত শকুন্তলার প্রবেশের পূর্বে, রজনী, রজনীর প্রবান পুরুষ দুঃখান্ত এবং রক্ত-প্রেক্ষক দর্শকগণ,—সকলের হৃদয়, একটা অস্পষ্ট কুহেলিকায় আবৃত করিয়া দিলেন । প্রসন্ন-হৃদয়ের সম্মুখে, অপ্রসন্ন হৃদয়ের উপস্থিতি সমঞ্জস নহে । তাই অপ্রসন্নভাঙ্গা, অভিশপ্তা, শকুন্তলাকে উপস্থিত

হুঙ্করসম্মত নুনবোধ-পুলক

ভাবস্থিতি জননাস্তর-সৌন্দর্য্যনি ।

করিবার পূর্বেই, হংসপদিকার বিষাদ-গীতিকার ব্যপদেশে, অতীত সকলকেও, একটা গভীর অবসাদের অস্পষ্ট ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন।

রাজা যখন ঋষিদিগের সম্মুখীন হইয়া দেখিলেন যে, কে একটি অবগুণ্ঠনবস্ত্রী ললনা আপসগণের সহিত উপনতা, তখন তিনি তাঁহাকে দেখিতে বাইতেন ছিলেন, কিন্তু দেখা হইল না। ‘অনির্বচনীয় পরকলত্র’ বলিয়া নয়ন-পরাবর্তন করিলেন। রাজার হৃদয় তাগারের একটা প্রাণ কক্ষ, যেন কষি, এই একটি কথার উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন।

ভ্রাক্ষণগণ, আশীর্বাদান্তে মহর্ষি কথের, সেই প্রাণ কালের উপদেশ-সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলি একে একে রাজার গোচর করিলেন। কথের সেই—

‘অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযম-ধনান্ উচৈঃকুলধ্বজানঃ

ত্বয়্যস্তাঃ কথমপ্যবাক্যবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চ তাম্।

সামান্য-প্রতিপত্তি-পূর্ব্বকমিয়ং দারেবু দৃশ্টা ত্বয়া

ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্ বাচ্যং বপ্ৰবক্ষুভিঃ’ ॥

বলিয়া যে শেষ কথা, তাহা রাজাকে শুনাইলেন। পরিশেষে কহিলেন, ‘রাজন্! আপনার এই সহস্রম্বীণী আপনসদা, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন।’

ঋষিদিগের উপর রাজার অগাধ বিশ্বাস, অসীম ভক্তি। ঋষিদিগের মাহাত্ম্য তিনি বিশেষরূপে বিদিত আছেন। ‘স্পর্শানুকূল সূর্য্যকান্তের’ জায় ঋষিগণের তেজও সে, অতীত অভিজ্ঞে ‘দাহাত্মক’ হয়, ইহা,

—শকু, ৪র্থ অঙ্ক। সংযম বিনা আমাদের যে অস্ত্র সম্পদ নাই, তাহা, এবং তুমি যে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা, এবং বক্ষুবাক্যবের তগোচরে তোমার উপর এই সরলার যে অসীম স্নেহ-প্রবৃত্তি, তাহা চিন্তা করিয়া, রাজন্! তোমার ভাষ্যাগণের মধ্যে ইহাকেও অস্ত্রতমরূপে দেখিও। তার পর ইহার অদৃষ্ট।

তিনি জানিতেন। ঋষিগণ স্ব স্ব তপস্যার যে বর্ষাংশ রাজাকে দান করেন, সেই বর্ষাংশের ফল যে অক্ষয়, ইহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন; ঋষিগণের সত্য-নিষ্ঠা, শম-প্রধান চরিত্র, ধর্মভাব, কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং তাঁহার যে অযথাভাবে, শকুন্তলাকে মাজাইয়া পাঠান নাই, রাজার বরং ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার যে অভ্রান্ত, একথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তবুও তিনি, আত্ম-চরিত্রের উপর তাঁহার যে অটল বিশ্বাস ও অপরিমিত আস্থা, তৎপ্রাণদিত হইয়া, কিছুতেই শকুন্তলাকে স্বীকার করিতে পারিলেন না। আত্ম-সত্যের তাঁহার এত অধিক বিশ্বাস, এত অধিক নির্ভর ছিল। তিনি আর্ষা নৃপতি। তাঁহার সিংহাসন বিলাসের সানখ্য নহে। সে সিংহাসন ধর্মাসন, আর রাজা ধর্মের প্রতিমূর্তি। ধর্মের জন্ত তিনি ঋষিদিগের রোধানলে ভস্মীভূত হওনাকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাই তিনি কণ্ঠ শিখা-কর্কুক বিশেষ অঙ্গি ফিষ্ট হইয়াও বলিয়াছিলেন ‘আনার ত কিছুই নহে পড়ে না। আমি কি করিয়া, আনার আত্মাকে ফেত্রিহ দোষাপন্ন করিব?’—এই উক্তি রাজা দুষ্যন্তের নহে। বিনিসনাগ্নে আর্গ্যধর্মের প্রতিমূর্তি, ইহা তাঁহারই উক্তি। শকুন্তলা যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন-পূর্বক, রাজাকে কত পুাতন কথা স্মরণ করাইতে লাগিলেন, তখন, রাজা, নিজের অকণ্ঠ কুলের সর্বনাশ-ভয়ে, একান্ত ভীত হইয়া, কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—‘ভদ্র! কুলঙ্কবা তটিনী বেগন, জল অপবিত্র এবং তট-ওককে—পাতিত করে, তদ্রূপ, তুমি কেন আনার কুল এবং আনাকে নিরয়ে পাতিত করিতে চেষ্টা করিতেছ? কেন তোমার এ প্রয়াস?’ ঋষিগণ যখন ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন যে, হে সভাবাদিন্! তুমি যে, শকুন্তলাকে

১—শকু. ৫ম অঙ্ক। রাজা।

ব্যপদেশনাবিলয়িত্বং কিনীহসে জর্মনিং চ পাতিয়িত্বম্।

কুলঙ্কবেব সিগুঃ প্রসন্নমন্ততটকঞ্চ।’

বঞ্চনা করিলে, স্থির জানিও, ইহার ফল ব পাত। তখন, সত্য-প্রিয় পৃথিবীপতি, ধীর-হৃদয়ে উত্তর দিলেন,—‘পৌরবদিগের বিনিপাত অসম্ভব, এ কথা একান্ত অশ্রদ্ধেয়।’ রাজা তিনি, তাঁহার কি দৃঢ়তা, কি সহিষ্ণুতা, কি ধীরতা ?

একদিন সেই মারিনীতীরের বৃক্ষ-বাটিকাগত, পাদপাস্ত্রয়িত মুগ্ধমুগ্ধি ছ্যাস্তকে দেখিয়াছি, অহা আজ আবার এই প্রশান্তগম্ভীর প্রশান্ত-বারিধিবৎ অকম্পিত-হৃদয়, ধীর ছ্যাস্তকে দেখিলাম। একবার তাঁহার মোহময়ী অবস্থা দেখিয়াছি, এইক্ষণে আবার তাঁহার জ্ঞানময়ী অবস্থা দেখিলাম। যখন মোহ, তখন তাহা জগতে অতুল। আবার যখন জ্ঞান, তখন, তাহাও জগতে অতুল! যিনি মহান্, তাঁহার সকলই মহান্, সকলই বিচিত্র। তাঁহার সম্পদ্বি-বিপদ্বি—সবই অদ্ভুত।

যখন, ঋষিগণ, শকুন্তলাকে রাজার সমীপে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন, সত্য সত্যই ছ্যাস্ত মহা বিপদে পড়িলেন। অশরণা রমণীর অপরাধ কি? সে রমণীকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রাণান্তেও প্রস্তুত নহেন সত্য, কিন্তু সেই কাতরলোচনা! নয়নজলে, তাঁহার দয়ার্জ হৃদয় ঢঞ্চল হইল। তাঁহার হৃদয়-বৃত্তি ‘পর-পরিগ্রহ-সংলেশ-পরাধুখী’ সত্য, তবুও, কিন্তু সে দয়ার হৃদয় গমিল। তিনি তখন, অনাত্মোপায় হইয়া, কাতরহৃদয়ে ও যুক্ত-কণ্ঠে, পুরোহিতের শরণাপন্ন হইলেন। ‘অ্যাপনিই বলুন, এখন কর্তব্য কি?’—বলিয়া কুলপুরোহিতের উপদেশ-প্রার্থনা করিলেন। হায় ব্রাহ্মণ! একদিন ভারত-সম্রাটও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তোমার নিকটে কর্তব্যোপদেশ চাহিতেন! দীন-হীন হইয়াও তোমার এত ক্ষমতা, এত আধিপত্য ছিল। আজ তুমি কোথায় ?

কবি, পুরোহিতের নিকট রাজাকে কর্তব্য-জিজ্ঞাস করিয়া, রাজ-চরিত্রের অ্যার একটি সম্পন্ন কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

ক্রমে অঙ্গুরীয়ক-দর্শনে, রাজার শকুন্তলাকে মনে পড়িল। সেই মুগয়া,

সেই মালিনীভীর, সেই বন-তোষিণী, সপ্তপর্ণ-বেদিকা, ভ্রমর-বাণী,
সেই আশ্র-প্রকাশ, সখীদ্বয়ের অন্তর্ধান, শকুন্তলার বিনয়-ভূষিতা মূর্তি,
আর সেই—

‘পরিগ্রহ-বহুত্বেহপি দে প্রতিষ্ঠে কুলশ্র মে ।’

সমুদ্র-রশনা চোবরী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥

বলিয়া, তপোবনে ধন্য সাফল্য করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই
প্রতিজ্ঞা, এক একে রাজার মনে জাগিতে লাগিল। কিছু পূর্বে যে
রাজা কঠিন-কায় পরীক্ষার জার অনন্তবাহুদয় ছিলেন, তিনি একেবারে,
শিথিল বৃন্ত-পন্নবের মত হইয়া পড়িলেন। ‘নাজিকল্লণে বা বায়দ্বোপে’
যেমন ক্ষণে ক্ষণে, নূতন নূতন, বিশ্বয়-কর, প্রত্যেক-প্রধান পদার্থ প্রদর্শিত
হয়, মহাকবি, সেট ভাবে, ‘প্রতিক্ষণেই দুঃস্বপ্ন’ নূতন নূতন বিশ্বয়কর
চরিত্রাংশ দেখাইতে গেলেন। দর্শকগণ দুঃস্বপ্নের যখন যে মূর্তি
দেখিতেছেন, তাঁহাদের মনে হইতেছে, যেন গঙ্গা আর ভুলনা নাহি।

ক্রমে, দেবতাদের আগ্রহ স্বর্গধানিনী শকুন্তলার সহিত, মর্ত্যবাসী
দুঃস্বপ্নের নিলন হইল। দুঃস্বপ্ন-শকুন্তলার তাপিত হৃদয় নির্দীপিত হইল।
দর্শকগণেরও মনঃপ্রাণ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল। মহাকবি, অতি
কৌশলে, এই মিলনোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

ইহু, স্বর্গ হইতে মাতলিকে দিয়া নিজের রথ পাঠাইয়া দিলেন,
দানব-যুদ্ধ উপস্থিত, দুঃস্বপ্নকে স্বর্গে যাঠিতে হইবে। দুঃস্বপ্ন শকুন্তলার
চিন্তায় একান্ত বিনয়মান ছিলেন। কিন্তু মাতলির আশ্রানে তাঁহার
সে বৈমনস্ত তিরোহিত হইল। তিনি যেন ‘নবীভূত-বীরা’ হইয়া, স্বর্গে
যাত্রা করিলেন। যাত্রা-কালে, বীর-শ্রেষ্ঠ বীরের ভাষায়, ‘অমাত্য
পিপুনকে’ বলিয়া গেলেন—

২—শকু, ৩য় অঙ্ক। আমার বহু পরিগ্রহ থাকিলেও মনীয় কুলের প্রতিষ্ঠার কারণ
মাত্র দুইটি,—একটি সমুদ্র-মেখলা পৃথিবী, অষ্টটি তোমাদের এই সখী।

‘তন্-মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তু প্রজাঃ ।

অধিজ্যামিদমগ্ন্যস্বিন্ কৰ্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ’ ॥’

ভারতজ্যোতির এই বীরোক্তি-বিছাৎ-প্রভায় তদীয় সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর কিরীটমণি যেন একবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ।

‘স্বর্গের দানবযুদ্ধে জয়-লাভ করিয়া, ছ্যাস্ত, মহেন্দ্র-কর্তৃক অত্যধিক সম্মানিত ও আদৃত হইয়া, প্রসন্ন-হৃদয়ে, মাতলি-পরিচালিত ইন্দ্রথে মর্ত্তে প্রণাবৃত হইতেছেন । সমর-জয়ের উল্লাসে ছ্যাস্ত-হৃদয় সমুল্লসিত, তাহাতে আবার, মাতলি, সে উল্লাসের মাত্র আরও বর্দ্ধিত করিতেছেন । স্বর্গরাজ্য নিরাপন্ন হইল, ইন্দ্রের সম্মান রক্ষিত হইল । মাতলির আনন্দের সীমা নাই । ছ্যাস্তে উন্মুক্ত-হৃদয়ে কত কথা কহিতেছেন, কত আলাপ করিতেছেন, আর মহেন্দ্রে সেচ নিম্নলি উন্মুক্ত আকাশ-পথ বাহিয়া

গেছে । ছ্যাস্তের বিক্রম-কাহিনী স্বর্গরাজ্যের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগরুক । দেবগণ স্বাস্থ্য-সুন্দরদের অঙ্গপ্রাঙ্গণে, অবশিষ্ট বর্ণিকাছারা, কল্প-লতাগুণ্ডকে ছ্যাস্ত চরিত্রের ‘দীপক’ পদ্যাবলী রচনাপূর্ব্বক, লিখিতেছেন, অবসরক্রমে গান করিবেন । মাতলি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ছ্যাস্তকে তাহা দেখাইলেন । ছ্যাস্ত প্রসঙ্গান্তরে সে আশ্র-প্রশংসা অন্তরিত করিলেন । সে দিন স্বর্গে আসেন, সে দিন, অসুর-যুদ্ধের জন্ত মন অতিশয় উৎসুক ছিল, তাই স্বর্গ পথে অতুল শোভা সে দিন রাজা ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই । আজ চিত্ত প্রশস্ত, ছ্যাস্তের সেই দিকে

১—শকু. ৬ষ্ঠ অঙ্ক । তোনর প্রজা; অনন্তপরতন্ত্রভাবে রাজ্য পালন করক । কেননা, আমার এই অধিজ্য ধনু, অস্ত্র কাণ্ডো ব্যাপৃত হইল । রাজ-কার্য্য আর আপাততঃ আমি দেখিতে পারিব না ।

২—শকু. ৭ম অঙ্ক । মাতলিঃ ! অগ্ন্যস্বিন্ ! ইতঃ পথ—

বিচ্ছিত্তি-শেষেঃ সুরমন্মরীণাং বর্ণেরনী কল্পলতাগুণ্ডেষ্ণু ।

বিচিন্ত্য গীতস্বন্দমর্থজাতং বিবোকসম্বচরিতং লিপতি ॥

দৃষ্ট পড়িল । তিনি স্থির-নয়নে, স্বর্গ-পথের সেই অমূল্য সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন । মেঘের উপর দিয়া রথ চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জলদ-গাত্রে সৌদামিনী খেলা করিতেছে, আর তাহার সেই দেহ-জ্যোতিঃ আসিয়া রথের অধ-গাত্রে পতিত হওয়ায়, অশ্বরাজি, এক এক বার জ্যোতির্থায়ায় স্নাত হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য্যপ্রিয় রাজা, মাতলিকে তাহা দেখাইতেছেন । রথ অনেক উর্দ্ধে, পৃথিবী তাহার অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে । পৃথিবীর কোন গন্ধও তত দূরে উঠিতে পারে না । মর্তের ভাবনা, মর্তের হর্ব-বিবাদ, প্রণয়-বিরহ, হৃৎ-দারিদ্র্য—মর্তের আত্মার্থ-প্রবৃত্তি, পরার্থ-বিশেষ, পর শ্রী-কাতরতা,—যাহার হৃদয়ে বিরাজমান, প্রদূষ ব্যক্তি বুঝি, সে নির্মল শাস্ত আকাশমার্গের পথিক হইতে পারে না, তাই ছদ্মস্তের হৃদয় হইতে, মর্তের সনন্ত ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে । মর্তের কথা তিনি একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছেন । তিনি সাফাৎ চৈতন্যময় পুরুষরূপে, উর্দ্ধে, অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ পথ দিয়া চলিয়াছেন, আর অচৈতন্য জড় জগৎ, তাহার নিম্নে, অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে । ইহা এক বিরাট দৃশ্য ! কবির কল্পনা যে কত ব্যাপিনী, কত শক্তিশালিনী, ইহা তাহারই উজ্জল দৃষ্টান্ত । নিবিষ্ট-মনে ভাবিলে মনে হয়, মহাকবির শক্তিমত্তী কল্পনা-সুন্দরী যেন স্বর্গমর্ত জুড়িয়া বসিয়া আছেন, স্বর্গমর্ত ব্যাপিয়া, তাহার সৌন্দর্য্যে মগ্নি-মাগিকা-পতিত চক্ষুঃপ্ৰাণ প্রলম্বিত করিয়াছেন, আর বিশ্বস্থ ভাবৎ পদার্থ,—জীব, জন্তু, কল্পনা-সুন্দরীর সেই দ্বিধা, কিরণমালী চক্ষুঃ-তপের অস্বাদেশে থাকিয়া, উদ্ভ্রান্ত-ভাবে, উর্দ্ধ-নয়নে, তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে । দেখিতে দেখিতে, কখনো পুলকিত, কখনো স্তম্ভিত, কখনো বিস্মিত, কখনো আবার বিমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হইতেছে । কবির স্বর্গ-পর্য্যন্ত ব্যাপিনী কল্পনার মোহন-মন্ত্র-প্রভাবে দর্শক-গণের হৃদয় যেন স্বর্গীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে । সে হৃদয় হইতে, মর্তের ভাবনা, মর্তের কল্পনা দূর হইয়া যাইতেছে । যখন দর্শকগণের হৃদয়, এই প্রকারে,

স্বর্গের বিমল-দীপ্তিতে দীপ্তিময়, সেই সময়ে, সেই নির্মল-শান্ত হৃদয়ে, কবি, তাঁহার স্বীয় আবিপত্য, প্রভাব, বিস্তার করিয়া লইতেছেন। মনের মত শিক্ষা-দীক্ষার, সে হৃদয় শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিতেছেন। দর্শক বুঝিতেছেন না, সে, তাঁহার মর্ত্য-হৃদয়, কবির অনুকম্পায় স্বর্গ্য-হৃদয়ে রূপিণীত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, ইহা মহাকবির এক বিরাট দৃশ্য। শক্তিমতী, স্বর্গমর্ত্যবাণিনী কল্পনা সুন্দরীর প্রাঞ্জল মূর্তি !

একবার রত্নবংশ, লঙ্ক-সমর-বিজয়ের পর রামসীতা যখন, পুষ্পকা-গোহে আকাশপথে অবোধ্য প্রত্যাগত হয়েন, তখন কবির কল্পনার এই প্রাঞ্জলমূর্তি দেখিয়াছিলাম। শত্রুক্ষয় হইয়াছে, সীতার উদ্ধার হইয়াছে, রাম-সীতা পুনর্মিলিত হইয়াছেন। সীতা সাধ্বী, পতিব্রতা, রামও নিঃশঙ্কচিত্ত, দয়াময়,—হুইজনে এক হইয়া, একপ্রাণ হইয়া মর্তের শোভা দেখিতে দেখিতে, স্বর্গপথে চলিয়াছেন, তাঁহার অনেক উপরে,—আর পৃথিবী তাঁহাদের অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে। সেই একবার দেখিয়াছিলাম, নিম্নে জড়জগৎ, আর উর্দ্ধে, চৈতন্তময় পুরুষ। আর এই আর একবার দেখিলাম।

দেখিতে দেখিতে রথ অনেক দূরে আসিল। মর্তের অস্পষ্ট মূর্তি ছব্যস্ত্রা নরন-গোচর হইল। ছব্যস্ত্র, সেই দুঃবর্তিনী, দৈব-প্রতীক্ষমানা-বয়না ধরণীর ‘উদাররমণীয়া’ মূর্তি মাতলিকে দেখাইলেন। নিমেষমধ্যে, ‘অদূরে, ‘কনক-রস-নিশ্চন্দী,’ ‘পূর্বাপর-সমুদ্রাবগাহী,’ ‘সাক্ষামেষ-পরিষবৎ’ এক রক্তবর্ণ পর্বত পরিদৃষ্ট হইল। ছব্যস্ত্র মাতলিকে ঐ পর্বতের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি কহিলেন, আয়ুয়ন্! ঐ পর্বতের নাম হেমকূট, উহা কিংপুরুষবর্ষের সীমান্তবর্তী। ঐ পর্বত তপস্বিপের প্রধান সিদ্ধিক্ষেত্র। ভগবান্ কশ্যপ দেবমাতা অদিতির সহিত, ঐ পর্বতে তপস্তা করেন। রাজা কহিলেন ‘পূজার পূজাব্যতিক্রম অবিধেয়! রথ স্থির কর, ভগবান্ ও ভাবতীকে প্রণাম করিয়া যাই।’ রথ স্থির হইল।

রাজা অবতীর্ণ হইয়া মাতলির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন । রাজ্য ইজের অমরাবতী দেখিয়াছেন, নন্দনবন দেখিয়াছেন, 'কিন্তু এমন নিবৃত্তিময় স্থান তিনি আর দেখেন নাট । তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন অমৃত-ব্রহ্মে অবগাহন করিতেছেন । মাতলি যাটতে যাটতে, কঠোর-তপস্ত্রাযগ্ন ঋষিদিগের তপোবন-ভূমি রাজাকে দেখাইলেন । রাজা বিশ্বকর্মা পূর্ণ-নয়নে দেখিলেন,—দেখিলেন, শ্রেণিবদ্ধভাবে করপাদপ রাজি দণ্ডায়মান, কাহার কোন অভিলাষই তাহার অপূর্ণ রাখে না, তবুও তাহার নিম্নে বসির ঋষিগণ অনিলাশনে প্রাণবাত্রা নির্বাহ করেন, কাঞ্চন পদ্ম-পরাগ-বাসিত সলিলে স্নানাদি করেন, রত্ন-শিলাভূলে বসিয়া ধ্যান করেন, অপ্সরোমণ্ডলীর মধাবর্তী থাকিয়াও সংযম-রক্ষা করেন । দেখিলেন, অপরাপর মুনিগণ, বাদৃশ নিবৃত্তিময়, সুখময়, পবিত্র স্থান লাভ করিবার বাদনায়, অনন্তকাল যাবৎ, কত কঠোর তপস্ত্রায় শরীর-পাত করেন, এই সকল ঋষি বাদৃশ স্থানে থাকিয়াও তপস্ত্রা রত । রাজা আশ্চর্য্যম্বিত হইলেন । মাতলি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপুরুষগণের প্রার্থনা উত্তরোত্তর-পরিবর্দ্ধিনী ও উদ্ধগামিনী । সেই মতে, মালিনীতটে, একদিন কধাশ্রম দেখিয়াছিলেন, আর আজ কণ্ডুপাশ্রম দেখিলেন । কধাশ্রমে প্রায়ঃ বনগোষিণী দেখিয়াছিলেন, অথবা সুধু বনগোষিণী কেন, তথায় বাহা বাহা দেখিয়াছিলেন, 'সে সমস্তই নশ্বর, মরণধন্য! আর এখানে বাহা বাহা দেখিলেন, সে'

—শকু, ৭ম অঙ্ক ।

••

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরচিতঃ সংকল্প-বৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চন-পদ্মরেণু-কপিশে ধর্মাভ্যেক-ক্রিয়া ।
ধ্যানং রত্ন-শিলাভূলেষু বিবৃষন্তীসন্নিধৌ সংযমঃ
সং-ভাজ্যন্তি তপোভিরন্তমুনয়ন্ত্যি-তপস্ত্রাস্তানী ।

সরসী অবিনশ্বরী, অমর । রাজার হৃদয় শান্তিরসে আগ্রাসিত হইল ! তিনি, এক মহান্ আবেশময় ভাবস্রোতে ভাসিয়া গেলেন ।

মাণ্ডলি জিজ্ঞাসী করিয়া জানিলেন, ভগবান্ কশ্যপ, মহর্ষিপত্নীগণ-পরিবেষ্টিত। দাক্ষায়ণী অদিতিকে পতিব্রতা-ধর্ম্মের উপাখ্যান শ্রবণ করিতেছেন । রাজা শুনিলেন, বুঝিলেন যে, পতিব্রতার মহাশ্রদ্ধা কি অদ্ভুত । স্বয়ং দেবমাতা অদिति পতিব্রতা ধর্ম্ম গুণবান্, আর দেবপিতা ভগবান্ মারীচ সেই ধর্ম্মের বক্তা ! এই স্বর্গাধিক-পতিব্রতার আশ্রমেও পতিব্রতার এত আদর, এত পূজা ! রাজা বুঝিলেন যে, পতিব্রতা কানিনী ধাতা, পূজনীয়া । ক্রমে সেই আশ্রমের এক অশোকবৃক্ষ নূতন রাজা দাঁড়াইলেন, আর মাণ্ডলি, ভগবান্ মারীচের দর্শন লাভের অবসর দেখিতে গেলেন ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

পুনর্মিলন ।

বহুকাল পূর্বে, মর্ত্তে সেই কথের আশ্রমে, এক দিন এমনি ভাবে, একাকী এক বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া, রাজা শকুন্তলার প্রথম সাফাৎকার লাভ করিয়াছিলেন । সে অনেক দিনের কথা । তার পর কত কি হইয়া গিয়াছে ! দুব্যস্ত-জীবনের কত স্বপ্ন অতীত হইয়াছে ! আজ কোথায় সে শকুন্তলা ! সেই এক দিন দাঁড়াইয়াছিলেন, আর আজ আবার, ঠিক তেমনি ভাবে, একাকী আশ্রমের অশোকপাদপমূলে দাঁড়াইয়াছেন ! রাজার হৃদয়ে, যেন কি একটা পুরাতনী ছায়া আসিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে । রাজা ভাল করিয়া, কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না, উদ্ভ্রান্তভাবে একাকী দাঁড়াইয়াই আছেন । এমন সময়ে আবার সেই ছুট দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল । সেই যখন, কথাশ্রমে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখনও এই বাহু, এমনই ভাবে কাঁপিয়াছিল ! নিমেষমধ্যে রাজার হৃদয়ে যেন একটা তড়িত খেলা করিয়া গেল । তিনি সে তড়িদ্বিলাসে প্রথমে চকিত, পরে কাতর হইয়া পড়িলেন । ভগ্ন-হৃদয়ে কহিলেন, আর কেন ? বাহু, কেন বুঝা স্পন্দন ? আমার ত আর কোন অভিনাবই নাট, তুমি কি পূর্ণ করিবে ? যাহার অভিনাব ছিল, তাহাকে ত হারাষ্টয়াছি ! তুমি কি আমাকে সেই ‘পূর্বাবধীরিত’ শ্রেয়ঃ মনে করাইয়া, অধিকতর দুঃখিত করিবার নিমিত্তই আবার স্পন্দিত হইতেছ ? রাজা মনে মনে, এই ভাবে, সেই অবধীরিতা শকুন্তলাকে স্মরণ করিতেছিলেন,—এমনই সময়ে, নেপথ্যে যেন কে

১—শকু, ৭ম অঙ্ক । নন্দারথায় নাশংসে কিং বাহে ! স্পন্দসে মুখা !

পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ঃ দুঃখং হি পরিবর্ততে !

বলিয়া উঠিল ‘চপলতা করিও না, ইহারই মধ্যে আপন স্বভাব পাইয়া বসিলে ?’ রাজা অবাক্ হইলেন ! কে চপলতা করে ? কে আপন স্বভাব পাইয়া বসিল ? ইহা ত শাস্ত আশ্রম, এ স্থানে ত কাহারও প্রকৃতি চপল হইতে পারেনা । তবে কে কাহাকে এমন কথা বলিল ? রাজা একান্ত উন্মনা হইলেন ।

দৃশ্যস্ত ! ‘আপনি পৃথিবীর রাজা, পরমজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত পুণ্য আশ্রমে উপস্থিত । আপনার বাহু স্পন্দিত হইল, তাহাতে আপনি বিস্মিত কেন ? চাপলা-প্রযুক্ত বাহকে দোষারোপ কেন ? প্রকৃতির নিয়মে বাহা ঘটতেছে, তাহাতে কটাক্ষ কেন ? আপনি স্বর্গে আসিয়াছেন, মর্তের রীতি-নীতি ভুলিয়া বান, মর্তের কথা ভুলিয়া বান, আসিতে না আসিতেই মর্তের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন কেন ?—এই ভাবে যেন, কবির বাক্য-ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল ।

মালিনীতটে, পরমতপাঃ কশ্যপবংশীয় কণ্ঠের আশ্রমে বাহু-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা শুনিয়াছিলেন ‘ইদো ইদো সহায়ো ।’ সেই শকুন্তলার প্রথম কথা । আর আজও কশ্যপাশ্রমে বাহুস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলেন ‘মাক্ষু চাপলং করস্ব’ ইহাও শকুন্তলা-পুল্লের প্রথম পরিচয়-ধ্বনি । সে বারেও প্রথমে রমণীর কণ্ঠ । এবারেও প্রথমে রমণীর কণ্ঠ । তবে প্রভেদ এই, সে বার সে মধুর স্বরলহরী শকুন্তলার নিজের, আর এবার শকুন্তলা-তনয়ের পরিচারিকার । সে বার প্রথমোদ্যমেই শকুন্তলাসন্দর্শন, আর এবার, প্রথম শকুন্তলা-তনয়ের পরিচারিকার, পরে শকুন্তলা-তনয়ের, তার পর, অনেক দূরে, শকুন্তলার পুনঃসন্দর্শন লাভ । সে বার সাক্ষাৎ মর্তে, এবার সাক্ষাৎ স্বর্গাধিক পবিত্রতর মারীচাশ্রমে । কথ মহর্ষি কশ্যপের অর্থাৎ মারীচের, সগোত্র, অদ্বস্তন পুরুষ । সে বার যে বংশের অদ্বস্তন পুরুষের আশ্রমে শকুন্তলা প্রাপ্তি হইয়াছিল, এবার সেই বংশের আদি ও প্রধান পুরুষের আশ্রমে তাঁহার পুনঃ প্রাপ্তি ঘটিল । অদ্বস্তনের আশ্রমে প্রথম মিলন,

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

উপসংহার ।

“যখন ছ্যাস্ত এবং শকুন্তলা প্রথম আমাদের দৃষ্টিপথে আবিভূত, তখন উভয়েই আমরা বিকাসোন্মুখ মুকুলের মতন দেখিতে পাই। উভয়েই যেন একটি বিশেষ অবস্থার দিকে খাইতেছেন। যেন একটি বিশেষ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন, পড়িলেন, যেন প্রশ্নাত্মরূপে মুক্ত হইলেন, হইলেন, যেন উষা ভাঙ্গিয়া দীপালোকে প্রকাশ হয়, হয়। দেখিতে দেখিতে মুকুল যেমন ফুটিয়া পড়ে, ছ্যাস্ত এবং শকুন্তলার সেই অস্ফুটরাগও তেমনি পূর্ণ গৌরবে প্রদীপ্ত হইল, যেন উষার অস্ফুটরাগ মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদধিকারী কিরণ রূপে রাগিয়া উঠিয়া দিগ্দ্গন্ত অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছে, ছ্যাস্ত এবং শকুন্তলা সেই বিষম অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া, তৃণ-নির্মিত পুতলির স্তায় ধূ ধূ করিয়া জলিয়া সাইতেছেন। যেন তাঁহাদের জ্ঞান নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই; যেন তাঁহারা জড়জগতের জড়ত-নাত্র! সহসা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তন। কোথা হইতে যেন এক অসীম-ভেজঃসম্পন্ন জ্ঞানময় অনন্তপুরুষ আসিয়া সেই অগ্নিরাশি নিবাইয়া দিল,—বিশ্বব্রহ্মাও যেন প্রলয় তিমিরে ডুবিয়া গেল, সেই মহাপ্রলয়ে শকুন্তলা কোথায়—তাঁহার ঠিকানা নাই; ছ্যাস্ত প্রলয়বস্ত্রণার প্রতিমূর্ত্তি ন্যায় প্রলয়ধীন! অকস্মাৎ এক মহাবাক্য শ্রুত হইল! ছ্যাস্ত হতভম্ব ভেদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিশ্বব্রহ্মাও হাসিয়া উঠিল, স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল, অপূর্ণ প্রভায় প্রভাসিত ল। সেই অপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে, সেই স্বর্গীয় আলোকে, সেই হেমকূট শিখরস্থিত বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যপ্রমে ছ্যাস্ত এবং শকুন্তলা প্রতিপন্নভাবে দণ্ডায়মান,—উভয়েই পাণ্ডবর্ণ, উভয়েই শীর্ণ-দেহ, বিমর্ষ, পীন অতি নির্মল জ্যোতির্ময় পরমাত্মস্থিত দুইখানি পবিত্র চেতনা-খণ্ড! কি দেখিয়া

লিলাম, আবার কি দেখিতেছি ! বসন্তের রাগ-গর্ভ মুকুল শরতের ত্রিমাণ :
 কুসুমের পরিণত হইয়াছে ! রাগময়ী জড়তা বিষ্ময়-ভাবে পরিণত হইয়াছে !
 পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়াছে ! পৃথিবী হইতে স্বর্গ এই অদ্ভুত নাটকের
 রঙ্গভূমি ! পৃথিবী হইতে স্বর্গ এই মহাকবির মহাশব্দের আকার ! পৃথিবী
 হইতে স্বর্গ এই মহাদর্শকের মহাদৃষ্টির পরিমাণ ! এই জড়তাময় পৃথিবী,
 এবং এই আবার দিব্যালোক-পূর্ণ স্বর্গ ! যিনি এই জড়তাময় পৃথিবী
 চরণে দলিত করিতে পারেন, এই দিব্যালোক-পূর্ণ স্বর্গ তাঁহারই, তিনিই
 এই দিব্যালোক-পূর্ণ স্বর্গের নিষ্কাশকর্তা । যিনি এই জড়তাময় পৃথিবীর
 প্রতি অস্বাভাবিক পুরুষের ভ্রায় ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই এই
 পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন করেন ! প্রকৃতি এবং পুরুষ, পরস্পর স্বাধীন ।
 কিন্তু যিনি প্রকৃতিকে পুরুষের শাসনাধীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত
 পুরুষ । ছয়সত্ত্ব প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিলেন ।
 মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া
 দেখাইয়াছেন । সে চিত্রের বিস্তার পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত । সে
 চিত্রে গ্রীক নাটকের আকারগতি সৌন্দর্য্য, জম্মাণ নাটকের প্রণালীগত
 ধর্ম্মাত্মিকতা, এবং ইংরাজী নাটকের কার্য্যগত জীবন্ততাব পূর্ণমাত্রায়
 পরিলক্ষিত হয় । সেট সৌন্দর্য্যপূর্ণ, ভাবগম্য গড়-রহস্য-ব্যঞ্জক মহা-
 পট্টের নাম অভিজ্ঞান শকুন্তল'

—বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ; ১২৮৮



